মহারাজ রাজবল্লভ সেন

ও

তৎসমকালবর্ত্তী বাঙ্গলার ইতিহাসের স্থূল স্থূল বিবরণ

দ্বিতীয় সংস্করণ

শ্রীরসিকলাল গুপ্ত, বি, এল,

প্রণীত।
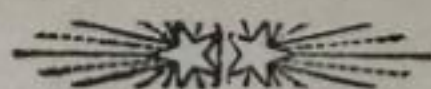
৮২ নং কলেজ ষ্ট্রীট, কলিকাতা

রায় এণ্ড কোম্পানী কর্ত্তৃক প্রকাশিত।

প্রথমবারের বিজ্ঞাপন

ভগবানের ইচ্ছায় অন্ন সংস্থানের নিমিত্ত আমাকে বঙ্গের রাজধানী ও প্রধান প্রধান নগর হইতে সুদূরে অবস্থান করিতে হইতেছে। এজন্য বৃত্তান্ত সংগ্রহবিষয়ে অনাবশ্যকরূপে অনেক অর্থব্যয় ও বিলম্ব সংঘটিত হইয়াছে। বৎসরাধিককাল চেষ্টা ও বন্ধুবর্গের সাহায্যে, অবশেষে যে কৃতকার্য্যতা লাভ করিতে সমর্থ হইয়াছি, তাহা নিরতিশয় সশঙ্কচিত্তে সাধারণের গোচরে উপস্থাপিত করিলাম। এতদ্বারা পাঠকবর্গের কিয়ৎ-পরিমাণে মনোরঞ্জন সাধিত হইলেও সমস্ত পরিশ্রম সার্থক মনে করিব।

যে যে মহাত্মা এই ব্রতে আমাকে সাহায্য প্রদান করিয়াছেন, তন্মধ্যে বিক্রমপুর মালখানগর নিবাসী শ্রীযুক্ত কিশোরীমোহন বসু, ঐ পরগণার অন্তর্গত সানসিদ্ধি নিবাসী শ্রীযুক্ত শ্যামাকান্ত মিত্র, ঢাকা কলেজিয়েট স্কুলের সহকারী হেডমাষ্টার পণ্ডিতবর শ্রীযুক্ত হরিমোহন সেন, বি, এ, গৌহাটী জেলার গবর্ণমেণ্ট উকিল, মহারাজ বংশপ্রভব শ্রীযুক্ত কালীচরণ সেন, বি, এল, বিক্রমপুর পালঙ্গনিবাসী মহারাজ-বংশপ্রভব শ্রীযুক্ত প্রতাপচন্দ্র সেন, ঐ পরগণার অন্তর্গত ভূতপূর্ব্ব জপসানিবাসী শ্রদ্ধাস্পদ শ্রীযুক্ত আনন্দনাথ রায় ও শ্রীযুক্ত যতীনাথ রায়, পণ্ডিতবর শ্রীযুক্ত বাবু উমেশচন্দ্র গুপ্ত বিদ্যারত্ন, স্নেহভাজন শ্রীমান বসন্তকুমার সেন, বি, এ, ভক্তিভাজন শ্রীযুক্ত রামচরণ কাব্যতীর্থ মহাশয়গণের নাম সমধিক উল্লেখ যোগ্য। কাব্যতীর্থ মহোদয় এই পুস্তকের আদ্যোপান্ত পাঠ করিয়া যথাস্থানে সংশোধন করিয়া দিয়াছেন।

বিভারিজ সাহেব কৃত "বাকরগঞ্জের ইতিহাস," আর, কেম্বে্র কোম্পানী কর্ত্তৃক প্রকাশিত হাজি মাস্তাফা সাহেব কৃত, "সায়র মোতাক্ষরীণ" নামক

পারস্ত ভাষায় লিখিত সুপ্রসিদ্ধ ইতিহাসের ইংরেজী অনুবাদ, হাণ্টার সাহেব প্রণীত ঢাকা, মুরশিদাবাদ, বাকরগঞ্জ, ফরিদপুর প্রভৃতি জেলার "ষ্টাটিস্‌টিকেল একাউণ্ট," অর্ম্ম সাহেব প্রণীত "ইন্দুস্তান" নামক ইংরেজী ইতিহাস, ষ্টুয়ার্টসাহেব প্রণীত "বাঙ্গালার ইতিবৃত্ত", ৺কার্ত্তিকেয়চন্দ্র রায় প্রণীত "ক্ষিতীশ বংশাবলী", মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কার প্রণীত "রাজাবলী," চন্দ্রকুমার রায় প্রণীত "মহারাজ রাজবল্লভ," লং সাহেব প্রণীত "অপ্রকাশিত সরকারী রিপোর্ট," নিখিলবাবুর "মুরশিদাবাদ কাহিনী," অক্ষয় বাবুর "সিরাজউদ্দৌলা," পণ্ডিত উমেশচন্দ্র বিদ্যারত্ন প্রণীত "জাতিতত্ব-বারিধি" প্রভৃতি গ্রন্থ অবলম্বন করিয়া এই পুস্তক বিরচিত হইয়াছে। মৌলবী আব্বাস সালেম সাহেব এপর্য্যন্ত "রিয়াজুসেলাতিনের" যে ইংরেজী অনুবাদ প্রচার করিয়াছেন, তাহাতে মাত্র মুরশিদকুলী খাঁর রাজত্বকাল পর্য্যন্ত বর্ণিত আছে। শ্রীযুক্ত বাবু হরিমোহন সেন মহাশয় মালদহ জিলাস্কুলের প্রধান শিক্ষকের পদে নিযুক্ত থাকা কালে, ঐ বিদ্যালয়ের প্রধান মৌলবী দ্বারা, ঐ গ্রন্থে বর্ণিত আলিবর্দ্দী হইতে মীর কাশেম পর্য্যন্ত রাজত্বকালের ইংরেজী অনুবাদ করাইয়া আমাকে প্রেরণ করিয়াছিলেন, উপায়ান্তর অভাবে আমি অগত্যা তাহাই অবলম্বন করিয়াছি। হাজি মস্তাফা সাহেব কৃত ইংরেজী ভাষায় অনুদিত "সায়র মোতাক্ষরীণের" প্রয়োজনীয় অংশসমূহ পারসিক ভাষায় প্রণীত মূল গ্রন্থের সহিত তুলনা করিয়া অনুবাদের বিশুদ্ধতা পরীক্ষা করিয়া লইয়াছি।

মহারাজ রাজবল্লভের উত্তরপুরুষগণের পালঙ্গ গ্রামস্থিত বর্ত্তমান আবাস স্থলে, তদীয় জীবনী সম্বন্ধে যে হস্তলিখিত পুস্তক বিদ্যমান আছে, তাহা এবং প্রচলিত কিংবদন্তীর প্রতি অনেক পরিমাণে নির্ভর করিতে হইয়াছে। সাময়িক পত্রিকায় রাজবল্লভ সম্বন্ধে যে সমস্ত প্রবন্ধ প্রচারিত হইয়াছে, তাহা সংগ্রহ করিতেও যথাসম্ভব চেষ্টা করিয়াছি।

যে রাজপুরুষের জীবনী এই পুস্তকে বর্ণিত হইয়াছে তিনি মুসলমান শাসনের অন্তিম সময়ে পূর্ব্ব বাঙ্গালার অদ্বিতীয় ব্যক্তি। তাঁহার জীবন-কালে মুরশিদকুলী খাঁ হইতে মীরকাশেম পর্য্যন্ত ক্রমে ছয়জন নবাবের আবির্ভাব ও তিরোভাব হইয়াছে। ইহা বাঙ্গালার রাজনৈতিক ইতিহাসের এক বিপ্লবপূর্ণ যুগ। ঘটনা পরম্পরার সামঞ্জস্য রক্ষা করিবার উদ্দেশ্যে সেই সমস্ত শাসনকর্ত্তৃগণের শাসনকালের স্থূল স্থূল বিবরণ লিপিবদ্ধ করিতে বাধ্য হইয়াছি। কিন্তু প্রচলিত ইতিহাসে যে সমস্ত ঘটনা বিশদরূপে বর্ণিত হইয়াছে তাহার আভাস মাত্র এই পুস্তকে সন্নিবিষ্ট হইল।

"সায়র মোতাক্ষরীণ" ১৭৮০ খৃষ্টাব্দে বিরচিত হইয়াছিল। সৈয়দ গোলাম হোসেন খাঁ নামে জনৈক সম্ভ্রান্ত মুসলমান এই গ্রন্থের রচয়িতা। গ্রন্থকার আলিবর্দ্দী, সিরাজউদ্দৌলা, মীরজাফর ও মীরকাশেমের সমসাময়িক এবং তাঁহাদের সম্পর্কান্বিত। সেই সময়ের অনেক ঘটনা তিনি প্রত্যক্ষ করিয়া লিখিয়াছেন। তাঁহার লিখিত বৃত্তান্ত পাঠে প্রতীয়মান হয় যে, ঐতিহাসিক সাধুতা রক্ষা বিষয়ে তিনি বিশেষ যত্নবান ছিলেন এবং আত্মীয়তার অনুরোধে তিনি কখনও ইচ্ছাপূর্ব্বক সত্যের সীমা লঙ্ঘন করেন নাই। মোসিও রেমণ্ড নামক ইসলাম ধর্ম্মে দীক্ষিত জনৈক ফরাসী, ১৭৮৯ খৃষ্টাব্দে এই গ্রন্থের ইংরেজী অনুবাদ করেন। মুসলমান ধর্ম্ম অবলম্বন করিয়া তিনি "হাজি মস্তাফা" নাম গ্রহণ করিয়াছিলেন। আলিবর্দ্দী হইতে মীরকাশেম পর্য্যন্ত নবাবগণের শাসনকালের অনেক ঘটনা তিনিও প্রত্যক্ষ করিয়াছেন। স্বীয় অভিজ্ঞতার প্রতি নির্ভর করিয়া, হাজি মস্তাফা সাহেব স্বকৃত অনুবাদের সহিত যে মন্তব্য প্রকাশ করিয়াছেন, তাহাও ঐতিহাসিক হিসাবে সমধিক মূল্যবান।

"রিয়াজু সেলাতিন" নামক ইতিহাসে বাঙ্গলা দেশের বিবরণ লিপিবদ্ধ হইয়াছে। গোলাম হোসেন সালিম সৈদপুরী পারস্য ভাষায় এই পুস্তক

রচনা করেন। তবে তিনি যে ১৮১৭ খৃষ্টাব্দে পরলোক গমন করিয়াছেন তৎসম্বন্ধে অনুমাত্রও সন্দেহ নাই। এই গ্রন্থকারের আদিম নিবাস অযোধ্যা প্রদেশে। পশ্চাৎ তিনি মালদহে গৃহ প্রতিষ্ঠা করিয়া সে স্থলে ডাকমুন্সির কার্য্য করিতেন।

অর্ম্ম সাহেবের প্রণীত "ইন্দুস্তান" অতি উপাদেয় ইতিহাস। তিনি ঐতিহাসিক সাধুতা রক্ষা করিতে যথেষ্ট চেষ্টা করিয়াছেন। অর্ম্মসাহেবও অনেক ঘটনা প্রত্যক্ষ করিয়া লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। স্থানে স্থানে তাঁহার লিখিত বৃত্তান্ত সহিত "সায়র মোতাক্ষরীণ" ও রিয়াজু সেলাতিনে" লিখিত বৃত্তান্তের অনৈক্য হইয়াছে। বিদেশীয় লেখকের পক্ষে যে সমস্ত ভ্রম প্রমাদ হওয়ার সম্ভাবনা, অর্ম্ম সাহেবের লিখিত ইতিবৃত্তে তাহার অভাব নাই। কিন্তু ঐতিহাসিক হিসাবে "ইন্দুস্থানের" মূল্য "সায়র মোতাক্ষরীণ' ও "রিয়াজু সেলাতিন" অপেক্ষা কোন অংশেই ন্যূন নহে।

রেভারেণ্ড জে লং সাহেব যে "ভারত-গবর্ণমেণ্টের অপ্রকাশিত রেকর্ড" প্রচার করিয়াছেন, তাহা হইতে বর্ণিত সময়ের অনেক রহস্য জ্ঞাত হওয়া যায়। দুঃখের বিষয়, তিনি সমস্ত রেকর্ড সংগ্রহ করিতে সমর্থ হন নাই। রেকর্ডের কিয়দংশ ১৭৩৭ খৃষ্টাব্দের প্রবল বন্যায় জলমগ্ন হইয়াছে, এবং কতক ১৭৫৬ খৃষ্টাব্দে সিরাজ কর্ত্তৃক কলিকাতা আক্রমণের সময় বিলয় প্রাপ্ত হইয়াছে। আধুনিক ইংরেজ লেখকগণ বাঙ্গালাদেশ সম্বন্ধে যে সমস্ত ইতিবৃত্ত প্রচার করিতেছেন, তাহার অধিকাংশই এই রেকর্ড, সায়র মোতাক্ষয়ীণ, রিয়াজু সেলাতিন এবং ইন্দুস্তান অবলম্বনে লিখিত।

৺চন্দ্রকুমার রায়, মহারাজ রাজবল্লভের যে জীবনী প্রণয়ন করিয়াছেন, তাহাতে লিখিত আছে যে, ৺গুরুদাস গুপ্ত মহাশয় বাঙ্গালা ভাষায় এবং অন্য এক ব্যক্তি পারস্য ভাষায় এই রাজপুরুষের জীবনবৃত্তান্ত লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন। দুঃখের বিষয় বিস্তর চেষ্টা করিয়াও তাহা সংগ্রহ

করিতে পারি নাই। চন্দ্রকুমার রায় মহাশয়ের প্রণীত জীবনীর স্থানে স্থানে ঐতিহাসিক প্রমাদ দৃষ্ট হয় সন্দেহ নাই, কিন্তু বর্ত্তমান পুস্তক প্রণয়ন বিষয়ে উক্ত গ্রন্থ হইতে আমি অনেক সাহায্য প্রাপ্ত হইয়াছি।

বাকরগঞ্জের ভূতপূর্ব্ব ডিষ্ট্রীক্ট্ ম্যাজিষ্ট্রেট শ্রীযুক্ত বিভারিজ সাহেব বাহাদুর "বাকরগঞ্জের ইতিহাস" নামে যে পুস্তক রচনা করিয়াছেন, সেই পুস্তকের স্থানে স্থানে রাজবল্লভ সংক্রান্ত বৃত্তান্ত লিপিবদ্ধ আছে। আবশ্যক মতে সে গ্রন্থ হইতেও অনেক কথা সংগ্রহ করা হইয়াছে।

রাজনগরের "নবরত্ন", "পঞ্চরত্ন", সপ্তদশরত্ন", "একবিংশতিরত্ন" প্রভৃতি অট্টালিকা, সৌন্দর্য্য ও স্থপতি কৌশলের নিমিত্ত বাঙ্গলা দেশে সবিশেষ খ্যাতিলাভ করিয়াছিল। প্রায় ৩৫ বৎসর হইল পদ্মার স্রোতঃ প্রবাহে তাহা সমস্ত নিমজ্জিত হইয়া অতীতের বিষয়ীভূত হইয়াছে। সেই সমস্ত অট্টালিকার প্রতিকৃতি সংগ্রহ করিবার নিমিত্ত অনেক চেষ্টা করিয়াও কৃতকার্য্য হইতে পারি নাই। এই পুস্তকে সেই সমস্ত প্রতিকৃতি সন্নিবিষ্ট করিতে পারিলে, রাজনগরের অট্টালিকা সমূহের সৌন্দর্য্য সহজে উপলব্ধ হইত, সন্দেহ নাই।

রাজবল্লভের স্বাক্ষরযুক্ত যে দানপত্রের প্রতিলিপি এই গ্রন্থে সন্নিবিষ্ট হইয়াছে, তাহা তাঁহার অনন্তরবংশ্য শ্রীযুক্ত কালীচরণ সেন, বি, এল, মহাশয় সংগ্রহ করিয়া দিয়াছেন। ভরসা করি এই স্বাক্ষর অনেকের নিকট আদরণীয় হইবে।

পণ্ডিতবর উমেশচন্দ্র বিদ্যারত্ন ও সুলেখক শ্রীযুক্ত বাবু দীনেশচন্দ্র সেন, বি, এ মহাশয়গণ রাজবল্লভের জীবনী সঙ্কলন করিতে প্রয়াসী ছিলেন। আমি এই কার্য্যে হস্তক্ষেপ করিয়াছি জানিতে পারিয়া উভয়েই স্বকীয় ঔদার্য্যগুণে ঐ সঙ্কল্প পরিত্যাগ করিয়াছেন। তাঁহাদের ন্যায় যোগ্য

ব্যক্তির হস্তে এই কার্য্য অর্পিত হইলে, মহারাজের জীবনী সম্পূর্ণ বিভিন্ন আকার ধারণ করিত সন্দেহ নাই।

শ্রীযুক্ত কৈলসেচন্দ্র সিংহ "বান্ধব" ও "নব্যভারত" নামক মাসিক পত্রিকায় রাজবল্লভ সম্বন্ধে কতিপয় প্রবন্ধ প্রচার করিয়াছেন। কৈলাস বাবুর লিখিত রাজবল্লভ সংক্রান্ত অধিকাংশ বৃত্তান্ত অপ্রকৃত ও বিদ্বেষ-মূলক। এই পুস্তকের স্থানে স্থানে আবশ্যক মতে সেই সমস্ত উক্তি উদ্ধৃত করিয়া তাহার অমূলকত্ব প্রদর্শন করা হইয়াছে। প্রোক্ত বৃত্তান্ত সম্বন্ধে কি প্রমাণ বিদ্যমান আছে, তাহা জানিবার জন্য কৈলাস বাবুর নিকট এক পত্র লিখিয়াছিলাম, তদুত্তরে তিনি লিখিয়াছেন ঃ—

ফেনি,

১২ই আষাঢ়।

মান্যবরেষু,

আপনার পত্রখানা পাইলাম। ঐতিহাসিক আলোচনা আমি পরিত্যাগ করিয়াছি, সুতরাং আপনার লিখিত বিষয়ে উত্তর দিতে পারিলাম না। বিনা প্রমাণে আমি কিছুই লিখি নাই। প্রচলিত ইতিহাস অপেক্ষা ইষ্টইণ্ডিয়া কোম্পানীর রিপোর্ট ইত্যাদিতে অনেক বিষয় পাওয়া যায় জানিবেন।

নিবেদক

শ্রীকৈলাসচন্দ্র সিংহ।

ইষ্টইণ্ডিয়া কোম্পানীর কোন্ রিপোর্টে উক্ত উক্তি সমর্থিত হইয়াছে তাহা জানিবার জন্য অতঃপর কৈলাস বাবুর নিকট দ্বিতীয় পত্র লিখিয়াছিলাম। দুর্ভাগাবশতঃ তিনি সেই পত্রের উত্তর দেওয়াই আবশ্যক মনে করেন নাই। তিনি "নব্যভারত" পত্রিকায় লিখিয়াছিলেন, 'বিবিধ ইতিহাস হইতে প্রমাণ সংগ্রহ করিয়াই' তিনি রাজবল্লভের অত্যাচার

বৃত্তান্ত লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। কোন স্থলেই কৈলাসবাবু 'ইষ্টইণ্ডিয়া কোম্পানীর' রিপোর্টের বিষয় উল্লেখ করেন নাই। তিনি রাজবল্লভ সম্বন্ধে যাহা লিখিয়াছেন, তদ্বারা স্পষ্ট প্রতীয়মান হইবে যে, তিনি কেবল রাজবল্লভের প্রতি শিষ্টাচার বিরুদ্ধ বাক্য প্রয়োগ করিবার উদ্দেশ্যেই আসরে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন। কৈলাস বাবু ষষ্ঠ সংখ্যক "নব্যভারতের" ৭৫ পৃষ্ঠায় ৺চন্দ্রকুমার রায়কে লক্ষ্য করিয়া বলিয়াছেন, "কিরূপ স্বার্থের বশবর্ত্তী হইয়া আমরা রাজবল্লভের চরিত্রে দোষারোপ করিয়াছি, তাহা অবশ্যই প্রদর্শন করা উচিত ছিল।" রাজবল্লভকে আক্রমণ করিতে গিয়া তিনি স্থানে স্থানে "বৈদ্য মহাশয়েরা কি বলেন?" "বৈদ্যকুলধুরন্ধর এবং নরাধম কিন্তু বৈদ্যদিগের মতে আদর্শ-পুরুষ" প্রভৃতি যে সমস্ত ইঙ্গিত করিয়াছেন, তদ্দ্বারা বৈদ্যজাতির প্রতি তাহার বিদ্বেষ ভাব বিশিষ্টরূপে প্রকটিত হইয়াছে। রাজবল্লভসম্বন্ধে তিনি যে সমস্ত প্রলাপোক্তি করিয়াছেন, তাহা ঐ বৈদ্য বিদ্বেষ হলাহলের বিজৃম্ভণ মাত্র। ফলতঃ কৈলাসবাবু "ক্রূর", "নির্দ্দয়", "দুরাচার", "দুর্ব্বিনীত" এবং "পাপিষ্ঠ" প্রভৃতি যে সমস্ত সুমধুর বচনে রাজবল্লভের প্রেতাত্মার তর্পণ করিয়াছেন, তদ্দ্বারা তাঁহার সুরুচি (?) ও সুশিক্ষার (?)ই পরিচয় পাওয়া যায়। রাজবল্লভ বৈদ্যবংশে জন্মগ্রহণ না করিলে তিনি কৈলাস বাবুর তুলিকায় সম্পূর্ণ বিভিন্ন বর্ণেই চিত্রিত হইতেন। তিনি ষষ্ঠ সংখ্যক নব্যভারতের ৫৫৭ পৃষ্ঠায় ৺চন্দ্রকুমার রায়কে লক্ষ্য করিয়া আক্ষেপ করিয়াছেন যে, "রায় মহাশয় ইতিহাসের গলায় ছুরিকা বিদ্ধ করিয়াছেন।" এই পুস্তকে কৈলাসবাবুর উক্তির যে সমস্ত ভ্রম প্রমাদ প্রদর্শন করা গিয়াছে তদ্দৃষ্টে প্রতীয়মান হইবে যে, রাজবল্লভ সংক্রান্ত বৃত্তান্ত সঙ্কলনে কৈলাস বাবু যে সমস্ত বিকৃত তত্ত্ব প্রচার করিয়াছেন, তাহাতে তাঁহার পক্ষে পূর্ব্বোক্ত কথাগুলি বলা মোটেই সঙ্গত হয় নাই।

যাঁহারা মনে করেন, বৈদ্যজাতির অবমাননা দ্বারা কায়স্থজাতির এবং কায়স্থজাতির অবমাননা দ্বারা বৈদ্যজাতির গৌরববৃদ্ধি হয়, তাঁহারা নিতান্তই ভ্রান্ত। এই বিংশ শতাব্দীতে স্বকীয় প্রতিভা ও সুশিক্ষাই প্রত্যেকের গৌরবের নিদান। ইতিহাসের পবিত্র ক্ষেত্রে বিচরণ করিতে হইলে সত্যে আস্থা থাকা একান্ত আবশ্যক। যাঁহারা এই মূলনীতি পরিত্যাগপূর্ব্বক ভিন্ন পথ অবলম্বন করেন, তাঁহাদের লেখনী সুতীক্ষ্ণ (১) হইলেও নিশ্চল থাকাই বাঞ্ছনীয়। যে সকল লেখক স্বার্থান্ধ হইয়া বিকৃত তত্ত্ব প্রচার করেন, তাহারা জাতীয়-উন্নতির পক্ষে বিষম অন্তরায় সন্দেহ নাই।

ভোলা,
অগ্রহায়ণ, ১৩১১ বঙ্গাব্দ।

শ্রীরসিকলাল গুপ্ত।

---

(১) কৈলাসবাবু ষষ্ঠসংখ্যক "নব্যভারতে"র ৫৭৪ পৃষ্ঠায় ৺চন্দ্রকুমার রায়কে লক্ষ্য করিয়া বলিয়াছেন, "সিরাজের প্রতি অন্যান্য লেখকগণ যে সমস্ত অনুচিত দোষারোপ করিয়াছেন, আমরা তাহা কিয়ৎপরিমাণে খণ্ডন করিতে চেষ্টা করিয়াছি বলিয়াই গ্রন্থকার আমাদের প্রতি তাঁহার '.ভাঙা কলম' শেলের ন্যায় প্রয়োগ করিতে চেষ্টা করিয়াছেন।"

দ্বিতীয়বারের বিজ্ঞাপন

প্রথম সংস্করণের এক সহস্র পুস্তক প্রায় নিঃশেষিত হওয়ায় দ্বিতীয় সংস্করণে প্রবৃত্ত হওয়া গেল। এবার গ্রন্থের কলেবর অনেক পরিমাণে বৃদ্ধি করা হইল। প্রথম সংস্করণে লিখিত যে যে বৃত্তান্ত প্রমাদপূর্ণ বলিয়া জানিতে পারিয়াছি তাহা এবার যত্ন সহকারে সংশোধন করিলাম। এই সংস্করণে ভাষার এরূপ আমূল পরিবর্ত্তন করা হইল যে, ইহাকে নূতন গ্রন্থ বলিলেও অত্যুক্তি হইবে না।

প্রথম সংস্করণের উপক্রমণিকায় ৺গুরুদাস গুপ্ত কর্ত্তৃক লিখিত "মহারাজ রাজবল্লভের জীবনী" না পাইয়া আক্ষেপ করিয়াছিলাম। সৌভাগ্যক্রমে সেই পুস্তক অবলম্বনে, চট্টগ্রামনিবাসী ৺উমাচরণ রায় যে গ্রন্থ রচনা করিয়া গিয়াছেন, তাহা এবার প্রাপ্ত হইয়াছি। চট্টগ্রাম-বিভাগের স্কুল-ইন্‌স্পেক্টর শ্রীযুক্ত মৌলবী আব্দুল করিম, বি,এ, মহোদয় উমাচরণ বাবুর প্রণীত পুস্তক ১৩১১ সালের "নবনূর" নামক মাসিক পত্রিকায় প্রকাশ করিয়াছেন। আব্দুল করিম সাহেব বলেন, "উমাচরণ বাবু চট্টগ্রাম জিলার অধীন পরৈকোড়াগ্রামের সুপ্রসিদ্ধ জমিদার বংশে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন এবং ১৭৮২ শকাব্দ অর্থাৎ ১৮৫০ খৃষ্টাব্দে তৎপ্রণীত মহারাজ রাজবল্লভের জীবনী ঢাকা যন্ত্রালয়ে মুদ্রিত হইয়াছিল।" এই গ্রন্থের পরিশিষ্টে উমাচরণ বাবুর সমগ্র পুস্তক উদ্ধৃত করা হইল। বর্ত্তমান সংস্করণে এই পুস্তক হইতে অনেক সাহায্য গ্রহণ করা হইয়াছে। পরিশিষ্ট পাঠে প্রতীয়মান হইবে যে, উমাচরণ বাবুর লিখিত ভাষা আধুনিক সময়ের প্রচলিত ভাষার অনুরূপ নহে। সুতরাং পাঠের সৌকর্য্য বিধানোদ্দেশ্যে গ্রন্থের যে যে স্থলে উমাচরণ বাবুর উক্তি উদ্ধৃত করা হইয়াছে, সেই সেই

স্থলেই গ্রন্থকর্ত্তার ভাব রক্ষা করিয়া তাহা আধুনিক ভাষায় পরিবর্ত্তিত করিয়া লওয়া হইয়াছে। একথা স্বীকার্য্য যে, উমাচরণ বাবুর গ্রন্থে যে যে কথা লিখিত আছে, তাহা সমস্তই প্রামাণ্য ইতিহাস দ্বারা সমর্থন করা যায় না। সুতরাং তাঁহার যে সমস্ত উক্তি প্রমাদপূর্ণ বলিয়া বোধ হইয়াছে তাহা এই পুস্তকে স্পষ্টরূপে প্রদর্শন করা গিয়াছে।

শ্রীযুক্ত মৌলবী আব্বাস সালেম, এম, এ, মহোদয় 'রিয়াজুসেলাতিনের' ইংরেজী অনুবাদ এসিয়াটিক সোসাইটির জার্ণেলে প্রকাশ করিতেছিলেন। প্রথম সংস্করণের সময় মুরশিদকুলী খাঁর নবাবী আমল পর্য্যন্ত অনুবাদ বাহির হইয়াছিল। এখন সমগ্র ইতিহাসের অনুবাদই পুস্তকাকারে প্রচারিত হইয়াছে। বর্ত্তমান সংস্করণে ঐ পুস্তক হইতে অনেক সাহায্য পাইয়াছি।

শ্রীযুক্ত পণ্ডিত উমেশচন্দ্র গুপ্ত বিদ্যারত্ন মহাশয় "বল্লাল মোহমুদ্গার" নামে যে বহু গবেষণাপূর্ণ পুস্তক রচনা করিয়াছেন তাহা প্রথম সংস্করণের সময় প্রকাশিত হয় নাই। এবার সেই পুস্তক হইতে অনেক তত্ত্ব সংগ্রহ করা হইল।

মুরশিদাবাদের নবাববাড়ীতে মহারাজ রাজবল্লভের এক তৈল-চিত্র আছে। কলিকাতা মিউজিয়মে ঐ প্রতিকৃতির ফটো আনিয়া রাখা হইয়াছে। মহারাজের উত্তরপুরুষ শ্রীযুক্ত কালীচরণ সেন, বি-এল্ মহোদয়ের আবেদনমতে মিউজিয়মের কর্ত্তৃপক্ষ সেই ফটো হইতে ফটো তুলিয়া কালীবাবুকে পাঠাইয়া দিয়াছেন। তাঁহারই অনুগ্রহে আমি মহারাজ রাজবল্লভের প্রতিকৃতি সংগ্রহ করিয়া এবার এই সংস্করণে প্রকাশ করিতে সমর্থ হইলাম।

রাজনগরের "একবিংশতি রত্ন", "নবরত্ন", "পঞ্চরত্ন", "সপ্তদশরত্ন" প্রভৃতি অট্টালিকা একদা বিক্রমপুরের গৌরব স্থান ছিল। প্রথম

সংস্করণের সময় ঐ সমস্ত অট্টালিকার প্রতিকৃতি সংগ্রহ করিতে পারি নাই। মহারাজের জ্ঞাতি, শ্রীযুক্ত চন্দ্রকান্ত সেন, ডিপুটি কালেক্টর মহোদয় সম্প্রতি পূর্ব্বোক্ত অট্টালিকাসমূহের প্রতিকৃতি অঙ্কিত করিয়া আমাকে পাঠাইয়া দিয়াছেন। এই সংস্করণে সে সমস্ত প্রতিকৃতি সন্নিবেশ করা গেল।

প্রথম সংস্করণের সময় যে সমস্ত মহোদয় আমাকে সাহায্য করিয়াছেন, এবারেও তাঁহাদের সহায়তা হইতে বঞ্চিত হই নাই। অধিকন্তু এবার অপর যে সমস্ত মহোদয় আমাকে সাহায্য করিতে অগ্রসর হইয়াছেন, তন্মধ্যে শ্রীযুক্ত বগলাপ্রসন্ন দাশ, এম-এ, বি-এল ও শ্রীযুক্ত চিন্তাহরণ মুখোপাধ্যায় মহাশয়দিগের নামই সমধিক উল্লেখযোগ্য। চিন্তাহরণ বাবু পূর্ব্বে রাজনগর বাস করিতেন। এখন বিক্রমপুরের অন্তর্গত চম্পকাদি গ্রামে অবস্থান করিতেছেন। তিনি এবং পণ্ডিতবর শ্রীযুক্ত উমেশচন্দ্র বিদ্যারত্ন মহোদয় এই সংস্করণের আদ্যোপান্ত পাঠ করিয়া যথাস্থানে সংশোধন করিয়া দিয়াছেন।

প্রথম সংস্করণ প্রচারিত হইলে, পশ্চিম ও পূর্ব্ব বাঙ্গালার শিক্ষা-বিভাগের ডিরেক্টর সাহেবগণ একশতখণ্ড পুস্তক ক্রয় করিয়া আমাকে উৎসাহিত করিয়াছেন, এতদ্ভিন্ন অনেক মহোদয় একমাত্র আমাকে উৎসাহ প্রদান করিবার উদ্দেশ্যেই এক এক খণ্ড পুস্তক ক্রয় করিতে কুণ্ঠিত হন নাই। এজন্য আমি তাঁহাদের সকলেরই নিকট কৃতজ্ঞ আছি। ভরসা করি, এবারেও তাঁহাদের সাহায্য হইতে বঞ্চিত হইব না। নিবেদন ইতি।

ভোলা
১৩১৯ বঙ্গাব্দ।

শ্রীরসিকলাল গুপ্ত

স্থলেই গ্রন্থকর্ত্তার ভাব রক্ষা করিয়া তাহা আধুনিক ভাষায় পরিবর্ত্তিত করিয়া লওয়া হইয়াছে। একথা স্বীকার্য্য যে, উমাচরণ বাবুর গ্রন্থে যে যে কথা লিখিত আছে, তাহা সমস্তই প্রামাণ্য ইতিহাস দ্বারা সমর্থন করা যায় না। সুতরাং তাঁহার যে সমস্ত উক্তি প্রমাদপূর্ণ বলিয়া বোধ হইয়াছে তাহা এই পুস্তকে স্পষ্টরূপে প্রদর্শন করা গিয়াছে।

শ্রীযুক্ত মৌলবী আব্বাস সালেম, এম, এ, মহোদয় 'রিয়াজুসেলাতিনের' ইংরেজী অনুবাদ এসিয়াটিক সোসাইটির জার্ণেলে প্রকাশ করিতেছিলেন। প্রথম সংস্করণের সময় মুরশিদকুলী খাঁর নবাবী আমল পর্য্যন্ত অনুবাদ বাহির হইয়াছিল। এখন সমগ্র ইতিহাসের অনুবাদই পুস্তকাকারে প্রচারিত হইয়াছে। বর্ত্তমান সংস্করণে ঐ পুস্তক হইতে অনেক সাহায্য পাইয়াছি।

শ্রীযুক্ত পণ্ডিত উমেশচন্দ্র গুপ্ত বিদ্যারত্ন মহাশয় "বল্লাল মোহমুদ্গর" নামে যে বহু গবেষণাপূর্ণ পুস্তক রচনা করিয়াছেন তাহা প্রথম সংস্করণের সময় প্রকাশিত হয় নাই। এবার সেই পুস্তক হইতে অনেক তত্ত্ব সংগ্রহ করা হইল।

মুরশিদাবাদের নবাববাড়ীতে মহারাজ রাজবল্লভের এক তৈল-চিত্র আছে। কলিকাতা মিউজিয়মে ঐ প্রতিকৃতির ফটো আনিয়া রাখা হইয়াছে। মহারাজের উত্তরপুরুষ শ্রীযুক্ত কালীচরণ সেন, বি-এল্ মহোদয়ের আবেদনমতে মিউজিয়মের কর্ত্তৃপক্ষ সেই ফটো হইতে ফটো তুলিয়া কালীবাবুকে পাঠাইয়া দিয়াছেন। তাঁহারই অনুগ্রহে আমি মহারাজ রাজবল্লভের প্রতিকৃতি সংগ্রহ করিয়া এবার এই সংস্করণে প্রকাশ করিতে সমর্থ হইলাম।

রাজনগরের "একবিংশতি রত্ন", "নবরত্ন", "পঞ্চরত্ন", "সপ্তদশরত্ন" প্রভৃতি অট্টালিকা একদা বিক্রমপুরের গৌরব স্থান ছিল। প্রথম

সূচি-পত্র

প্রথম অধ্যায়

দ্বিতীয় অধ্যায়

তৃতীয় অধ্যায়

বিষয় পৃষ্ঠা

অষ্টম অধ্যায়

নবম অধ্যায়

চতুর্থ অধ্যায়

পঞ্চম অধ্যায়

ষষ্ঠ অধ্যায়

সপ্তম অধ্যায়

প্রথম অধ্যায়

প্রথম পরিচ্ছেদ

রাজনগর

সুপ্রসিদ্ধ বিক্রমপুর পরগণা বর্ত্তমান ঢাকা ও ফরিদপুর জেলার কিয়দংশ লইয়া পরিগণিত। একদা সেন-রাজগণ এই পরগণার অন্তর্গত "রামপাল" নামক স্থানে অবস্থান করিয়া সমগ্র বাঙ্গালার শাসনদণ্ড পরিচালনা করিয়া গিয়াছেন। সেনরাজবংশসম্ভূত বিক্রমসেন ও রামদেব সেনের নামানুসারে "বিক্রমপুর" ও "রামপাল" স্ব স্ব আখ্যা প্রাপ্ত হইয়াছে (১)। রামপাল এখন বনাকীর্ণ ও হিংস্রজন্তুগণের

---

(১) আস্তে মৎসন্নিধৌ কন্যে রামপালেতি বিশ্রুতা।
নগরী পালিতা পূর্ব্বে আদিশূরস্য ভূপতেঃ॥
তত্রাসীৎ রামনাম্নৈকো বৈদ্যরাজো মহাধনী।
তৎপালিতা সা নগরী রামপালেতি সংজ্ঞিতা॥

লঘু ভারত ২য় খণ্ড ১২৭।১২৮ পৃঃ।

দাক্ষিণাত্য-বৈদ্যরাজশ্চৈকোঽশ্বপতিসেনকঃ।
তদ্বংশে জনিতশ্চন্দ্রকেতুসেন মহাধনঃ।
তস্য বংশে বীরসেনো ভূপঃ পরপুরঞ্জয়ঃ॥

সেনানী রামপাল আক্রমণ করিলে সেনবংশীয় শেষ রাজা সেনাসহ তাঁহাকে প্রতিরোধ করেন; যুদ্ধে গমন করিবার প্রাক্কালে তিনি একটি কপোত সঙ্গে লইয়া গিয়াছিলেন এবং রাজপুরীতে এক অগ্নিকুণ্ড প্রজ্বালিত করিয়া পরিবারবর্গকে বলিয়াছিলেন—"যদি এই কপোত প্রত্যাগত হয়, তবে জানিবে যে যুদ্ধে আমি নিধনপ্রাপ্ত হইয়াছি, তখন আত্মসম্মান রক্ষার্থ তোমরা এই অনলে প্রবেশ করিয়া স্বীয় প্রাণ বিসর্জ্জন করিবে।" সেনরাজ কাপুরুষ ছিলেন না; তিনি অসীম বীরত্ব প্রদর্শন করিয়া মুসলমান সেনাগণকে ছিন্ন ভিন্ন করিয়া দিলেন এবং শ্রান্তি অপনোদন করিবার নিমিত্ত অশ্বহইতে অবতরণপূর্ব্বক সমীপবর্ত্তী ধলেশ্বরী নদীতে অবগাহন করিতে প্রবৃত্ত হইলেন; তাঁহার বস্ত্রাভ্যন্তরে যে কপোত রক্ষিত ছিল, তাহা ইত্যবসরে মুক্ত হইয়া আকাশপথে উড্ডীয়মান হইল এবং রাজপ্রাসাদের ছাদের উপর আসিয়া উপবেশন করিল; রাজপরিবারবর্গ কপোত দেখিয়া মনে করিলেন, রাজা যুদ্ধে নিহত হইয়াছেন; সুতরাং তাঁহারা অনতিবিলম্বে প্রজ্জলিত অগ্নিকুণ্ডে প্রবেশ করিয়া আত্মোৎসর্গ করিলেন। রাজা কপোতকে উড্ডীয়মান হইতে দেখিয়াই অমঙ্গল আশঙ্কায় অশ্বে আরোহণপূর্ব্বক দ্রুতবেগে রাজধানী অভিমুখে ধাবমান হইয়াছিলেন. কিন্তু আসিয়াই দেখিলেন যে, সমস্তই শেষ হইয়া গিয়াছে; তখন তিনি জীবন রক্ষা করা নিষ্প্রয়োজন মনে করিয়া স্বয়ং অগ্নিকুণ্ডে ঝম্পপ্রদানপূর্ব্বক আত্মীয়-বিয়োগ-জনিত শোকহইতে নির্ম্মুক্ত হইলেন এবং সঙ্গে সঙ্গে হিন্দু-রাজলক্ষ্মী মুসলমানের করায়ত্ত হইয়া গেল।" রাজপুরীর পশ্চিমদিকে একটি মসজিদ ও তাহার সমীপে এক সমাধিস্থান আছে। লোকে ঐ সমাধিস্থানকে "বায়াদমে"র কবর বলে। মসজিদে এক প্রস্তর-লিপি সংলগ্ন রহিয়াছে সত্য; কিন্তু এ পর্য্যন্ত উহার পাঠোদ্ধার সাধিত হয় নাই। রামপালের পূর্ব্বদিকে "পঞ্চসার" নামক গ্রাম অব-

আবাস-ভূমিতে পরিণত। এমন সময় গিয়াছে, যখন এই নগরীর সৌধমালা ও সমৃদ্ধি দর্শকের নয়ন চরিতার্থ করিত। সেন-রাজগণ যখন যুদ্ধে জয়লাভ করিয়া বিজয়দৃপ্ত অনীকিনীসহ নগরে প্রবেশ করিতেন, তখন কতই না সমারোহে এস্থলে বিজয়োৎসব সম্পন্ন হইত। কিন্তু সে বহুদিনের কথা। বাঙ্গালাদেশ মুসলমানাধিকারগত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে রামপালের গৌরব-রবি চিরকালের নিমিত্ত অস্তমিত হইয়াছে। এখন সে স্থলে কেবল নির্জ্জনতা ও ধ্বংসাবশেষ অট্টহাস্য করিয়া লোকের অন্তঃকরণে উদাসভাবের উদ্রেক করিতেছে। নগরীর যে অংশ "বল্লালপুরী" নামে আখ্যাত, তাহা এক সুদীর্ঘ সরোবরের উত্তর তীরে অবস্থিত। এই পুরীর অপর তিন দিকে সুবিস্তৃত পরিখা। পরিখা ও সরোবর এখন প্রায় শুষ্ক হইয়া গিয়াছে। সরোবরের উত্তর তটে এক বিশাল গজারি বৃক্ষ মস্তকোত্তোলন করিয়া সগর্ব্বে দণ্ডায়মান রহিয়াছে। জনশ্রুতি এই যে, সেই বৃক্ষ মহারাজ আদিশূরের হস্তিবন্ধন স্তম্ভ ছিল; তিনি যজ্ঞসম্পাদনকল্পে কান্যকুব্জহইতে পাঁচজন ব্রাহ্মণ আনয়ন করিলে, তাঁহারা মহারাজকে আশীর্ব্বাদ করিবার নিমিত্ত যে নির্ম্মাল্য সঙ্গে আনিয়াছিলেন, তাহা মহারাজের সাক্ষাৎ না পাইয়া ঐ স্তম্ভোপরি রাখিয়া দিয়াছিলেন এবং তাহাতে উহা সজীব হইয়া কালক্রমে বিশাল মহীরুহে পরিণত হইয়াছে। "বল্লালপুরী"র এক স্থান খনন করিলে কেবল কয়লা বাহির হইয়া থাকে; ইহা সেনরাজবংশের শ্মশান-ক্ষেত্র বলিয়া আখ্যাত। লোকে বলে, "বায়াদম নামে জনৈক ইসলাম

তদ্বংশে বিক্রমসেনো জাতঃ পরমধার্ম্মিকঃ।
কৃতবান্ বিক্রমপুরীং স্বনাম্নাভিহিতাং সুধীঃ।
তস্য পুত্রঃ শুকদেবসেনঃ খ্যাতগুণোৎকরঃ॥

বল্লালমোহমুদ্গারধৃতবিপ্রকুলকল্পলতা ৩২২ পৃঃ।

আশালতার সহিত বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইত এবং রবির উজ্জ্বল কিরণে উদ্ভাসিত হইয়া লোচন-স্নিগ্ধকর শোভার অবতারণা করিত।

রাজনগর বহুসংখ্যক পল্লীতে বিভক্ত ছিল। বঙ্গীয় হিন্দুসমাজের প্রায় সমস্ত জাতিই তথায় শ্রেণীবদ্ধভাবে অবস্থান করিত। যে পল্লীতে যে জাতীয় কিংবা সম্প্রদায়ভুক্ত লোক বাহুল্যরূপে সন্নিবেশিত ছিল তাহা সেই জাতি কিংবা সম্প্রদায়ের নামানুসারে আখ্যাত হইত। প্রায় প্রত্যেক পল্লীতেই এক কিংবা অতোধিক পাঠশালা, মক্তব অথবা চতুষ্পাঠী অবস্থাপিত ছিল। জনপদের উচ্চ জাতীয় বালকগণ পাঠশালা-হইতে প্রাথমিক শিক্ষা সমাপন করিয়া কেহ বা মক্তবে পারসিক ভাষা শিক্ষা করিত এবং কেহ বা চতুষ্পাঠীতে গিয়া সংস্কৃত ভাষা অধ্যয়নে নিযুক্ত হইত। নিম্নশ্রেণীর বালকগণমধ্যে কেহ কেহ পাঠশালায় প্রাথমিক শিক্ষার আলোচনা করিত। কর্ম্মকার, কুম্ভকার, গোপ, মালাকার, কাংস্যবণিক্, গন্ধবণিক্, সুবর্ণবণিক্ ও তন্তুবায় প্রভৃতি জাতি সর্ব্বদাই স্বীয় স্বীয় ব্যবসায়ের উৎকর্ষ-সাধনে নিরত থাকিত। ফলতঃ রাজনগরের শিল্পিগণ যে সকল শিল্পচাতুর্য্য প্রদর্শন করিত তাহা সমগ্র পূর্ব্ববঙ্গে আদর্শ স্থানীয় বলিয়া পরিগণিত ছিল। অধিকাংশ লোককে অভাবজনিত কষ্ট উপভোগ করিতে হইত না। প্রায় সকলেই স্বচ্ছন্দমনে জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করিত। নানা জাতিয় এবং বহুলোকের বসতিনিবন্ধন দিবস ও যামিনী সকল সময়েই লোক কোলাহল উত্থিত হইয়া রাজনগরের সজীবতা বিঘোষিত করিত।

১৮৬৮ খ্রীষ্টাব্দের পূর্ব্বে রাজনগরের অনেক উত্তরে পদ্মানদীর এক শাখা ক্ষুদ্র কলেবরে পশ্চিমহইতে পূর্ব্বাভিমুখে প্রবহমাণ ছিল। লোক সকল সেই সময় ইহাকে “রথখোলার” নদী নামে অভিহিত করিত

স্থিত। প্রবাদ এই যে, কান্যকুব্জাগত ব্রাহ্মণপঞ্চক যজ্ঞসম্পাদনকালে সেই গ্রামে অবস্থান করিয়াছিলেন।

এখন পদ্মানদীর এক শাখা বিক্রমপুর পরগণাকে দুই খণ্ডে বিভক্ত করিয়া "কীর্ত্তিনাশা" নামে অভিহিত হইতেছে। কীর্ত্তিনাশার দুর্দ্দমনীয় স্রোতোবেগ, অত্যুত্তাল তরঙ্গমালা ও বিশাল আয়তন দর্শন করিলে হৃদয়ে ভীতির সঞ্চার হয় না, এমন লোক অতি বিরল। ১৮৬৭ খ্রীষ্টাব্দের পূর্ব্ব পর্য্যন্ত এই স্রোতঃ প্রবাহের অবস্থান স্থলে "রাজনগর" নামে এক সমৃদ্ধ জনপদ বিদ্যমান ছিল। (১) ধ্বংসাবশিষ্ট রামপালের কথা ছাড়িয়া দিলে সমগ্র বিক্রমপুর পরগণার অন্য কোন স্থানে এপর্য্যন্ত রাজনগরের সমৃদ্ধি পরিলক্ষিত হয় নাই। বৃহৎ ক্ষুদ্র এবং বিচিত্রকারুকার্য্যখচিতঅট্টালিকাবাহুল্যে একমাত্র রাজনগরই রাজনগরের তুলনাস্থল ছিল। স্বয়ং প্রকৃতি দেবী এই জনপদের সৌন্দর্য্যসাধনে সর্ব্বদাই মুক্তহস্ততা প্রদর্শন করিতেন। আম, জাম, গুবাক, নারিকেল, খর্জ্জুর-প্রভৃতি বৃক্ষরাজি উপযুক্ত সময়ে ফুল ও ফলভরে নত হইয়া অপূর্ব্ব শোভা বিস্তার করিত। জনপদের বিভিন্ন অংশে বহুসংখ্যক জলাশয় বিদ্যমান ছিল। ঐ সমস্ত জলাশয়ের সুশীতল বারিরাশি জননীদেবীর বক্ষোবিনিঃসৃত অমৃতধারার ন্যায় নিয়ত শ্রান্ত পথিকবৃন্দের এবং অধিবাসি-জনসাধারণের পরিতৃপ্তি সাধন করিত। বৃহৎ বৃহৎ জলাশয়ে জলপদ্ম প্রস্ফুটিত থাকিত এবং হংস, বক, সারস-প্রভৃতি জলচর পক্ষিগণ তন্মধ্যে অকুতোভয়ে বিচরণ করিয়া বেড়াইত। প্রান্তরে শ্যামল শস্যরাজি কৃষক পুরুষ ও রমণীর

(১) Hunter's statistical account of Ducca, Page 71.

সার্ভেনক্‌সা ভামরাইয়া স্থিরীকৃত হইয়াছে যে কীর্ত্তিনাশার বক্ষে এখন যে চড় "জ্বাজিরা" নামে খ্যাত, তাহার দক্ষিণ পশ্চিমাংশেই রাজনগর অবস্থিত ছিল।

হইয়াছিল। সরোবরের স্বচ্ছসলিলরাশি শুভ্র স্ফটিকের ন্যায় প্রতিভাত হইত। অতি মৃদু বায়ু হিল্লোলেই সেই সলিলরাশি সঞ্চালিত হইয়া অগণ্য তরঙ্গমালা উৎপাদন করিত এবং তৎকালে গাম্ভীর্য্য ও চাঞ্চল্যের সংমিশ্রণে এক অপূর্ব্ব শোভা বিন্যস্ত হইত।

রাজসাগরের উত্তরতটে "রাজসাগরের হাট" নামক সুপ্রসিদ্ধ বন্দর অবস্থিত ছিল। বন্দরের মধ্য দিয়া বহুসংখ্যক রাস্তা পূর্ব্বহইতে পশ্চিম ও উত্তরহইতে দক্ষিণ দিকে বন্দরের প্রান্ত পর্য্যন্ত বিস্তৃত ছিল। এই সমস্ত রাস্তার উভয় পার্শ্বে নানা শ্রেণীর ব্যবসায়িগণ আপণ-সংস্থাপন পূর্ব্বক পার্শ্ববর্ত্তী লোকের আবশ্যক দ্রব্যাদি সরবরাহ করিত। সে সময়ের সভ্যতার উপযোগী সমস্ত দ্রব্যই তথায় সুলভ ছিল। লোকে বলে শ্রাদ্ধের দিবস প্রাতে কেহ "দানসাগরের" সংকল্প করিয়া কার্য্যে ব্রতী হইলেও সে অনায়াসে রাজসাগরের হাটহইতেই সমস্ত আবশ্যক বস্তু সংগ্রহ করিতে পারিত। বন্দরের উত্তর পার্শ্ব দিয়া রাজনগরের খাল সর্ব্বদা প্রবহমাণ ছিল বলিয়া তথায় অতি অল্প ব্যয়ে যাবতীয় পণ্য দ্রব্যের আমদানি ও রপ্তানি হইত।

সরোবরের পশ্চিম তটে একটি কাছারী বাড়ী ও ইষ্টকনির্ম্মিত এবং বিচিত্র কারুকার্য্যখচিত দুইটি সুবৃহৎ দেবালয় বিদ্যমান ছিল। এক দেবালয়ে "মহাপ্রভু" ও অপর দেবালয়ে "জগন্নাথ দেব" প্রতিষ্ঠাপিত ছিলেন। প্রত্যহ ষোড়শোপচারে উভয় দেবতারই অর্চ্চনা করা হইত। প্রাতে, মধ্যাহ্নে ও সায়াহ্নে ঐ উভয় দেবমন্দিরে শঙ্খ-ঘণ্টা-প্রভৃতি সংযোগে আরতিধ্বনি হইত। আরতির সুমধুর নিক্কণ দিগ্‌দিগন্ত প্রতিধ্বনিত করিয়া ভক্তবৃন্দের মনে ভক্তির উৎস উন্মুক্ত করিয়া দিত।

রাজসাগরের পূর্ব্ব ও দক্ষিণ তটে বহুসংখ্যক ব্যবসায়ী বাস করিত। এই সমস্ত ব্যবসায়িগণ স্ব স্ব ব্যবসায় পরিচালনাদ্বারা সবিশেষ সমৃদ্ধি

(১) ১৭৮০ খ্রীষ্টাব্দে মেজর রেনেল সাহেব বঙ্গদেশের যে মানচিত্র অঙ্কিত করেন, তাহাতে রথখোলা নদীর অস্তিত্বই পরিলক্ষিত হয় না। রেনেল সাহেবের সময় পদ্মানদী ঢাকা জিলার পশ্চিম ও দক্ষিণ পশ্চিম দিয়া প্রবাহিত হইত এবং বাকরগঞ্জ জিলার অন্তর্গত মেহন্দিগঞ্জ স্থানে সুপ্রসিদ্ধ মেঘনাদ নামক নদের সহিত সম্মিলিত ছিল (২)।

রাজনগরের বক্ষঃ বিদীর্ণ করিয়া পূর্ব্বহইতে পশ্চিমদিকে এক পয়ঃপ্রণালী প্রবাহিত ছিল। ঐ খালের সাহায্যে তথায় অতিসহজে পণ্যদ্রব্যের আমদানি ও রপ্তানি হইত। খালের পূর্ব্ব প্রান্তহইতে পশ্চিমদিকে কিয়ৎদূর অগ্রসর হইলে "রাজসাগর" নামক এক সুবিস্তৃত জলাশয় আগন্তুকের নয়ন পথে পতিত হইত। এই সরোবরের আয়তন এত বৃহৎ ছিল যে উহার এক তীর হইতে বন্দুকধ্বনি করিলে সেই ধ্বনি অপর তীরে সুস্পষ্টরূপে শ্রুতিগোচর হইত না (৩)। "রাজসাগরের" প্রত্যেক তটদেশের মধ্যস্থলে ইষ্টকনির্ম্মিত সোপানাবলী সংস্থাপিত ছিল; তদ্দ্বারা অভ্যন্তরস্থ সুশীতল বারিরাশি সাধারণের পক্ষে সহজলভ্য

---

(১) অতিপূর্ব্বে "রথখোলার" নদীরও অস্তিত্ব ছিল না। ঐ স্থানের দক্ষিণভাগে বিলদাওনীয়া ও উত্তরভাগে হাতরাভোগ, নওপাড়া ও অন্যান্য গ্রাম অবস্থিত ছিল। নদীর অবস্থান স্থলে উভয় পার্শ্বস্থ গ্রামবাসিগণ রথোৎসব সম্পন্ন করিত। রথচক্রের নিয়মিত আবর্ত্তনে ঐ স্থান ক্ষয়প্রাপ্ত হইতে হইতে নিম্ন হইয়া গিয়াছিল এবং পার্শ্ব-বর্ত্তী গ্রামসমূহহইতে সেই স্থান দিয়া ক্রমে বৃষ্টির জল নির্গত হওয়ায় উহা খালের আকার ধারণ করিয়া পদ্মার সহিত মিলিত হইয়াছিল। তদবধিই উহা "রথখোলার নদী" বলিয়া অভিহিত হইতেছিল।

(২) Hunter's statistical account of Ducca, Page 71.

(৩) বিশ্বস্ত সূত্রে অবগত হওয়া গিয়াছে যে ঐ সরোবর ২২০ বিঘা ১৬ কাঠা জমি লইয়া বিস্তৃত ছিল।

মান সহকারে বাদ্যোদ্যম করিয়া ঘূর্ণ্যমান লোকদিগকে প্রোৎসাহিত করিত। স্বচক্ষে এই দৃশ্য অবলোকন করিয়াছেন এমন অনেক লোকের নিকট অবগত হওয়া গিয়াছে যে চড়ক পূজার সময় শতাধিক পটহ একত্রে নিনাদিত হইয়া প্রলয়কালীন বাত্যা-নির্ঘোষের ন্যায় গুরু-গম্ভীর শব্দ উৎপাদন করিত।

কালবৈশাখীর মেলায় আমোদ প্রমোদের অভাব ছিল না। অনেকেই জানেন যে রাজনগর সঙ্গীতচর্চ্চার জন্য বিশেষ প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছিল এবং অনেক গায়কসম্প্রদায় সঙ্গীতনৈপুণ্য প্রদর্শন করিয়া রাজসরকারের "বৃত্তি" উপভোগ করিত। কালবৈশাখীর মেলায় সেই সমস্ত গায়কগণের সঙ্গীতনৈপুণ্যের পরীক্ষা হইত। আমোদ প্রমোদের সীমা একমাত্র নৃত্যগীতেই নিবদ্ধ রহিত না। দেশদেশান্তরহইতে বিবিধ শ্রেণীর মল্ল সেই মেলায় আগমন করিত। তাহাদের কেহ লাঠি খেলিত, কেহ বা তরবারী ও তীরের সঞ্চালন-নৈপুণ্য প্রদর্শন করিত এবং কেহ কেহ কুস্তি করিয়া লোকের চিত্তাকর্ষণ করিত। কখন কখন যুবকগণ দলবদ্ধ হইয়া পুরাতন দীঘির মধ্যে সন্তরণে ব্যস্ত হইত ও সর্ব্বাগ্রে গন্তব্যস্থানে উত্তীর্ণ হইবার নিমিত্ত আগ্রহসহকারে প্রতিযোগিতা করিত। কখনও বা লোকে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ক্ষেপণীহস্তে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র নৌকা লইয়া সরোবরের জলে নৌসঞ্চালনে প্রবৃত্ত হইত এবং যে ব্যক্তি দ্রুতহস্তে ক্ষেপণী চালাইয়া সর্ব্বপ্রথম নির্দ্দিষ্ট স্থানে উপনীত হইতে পারিত, দর্শকবৃন্দ আনন্দধ্বনি করিয়া তাহাকে আপ্যায়িত করিতে বিস্মৃত হইত না। মেলার কোন অংশে ঘোড়দৌড় হইত এবং কোন অংশে লোকে কৃত্রিম সাজসজ্জা পরিধান করিয়া বিবিধ চরিত্রের অভিনয় করিত। জনসাধারণ সমগ্র বৎসর জীবন সংগ্রামে লিপ্ত থাকিয়া মেলার সময় এই সমস্ত নির্দ্দোষ আমোদে যোগদান করিত

সম্পন্ন হইয়া উঠিয়াছিল। তাহাদের অধিকাংশেরই বাসস্থলে সুন্দর সুন্দর অট্টালিকা বিদ্যমান ছিল। এই সমস্ত সৌধরাজি রাজসাগরের সুনির্ম্মল সলিলে সর্ব্বদা প্রতিবিম্বিত হইত এবং সরোবরের গর্ভে বহু সংখ্যক অট্টালিকা বিপরীতভাবে সংস্থাপিত আছে বলিয়া লোকের মনে ভ্রম উৎপাদন করিত।

রাজনগরের খালের উত্তর তট দিয়া পূর্ব্বহইতে পশ্চিম অভিমুখে এক বর্ত্ম বিদ্যমান ছিল। জনপদের পূর্ব্ব প্রান্তহইতে সেই পথ অবলম্বনে প্রায় এক মাইল পশ্চিম দিকে অগ্রসর হইলে, উত্তর দক্ষিণে বিস্তৃত এক রাস্তার দক্ষিণ প্রান্তে সমুপস্থিত হওয়া যাইত। এই শেষোক্ত রাস্তার পরিসর ৬৫ হাতের ন্যূন ছিল না। উত্তরদক্ষিণবাহী রাস্তা ধরিয়া উত্তর দিকে প্রায় অর্দ্ধ মাইল অতিক্রম করিলে "পুরাতন দীঘি" নামক সরোবরের পশ্চিম তটের সমীপবর্ত্তী হওয়া যাইত। "রাজসাগর" অপেক্ষা এই সরোবরের আয়তন কিঞ্চিৎ ন্যূন ছিল। "পুরাতন দীঘির পশ্চিম তটে "কালবৈশাখীর" মেলা সন্নিবিষ্ট হইত। প্রতি বর্ষের শেষ দিবসহইতে পরবর্ত্তী দুই মাস পর্য্যন্ত সেই মেলা অবস্থিত থাকিত। ঢাকা জিলার সুপ্রসিদ্ধ কার্ত্তিকবারুণীর মেলার ন্যায় এই মেলারও খ্যাতি ছিল। কালবৈশাখীর মেলায় দেশদেশান্তরহইতে অসংখ্য ব্যবসায়ী ও ক্রেতার সমাগম হইত এবং লোকে সেই সময় তথাহইতে অনেক আবশ্যক ও দুষ্প্রাপ্য দ্রব্য ক্রয় করিয়া গৃহজাত করিয়া রাখিত।

প্রতি বিষুবসংক্রান্তিতে "পুরাতন দীঘির" পশ্চিম তটে অতি সমারোহের সহিত চড়ক পূজার অনুষ্ঠান হইত। তৎকালে এক বিশাল চড়ক বৃক্ষ প্রোথিত করিয়া তাহার শীর্ষদেশে এক নহবতখানা নির্ম্মাণ করা হইত। ষোড়শসংখ্যক পুরুষ একযোগে ঐ চড়ক বৃক্ষে ঘূর্ণিত হইত এবং বাদকগণ নহবতখানায় উপবেশনপূর্ব্বক নানাবিধ তান-লয়

নবরত্ন
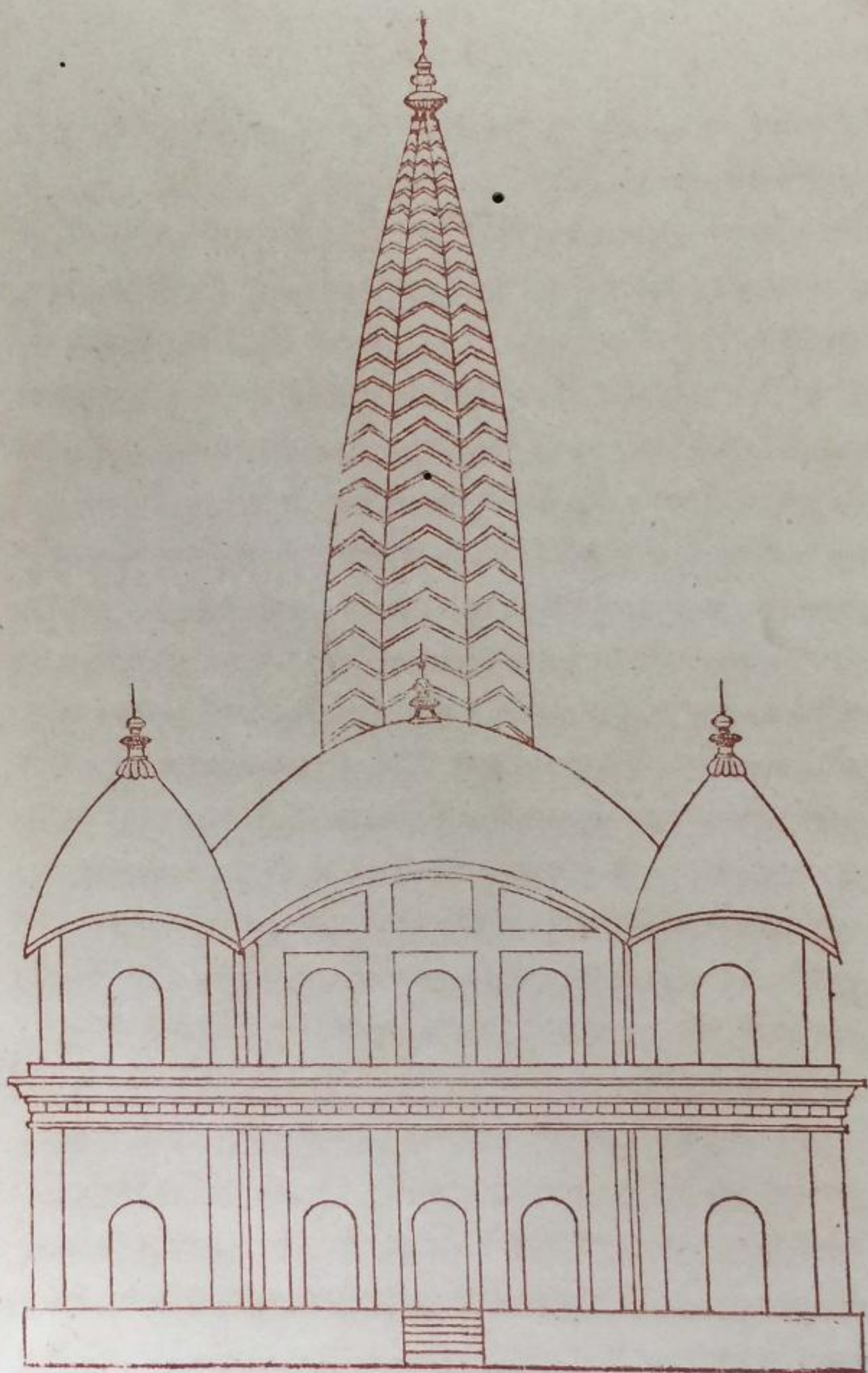
এবং ইহার ফলে তাহাদের শ্রমক্লিষ্ট অন্তঃকরণে পুনরায় নবীনতা ও প্রফুল্লতার সঞ্চার হইত।

পুরাতন দীঘি অতিক্রম করিয়া উত্তরদিকে কিয়দ্দূর অগ্রসর হইলেই রায় মৃত্যুঞ্জয়ের তোরণ-দ্বার সম্মুখে পতিত হইত। রায় মৃত্যুঞ্জয় মহারাজ রাজবল্লভের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার পুত্র, ক্ষমতা ও ঐশ্বর্য্যে রাজনগরমধ্যে তিনি রাজবল্লভের পরেই শ্রেষ্ঠ স্থান অধিকার করিয়াছিলেন। রায় মৃত্যুঞ্জয়ের নিকেতন বহুসংখ্যক অট্টালিকায় পরিশোভিত ছিল এবং সেই সমস্ত অট্টালিকায় যথেষ্ট স্থাপত্য-কৌশল দৃষ্ট হইত।

সরোবরের পশ্চিমতটের উত্তর প্রান্তহইতে এক রাস্তা পশ্চিমদিকে প্রসারিত ছিল। ইহাই রাজনগরের সুপ্রসিদ্ধ "পুরাতন দরজা"। 'পুরাতন দরজা'র উভয় পার্শ্বে কতিপয় ক্ষুদ্র ও বৃহৎ জলাশয় এবং পশ্চিম প্রান্তে রাজবল্লভের পিতা কৃষ্ণজীবন মজুমদারের ভদ্রাসন অবস্থিত ছিল। এই ভদ্রাসনের হর্ম্ম্যমালা মধ্যে "নবরত্ন" নামক প্রাসাদই সমধিক উল্লেখযোগ্য। 'নবরত্ন' একটি দ্বিতল অট্টালিকা। প্রথমতলের ছাদের প্রত্যেক কোণে এক একটি সমায়তন ছোট ছোট ঝিকটি ঘর (১) এবং প্রত্যেক দুইটি ছোট ঝিকটি ঘরের মধ্যে এক একটি বৃহদায়তন ঝিকটি ঘর ও ছাদের মধ্যস্থলে একটি সুবৃহৎ মঠ দণ্ডায়মান ছিল। বিশ্বস্তসূত্রে অবগত হওয়া গিয়াছে যে, মঠের উচ্চতা ভূতল হইতে এক শত হস্তের ন্যূন ছিল না। আটটি ঝিকটি ঘর ও একটি মঠের সমবায় নিবন্ধন লোকে এই প্রাসাদকে "নবরত্ন" বলিত। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ইষ্টক এবং প্রস্তরখণ্ডদ্বারা "নবরত্ন" নির্ম্মিত হইয়াছিল এবং তাহার প্রাচীরে নানাবিধ লতাপাতা এবং ফুল ফল অতি সুকৌশলে উৎকীর্ণ হইয়াছিল।

---

(১) দোচালা অথবা চৌচালা ঘরের ছাদের আকারবিশিষ্ট ইষ্টক অথবা প্রস্তর নির্ম্মিত গৃহবিশেষ।

পুরাতন দীঘির পশ্চিম তটের মধ্যহইতে এক রাস্তা পশ্চিমদিকে বিস্তৃত ছিল। এই রাস্তার পরিসরও ৬৫ হাতের ন্যূন ছিল না। মহারাজ রাজবল্লভের আবাসস্থলে প্রবেশ করিতে হইলে, এই পথ অবলম্বন করিতে হইত। রাজপুরীর পূর্ব্বভাগে "একবিংশতি রত্ন" নামক এক বিশাল তোরণ-দ্বার সংস্থাপিত ছিল। "একবিংশতি রত্ন" একটি দ্বিতল অট্টালিকা—নিম্নতর তলের ছাদের মধ্যভাগে উর্দ্ধতর তল গঠিত হইয়াছিল। প্রথমতলের মধ্যভাগে সিংহদ্বার—তাহার পরিসর এত বিস্তৃত ছিল যে, তিনটি হাতী হাওদাসহ পাশাপাশি হইয়া অনায়াসে তন্মধ্য দিয়া গমনাগমন করিতে পারিত। দ্বারের উপরিভাগ অর্দ্ধবৃত্তাকারে গঠিত ছিল। দুইটি বেদিকা দ্বারের সম্মুখভাগে সংস্থাপিত ছিল। সান্ত্রীগণ ঐ বেদিকায় দণ্ডায়মান থাকিয়া অষ্টপ্রহর দ্বারদেশ রক্ষা করিত। সিংহদ্বারের উভয় পার্শ্বে একাদশটি প্রকোষ্ঠ বিদ্যমান ছিল; রাজকীয় সেনাগণ ঐ সমস্ত প্রকোষ্ঠে অবস্থান করিত। একতলের ছাদের প্রত্যেক কোণে এক একটি সমায়তন ঝিকটি ঘর ও সম্মুখস্থ দুইটি ঝিকটি ঘরের মধ্যভাগে সিংহদ্বারসমসূত্রে তিনটি ঝিকটি ঘর সংস্থাপিত ছিল। শেষোক্ত তিনটি ঝিকটি ঘর পরস্পর সংলগ্নভাবে গঠিত হইয়াছিল। মধ্যস্থিত ঝিকটি ঘরটি অপর দুইটি ঝিকটি ঘর অপেক্ষা বৃহদায়তন ছিল। প্রতিদিন ঐ তিনটি ঝিকটি ঘরে সুমধুররবে নহবত বাজিত। প্রাতে নহবতখানা হইতে ভায়রো, ভৈরবী, কালেংড়া, ললিত প্রভৃতি রাগিণী বিনির্গত হইয়া মৃদুমন্দ প্রাতঃসমীরণের সহায়তায় জনপদের চতুর্দ্দিকে ব্যাপ্ত হইত এবং যামিনীর অবসান জ্ঞাপন করিয়া অধিবাসিগণকে শয্যা ত্যাগ করিবার নিমিত্ত আহ্বান করিত। প্রদোষে পুনরায় সেই সমস্ত ঘর হইতেই পুরবী, সিন্ধু প্রভৃতি রাগিণী সান্ধ্য-সমীরণের যোগে দিগ্‌দিগন্তে বিস্তৃত হইত এবং দৈনিক কার্য্য শেষ করিয়া ভগবানের চরণারবিন্দে
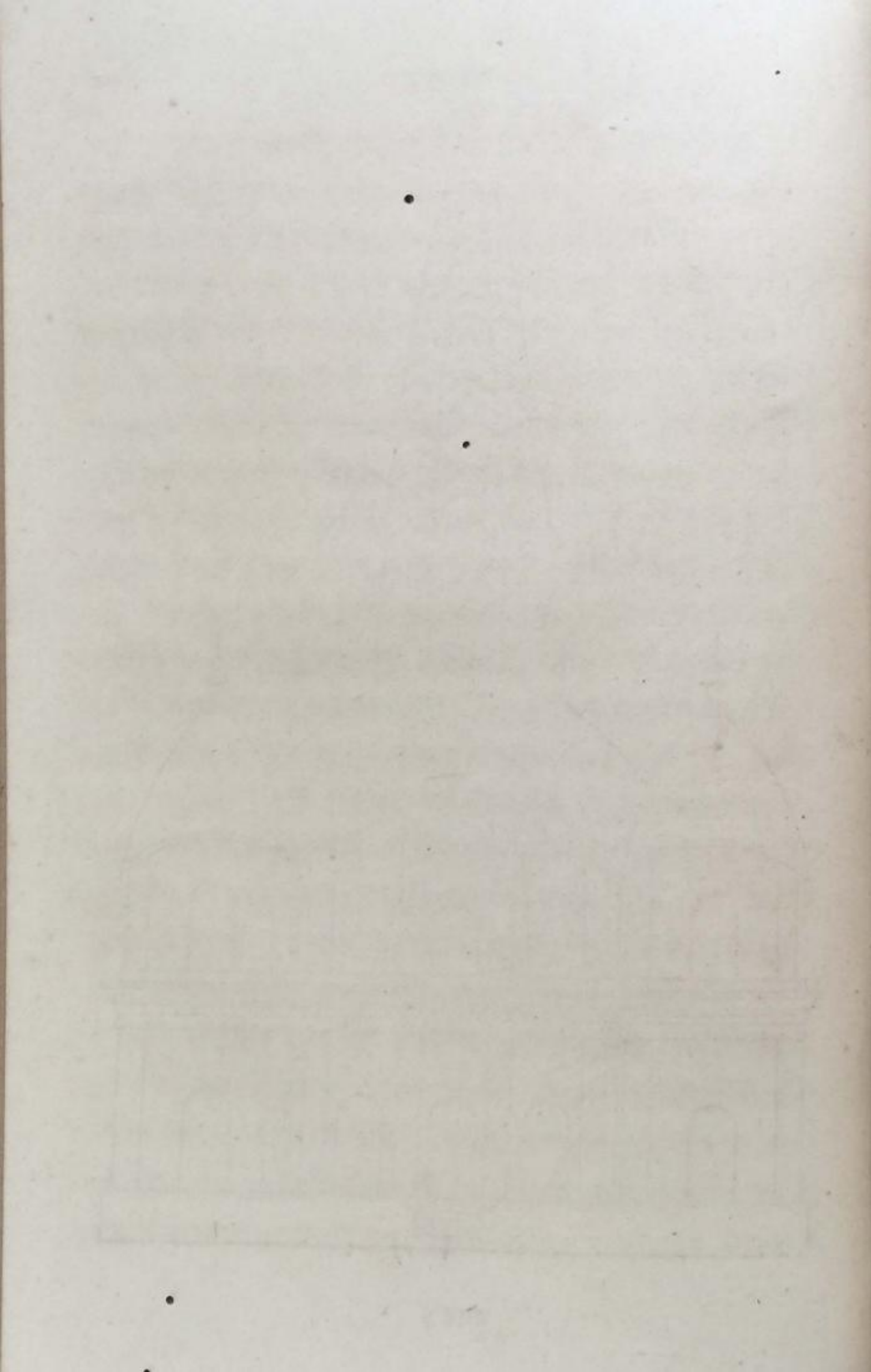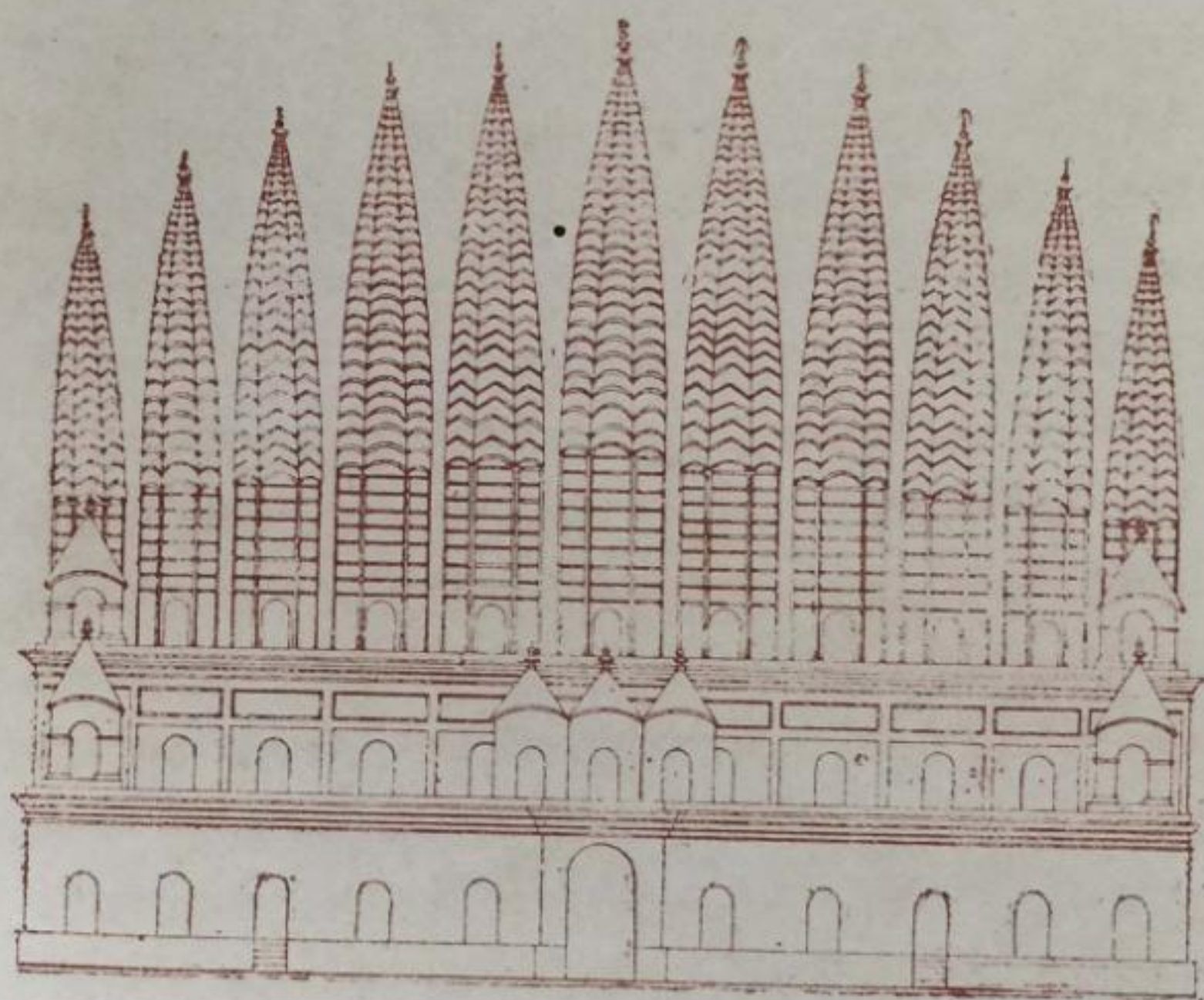
একুশ রত্ন

সম্মুখের (পূর্ব্বদিকের) দৃশ্য।

আত্মসমর্পণ করিবার জন্য লোকদিগকে প্রণোদিত করিত। দ্বিতলের ছাদের সম্মুখস্থ দুই কোণে এক একটি সমায়তন ঝিকটি ঘর ও মধ্যভাগে একাদশটি মঠ দণ্ডায়মান ছিল। এই একাদশটি মঠের মধ্যস্থ মঠটি সর্ব্বাপেক্ষা উচ্চভাবে এবং তাহার উভয় পার্শ্বের প্রত্যেক পরবর্ত্তী মঠ পূর্ব্ববর্ত্তী মঠ অপেক্ষা ক্রমশঃ নিম্নভাবে গঠন করা হইয়াছিল। এই সমস্ত মঠের শিরোভাগ এরূপভাবে বিন্যস্ত ছিল যে, দূরহইতে অবলোকন করিলে উহাদের সমষ্টি একখানি সুবৃহৎ ধনুর ন্যায় প্রতীয়মান হইত। একাদশটি মঠ ও দশটি ঝিকটি ঘর ছিল বলিয়া এই অট্টালিকা "একবিংশতি রত্ন" আখ্যা প্রাপ্ত হইয়াছিল।

সিংহদ্বারের পশ্চিমভাগে এক সুবিস্তৃত প্রাঙ্গণ অবস্থিত ছিল। প্রাঙ্গণের দক্ষিণ ভাগে সেঘরা—ইহা একটি দ্বিতল অট্টালিকা। সেঘরার একতলের ছাদের উপর তিনটি ঝিকটি ঘর পরস্পর সংলগ্নভাবে গঠিত ছিল বলিয়া লোকে উহাকে "সেঘরা" বলিত এবং উৎসব উপলক্ষে বাদকগণ তথায় বসিয়া বাদ্যোদ্যম করিত। প্রাঙ্গণের উত্তরভাগে বিচিত্র কারুকার্য্য-খচিত একটি ঝিকটি ঘর অবস্থিত ছিল। কথিত আছে যে, মহারাজ রাজবল্লভ এককোটি শিবলিঙ্গ অর্চ্চনা করাইয়া অর্চ্চনাস্থলে সেই গৃহ নির্ম্মাণ করাইয়াছিলেন। প্রাঙ্গণের পশ্চিমভাগ দ্বিতীয় একটি তোরণদ্বারদ্বারা সুরক্ষিত ছিল। দ্বিতীয় তোরণদ্বারের উভয়পার্শ্বস্থ কক্ষে প্রহরিগণ অবস্থান করিত।

এই তোরণ-দ্বার অতিক্রম করিলে প্রাঙ্গণে সমুপস্থিত হওয়া যাইত। এই প্রাঙ্গণের দক্ষিণভাগে "রঙমহল" নামক রমণীয় বৈঠকখানা এবং পশ্চিমভাগে "দেওয়ানখানা" প্রতিষ্ঠাপিত ছিল। দেওয়ানখানার উত্তর পার্শ্ব দিয়া তির্য্যগ্‌ভাবে আর একটি তোরণ-দ্বার সংস্থাপিত ছিল। তৃতীয় প্রাঙ্গণে প্রবেশ করিতে হইলে এই দ্বারের মধ্য দিয়া যাইতে
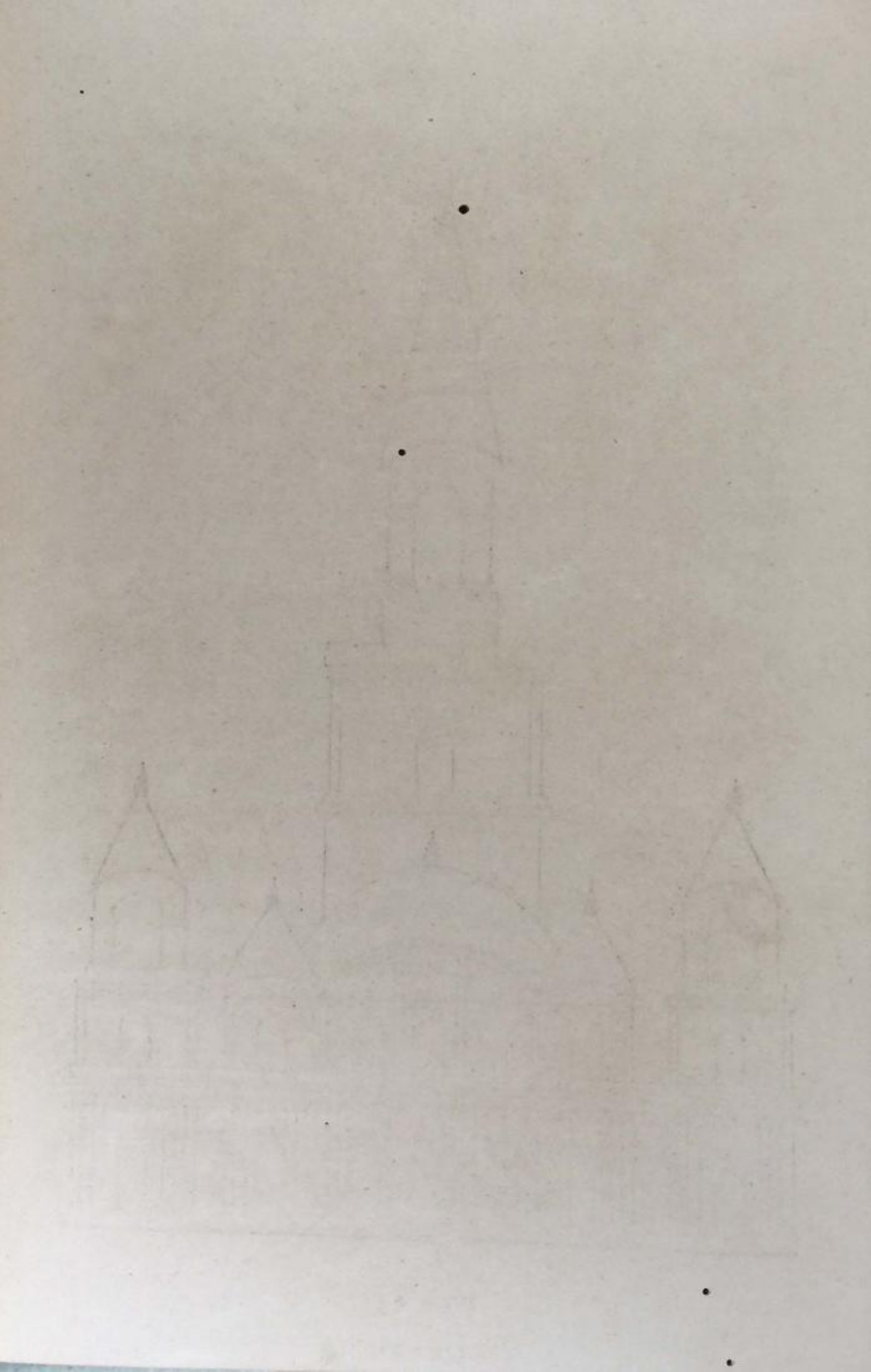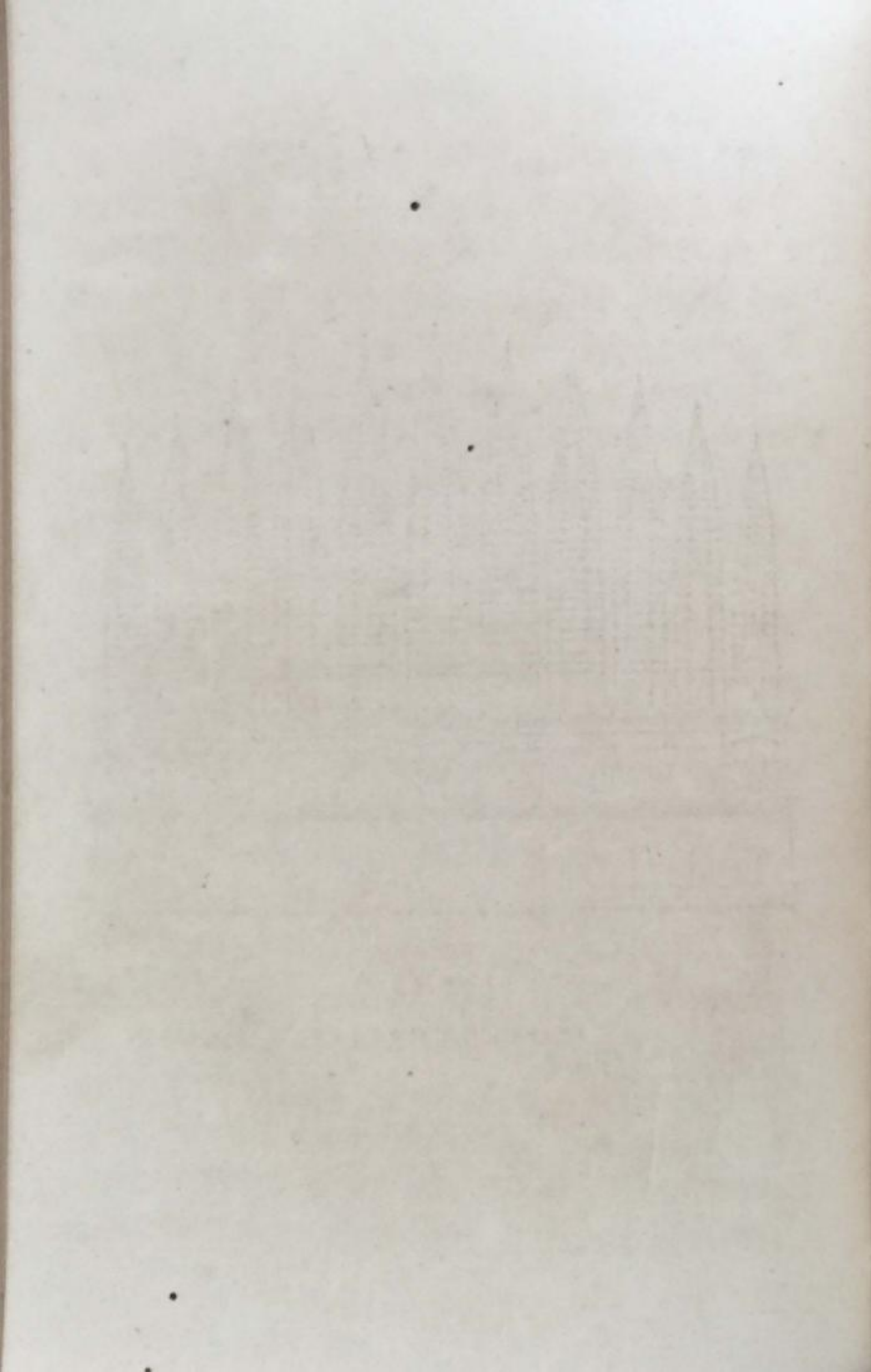
হইত। সুপ্রসিদ্ধ "সপ্তদশ রত্ন" নামক দোলমঞ্চ প্রকৃতপক্ষে তৃতীয় প্রাঙ্গণের পূর্ব্বভাগে অবস্থিত ছিল। কিন্তু দ্বিতীয় প্রাঙ্গণহইতে অবলোকন করিলে উহা দ্বিতীয় প্রাঙ্গণের উত্তরভাগে অথচ কিঞ্চিৎ ব্যবধানে অবস্থিত বলিয়া বোধ হইত।

"সপ্তদশরত্ন" একটি চতুস্তল অট্টালিকা। উহার দ্বিতীয় ও চতুর্থতল প্রথম ও তৃতীয় তলের ছাদের মধ্যস্থলে অবস্থিত ছিল। প্রথম তলের ছাদের প্রত্যেক কোণে এক একটি সমআয়তন দোতালা ঝিকৃটি ঘর এবং প্রতি দুইটি দোতালা ঝিকৃটি ঘরের মধ্যস্থলে সংলগ্নভাবে গঠিত তিনটি একতালা ঝিকৃটি ঘর প্রতিষ্ঠাপিত ছিল। চতুর্থ তলাটি একখানি মন্দিরের ন্যায় প্রতীয়মান হইত। বাসন্তী পূর্ণিমায় ৺লক্ষীনারায়ণ চক্র স্বর্ণসিংহাসনে উপবেশনপূর্ব্বক কুঙ্কুমরাগে রঞ্জিত হইয়া চতুর্থতলে পরিদোলায়মান হইতেন। সে সময় প্রকৃতি দেবী বসন্তকাল সুলভ শ্যামলপত্র ও বিচিত্র পুষ্পভূষণ পরিধারণ করিয়া মোহিনীবেশে লোকলোচনসমক্ষে দাঁড়াইতেন। সুমধুর যামিনী নির্ম্মল চন্দ্রালোক ঢালিয়া দিয়া স্বপ্নজগতের ন্যায় এক অপূর্ব্ব সুষমা বিন্যস্ত করিত। রাজনগরবাসী আবাল-বৃদ্ধ-বনিতা বাসন্তীপরিচ্ছদে সুশোভিত হইয়া উদ্ভ্রান্তভাবে ফল্গুচূর্ণ লইয়া ক্রীড়া করিত; সমগ্র অট্টালিকা ও চতুষ্পার্শ্বস্থ স্থল অবিরাম ফল্গুচূর্ণক্ষেপণে রক্তিমাভ হইয়া উঠিত এবং "হোরীর" উদ্দাম নৃত্যগীতে সমগ্র প্রাসাদ বিকম্পিত ও প্রতিধ্বনিত হইত। ষোড়শটি ঝিকৃটি ঘর ও একটি মন্দিরের সমবায়হেতু লোকে এই চতুস্তল অট্টালিকাকে "সপ্তদশরত্ন" বলিত। প্রত্যেক সংলগ্ন তিনটি ঝিকৃটি ঘরের উভয় পার্শ্বস্থ ঝিকৃটি ঘর দুইটি আয়তনে সমান এবং মধ্যস্থ ঝিকৃটি ঘরটি তদপেক্ষা বৃহদায়তন ছিল। চতুর্থতলে দণ্ডায়মান হইলে বৃহদায়তন বৃক্ষসমূহ ছোট ছোট চারাগাছের ন্যায় এবং কীর্ত্তিনাশা
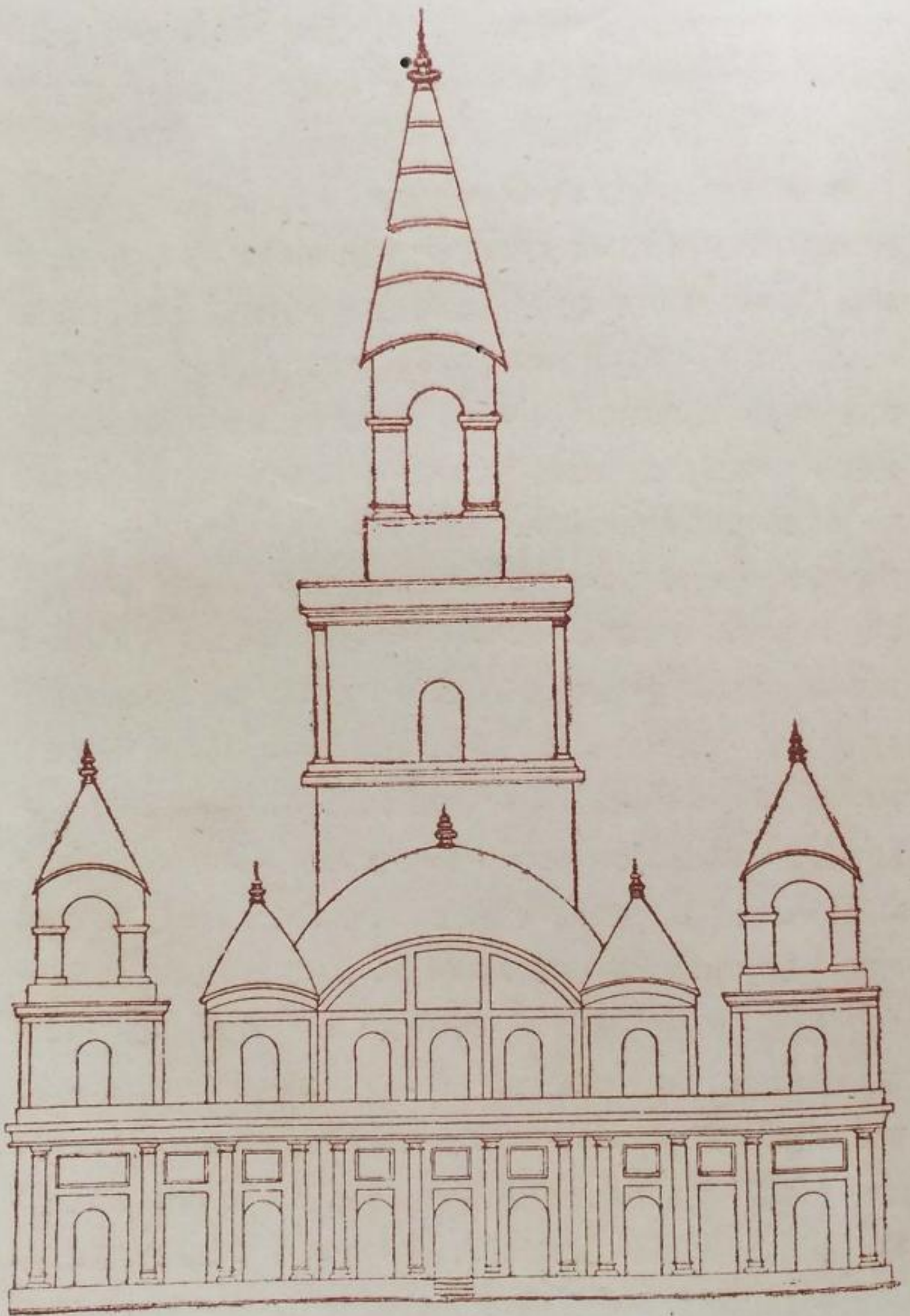
সতর রত্ন

উত্তরের দৃশ্য।

পঞ্চ রত্ন।

পূর্ব্বদিগের দৃশ্য।
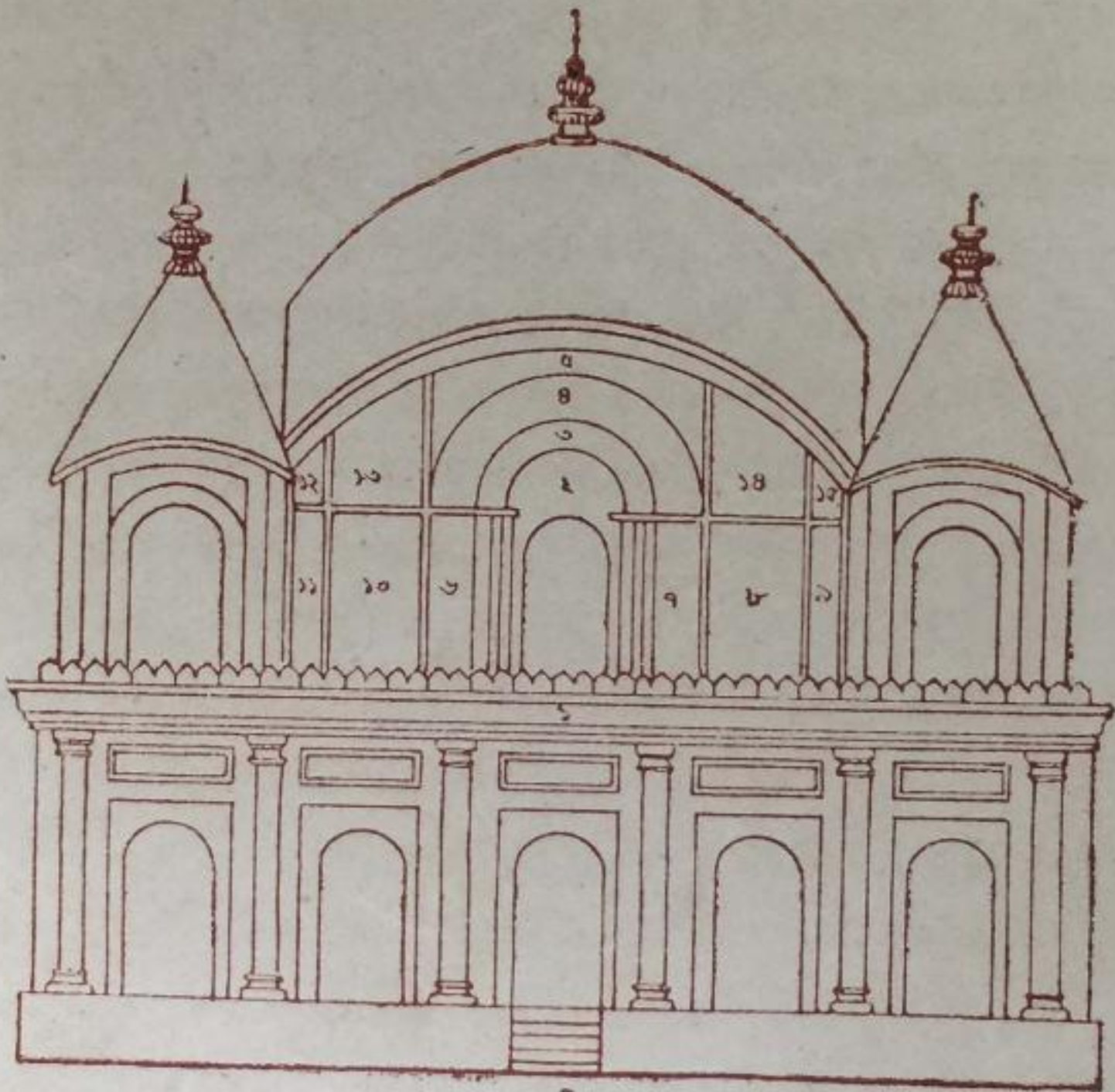
১ হইতে ১৫ চিহ্নিত স্থানে নানাপ্রকার লতা, ফুল, দেব-দেবী ও জন্তুর প্রতিমূর্ত্তি—গাথনীর উপরে অথবা ইষ্টকে খোদিত ছিল।

নদী একখণ্ড ক্ষুদ্র সুনীল বস্ত্রের ন্যায় বোধ হইত। এই মন্দির ভূপৃষ্ঠ হইতে ১২৫ হাতের কম উচ্চ ছিল না। সুবিন্যস্ত সোপানাবলীর সাহায্যে অনায়াসে প্রত্যেক তলহইতে উর্দ্ধতর তলে আরোহণ এবং উর্দ্ধতর তলহইতে নিম্নতর তলে অবরোহণ করা যাইত।

তৃতীয় প্রাঙ্গণের উত্তর ভাগে একটি একতল অট্টালিকা ও দক্ষিণ ভাগে পূর্ব্বকথিত দেওয়ানখানা অবস্থিত ছিল। রাজকীয় কর্ম্মচারিগণ দেওয়ানখানায় উপবেশনপূর্ব্বক বৈষয়িক কার্য্য সম্পাদন করিত এবং একতল অট্টালিকায় শরৎ ঋতুতে জগজ্জননী দশভূজা অর্চ্চিতা হইতেন। অঙ্গনের অপর পার্শ্বে "পঞ্চরত্ন" নামক সুরম্য দেবালয় প্রতিষ্ঠাপিত ছিল। সমগ্র রাজনগর মধ্যে পঞ্চরত্নের ন্যায় শিল্পচাতুর্য্যসম্পন্ন দ্বিতীয় অট্টালিকা বিদ্যমান ছিল না। পাঁচটি মন্দিরের সমবায়নিবন্ধন এই অট্টালিকা "পঞ্চরত্ন" নামে অভিহিত হইত। ঐ মন্দিরপঞ্চক একতলের ছাদের উপর সন্নিবিষ্ট ছিল। একটি মন্দির মধ্যভাগে এবং অপর চারিটি তাহার এক এক কোণে গঠিত হইয়াছিল। মধ্যস্থ মন্দিরের প্রাচীরের উভয় দিকে নানাবিধ দেবদেবীর মূর্ত্তি ও লতাপাতা অঙ্কিত ছিল। অট্টালিকার এক কক্ষে লক্ষ্মীনারায়ণ, এক কক্ষে রাজরাজেশ্বরী, এক কক্ষে কাত্যায়নী এবং অপর দুই কক্ষে অন্যান্য দেবতাগণ প্রতিষ্ঠাপিত ছিলেন। তৃতীয় প্রাঙ্গণ পার হইয়া ক্রমে আরো দুইটি প্রাঙ্গণ অতিক্রম করিলে অন্তঃপুরের সীমায় উপস্থিত হওয়া যাইত। এই সমস্ত অঙ্গনের পার্শ্বেই অট্টালিকাসমূহ বিদ্যমান ছিল।

অন্তঃপুরখণ্ডের মধ্যস্থলে এক সুবিস্তৃত প্রাঙ্গণ এবং প্রাঙ্গণের চতুষ্পার্শ্বে চারিটি সুবৃহৎ অট্টালিকা অবস্থিত ছিল। উত্তরদিকের অট্টালিকা ত্রিতল এবং অপর তিন দিকের অট্টালিকা দ্বিতল ছিল। মহারাজ রাজবল্লভ ত্রিতল অট্টালিকায় শয়ন করিতেন। প্রত্যেকটি

অট্টালিকার অভ্যন্তরে বহুসংখ্যক প্রকোষ্ঠ এবং সম্মুখে বারেন্দা ছিল। অন্তঃপুরের দক্ষিণ পশ্চিম ও উত্তর দিকে এক একটি দীঘি ছিল। এই সমস্ত দীঘি যথাক্রমে "বারদোয়ারির দীঘি" "ধারাইসারের দীঘি" এবং "বুড়াঠাকুরাণীর দীঘি" নামে অভিহিত হইত।

সুপ্রসিদ্ধ কৃষ্ণদেব বিদ্যাবাগীশের নিকেতন রাজপ্রসাদহইতে কিঞ্চিৎ ব্যবধানে ও তাহার দক্ষিণ পশ্চিম দিকে অবস্থিত ছিল। এই নিকেতনের তোরণদ্বার এবং বহুসংখ্যক সুন্দর সুন্দর অট্টালিকা নিয়ত লোকের চিত্তাকর্ষণ করিত। বিদ্যাবাগীশ মহাশয় মহারাজ রাজবল্লভের শিবমন্ত্র দাতা ছিলেন এবং তাঁহার বিদ্যাবত্তার খ্যাতি একদা সমগ্র বঙ্গদেশে পরিব্যাপ্ত হইয়াছিল।

এই আলয়ের পশ্চিম দিকে ভড়দ্বাজপাড়ানামক পল্লী ছিল এবং তাহার পশ্চিমে বাৎস্যপাড়া নামে দ্বিতীয় পল্লী অবস্থিত ছিল। সেই উভয় পল্লীতেই যথাক্রমে ভরদ্বাজ ও বাৎস্যগোত্রীয় ব্রাহ্মণগণ বাস করিতেন। পশ্চিমপাড়া-নামক পল্লী রাজভবনের পশ্চিমে এবং ঐ উভয় পল্লীর উত্তরে ছিল। রাজবল্লভের বহু সংখ্যক জ্ঞাতি এই শেষোক্ত পল্লীতে বাস করিতেন এবং তাঁহাদের অধিকাংশের আবাসস্থল রমণীয় অট্টালিকা ও সরোবরে পরিশোভিত ছিল।

"পুরাতন দীঘির" পূর্ব্ব দিকে "রাউতপাড়া" নামে এক পল্লী ছিল। এ স্থলেও রাজবল্লভের কতিপয় জ্ঞাতি বাস করিতেন। রাউতপাড়ার পূর্ব্বভাগে "রাণীসাগর" নামক সুদীর্ঘ সরোবর অবস্থিত ছিল। বহু সংখ্যক রজঃপুতজাতীয় লোক সেই সরোবরের তটে উপনিবেশ সংস্থাপন করিয়া মহারাজের সৈনিক বিভাগে কার্য্য করিত। রাণীসাগরের পূর্ব্ব ভাগে "নারিকেলতা পল্লী" ও তাহার পূর্ব্ব ভাগে "মান্দারিয়া" প্রমুখ কতিপয় পল্লী বিদ্যমান ছিল। "কৃষ্ণসাগর" ও "মতিসাগর" নামক দুই
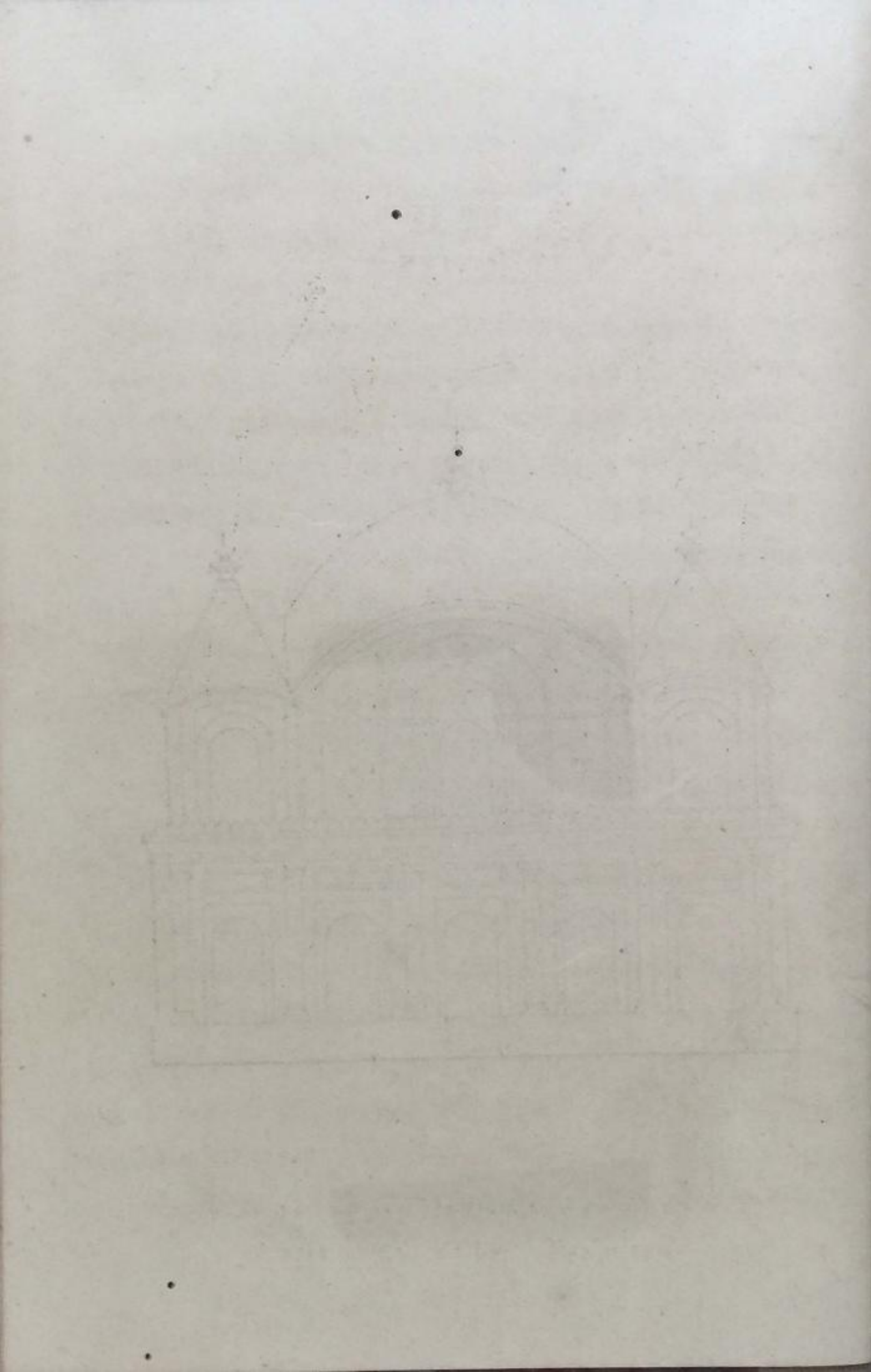
একটি মাত্র সমাজ ছিল এবং রাজবল্লভ ও তাঁহার উত্তরপুরুষগণ সেই সমাজের নেতা ছিলেন। গ্রাম্য দলাদলির ঝঞ্ঝাবাত কখনও এই সমাজকে স্পর্শ করিতে পারে নাই।

মধ্যাহ্ন আহারের পর সকলেই বিশ্রামসুখ ভোগ করিত। এই সময় রমণীগণ ভিন্ন ভিন্ন স্থানে মিলিত হইয়া চড়কায় সূতা কাটিত এবং সঙ্গে সঙ্গে খোসগল্প করিয়া একে অন্যের চিত্ত বিনোদন করিত। প্রাচীন ও প্রাচীনাগণ বিশেষ বিশেষ স্থানে একত্রিত হইয়া রামায়ণ, মহাভারত, শ্রীমদ্ভাগবৎপ্রভৃতি পুস্তকের পূত কাহিনী শুনিতে শুনিতে আত্মহারা হইয়া যাইত। যামিনীর প্রথম ভাগে বর্ষীয়সীরা নিজ নিজ গৃহকোণে বসিয়া চড়কায় সূতা কাটিত এবং পরিবারস্থ বালকবালিকাগণ উপকথা শুনিবার উদ্দেশ্যে তাহাদিগকে ঘিরিয়া বসিত। গভীর রাত্রি পর্য্যন্ত চড়কার ধ্বনির সঙ্গে সঙ্গে উপকথা চলিতে থাকিত।

বিধাতার নির্ব্বন্ধে এই আনন্দধাম অধিককাল স্থায়ী হয় নাই। অতি অশুভক্ষণে অনন্তকালসাগরে বাঙ্গালা ১২৭৬ শাল সমাগত হইল। "রথখোলা" নামে যে নদী এত দিন ক্ষুদ্রকলেবরে প্রবহমাণ হইতেছিল, তাহা সহসা বর্ষাকালে স্ফীত হইয়া ক্ষুধার্ত্তা রাক্ষসীর ন্যায় করাল বদন বিস্তার করিতে করিতে দক্ষিণদিকে অগ্রসর হইতে লাগিল। নগরের অধিকাংশ সৌধমালা অল্পকালমধ্যেই "রথখোলার" কুক্ষিগত হইয়া গেল। অনেক সুবৃহৎ ও সুরম্য নিকেতন চট্ চট্ শব্দ করিয়া নিমেষ মধ্যে স্রোতোপ্রবাহে অন্তর্দ্ধান করিল। পক্ষিগণ আশ্রয়শূন্য হইয়া আকাশপথে উড্ডীয়মান হইল। মনুষ্য ও পশুগণ আবাসের স্থান খুঁজিয়া না পাইয়া গ্রামান্তরে চলিয়া গেল। সমগ্র রাজনগরে সমবেত-স্বরে ক্রন্দনের রোল উঠিল।

সুবৃহৎ সরোবর নারিকেলতা পল্লীর মধ্যে অবস্থিত ছিল। রাজবল্লভের দ্বিতীয় পুত্র রাজা কৃষ্ণদাসের প্রযত্নে কৃষ্ণসাগর খনিত হইয়াছিল।

রাজসাগরের পশ্চিম ভাগে চাকলাদারপল্লী ও তাহার পশ্চিমে ভরদ্বাজপল্লী অবস্থিত ছিল। এই উভয় পল্লীতেই বহুসংখ্যক ব্রাহ্মণ বাস করিতেন। ভরদ্বাজপল্লীর পশ্চিম দিকে "শিববাড়ীর দীঘি" নামে এক সুবৃহৎ সরোবর দৃষ্ট হইত। সেই সরোবরের উত্তর তটে সাতটি মঠ এবং প্রত্যেকটি মঠে এক একটি পাষাণময় শিবলিঙ্গ প্রতিষ্ঠাপিত ছিল। আম, জাম, গুবাক, নারিকেল, খর্জ্জুর প্রভৃতি বৃক্ষের নিভৃত নিকুঞ্জমধ্যে ঐ সমস্ত শিবালয়ের অবস্থাননিবন্ধন দিবালোকেও তাহাদের সম্মুখীন হইতে লোকের মনে এক অব্যক্ত ভয়ের আবির্ভাব হইত। ঐ সরোবরের দক্ষিণ ও পশ্চিম ভাগে আরো কতিপয় পল্লী ছিল। সেই সমস্ত পল্লীতেও নানাজাতীয় লোক বাস করিত।

যে সমস্ত পল্লীর বিষয় উল্লেখ করা হইল তাহাদের প্রত্যেকটি পল্লী এক একটি গণ্ডগ্রামের ন্যায় বৃহদায়তন ছিল এবং প্রতি পল্লীতেই বহু সংখ্যক অট্টালিকা ও জলাশয় লক্ষিত হইত। পল্লীবাসিগণ মহারাজের ও তাঁহার জ্ঞাতিগণের প্রদত্ত জায়গীর ব্রহ্মোত্তর অথবা নানকারহইতে বৎসরের আহার্য্য সংগ্রহ করিয়া নিশ্চিন্তমনে স্ব স্ব ব্যবসায় পরিচালনা করিত। ব্রাহ্মণপ্রমুখ উচ্চজাতি চতুষ্পাঠীতে ও মক্তবে শাস্ত্রের আলোচনা করিতেন; শিল্পব্যবসায়িগণ অনন্যমনে শিল্পের অনুশীলনায় নিযুক্ত হইত। সম্পন্ন অধিবাসীর গৃহে প্রতি পর্ব্বোপলক্ষেই উৎসবের অনুষ্ঠান হইত এবং গ্রামবাসিগণ তাহাতে যোগদান করিয়া বিমল আনন্দ উপভোগ করিত। কেহই উৎকট ধনাকাঙ্ক্ষাদ্বারা প্রণোদিত হইত না, সকলেই সংযতভাবে জীবন যাপন করিত। অতিথি আসিয়া কোন গৃহস্থের আলয়হইতে বিমুখ হইয়া যাইত না। সমগ্র রাজনগরে

তাৎকালিক অবস্থা সহজেই হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিবেন। সেই যুগান্তর প্রলয়ের চিত্র অঙ্কিত করা এই দুর্ব্বল লেখনীর সাধ্যায়ত্ত নহে। যে সময় ঐ মর্ম্মভেদী অঙ্ক অভিনীত হইতেছিল, তৎকালে শ্রীহট্টনিবাসী সুপ্রসিদ্ধ জয়চন্দ্র ভট্ট রাজকবিরূপে রাজনগরে অবস্থান করিতেছিলেন। তিনি স্বচক্ষে সেই দৃশ্য অবলোকন করিয়া আবেগপূর্ণহৃদয়ে যে বিষাদ-সঙ্গীত রচনা করিয়াছিলেন, তাহা অদ্যাপি পূর্ব্ববঙ্গের ভট্টকবিগণ স্বরসংযোগে আবৃত্তি করিয়া থাকেন। কালের কঠোর শাসনে বহুকাল হইল সেই ভট্টকবি ইহধাম ত্যাগ করিয়া অনন্তধামে চলিয়া গিয়াছেন। কিন্তু তাঁহার বিরচিত শোকগাথা এখনও শ্রোতৃবর্গের মর্ম্মস্থলে প্রবেশ করিয়া দুর্ব্বিষহ যাতনা প্রদান করিয়া থাকে (১)। নিম্নে সেই গাথা উদ্ধৃত করা গেল।

নমো লক্ষ্মীনারায়ণ চক্রসুদর্শন,
শ্রীপতি শ্রীজনার্দ্দন।
গোলোক বিহারী গোলোকেশ্বর হরি
বৈকুণ্ঠে যে নারায়ণ॥

---

(১) শ্রীযুক্ত বাবু কৈলাসচন্দ্র সিংহ ১২৮৯ শালের "বান্ধব" পত্রিকার ৭৮ পৃষ্ঠায় রাজবল্লভের কীর্ত্তিসমূহ কীর্ত্তিনাশাকর্ত্তৃক ধ্বংস হওয়ার কথা উল্লেখ করিতে গিয়া লিখিয়াছেন—"পাপের প্রায়শ্চিত্ত"। ঐ প্রবন্ধের ৭৭ পৃষ্ঠায় তিনিই আবার লিখিয়াছেন, "বীরকেশরী চাঁদরায়কেদাররায়ের কীর্ত্তিপুঞ্জ গ্রাস করিয়াই বিক্রমপুরের মধ্যে গঙ্গা কীর্ত্তিনাশা আখ্যা ধারণ করিয়াছেন।" যদি বৈদ্যবংশীয় রাজবল্লভের অন্যায় আচরণ রাজনগরধ্বংসের কারণ হইয়া থাকে, তবে কায়স্থবংশজ বীরকেশরী চাঁদ-রায়কেদাররায়ের কীর্ত্তিসমূহ কীর্ত্তিনাশা কি জন্য গ্রাস করিল, তাহার কারণ কৈলাশ বাবু বলিবেন কি ? ফলতঃ যাহারা বিদ্বেষের বশে লেখনী ধারণ করে, তাহাদের পক্ষে পূর্ব্বাপর সামঞ্জস্য রক্ষা করা কখনও সম্ভবপর হইয়া উঠে না।

এই সময় প্রশান্ত "রথখোলার" নদী সংহারমূর্ত্তি পরিগ্রহ করিয়া নগরের ধ্বংসসাধনে নিযুক্ত হইল। নদীগর্ভে বহুসংখ্যক ঘূর্ণাবর্ত্ত উত্থিত হইয়া ভীষণ শব্দ উৎপাদন করিতে লাগিল এবং যে স্থলে একদা সুরম্য নগর বিদ্যমান ছিল, তাহা একেবারে সুবৃহৎ তরঙ্গসঙ্কুল স্রোতো-প্রবাহে পরিণত হইয়া গেল। যে রাজনগর একদা সৌষ্ঠব ও সমৃদ্ধির নিমিত্ত সমগ্র বঙ্গদেশে খ্যাতি লাভ করিয়াছিল, যাহা মহারাজ রাজ-বল্লভের অসামান্য কীর্ত্তিস্তম্ভরূপে বিরাজমান ছিল, তাহা এইরূপে ধ্বংসের ফলেই "রথখোলা" কীর্ত্তিনাশা নাম সার্থক হইল (১)। যাঁহারা স্বচক্ষে সেই ধ্বংসদৃশ্য নিরীক্ষণ করিয়াছেন, তাঁহারা রাজনগরবাসিগণের

---

(১) "কীর্ত্তিনাশা" নামকরণসম্বন্ধে বিভিন্ন মত প্রচলিত আছে। কেহ বলেন রাজনগরের কীর্ত্তি ধ্বংস করিয়া রথখোলা নদী "কীর্ত্তিনাশা" আখ্যা প্রাপ্ত হইয়াছে। কাহারও মতে চাঁদরায়কেদাররায়ের কীর্ত্তি ধ্বংস করিয়া রথখোলার নাম কীর্ত্তি-নাশা হইয়াছিল। Tailor সাহেবকৃত Topography of Dacca নামক পুস্তকে "কীর্ত্তিনাশার" নাম উল্লেখ আছে। এই গ্রন্থ রাজনগর ধ্বংসের পূর্ব্বে বিরচিত; সুতরাং কীর্ত্তিনাশা নাম রাজনগরধ্বংসের সঙ্গে সঙ্গে যে হয় নাই, একথা নিঃসন্দেহে বলা যাইতে পারে। জয়চন্দ্র ভট্টের কবিতাপাঠে জ্ঞাত হওয়া যায়, ১২২৫ শালে রথ-খোলা নদী উদ্বেলিত হইয়া চাঁদরায় ও কেদাররায়ের আবাসস্থল ভাঙ্গিয়া আসিয়া রাজনগর পর্য্যন্ত অগ্রসর হইয়াছিল। দক্ষিণ বিক্রমপুর ছয়গাঁনিবাসী বঙ্গচন্দ্র ন্যায়ভূষণ মহাশয় বলেন, এই সময় রাজবল্লভের উত্তরপুরুষগণ এক যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিয়া রাজনগরকে কীর্ত্তিনাশার গ্রাস হইতে রক্ষা করেন; এবং তৎকালে কবিওয়ালাগণ সেই ঘটনা উপলক্ষ করিয়া যে গান রচনা করিয়াছিল, তাহাতে "কীর্ত্তিনাশার কীর্ত্তি কর্‌লে নাশ" এই কথাটি বিদ্যমান আছে। অতএব বুঝা যাইতেছে যে ১৮৩৮ খৃষ্টাব্দের পূর্ব্ব হইতেই কীর্ত্তিনাশা নাম প্রচলিত আছে। তবে একথা অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে যে রাজনগর ধ্বংসের পূর্ব্বে কীর্ত্তিনাশা নাম তাদৃশ প্রসিদ্ধি লাভ করে নাই।

মজুমদার কৃষ্ণ, জীবন বিশিষ্ট,
সুতপস্যা ভবার্ণব।
তস্য ঘরে জাত, হইল বিখ্যাত,
মহারাজ রাজবল্লভ ॥
হইয়া মহারাজ, রাজনগর মাঝ,
বৈদ্যবংশে অবতার।
রাঢ় গৌড় কলিঙ্গ, তুল্য অঙ্গ বঙ্গ
চমৎকার কীর্ত্তি যার ॥
জন্মে ভূমণ্ডলে, নিজ বাহুবলে
কীর্ত্তি করেন বহুতর।
বিল দাওনিয়া ভরি, অট্টালিকা পুরী,
নির্ম্মাইল নরেশ্বর।
সব দালান পাকা, চক মিলান বাঁকা,
তুল্য অমরনগর।
শতরত্নাবধি (১) পঞ্চরত্ন আদি,
একুশ রত্ন মনোহর ॥
দোলমঞ্চশোভা, আহা মরি কিবা
সুমেরুর চূড়াপ্রায়।
দীঘি সরোবর, সব প্রায় সাগর,
স্থানে স্থানে দেখা যায় ॥
কত স্থানাস্থান, দেবালয় নির্ম্মাণ
শিবালয়ে স্থাপিত শিব।

(১) সপ্তদশ রত্নকে লোকে "শতরত্ন" বলিত।

ভক্তাধীন হরি ভক্তের বাঞ্ছাকারী,
ভক্তকে করেন উদ্ধার।
অসংখ্য মহিমা বেদে নাহি সীমা,
জীবের বুঝা সাধ্য ভার।
ভবে বাস তরে, একস্থান পরে
সৃজন করিলা হরি।
(ঐ) সোণার রাজনগর, সৃজিলা শ্রীধর
সুখবাঞ্ছা মনে করি॥
বিপ্র বৈশ্য কায়স্থ, বিষয়ী সমস্ত
বাস্ত আছে বহুতর।
(যেমন) যমুনা মধ্যেতে, মথুরা ব্রজেতে,
(তেম্নি) খাল বিল নদী নগর।
যত দেবলোক, করিয়া কৌতুক
সৃজিলেন ভগবান্।
তেম্নি ধন্য ধাম, রাজনগর গ্রাম,
দ্বিতীয় করিল নির্ম্মাণ॥
সে স্থানে ভূপতি, নাহি যদুপতি
দেখে, চিন্তাযুক্ত মন।
এই মনে করে, সমুদ্রের তীরে
দ্রুত করিলেন গমন॥
ঘোর যুদ্ধ করি, আপনি শ্রীহরি
জরাসন্ধে কল্লেন বধ।
পুনঃ জন্মে তারে, দিল রাজনগরে,
দ্বিতীয় রাজত্বপদ॥

নেপাল মথুরা, কর্ণাট ত্রিপুরা,
এমন কীর্ত্তি নাহি আর॥
জানি কোন শাপে, জরাসন্ধ ভূপে
জন্মিল রাজনগর মাঝ॥
যাঁহার কৃপাতে, বাঙ্গালা মুল্লুকেতে,
প্রকাশ পাইল ইংরাজ॥
নবাবী আমল, করি বেদখল,
ইংরাজকে রাজত্ব দিল।
ধন্য মহারাজ, ডঙ্কা ভব মাঝ
রেখে পরলোক হল॥
যদিও নির্জ্জীব, কীর্ত্তি তাঁর সজীব,
বর্ত্তমান ভূমণ্ডলে।
সে কীর্ত্তির বাদী, কীর্ত্তিনাশা নদী,
অকস্মাৎ তরঙ্গ হলে॥
শুনি পঁচিশ শালে, ভাঙ্গিল দুকূলে,
কীর্ত্তিনাশা হয়ে থল।
আড়া ফুলবেড়িয়া (১) গোকুলগঞ্জ (২) ভাঙ্গিয়া
মূলফৎগঞ্জ (৩) কল্লে তল॥
চাঁদ কেদার রায়ের (৪), কীর্ত্তি চমৎকার
ভেঙ্গে নিল কোটীশ্বর (৫)।
গোবিন্দ মঙ্গল (৬), (সোণার) সোণার দেউল (৭)
খাকুটিয়াদি (৮) বহুতর॥

---

(১), (২), (৩), (৫), (৬) (৭), (৮)। গ্রামের নাম।

(৪) কায়স্থবংশীয় সুপ্রসিদ্ধ জমিদার। বিক্রমপুরের অন্তর্গত রাজাবাড়ীর মঠ তাঁহারা সংস্থাপন করেন বলিয়া লোকপ্রবাদ।

কোটি শিব কুড়াশি (১) তুল্য প্রায় কাশী
দৃষ্টিকর কলির জীব ॥
রাজা লক্ষ্মী নারায়ণ(২) দেবাদি ব্রাহ্মণ
সেবা করে নিরন্তর।
যাঁর কৃপাবলে, রাজত্বপদ পেলে,
আসিয়া ধরণী পর ॥
সিংহদরজার, নক্সা চমৎকার,
দেখিয়ে হয় যে শঙ্কা।
(যেমন) সমুদ্র মাঝারে, রাজা লঙ্কেশ্বরে
সৃজিল কনকলঙ্কা ॥
যেম্‌নি রামায়ণে, শুনেছি শ্রবণে,
প্রত্যক্ষ তা দেখাইল।
তেম্‌নি মত সব, রাজা রাজবল্লভ,
বিল দাওনিয়া দীপ্তি কৈল ॥
রাবণ ঠসর, রাবণ চসর,
রাবণ প্রতাপ সব।
রাবণ জিনিয়া, দিগ্বিজয়ী হৈয়া,
মহারাজ রাজবল্লভ ॥
সুবে বাঙ্গলায়, সুবে উড়িষ্যায়
সুবে বর্দ্ধমান বিহার।

---

(১) কুড়াশি গ্রামে এককোটি শিবলিঙ্গ প্রতিষ্ঠাপিত ছিল। কেহ বলেন উহা রাজবল্লভকর্ত্তৃক এবং কাহারও মতে উহা তাঁহার ভ্রাতুষ্পুত্র রায় মৃত্যুঞ্জয় কর্ত্তৃক সংস্থাপিত হইয়াছিল।

(২) লক্ষ্মীনারায়ণ চক্র।

মহারাজের বাদী কীর্ত্তির,
হ'ল কীর্ত্তিনাশা ॥
(হায়রে) দারুণ বিধি, বুঝি নদীরূপে কাল হইয়া।
কৈল অসময়, কি খণ্ড প্রলয়, রাজনগর ভাঙ্গিয়া ॥
নাই ভারতবর্ষে, বাঙ্গালাদেশে, এমন কীর্ত্তি আর।
(সেই) সোণার নগর, কীর্ত্তিসাগর, কল্লে কি ছারখার ॥
ও সব দেখিয়ে লোকে, মনের দুঃখে, বলে হায় রে হায়।
কল্লেম কি জন্য, অর্জ্জিত বিত্ত, নদী লইয়া যায় ॥
অগ্নি কলরব, অসম্ভব, হইল নগরে।
(কেহ) কোলের ছেলিয়া, বিত্ত ফেলিয়া, সরিয়া যাইতে নারে ॥
ক্ষুদ্র তালুকদাররা, চিত্তহারা, হ'ল হতজ্ঞান।
বলে জীবনে কি সাধ, ভবে কিসে রবে মান ॥
কেহ বলে ভাই, কি হইল রে, এই ছিল কি লেখা।
বুঝি এই রাজ্যে আর, কার সঙ্গে কার, না হইবে দেখা ॥
নদীর বেগ অতি, রাজ্য প্রতি, কি ছিল আক্রোশ।
যাচ্ছে মহারঙ্গে, রাজ্য ভেঙ্গে, মধ্যে দিয়া ঢোস ॥
লোকে কোথা যাবে, কি করিবে, হ'ল সশঙ্কিত।
(হায়রে) কিবা দশা, কীর্ত্তিনাশা, কল্লে আচম্বিত।
এমন চমৎকার, কীর্ত্তি আর, হবে না ভুবনে।
এমন সোণার নগর, কীর্ত্তিসাগর, পাব কোন্ স্থানে ॥
কত দেশবিদেশী, লোক আসি, দেখে বলে হায়।
নদী কি তরঙ্গে, কীর্ত্তিভেঙ্গে, রাজ্য লয়ে যায় ॥
কত দালান পাকা, চকমিলান বাঁকা, ভাঙ্গিল বহুতর।
প্রথম কুণ্ডের বাড়ী ভেঙ্গে ধরিলেক সুখসাগর ॥

পূর্ব্বে এই মত, ভেঙ্গে নিয়ে কত,
স্থির ছিল কিয়ৎকাল।
পুনঃ ছিয়াত্তর শালে, ভাঙনি আরম্ভিলে
হইল তরঙ্গ উত্তাল ॥
দেখ দেখ ভাইরে, রাজনগরের হ'ল কি দুর্দ্দশা।
কল্লে মহারাজের কীর্ত্তিনিবৃত্তি কীর্ত্তিনাশা ॥
(যেমন) নল রাজা, মহাতেজা,
পাপাশ্রিত হলো।
দুষ্ট কলি যেয়ে, প্রবেশিয়ে,
রাজ্যভ্রষ্ট কৈল ॥
হ'ল তদাকার, ধরা'পর,
কলুষ প্রবল।
(নৈলে) সাগর নগরে, কি নদী করে,
হ'য়ে এত খল ॥
যাকে ভবার্ণবে, এম্নি ভাবে,
বিধি হয়রে বাম।
তাকে এরূপে কি, দেখ দেখি,
করয়ে নির্নাম ॥
(যখন) চন্দ্রধর, প্রতি কর,
মনসা বিবাদী।
এনে কালীদহে, করে তাহে,
ঊনশত নদী ॥
করে মহার্ণব, ডিঙ্গা সব,
ভাসান মনসা।

সাধের নব রতন পতন যখন নদীর মাঝারে।
(যেমন) নিরাকারে বটপত্র প্রায় ভাসে নীরে। (১)
এমন দেখি নাই আর জগৎ সংসারে॥

বলেন বাবু সবে, বিষাদ ভেবে, বিধির হ'ল কোপ।
একে কালে মহারাজের নামটি কর্‌লে লোপ।
(হায়রে) কীর্ত্তিনাশা হ'য়ে কালস্বরূপ॥

অমনি সোণার মঞ্চ দোলমঞ্চ হইল পতন।
রাজা লক্ষ্মীনারায়ণ থাকৃতে হ'ল এরূপ লাঞ্ছন।
বুঝি দৈব ধর্ম্ম নাই কলিতে এখন॥

যদি থাকৃত সত্য মাহাত্ম্য ব্রাহ্মণদেবতার।
তবে কি আর ছিন্ন ভিন্ন হয়রে এ সংসার।
(জানিলাম) কলিতে হবে সব একাকার॥

(হায়রে) কীর্ত্তিনাশা কি নিরাশা কর্‌লে একবার।
একটা চিহ্ন না রাখিল নাম রাখিতে আর।
হায়রে জহ্নু মুনি নাইরে এ সংসার॥

দেখি স্থলে কাঁদে স্থলচর, জলে কাঁদে মীন।
আকাশের চন্দ্র সূর্য্য হইল মলিন।
(হায়রে) একুশ রত্ন পড়িল যেদিন॥

---

(১) "নবরত্ন" প্রাসাদ এরূপ সুদৃঢ়ভাবে গঠিত ছিল যে সমগ্র রাজনগর নদী-গর্ভস্থ হইলেও এই প্রাসাদ অনেকদিন পর্য্যন্ত স্থিরভাবে নদীগর্ভে দণ্ডায়মান ছিল। তৎকালে বোধ হইত যেন কীর্ত্তিনাশার বিশাল সলিলরাশির অভ্যন্তর হইতে উহা উত্থিত হইয়াছে।

নিল সুখের সাগর, সুখ সাগর (১), মহাসাগর (২) ধরে।
নদীর কি প্রতাপ অসম্ভব, প্রাণটি কাঁপে ডরে॥
সাধের মতি সাগর (৩), মুহূর্ত্তেক পর, ভাঙ্গিল রে ভাই।
দেখ কোথায় গেল, রাউতপাড়া (৪) আকশার (৫) চিহ্ন নাই॥
নিল রাণীসাগর (৬), কৃষ্ণসাগর (৭), গুরুধাম (৮) আর।
হায়রে খালে বিলে এক সমান যে কর্‌লে একাকার॥
(হায়রে) পুরাণ দীঘি, কালবৈশাখী, হ'ত যার পার।
নিল সেই মেলা, জুয়াখেলা, লালরাজারবাহার॥
যাচ্ছে ক্রমাগত, ভেঙ্গে যত, রাজবংশের কীর্ত্তি।
রায়মৃত্যুঞ্জয়ের কীর্ত্তি পরে করিল নিবৃত্তি॥
(যখন) শতরতন, হইল পতন, চমৎকার নগরে।
হ'ল কাশীতে যে ভূমিকম্প পঞ্চক্রোশী'পরে॥
ভট্টজয়চন্দ্র, পদ বন্দে করিল বর্ণন।
(এখন) পুরাণ হাওলীর কথা বলি শুন সর্ব্বজন॥
(হায়রে) কীর্ত্তিনাশা কীর্ত্তি সব নিল।
(বুঝি) এতদিনে মহারাজের নামটি লোপ হ'ল।
সোণার রাজনগর কি জলাকার হইল॥
ভেঙ্গে রায় মৃত্যুঞ্জয়ের হাওলী, বাওলী দিয়ে অকস্মাৎ।
পুরাণ হাওলী যে'য়ে ধরণ একি বজ্রাঘাত।
(হায়রে) বাবু সবকে করিয়া অনাথ॥

---

(১), (২), (৩), (৬), (৭) রাজনগর মধ্যস্থিত তৎতন্নামক সরোবর।

(৪), (৫) রাজনগর মধ্যগত পল্লীবিশেষ।

(৮) রাজনগরের যে অংশে কৃষ্ণদেববিদ্যাবাগীশের ইষ্টদেবতা বাস করিতেন, তাহাকে গুরুধাম বলিত।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

ভারতীয় আর্য্যজাতির যে অম্বষ্ঠব্রাহ্মণ শাখা উত্তরকালে বাঙ্গলাদেশে "বৈদ্য" নামে অভিহিত হইয়াছে, সেই অভিজাত সম্প্রদায়ে শ্রীহর্ষনামে জনৈক মহামহোপাধ্যায়ের আবির্ভাব হইয়াছিল। বৈদ্যকুলপঞ্জিকানুসারে তিনি সেনভূমি (১) প্রদেশের নরপতি ও সুবিখ্যাত সেনরাজবংশসম্ভূত মহারাজ বল্লালসেনের সমকালবর্ত্তী ব্যক্তি ছিলেন। (২)

---

(১) এই প্রদেশ বর্ত্তমান মানভূমি জিলায় অবস্থিত।

(২) ১৩০৬ শালের সাহিত্যপরিষৎনামক পত্রিকার ২২৭ পৃষ্ঠায় শ্রীযুক্ত আনন্দনাথ রায় মহাশয়ের যে প্রবন্ধ বাহির হইয়াছে, তাহাতে লিখিত আছে যে, রাজা শ্রীহর্ষ ফকর উদ্দিনের স্ত্রীর মৃতবৎসারোগ আরোগ্য করিয়া রাজা উপাধি ও সেনভূমি প্রদেশের জমিদারী প্রাপ্ত হন। আনন্দনাথ বাবু এই উক্তি সমর্থনোদ্দেশ্যে "অম্বষ্ঠকুলদীপিকা" নামক গ্রন্থঃহইতে এক শ্লোক উদ্ধৃত করিয়াছেন। অম্বষ্ঠকুলদীপিকা অতি আধুনিক গ্রন্থ। কবিকণ্ঠহারপ্রণীত প্রাচীন সদ্বৈদ্যকুলপঞ্জিকা পাঠে অবগত হওয়া যায় যে, রাজা শ্রীহর্ষ বল্লালের সমকালবর্ত্তী ছিলেন। বিশ্বস্ত ঐতিহাসিকগণ বল্লালকে খৃষ্টীয় একাদশ শতাব্দীর এবং ফকর উদ্দিনকে চতুর্দ্দশ শতাব্দীর লোক বলিয়া নির্দ্দেশ করেন। শ্রীহর্ষহইতে রাজবল্লভ পর্য্যন্ত গণনা করিলে কনিষ্ঠতম শাখায় উনবিংশ পুরুষ হয়। রাজবল্লভ খৃষ্টীয় অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রথম ভাগে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। প্রতি তিন পুরুষে এক শতাব্দী গণনা করিলে রাজা শ্রীহর্ষও প্রায় একাদশ শতাব্দীর লোক হইয়া দাঁড়ান। অতএব শ্রীহর্ষ যে বল্লালের সমকালবর্ত্তী ছিলেন এবং ফকর উদ্দিনের সমকালবর্ত্তী নহেন, তাহা অনায়াসে নির্দ্ধারণ করা যাইতে পারে। পশ্চাৎ আনন্দনাথ বাবু জানাইয়াছেন যে, তিনি ভ্রমে শ্রীহর্ষকে ফকর

যত পাখী সব উড়ে উড়ে ঘুরিয়ে বেড়ায়।
(তাদের) আশা বাসা কীর্ত্তিনাশা ভেঙ্গে নিয়ে যায়।
তারা বসিবার স্থান নাহি পায়॥

কেহ যায়রে হাসেরকাঁদি (১) কেহ খিলগাঁয়। (২)
কেহ কেহ পাতনা দিয়ে বসে দিন কাটায়।
বলে নদী নিরে (৩) একবার ফিরে যায়॥

ভট্ট জয়চন্দ্রের এই নিবেদন শুন সর্ব্বজন।
কাছাড় জিলায় ভূমিকম্পে এইরূপ ঘটন।
তাতে হয়েছে এক আশ্চর্য্য প্রলয়॥

জান্‌লেম বিধিকৃত কর্ম্ম যত খণ্ডন না যায়।
যা হবার তা হয়ে গেছে আমার কি উপায়।
এমন মান্য আমি পাব বা কোথায় (৪)

---
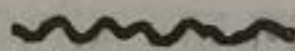
(১), (২) গ্রামের নাম।

(৩) কিনা।

(৪) ভট্টকবির বিরচিত এই কবিতার স্থানে স্থানে যতিভঙ্গ হইয়াছে এবং স্থানে স্থানে শ্রীহট্টপ্রদেশীয় শব্দের প্রয়োগ আছে। কিন্তু ভট্ট কবিগণ যখন স্বর-সংযোগে এই কবিতার আবৃত্তি করেন, তখন ঐ সমস্ত দোষ পরিলক্ষিত হয় না।

বাচস্পতির পুত্র হৃষীকেশ, হৃষীকেশের পুত্র যশশ্চন্দ্র, যশশ্চন্দ্রের পুত্র গোবিন্দ এবং গোবিন্দের পুত্র বেদগর্ভসেন। বেদগর্ভ যশোহর জিলার অন্তর্গত ইতিনা গ্রামে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। একদা ব্রহ্মপুত্র স্নানোপলক্ষে তিনি "দাওনীয়া" গ্রামে আসিয়া উপস্থিত হন (১)। তৎকালে সুপ্রসিদ্ধ নওপাড়ার চৌধুরীবংশের দেওয়ান সত্যমন্ত দাশ এই গ্রামে বাস করিতেন। বেদগর্ভ সত্যমন্তদাশের জনৈক কন্যার রূপ লাবণ্যে মোহিত হইয়া তাঁহার পাণিগ্রহণ করেন ও শ্বশুরালয়ে গৃহ-জামাতৃরূপে অবস্থান করিতে থাকেন। কালক্রমে ঐ মহিলার গর্ব্ভে নীলকণ্ঠ ও শ্রীকৃষ্ণ নামে দুই পুত্র জন্মে। নীলকণ্ঠ পৈত্রিক আলয় পরি-ত্যাগপূর্ব্বক অদূরবর্ত্তী জপসাগ্রামে গৃহপ্রতিষ্ঠা করেন। জপসানিবাসী সুপ্রসিদ্ধ রায়বংশীয় জমিদারগণ নীলকণ্ঠেরই উত্তর পুরুষ। নীলকণ্ঠের বংশে অনেক সুকবি জন্মগ্রহণ করিয়া তাঁহার গৌরব রক্ষা করিয়াছেন। "মায়াতিমিরচন্দ্রিকা" নামক সংস্কৃতকাব্যপ্রণেতা রামগতি রায়, "হরিলীলা" ও "চণ্ডিকা" নামক বাঙ্গলাকাব্যপ্রণেতা লালা জয়নারায়ণ এবং আনন্দ-ময়ী দেবী ও গঙ্গাদেবী নামক দুই মহিলা কবি এই বংশেই জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। গঙ্গাদেবীবিরচিত বহুসংখ্যক সঙ্গীত এখনও পূর্ব্ববঙ্গে বিবাহোপলক্ষে রমণীসমাজকর্ত্তৃক গীত হইয়া থাকে। "বঙ্গভাষা ও সাহিত্য"নামক গ্রন্থপ্রণেতা শ্রীযুক্ত দীনেশচন্দ্র সেন ঐ গ্রন্থের একস্থানে লিখিয়াছেন "আনন্দময়ী দেবীর যেরূপ রচনা পারিপাট্যের উদাহরণ দেওয়া গিয়াছে, তাহাতে তাঁহাকে আধুনিক বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাধিধারিণী শিক্ষিতা মহিলাগণের অন্ততঃ সমকক্ষ গণ্য করিতে হইবে" (২)।

(১) কাহারও মতে তিনি পাঠাভ্যাসের উদ্দেশ্যে আগমন করেন।

(২) শ্রীযুক্তআনন্দনাথরায়বিরচিত ১৩০৭ শালের সাহিত্যপরিষৎপত্রিকার ১৫২ পৃষ্ঠায় প্রকাশিত "কবি লালা জয়নারায়ণ" নামক প্রবন্ধ অবলম্বনে লিখিত।

রাজা শ্রীহর্ষের বংশে অনেক যশস্বী ব্যক্তির জন্মগ্রহণ হইয়াছে। ভট্টি প্রভৃতি কাব্যের টীকাকার মল্লিনাথস্পর্দ্ধী মহামহোপাধ্যায় ভরত মল্লিক, সাধকপ্রবর রামপ্রসাদ সেন, সুবিখ্যাত পণ্ডিত শিবদাস সেন বাচস্পতি ও জগন্নাথ সেন সার্ব্বভৌম, স্বপ্নবিলাস, দিব্যোন্মাদ প্রভৃতি গীতিকাব্যপ্রণেতা কৃষ্ণকমল গোস্বামী এবং ধর্ম্মাত্মা ও সুপ্রসিদ্ধ বাগ্মী কেশবচন্দ্র সেন এই বংশ হইতেই সমুদ্ভূত হইয়াছিলেন।

শ্রীহর্ষের দুই পুত্র :—কমল ও বিমল। বিমল পিতৃরাজ্য পরিত্যাগ পূর্ব্বক রাঢ়দেশে আগমন করেন (১)। বিমলের পুত্র বিনায়ক, বিনায়কের পুত্র ধন্বন্তরী, ধন্বন্তরীর পুত্র গাণ্ডেয়ী, গাণ্ডেয়ীর পুত্র হিঙ্গু (২) এবং হিঙ্গুর পুত্র বলভদ্রসেন। অনিরুদ্ধ নামে বলভদ্রের এক পুত্র জন্মিয়াছিল (৩)। অনিরুদ্ধের পুত্র অর্জ্জুন, অর্জ্জুনের পুত্র বাচস্পতি,

---

উদ্দিনের সমসাময়িক বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছিলেন, কিন্তু 'নরহরি' নামক অন্যতর প্রবন্ধে তিনি শ্রীহর্ষকে বল্লালের সমকালবর্ত্তী বলিয়াই নির্দ্দেশ করিয়াছেন।

(১) ভরতমল্লিকের মতে বিনায়ক সেনই রাঢ়দেশে আগমন করিয়াছিলেন। কিন্তু প্রকৃত কথা এই যে বিমল আপন কৃতী পুত্র বিনায়কসহ রাঢ়ে আগমন করেন। বিমলের ভ্রাতা কমল সেনভূমিতে রাজত্ব করিতে থাকেন। ভরত তদীয় চন্দ্রপ্রভার ২১০ পৃষ্ঠায় তাঁহাকেই ভ্রমক্রমে বিমল বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। কিন্তু এ বিষয়ে কবিকণ্ঠহারের উক্তিই সত্যগন্ধি। তিনি লিখিয়াছেন :—

> সেনভূমাবভূৎ রাজা ধন্বন্তরিকুলোদ্ভবঃ।
> শ্রীহর্ষস্তস্য তনয়ঃ কমলোবিমলো তথা॥
> পিতৃরাজ্যেঽভিষিক্তোঽভূৎ কমলো বিমলঃ পুনঃ।
> কুলচ্ছত্রমুপাদায় রাঢ়দেশমুপাগতঃ॥

(২) হিঙ্গু রাঢ়দেশ পরিত্যাগপূর্ব্বক খুলনা জিলার অন্তর্গত সেনহাটীর লাগ পূর্ব্বপার্শ্বস্থ চন্দনীমহল গ্রামে আগমন করেন।

(৩) অনিরুদ্ধ সেনহাটী ত্যাগ করিয়া ইতিনা গ্রামে উঠিয়া আসেন।

বলিয়া পরিচয় দিয়া থাকেন। তিনি এই বাক্যের সত্যাসত্যনির্ণয় করিবার জন্য ১৮০৯ খৃষ্টাব্দে সুবর্ণগ্রামে পদার্পণ করেন। সেই সময় পূর্ব্ববঙ্গের প্রধান পণ্ডিতগণ তাঁহার নিকট বলিয়াছিলেন যে, ত্রিপুরা ও মণিপুরের রাজগণ চন্দ্রবংশজ। এই উক্তি যেরূপ হাস্যজনক ও অকর্ম্মণ্য, রাজবল্লভ ও তাঁহার সন্তানসন্ততির উক্তিও তদ্রূপই বটে।

রাজবল্লভ ও তাঁহার উত্তরপুরুষেরা সমাজে প্রাধান্যলাভের দুরাকাঙ্ক্ষায় পূর্ব্বপুরুষের নাম পর্য্যন্ত পরিবর্ত্তন করিতে কুণ্ঠা বোধ করেন না, ইহা প্রদর্শন করিবার অভিপ্রায়েই যে কৈলাস বাবু পূর্ব্বোক্ত কথাগুলির অবতারণা করিয়াছেন, সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। কিন্তু ডাক্তার সাহেব যে ঐরূপ কোন উক্তি করিয়াছেন, তাহা কৈলাস বাবু প্রমাণপ্রয়োগদ্বারা প্রদর্শন করেন নাই। অতএব ডাক্তার সাহেব ঐরূপ কোন উক্তি করিয়াছেন কি না তাহা নিশ্চিতরূপে বলা সুকঠিন। ডাক্তার সাহেব সেইরূপ কোন কথা বলিয়া থাকিলেও তাহা বিনা বাক্যব্যয়ে উদ্ধৃত করা কৈলাস বাবুর পক্ষে সঙ্গত হয় নাই। রাজবল্লভের আবাসস্থল বিক্রমপুর হইতে মালদহ ও সুবর্ণগ্রাম যে সুদূরবর্ত্তী তাহা বোধ হয় অনেকেই জ্ঞাত আছেন। ফলে বিক্রমপুরসমাজস্থ কোন বৈদ্যের বংশাবলী সুবর্ণগ্রামনিবাসী কোন ব্রাহ্মণের (১) নিকট জানিতে প্রয়াস পাওয়া বাতুলতা ভিন্ন আর কি হইতে পারে। ১৮০৯ খ্রীষ্টাব্দের বহুপূর্ব্বে, অর্থাৎ ১৭৬৩ খ্রীষ্টাব্দে রাজবল্লভ পরলোক গমন করেন। এ অবস্থায় ১৮০৯ খ্রীষ্টাব্দের প্রাক্কালে রাজবল্লভ সূক্ষ্মশরীরের সাহায্য ভিন্ন মালদহ অঞ্চলে স্বীয় আভিজাত্য প্রচার করিতে পারেন না। রাজবল্লভের

---

(১) কৈলাস বাবু "প্রধান পণ্ডিত" এই কথা বলিয়াছেন। তিনি যে তদ্দ্বারা ব্রাহ্মণ পণ্ডিত বুঝাইতেছেন তাহা বোধ হয় না বলিলেও সহজে অনুমান করা যাইতে পারে।

বেদগর্ব্ভের দ্বিতীয় পুত্র শ্রীকৃষ্ণসেন পৈত্রিক ভদ্রাসনেই রহিয়া গিয়াছিলেন। শ্রীমুখ, নরসিংহ ও মহেশচন্দ্র নামে ক্রমে তাঁহার তিন পুত্র জন্মিয়াছিল। শ্রীমুখ সেনের উত্তর পুরুষেরা রাজনগরের অন্তর্গত "মান্দারিয়া" পল্লীতে ও মহেশের উত্তর পুরুষগণ ঐ জনপদের মধ্যগত "পশ্চিমপাড়া" পল্লীতে বাস করিতেন। শ্রীকৃষ্ণের মধ্যম পুত্র নরসিংহ সেন ঢাকানগরীতে রাজস্ববিভাগে কার্য্য করিয়া "মজুমদার" উপাধি লাভ করিয়াছিলেন এবং তাঁহার অনন্তরবংশীয়েরা এখনও "মজুমদার" বলিয়াই অভিহিত হইতেছেন। রামচরণ, রামনারায়ণ এবং রাম-গোবিন্দ নামে তিন পুত্র বিদ্যমান রাখিয়া নরসিংহ কালগ্রাসে পতিত হন। জ্যেষ্ঠ রামচরণের কোন সন্তান জন্মে নাই। রামনারায়ণের উত্তরপুরুষেরা রাজনগরের অন্তর্গত "রাউতপাড়া" পল্লীতে বাস করিতেন। কনিষ্ঠ রামগোবিন্দের একমাত্র পুত্রের নাম কৃষ্ণজীবন মজুমদার। কৃষ্ণজীবনের পুত্র মহারাজ রাজবল্লভের জীবনবৃত্তান্তই বর্ত্তমান গ্রন্থের প্রধান আলোচ্য বিষয়।

রাজা শ্রীহর্ষের দ্বিতীয় পুত্র বিমলসেন কৌলীন্যমর্য্যাদা লাভ করিয়া বাঙ্গালা দেশের অন্তর্গত পুণ্যতীর্থ মালঞ্চ নগরে (ইহা ভাগীরথীর পূর্ব্বতীরবর্ত্তী কুলে ও শান্তিপুরের উপকণ্ঠবর্ত্তী গ্রাম) আগমন করিলেও, তাঁহার উত্তর পুরুষেরা সকলেই মর্য্যাদা অক্ষুণ্ণ রাখিতে সমর্থ হন নাই। বিক্রমপুরাগত বেদগর্ভ সেনের উত্তর পুরুষগণ বিক্রমপুরস্থ বৈদ্যসমাজে এখন আর কুলীন বলিয়া পরিগৃহীত নহেন; তাঁহারা এই সমাজের মধ্যমশ্রেণীতে অবস্থিত আছেন।

শ্রীযুক্ত বাবু কৈলাসচন্দ্র সিংহ ১২৮৯ শালের বান্ধব পত্রিকার ৭৯ পৃষ্ঠায় লিখিয়াছেন "ডাক্তার বুকানন্ সাহেব মালদহ অবস্থান কালে শুনিতে পান যে, রাজবল্লভ ও তদ্বংশধরগণ আপনাদিগকে বল্লালবংশজ

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

জাহাঙ্গীর নগর

মুসলমানবিজয়ের পূর্ব্বে বাঙ্গালাদেশ রাঢ়, বাগড়ী, বঙ্গ, বরেন্দ্র এবং মিথিলা এই পাঁচ প্রধানবিভাগে বিভক্ত ছিল।

এই সময় হুগলীনদীর পশ্চিমহইতে গঙ্গানদীর দক্ষিণপ্রান্ত পর্য্যন্ত রাঢ়দেশ, গঙ্গানদীর উপকূলস্থানসমূহ বাগড়ীপ্রদেশ, বাগড়ীর পূর্ব্বভাগে বঙ্গদেশ, গঙ্গানদীর উত্তর হইতে করতোয়া ও মহানন্দানামক স্রোতস্বতী-দ্বয়ের মধ্যবর্ত্তীস্থান বরেন্দ্রপ্রদেশ এবং মহানন্দার পশ্চিম হইতে যাবতীয় স্থল মিথিলা নামে আখ্যাত হইত। *

সুপ্রসিদ্ধ সেনরাজগণ সর্ব্বপ্রথম বঙ্গদেশে রাজত্ব প্রতিষ্ঠিত করিয়া ক্রমে সমগ্র বাঙ্গালাদেশ করতলগত করিয়াছিলেন। পূর্ব্ববর্ণিত "রামপাল" নগরই তাঁহাদের প্রথম রাজধানী ছিল। মহারাজ বল্লাল-সেনের পুত্র লক্ষ্মণসেন সিংহাসনে আরোহণ করিয়া লক্ষ্মণাবতীতে রাজ-ধানী স্থানান্তর করেন। লক্ষ্মণাবতীর অন্য নামই "গৌড়নগর"।

পাঠানবিজয়ের প্রাক্কালে বাঙ্গালার রাজধানী নবদ্বীপে প্রতিষ্ঠিত ছিল। পাঠানশাসনকর্ত্তৃগণ প্রথম প্রথম "গৌড়নগরে" অবস্থান করিয়া শাসনদণ্ড পরিচালনা করিতেন। অবশেষে সম্রাট আলাউদ্দীনের সময় বাঙ্গালাদেশ পূর্ব্ব ও পশ্চিম দুইভাগে বিভক্ত হইয়া যায় এবং তদবধি

---

* English translation of Riazoo Salatin by Abdus Salem, M. A., page 47.

উত্তরপুরুষেরা সুদূরবর্ত্তী মালদহ গিয়া কি জন্য আপন আপন বংশাবলী কীর্ত্তনে প্রবৃত্ত হইবেন, তাহার কারণ অনুমান করাও সহজসাধ্য নহে।

যে সমস্ত বৈদ্যসন্তান বল্লালবংশজ বলিয়া আত্মপরিচয় দিয়া থাকেন, তাঁহারা "বৈশ্বানর" নামে খ্যাত এবং বৈদ্যসমাজের অতি নিম্নস্তরে অবস্থিত। রাজবল্ল ও তাঁহার উত্তরপুরুষেরা সমাজের উচ্চস্তরে প্রতিষ্ঠিত আছেন, তাঁহারা যে বল্লালবংশজ বলিয়া আত্মপরিচয় দিয়া সমাজের উচ্চস্তর হইতে নিম্নস্তরে যাইতে অভিলাষ করিবেন তাহা কদাচ সম্ভবপর নহে। বিক্রমপুরবৈদ্যসমাজে রাজবল্লভের বংশধরেরা শ্রীহর্ষহইতে সমুদ্ভূত বলিয়াই পরিচিত এবং তাঁহারা বরাবর রাজা শ্রীহর্ষকেই বীজিপুরুষ বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়া আসিতেছেন। কবিকণ্ঠহার প্রণীত প্রাচীন বৈদ্যকুলপঞ্জিকায় উল্লিখিত আছে যে, রাজবল্লভের পূর্ব্বপুরুষ বলভদ্রসেন রাজা শ্রীহর্ষের বংশে জন্মগ্রহণ করেন। কৈলাস বাবুর মতে বল্লালবংশে জন্মগ্রহণ অতি শ্লাঘার বিষয় হইলেও বিক্রমপুর বৈদ্যসমাজে উহা অণুমাত্রও গৌরবের পরিচায়ক নহে। বকলন সাহেবের সহিত রাজবল্লভের কোন উত্তরপুরুষের এ বিষয়ে আলোচনা হইয়া থাকিলে তিনি বোধ হয় সাহেবকে বলিয়া থাকিবেন যে, বল্লাল ও রাজবল্লভ একই জাতিভুক্ত। বিদ্বেষের বশবর্ত্তী না হইয়া স্থিরভাবে লেখনী ধারণ করিলে কৈলাস বাবু বুঝিতে পারিতেন যে, সাহেবের উক্তি প্রকৃত হইলে তিনি রামকে রহিম বুঝিয়াছিলেন। কৈলাস বাবু বিক্রমপুরের অনতিদূরবর্ত্তী ত্রিপুরা জিলার অধিবাসী। ইচ্ছা করিলেই তিনি বিক্রমপুরে আসিয়া রাজবল্লভের বংশাবলী সংগ্রহ করিতে পারিতেন। দুর্ভাগ্যবশতঃ বৈদ্যবিদ্বেষবশে তিনি সত্যসংগ্রহে তাদৃশ যত্নশীল না হইয়া বৈদ্যগণকে আক্রমণ করিতেই আগ্রহাতিশয় প্রদর্শন করিয়াছেন।

কেহ কেহ এরূপও বলিয়া থাকেন যে, ঢাকবৃক্ষের বাহুল্যনিবন্ধন ঐ স্থানের নাম ঢাকা হইয়াছে। § সম্রাট জাহাঙ্গীরের সময় হইতে ঢাকানগরী জাহাঙ্গীরনগর আখ্যা লাভ করে।

বাঙ্গালাদেশ মোগলসম্রাটের করতলগত হইলে তাহার শাসনকার্য্য নাজিমী ও দেওয়ানী এই দুই প্রধানবিভাগে বিভক্ত হইয়াছিল। তদবধি নাজিমীবিভাগের অধ্যক্ষ নাজিম ও দেওয়ানীবিভাগের অধ্যক্ষ দেওয়ান নামে অভিহিত হইতেন।

নাজিম আভ্যন্তরিক শান্তিরক্ষাবিষয়ে লক্ষ্য রাখিয়া ফৌজদারী বিচার-সংক্রান্ত কার্য্য পর্য্যবেক্ষণ করিতেন। রাজস্বসম্বন্ধীয় যাবতীয় কার্য্য এবং দেওয়ানী বিচারবিভাগ দেওয়ানের হস্তে অর্পিত ছিল। দেওয়ানের উপর নাজিমের অথবা নাজিমের উপর দেওয়ানের কোনরূপ কর্ত্তৃত্ব চলিত না, উভয়েই স্বাধীনভাবে আপন আপন বিভাগের কর্ত্তব্য সম্পাদন করিতেন।

নাজিমী বিভাগে নায়েব নাজিম, সেবশঙ্কর, ফৌজদার, কোতোয়াল, ও থানাদার উপাধিধারী বিভিন্ন শ্রেণীর কর্ম্মচারী নিযুক্ত ছিল। এই সমস্ত কর্ম্মচারিগণ নাজিমের আদেশ গ্রহণ করিয়া স্ব স্ব পদোচিত কর্ত্তব্য নির্ব্বাহ করিত।

দেওয়ানী বিভাগে যে সমস্ত বিভিন্নশ্রেণীর কর্ম্মচারী ছিলেন, তাঁহাদের কেহ বিচারসংক্রান্ত কার্য্যে এবং কেহ রাজস্ববিষয়ক ব্যাপারে লিপ্ত থাকিতেন। যাঁহারা বিচারবিভাগে নিযুক্ত ছিলেন তাঁহারা যথাক্রমে কাজি ওল কজ্জত বা প্রধান বিচারপতি, কাজি, মুফতি, মীর অদনস এবং সদরস সংজ্ঞায় অভিহিত হইতেন। রাজস্বসংক্রান্ত কর্ম্মচারিগণের

§ Hunter's Statistical Account of Dacca, page 19.

পূর্ব্ববাঙ্গালার শাসনকর্ত্তা সোণারগাঁয়ে এবং পশ্চিমবাঙ্গালার শাসনকর্ত্তা গৌড়নগরে অবস্থান করিতে থাকেন। নবাব ফকরউদ্দিন দিল্লীর অধীনতাপাশ ছিন্ন করিলে রাজাবাস সোনারগাঁহইতে উঠিয়া গিয়া একমাত্র গৌড়নগরেই সংস্থাপিত হইয়াছিল। মোগলকুলতিলক সম্রাট্ আকবরের সময় বাঙ্গালাদেশ পুনরায় দিল্লীর শাসনাধীন হইলে এক মহামারী উপস্থিত হইয়া গৌড়নগরীকে শ্মশানক্ষেত্রে পরিণত করে। সেই সময় বাঙ্গালার রাজধানী গৌড়হইতে রাজমহলে স্থানান্তরিত হইয়াছিল। আকবরসাহ প্রথমে পশ্চিমবাঙ্গালা জয় করেন; পূর্ব্ব-বাঙ্গালা মোগলশাসনাধীন হইতে কিঞ্চিৎ বিলম্ব ঘটিয়াছিল। ক্রমে মোগলবাহিনী পূর্ব্ববাঙ্গালায় প্রবেশ করিয়া তথায় মোগলবৈজয়ন্তী উড্ডীয়মান করিলেও মগ ও আরাকানবাসিগণ সেই সমস্ত বিজিত প্রদেশে অভিযান করিয়া প্রকৃতিপুঞ্জকে ব্যতিব্যস্ত করিয়া তুলিতেছিল। এই সময় বাঙ্গালার শাসনকর্ত্তা সুদূরবর্ত্তী রাজমহলে অবস্থান করিয়া পূর্ব্ববাঙ্গালার শান্তিরক্ষা করিতে ক্ষম হইলেন না। সুতরাং ১৬০৮ খৃষ্টাব্দে নবাব ইসলামখাঁর শাসনকালে রাজমহল হইতে রাজধানী ঢাকায় উঠিয়া আসিল। *

ঢাকানগরী যে এই সময় হইতেই প্রসিদ্ধিলাভ করিল, এমন নহে। "আকবরনামা" পুস্তকপাঠে অবগত হওয়া যায় যে, ১৫৮৪ খ্রীষ্টাব্দে তথায় এক থানা সংস্থাপিত ছিল। † আইন-ই-আকবরীতে ঢাকা বাজুর নাম উল্লিখিত আছে। প্রাচীনদিগের মতে মহারাজ বল্লালসেনের প্রতিষ্ঠিত "ঢাকেশ্বরী" নামক দেবতার নামানুসারে ঢাকার নামকরণ হইয়াছে।

---

* English translation of Riazoo Salatin by Abdus Salem, M. A., page 39.

† Do. Do. page 39.

সরিফতাবাদ, সলিমাবাদ ও মান্দারণ গঙ্গানদীর দক্ষিণে এবং ভাগীরথীর পশ্চিমভাগে অবস্থিত ছিল। *

বর্ত্তমান ঢাকা জিলার কিয়দংশ রাজসাহী, বগুড়া এবং পাবনা জিলা ও সমগ্র ময়মনসিংহ জিলার পশ্চিমভাগ সরকার বাজুহার অন্তর্ভুক্ত ছিল। মেঘনানদ ও ব্রহ্মপুত্রনদের উভয়পার্শ্বস্থ স্থান, ঢাকা ও ময়মনসিংহ জিলার পূর্ব্বাংশ এবং সমগ্র নোয়াখালী জিলা সরকার সোণারগাঁ নামে অভিহিত হইত। ঢাকার অবশিষ্টাংশ, যশোহরের কিয়দংশ, ফরিদপুরের অধিকাংশ, বাখরগঞ্জের উত্তরভাগ, দক্ষিণ সাহাবাজপুর ও সন্দীপ সরকার ফতেবাদ বলিয়া আখ্যাত ছিল। বাখরগঞ্জের পশ্চিমভাগ ও যশোহরের দক্ষিণভাগকে সরকার খলিফতাবাদ বলিত।

টোড়রমল্ল বাঙ্গালার শাসনকর্ত্তৃত্ব লাভ করিয়া রাজস্বকার্য্য পর্য্যবেক্ষণ উদ্দেশ্যে প্রত্যেক পরগণায় এক একজন কাননগু এবং সকল কাননগুর উপর একজন সদর কাননগু নিযুক্ত করেন। পরগণার অন্তর্গত জমির পরিমাণ ও জমার নিরিখ ধার্য্যকরণ কাননগুদিগের প্রধানকর্ত্তব্য ছিল। তাঁহারা রাজস্বসম্বন্ধীয় যে কাগজ প্রস্তুত করিতেন, তাহাতে সংগৃহীত রাজস্ব, নির্দ্ধারিত আবুয়াব ও বিভিন্নশ্রেণীস্থ ভূমির নির্ঘণ্ট ও সীমা লিখিত থাকিত। কোন ভূমি দানবিক্রয় ও পত্তনপ্রভৃতিদ্বারা হস্তান্তরিত হইলে কাননগুগণকে তাহাও ঐ কাগজে উল্লেখ করিতে হইত। এক এক বৎসর অতীত হওয়ার অব্যবহিত পরেই সেই বৎসরের কাগজ কাননগুগণ সদর কাননগুর সেরেস্তায় বুঝাইয়া দিতেন।

টোড়রমল্লের সময় ভগবান্‌চন্দ্র রায় নামক এক ব্যক্তি সদরকাননগুর পদে প্রতিষ্ঠিত ছিলেন। বর্দ্ধমান জিলার অন্তর্গত খাজুরডিহি গ্রামে

---

* English Translation of Riazoo Salatin by Abdus Salem, M.A. page 48

নাম নায়েব বা স্থানীয় দেওয়ান, আমিন, শিকদার, কারকুন, কাননগু, পাটোয়ারী এবং মজুমদার ছিল। *

দেওয়ানের অধীন প্রদেশসমূহ বিভিন্ন জিলায় ও প্রত্যেক জিলা বিভিন্ন পরগণায় এবং প্রত্যেক পরগণা বিভিন্ন গ্রামে বিভক্ত ছিল। কয়েকটি গ্রাম লইয়া এক একটি মহাল এবং কয়েকটি মহাল লইয়া এক একটি তরফ গঠিত ছিল।

এক একজন পাটোয়ারী এক একটি গ্রামের রাজস্বসংক্রান্ত কার্য্য নির্ব্বাহ করিত। এক একজন কারকুন দ্বারা এক একটি পরগণার হিসাব রক্ষিত হইত। পরগণায় যে সমস্ত পাটোয়ারী ছিল তাহাদের কার্য্যের প্রতি লক্ষ্য রাখাও কারকুনগণের কর্ত্তব্যের মধ্যে পরিগণিত ছিল। এক একজন আমিন এক একটি পরগণার হিসাব রক্ষা করিত। প্রত্যেক মহালের রাজস্ব এক একজন সিকদারকর্ত্তৃক ও প্রত্যেক তরফের রাজস্ব এক একজন মজুমদারকর্ত্তৃক সংগৃহীত হইত। নায়েব বা স্থানীয় দেওয়ান রাজস্ব ও দেওয়ানী বিচারবিভাগ পর্য্যবেক্ষণ করিতেন।

আকবরসাহের সুদক্ষ সচিব রাজা টোড়রমল্ল রাজস্ববিষয়ক যে বন্দোবস্ত করিয়াছিলেন তাহাতে বাঙ্গালাদেশ ঊনবিংশ সরকার এবং সাতশত আটচল্লিশ মহালে বিভক্ত হইয়াছিল। † এই সমস্ত সরকার মধ্যে লক্ষ্মণাবতী, পূর্ণিয়া, তাজপুর, গাঙ্গারা, ঘোড়াঘাট, বরকাবাদ, বাজুহা, শ্রীহট্ট, সোনারগাঁ ও চট্টগ্রাম গঙ্গানদীর উত্তর এবং পূর্ব্বভাগে; সপ্তগ্রাম, মামুদাবাদ ও খলিফতাবাদ ঐ নদীর উপকূলে; তাণ্ডা,

---

* English translation of Riazoo Salatin by Abdus Salem, M. A., page 6.

† Do. Do. Do

সেই দুর্গের চিহ্ন পর্য্যন্ত বিদ্যমান নাই। তবে অনেকেই বলেন, ঢাকার বর্ত্তমান কারাগৃহ ইসলাম খাঁর আমলে যে দুর্গ নির্ম্মিত হইয়াছিল, সেই দুর্গের অবস্থানস্থলের একাংশে অবস্থিত আছে। *

ইসলাম খাঁর পরে ক্রমে ইব্রাহিম খাঁ, ফেদাই খাঁ, কাসিম খাঁ, ইসলাম খাঁ মুশমেহদি এবং সুলতান সুজা ঢাকার নবাবী (নাজিমী) পদে অভিষিক্ত হইয়াছিলেন। সুলতান সুজার সময় রাজাবাস ঢাকা হইতে উঠিয়া গিয়া পুনরায় রাজমহলে স্থানান্তরিত হইয়াছিল। রাজমহল যাইবার পূর্ব্বে তিনি ১৬৪৫ খৃষ্টাব্দে ঢাকার চকবাজারের সম্মুখস্থ সুপ্রসিদ্ধ কাটরা নির্ম্মাণ করেন। † ১৬৫৩ খৃষ্টাব্দে মীরজুমলা নবাবী পদ লাভ করিলে রাজধানী পুনরায় ঢাকায় উঠিয়া আসিয়াছিল। মীরজুমলার আমলেই মগপ্রভৃতি পার্ব্বত্যজাতির অভিযাননিবারণকল্পে হাজিপুর ও ইদ্রাকপুরের দুর্গ নির্ম্মিত হইয়াছিল। ‡ ঢাকা নগরে বড় কাটারা নামে যে প্রাসাদ বিদ্যমান আছে, তাহার সম্মুখভাগে মীরজুমলা দুইটি সুবৃহৎ কামান সংস্থাপন করিয়াছিলেন। সেই দুইটির মধ্যে একটি কামান এখনও ঢাকার চকবাজারে বিদ্যমান রহিয়াছে। ¶ পাগলা ও টঙ্গিতে যে দুইটি ইষ্টকের সেতু দেখিতে পাওয়া যায় তাহাও এই নবাবের প্রযত্নেই নির্ম্মিত হইয়াছিল। * ইদ্রাকপুরের দুর্গের ভগ্নাবশেষ এখনও বিদ্যমান আছে। বিক্রমপুরের অন্তর্গত মুন্সিগঞ্জ মহকুমার ভারপ্রাপ্ত কর্ম্মচারী সেই দুর্গে বাস করিয়া থাকেন। †

---

* Hunter's Statistical Account of Dacca page 69.

† Hunter's Statistical Account of Dacca page 66 & 67

‡ Hunter's Statistical Account of Dacca page 121.

¶ Hunter's Statistical Account of Dacca page 121.

* Hunter's Statistical Account of Dacca page 121.

† Do. Do. page Do.

উত্তররাঢ়ীয় মিত্রোপাধিধারী কায়স্থবংশে তিনি জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। ভগবান্‌রায়ের পর তৎপুত্র বঙ্গবিনোদরায় ঐ পদলাভ করেন। এই সময়ই বাঙ্গালার রাজধানী ঢাকায় স্থানান্তরিত হইয়াছিল। ১৬৭৯ খ্রীষ্টাব্দে বঙ্গবিনোদ পরলোক গমন করিলে তৎপুত্র হরিনারায়ণ সদর কাননগুর পদে বরিত হন। মুরশিদকুলি খাঁ দেওয়ানীবিভাগ ঢাকা হইতে মুর্শিদাবাদে স্থানান্তর করিলে হরিনারায়ণকেও মুরশিদকুলীর সহিত মুর্শিদাবাদে যাইতে হইয়াছিল। (১)

ইসলামখাঁ ঢাকায় রাজাবাস স্থানান্তর করিলেও আসামী ও আরাকানীরা এবং পর্টুগীজ জলদস্যুগণ উত্তরবঙ্গে উপদ্রব করিতে বিরত হয় নাই। অগত্যা তিনি এক নৌ-সেনা বিভাগ (নাওয়ার) সৃষ্টি করিয়া পদ্মা ও মেঘনানদ সুরক্ষিত করেন। * এই বিভাগে সপ্তদশশত নৌকা ও কতিপয় বজরা যুদ্ধোপকরণসহ সর্ব্বদা প্রস্তুত থাকিত এবং আবশ্যক হইলে পদ্মা ও মেঘনানদের উপকূলবাসী প্রকৃতিপুঞ্জকে ঐ সমস্ত দস্যুগণের আক্রমণ হইতে রক্ষা করিত। নৌ-সেনাবিভাগের ব্যয়নির্ব্বাহের নিমিত্ত কতিপয় মহাল নির্দ্দিষ্ট ছিল। যে সমস্ত ভূমি এখন "নাওয়ার" নামে আখ্যাত, তাহা সমস্তই তৎকালে ঐ সকল মহালের অন্তর্ভুক্ত ছিল। নাওয়ার বিভাগের কার্য্যপরিচালনার ভার একজন অধ্যক্ষের হস্তে সমর্পিত থাকিত ; তিনি নাজিমের অধীন হইয়া স্বীয় পদোচিত কর্ত্তব্য সম্পাদন করিতেন। †

১৬১৮ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত ইসলাম খাঁ নাজিমী পদে অভিষিক্ত ছিলেন। তাঁহার শাসন কালেই ঢাকার প্রাচীন দুর্গ নির্ম্মিত হইয়াছিল। এখন

---

(১) মুর্শিদাবাদ কাহিনী ৮৯ পৃষ্ঠা।

* Hunter's Statistical Account of Dacca, page 62.

† Hunter's Statistical Account of Dacca, page 62.

দস্যুগণ সমুচিত শিক্ষালাভ করিয়াছিল। সায়েস্তা খাঁ তাহাদিগকে যুদ্ধে পরাভূত করিয়া তাহাদিগের উপনিবেশের নিমিত্ত রামপালের সমীপবর্ত্তী একটি স্থান নির্দ্দিষ্ট করিয়া দেন। সেই স্থল এখন "ফেরিঙ্গি রাজার" নামে খ্যাত। সায়েস্তা খাঁর নবাবী আমলে ঢাকা সহর টঙ্গী পর্য্যন্ত বিস্তৃত হইয়াছিল।

সায়েস্তা খাঁর পর ইব্রাহিম খাঁ এবং ইব্রাহিম খাঁর পর মহম্মদ আজিমের পুত্র আজিমওসান বাঙ্গলার নবাব হইয়া আসেন। আজিম ওসানের শাসনকালেই সুপ্রসিদ্ধ মুরশিদকুলি খাঁ দেওয়ানী পদ লাভ করিয়া বাঙ্গালায় আগমন করেন। আজিম ওসানের সহিত মনোমালিন্য ঘটিলে মুরশিদকুলি দেওয়ানী বিভাগ ঢাকা হইতে মুরশিদাবাদে উঠাইয়া আনেন। আজিম ওসানের পর ফেরক পিয়ার বাঙ্গলার নবাব হইয়াছিলেন। অবশেষে তিনি দিল্লীর সিংহাসনে আরোহণ করিলে ১৭১৮ খৃষ্টাব্দে মুরশিদকুলিই বাঙ্গলার নবাবী পদ লাভ করেন। এই সময় হইতেই নাজিমী ও দেওয়ানী উভয় বিভাগ একই ব্যক্তির হস্তগত হইয়াছিল। মুরশিদকুলী নাজিমী পদ লাভ করিয়া বাঙ্গলা দেশ ত্রয়োদশ চাকলায় বিভক্ত করেন। বন্দর, বালেশ্বর, হিজলী, সাতগাঁ, বর্দ্ধমান, মুরশিদাবাদ, যশোহর, ভূষণা, আকবর নগর, ঘোড়াঘাট, কড়ইবাড়ী, জাহাঙ্গীর নগর, শ্রীহট্ট ও ইসলামাবাদই সেই ত্রয়োদশ চাকলা।

চাকলে জাহাঙ্গীর নগর সরকার বাজুহা ও সোণার গাঁ লইয়া গঠিত (১)। চাকলে ইসলামবাদ সরকার চট্টগ্রামের নামান্তর মাত্র। রাজধানী মুরশিদাবাদে স্থানান্তরিত হইলে ঢাকা নগরী একজন নায়েব নাজিমের আবাস স্থানরূপে নির্দ্দিষ্ট হইয়াছিল। চাকলে জাহা-

---

(১) Hunter's Statistical Account of Dacca, Page 126

১৬৬২ খৃষ্টাব্দে মীরজুমলা লোকান্তরিত হইলে সুপ্রসিদ্ধ সায়েস্তা খাঁ বাঙ্গলার নবাব হইয়া ঢাকায় আগমন করেন। ১৬৭৭ খৃষ্টাব্দে তিনি কার্য্য ত্যাগ করিলে হাজি সাফি খাঁ তৎপদে নিযুক্ত হন (১)। হাজি-সাফি অতি অল্প সময় নবাবী তক্ত অধিকার করিয়াছিলেন। ১৬৭৯ খ্রীষ্টাব্দে সম্রাট্ আওরঙ্গজেবের পুত্র মহম্মদ আজিম নবাবীপদে নিযুক্ত হইয়া বাঙ্গলায় আসেন। এই সময়ই ঢাকার লালবাগ প্রাসাদের ভিত্তি সংস্থাপিত হইয়াছিল। মহম্মদ আজিমের পর সায়েস্তা খাঁ পুনরায় নবাব হইয়া আসিলে সেই প্রাসাদের নির্ম্মাণকার্য্য প্রায় সমাপ্ত হইয়া যায় (২)।

মহম্মদ আজিম সায়েস্তা খাঁর তনয়া পরী বিবীর পাণিগ্রহণ করিয়াছিলেন (৩)। ঢাকা নগরীতে এই মহিলা পরলোক গমন করিলে সায়েস্তা খাঁ তদীয় সমাধিস্থলে এক রমণীয় মসজিদ প্রস্তুত করিয়াছিলেন। লালবাগ প্রাসাদের একস্থানে অদ্যাপি সেই মসজিদ বিদ্যমান আছে (৪)।

সায়েস্তা খাঁর শাসনকার্য্যের অনেক সুখ্যাতি শুনিতে পাওয়া যায়। তাঁহারই শাসনকালে ঢাকায় আটমণদরে চাউল বিক্রীত হইয়াছিল। ১৬৮৯ খৃষ্টাব্দে পদত্যাগের অব্যবহিত পূর্ব্বে তিনি ঢাকায় এক তোরণ নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন এবং ঢাকা পরিত্যাগ কালে তিনি উহা অর্গল বদ্ধ করিয়া উপরিভাগে লিখিয়া রাখিয়াছিলেন, "যে নবাব তাঁহার ন্যায় সুলভ মূল্যে চাউল বিক্রয় করাইতে অশক্ত হইবেন তিনি যেন এই অর্গল উন্মুক্ত না করেন।" এই নবাবের শাসন কালেই পর্টুগিজ জল-

(১) Stuart's History of Bengal, Page 191

(২, ৩, ৪,) Hunter's Statistical Account of Dacca, Page 67

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

কৃষ্ণজীবন মজুমদার

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদে উল্লিখিত কৃষ্ণজীবনের পিতা রামগোবিন্দ সেন অতিশয় সাধু পুরুষ ছিলেন। সংসারে তাঁহার বিশেষ আসক্তি ছিল না। তিনি সর্ব্বদা কেবল তপশ্চর্য্যায় নিরত থাকিতেন। কিরূপে পরিবারবর্গের অন্নসংস্থান হইবে এই চিন্তা কখনও তাঁহার হৃদয়ে স্থান লাভ করিত কিনা সন্দেহ। একমাত্র ভগবচ্চিন্তায় বিভোর হইয়াই তিনি কালযাপন করিতেন। উত্তরাধিকার-সূত্রে রামগোবিন্দ পিতৃত্যক্ত ভূসম্পত্তির যে অংশ প্রাপ্ত হইয়াছিলেন, তাহার আয় এত সামান্য ছিল যে তদ্দ্বারা তাঁহার পরিবারবর্গের গ্রাসাচ্ছাদন নির্ব্বাহিত হইয়া উঠিত না। জ্যেষ্ঠ রামচরণ সেন তৎকালে ঢাকায় রাজস্ব বিভাগে কার্য্য করিতেন। তিনি অনেক সময় অর্থসাহায্য করিয়া রামগোবিন্দের অভাব মোচন করিয়া দিতেন।

ধর্ম্মাত্মা রামগোবিন্দের অনেক চরিত্রগুণ কৃষ্ণজীবনের চরিত্রে প্রতিফলিত হইয়াছিল। তিনি বাল্যকাল হইতেই সরলতা, অমায়িকতা এবং ধীরতার নিমিত্ত সকলের প্রিয়পাত্র হইয়াছিলেন। নিঃসন্তান রামচরণ অপত্যস্নেহে কৃষ্ণজীবনকে লালন পালন করিতেন। অবশেষে জ্যেষ্ঠতাতেরই অনুগ্রহে তিনি সেই সময়ের উপযোগী শিক্ষালাভ করিয়া নবাবসরকারে প্রবেশ করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন।

বর্ত্তমান যুগের বাঙ্গালীর ন্যায় কৃষ্ণজীবন দুর্ব্বল ছিলেন না। তাঁহার সুস্থ ও উন্নত দেহ, স্ফীত বক্ষঃ, মাংসল স্কন্ধদেশ, সুদৃঢ় বাহু এবং উজ্জ্বল

ঙ্গীর নগর, শ্রীহট্ট ও ইসলামবাদ এই নায়েবের শাসনাধীন ছিল। মুরশিদাবাদের নবাবের অধীন যে সমস্ত রাজপদ ছিল, তন্মধ্যে ঢাকার নায়েবতীই এক সময় সর্ব্বাপেক্ষা লাভজনক বলিয়া পরিগণিত হইত (১) নবাব সুজা খাঁর আমলে বিহার প্রদেশ বাঙ্গলার নবাবের শাসনাধীন হইলে বিহারের নায়েবতী ঢাকার নায়েবতী অপেক্ষাও উচ্চস্থান অধিকার করিয়াছিল।

---

(1) Hunter's Statistical Account of Bengal, Page 123

একাদশী উপলক্ষে পূর্ব্ববঙ্গে নিরম্বু উপবাসের পরিবর্ত্তে সামান্য পরিমাণ জলযোগের প্রথা প্রবর্ত্তিত আছে। প্রচলিত ভাষায় এইরূপ জলযোগ "একাদশী" করা বলে। প্রবাদ এই যে কৃষ্ণজীবন সচরাচর দশ কি বার সের ধানের খই দিয়া একাদশী করিতেন।

এই সমস্ত প্রবাদের মূলে সত্য নিহিত আছে কিনা নিঃসন্দেহরূপে বলা সুকঠিন। তবে এ কথা নিশ্চয় যে কৃষ্ণজীবন তাঁহার সমকালবর্ত্তী বাঙ্গালীগণের মধ্যে বলশালী বলিয়া বিখ্যাত ছিলেন।

বিক্রমপুরের অন্তর্গত মালখাঁনগর গ্রামে এক সেঘরার ভগ্নাবশেষ অদ্যাপি বিদ্যমান আছে। শ্রীযুক্ত কিশোরীমোহন বসুর (১) নিকট অবগত হওয়া গিয়াছে যে, ঐ গৃহের এক ইষ্টকে "শ্রীগোবিন্দ আসবন্দ দেবিদাস বসু কাননগুঁই নাওয়ার এতমাম শ্রীকৃষ্ণাই খাসনবীস সন ১০৮৭ বাঙ্গালা মাহে চৈত্র" এই কয়টি কথা এবং অপর ইষ্টকে "বাদসাহ আরঙ্গজীব নওয়ার (নবদ) আমির ওল ওমরা দেওয়ান হাজি সাফি খাঁ" এই উক্তি লিখিত ছিল (২)। সেই উভয় ইষ্টক-লিপি হইতে প্রতীয়মান হইতেছে, যে সময় আরঙ্গজেব দিল্লীর সম্রাট এবং হাজিসাফি খাঁ বাঙ্গলার নবাব, সেই সময় অর্থাৎ ১০৮৭ সনে দেবিদাস বসু কাননগু ও নাওয়ার মহালের এহেতেমাম পদে এবং শ্রীকৃষ্ণাই খাসনবীস পদে নিযুক্ত ছিলেন। বাঙ্গলা ১০৮৭ সন ১৬৮০ খৃষ্টাব্দে হয়। তৃতীয় পরিচ্ছেদে বলা হইয়াছে যে, সায়েস্তা খাঁ ও মহবদ আজিমের নবাবী আমলের সন্ধিস্থলে অর্থাৎ ১৬৭৮ খৃষ্টাব্দে হাজি সাফি খাঁ বাঙ্গালার

---

(২) মালখাঁনগর নিবাসী দেবিদাস বসুর অন্যতম উত্তর পুরুষ। বসু মহোদয়ের বংশধরেরা বঙ্গীয় কায়স্থ সমাজেও সুপ্রতিষ্ঠিত এবং তাঁহাদের অনেকেই বিশ্ববিদ্যালয়ের উচ্চ উপাধিধারী।

নয়নযুগল অবলোকন করিলে লোকে তাঁহাকে বীরপুরুষ বলিয়া মনে করিত। ফলে কৃষ্ণজীবনের শরীরে অসাধারণ শক্তিও ছিল। তিনি একবারে একটি ছাগের মাংস ও পাঁচসের চাউলের অন্ন অনায়াসে আহার করিতে পারিতেন। ফরিদপুরের অন্তর্গত পালঙ্গ গ্রামস্থিত মহারাজ রাজবল্লভের উত্তর পুরুষগণের বর্ত্তমান আবাসস্থলে একখানা পীড়ি বিদ্যমান রহিয়াছে। সেই পীড়িখানা দীর্ঘে সোয়া দুই হাত এবং প্রস্থে পৌনে দুই হাত। মহারাজের উত্তর পুরুষেরা বলেন, আহারের সময় কৃষ্ণজীবন তাহাতেই উপবেশন করিতেন।

কৃষ্ণজীবনের আহার সম্বন্ধে অনেক গল্প প্রচলিত আছে। কথিত আছে, একদা তিনি নিজালয় হইতে পদব্রজে ঢাকায় যাইতেছিলেন; অনেক পথ অতিক্রম করিলে তাঁহার অত্যন্ত ক্ষুধা বোধ হইল; নিকটে এমন কোন বন্দর ছিল না যে তথা হইতে আহার্য্য সংগ্রহ করা যাইতে পারে; অগত্যা তিনি কোন গৃহস্থের বাটীতে গিয়া কিঞ্চিৎ জলযোগ করিবার ইচ্ছা প্রকাশ করিলেন। লোকে সাধারণতঃ যে পরিমাণ আহার করে, গৃহস্থ সেই পরিমাণ জলযোগের বন্দোবস্ত করিয়া দিলে কৃষ্ণজীবন নিমেষ মধ্যে তাহা উদরসাৎ করিয়া ফেলিলেন; কিন্তু তাহাতে তাঁহার অনুমাত্রও ক্ষুন্নিবৃত্তি হইল না। লজ্জার অনুরোধে তিনি গৃহস্থের নিকট আর এ কথা ব্যক্ত না করিয়া পুনরায় পথ চলিতে লাগিলেন। পথে আসিয়া তিনি দেখিতে পাইলেন যে, অদূরে কতকগুলি করাতের গুঁড়া পড়িয়া রহিয়াছে; কৃষ্ণজীবন তৎকালে ক্ষুধার তাড়নায় অত্যন্ত ক্লেশ বোধ করিতেছিলেন, অগত্যা তিনি তথা হইতে তিন কি চারি সের করাতের গুঁড়া লইয়া জলের সহিত গলাধঃকরণ করিলেন এবং এইরূপে ক্ষুন্নিবৃত্তি করিয়া পুনরায় ঢাকা অভিমুখে চলিতে লাগিলেন।

কিশোরী বাবু বলেন, "দেবিদাস বসু যশোহরবাসী ছিলেন। রাজকার্য্যোপলক্ষে ঢাকায় আসিয়া তিনি তথায় গৃহ প্রতিষ্ঠা করেন। ঢাকায় অবস্থান করিলে কৌলীন্য রক্ষা পাইবে না আশঙ্কায় তিনি পরে ঢাকা হইতে মালখানগরে উঠিয়া আসিয়াছিলেন। বসু মহাশয় কৃষ্ণমন্ত্রে দীক্ষিত ছিলেন। রাজকার্য্যোপলক্ষে একদা বিপন্ন হইয়া তিনি অনেক দিন পর্য্যন্ত পলায়িত অবস্থায় থাকেন এবং অবশেষে শক্তিমন্ত্রে দীক্ষিত হইয়া দেওয়ান কৃষ্ণজীবন মজুমদারের সাহায্যে সেই বিপদ হইতে উত্তীর্ণ হন।"

কিশোরী বাবু আরও লিখিয়াছেন যে, কৃষ্ণজীবনের পুত্র, রাজবল্লভ উত্তরকালে প্রধান রাজপদে নিযুক্ত হইয়া মালখানগরনিবাসী বসু বংশের অনেক উপকার করিয়াছেন। * দেবিদাস বসু ও কৃষ্ণজীবন মজুমদারের বংশধরগণমধ্যে যে অনেক দিন পর্য্যন্ত সৌহার্দ্দ বিদ্যমান ছিল, তাহা উভয় পরিবারস্থ লোকেই স্বীকার করিয়া আসিতেছেন। অতএব পূর্ব্বোক্ত কিংবদন্তীসমূহ পর্য্যালোচনা করিলে স্পষ্টই প্রতীয়মান হয় যে, শ্রীকৃষ্ণাই খাসনবীস ও কৃষ্ণজীবন মজুমদার এক ও অভিন্ন ব্যক্তি।

শ্রীযুক্ত কৈলাসচন্দ্র সিংহ নব্যভারতে লিখিয়াছেন, "কৃষ্ণজীবন মজুমদার দেবিদাস বসুর গোমস্তা ছিলেন;" সেই প্রবন্ধের আর এক স্থলে তিনি দেবিদাস বসুকে রাজবল্লভের পৈত্রিক প্রভু বলিয়াও বর্ণনা করিয়াছেন। অবশ্য কিশোরী বাবুর মতেও কৃষ্ণজীবন দেবিদাস বসুর দেওয়ান ছিলেন। কিন্তু পূর্ব্বোক্ত ইষ্টক-লিপিতে যাহা লিখিত আছে,

* দেবিদাস বসুর উত্তর পুরুষ শ্রীযুক্ত প্রসন্নকুমার বসু, এম, এ মহোদয় বলেন, কায়স্থসমাজে যে মালখানগর বসুবংশের প্রাধান্য তাহাও রাজবল্লভের প্রসাদের ফল।

নবাব ছিলেন। ইষ্টক-লিপিতে যে দুই বৎসরের গোলযোগ দেখিতে পাওয়া যায় তাহা তৎকালিক সংবাদবিভাগের বিশৃঙ্খলানিবন্ধন সংঘটিত হওয়া বিচিত্র নহে।

কৃষ্ণজীবনসম্বন্ধে একটি কিংবদন্তী প্রচলিত আছে যে, ঢাকাবিভাগের জনৈক কাননগু বহুকাল পর্য্যন্ত নিকাশ না দেওয়ায় মুরশিদাবাদের সদর কাননগু সিরিস্তা হইতে জনৈক উচ্চপদস্থ কর্ম্মচারী নিকাশ লইবার উদ্দেশ্যে ঢাকায় পদার্পণ করেন। কাননগুর নিকাশ প্রস্তুত ছিল না। সুতরাং তিনি সদরসিরিস্তার কর্ম্মচারীর আগমনবার্ত্তা শুনিয়াই পলায়মান হইলেন। কাননগুসিরিস্তার সমীপবর্ত্তী কক্ষে কৃষ্ণজীবন কার্য্য করিতেছিলেন; সেই রাজ-কর্ম্মচারী কৃষ্ণজীবনের সাক্ষাৎ পাইয়া তাঁহাকেই নিকাশ বুঝাইয়া দিবার নিমিত্ত আদেশ করিলেন। কৃষ্ণজীবন কাননগু-সিরিস্তার কার্য্যে অনভিজ্ঞ ছিলেন; সুতরাং তিনি নিকাশ প্রস্তুত বিষয়ে অক্ষমতা প্রকাশ করিলেন। সদরসিরিস্তার কর্ম্মচারী তাহাতে সন্তুষ্ট না হইয়া কৃষ্ণজীবনকে বিশেষ পীড়াপীড়ি করিতে লাগিলেন। অগত্যা কৃষ্ণজীবন দুই মাস পরিশ্রম করিয়া নিকাশ প্রস্তুত করিয়া তাহাতে কাননগুর সিল অঙ্কিত করিয়া দিলেন। কৃষ্ণজীবনের কার্য্যে সেই কর্ম্মচারী এতদূর প্রীত হইলেন যে, তিনি কৃষ্ণজীবনকেই অনুপস্থিত কাননগুর পদে নিযুক্ত করিয়া নিকাশ সহ মুরশিদাবাদে প্রস্থান করিলেন। অতঃপর পলায়মান কাননগুও আসিয়া উপস্থিত হইলেন। কৃষ্ণজীবনের হৃদয় অতিশয় উচ্চ ছিল, তিনি কাননগু উপস্থিত হইলেই শিলমোহর সহ কাননগুর সিরিস্তা তাঁহাকে বুঝাইয়া দিলেন।

উমাচরণরায়প্রণীত রাজবল্লভের জীবনীতে লিখিত আছে যে, এইরূপে নিকাশ প্রস্তুত করিয়া দিয়া কৃষ্ণজীবন নবাব সরকার হইতে দুই লক্ষ টাকা পুরস্কারস্বরূপ লাভ করিয়াছিলেন।

রাজকার্য্যে নিযুক্ত হইয়া কৃষ্ণজীবন অনেক অর্থোপার্জ্জন করিয়াছিলেন সন্দেহ নাই। কিন্তু দারপরিগ্রহ করিয়াই যে তিনি প্রথমতঃ সৌভাগ্যের সোপানে আরোহণ করেন একথা নিঃসংকোচে বলা যাইতে পারে। তৎকালে বর্ত্তমান বাকরগঞ্জ জিলার অন্তর্গত দাদপুর গ্রামে চাঁদরায় নামে জনৈক জমিদার বাস করিতেন। তিনি ত্রিপুর গুপ্ত বংশীয় মহীপতিগুপ্তের ধারায় জন্মগ্রহণ করেন। "লক্ষ্মীপ্রিয়া" নামে চাঁদরায়ের এক তনয়া ছিল। লক্ষ্মীপ্রিয়া বিবাহযোগ্য বয়ঃপ্রাপ্ত হইলে, জনৈক ঘটক সম্বন্ধোদ্দেশ্যে বিলদাওনিয়ায় আসিয়া উপস্থিত হয় এবং কৃষ্ণজীবনের সহিত সেই তনয়ার বিবাহ সম্বন্ধের প্রস্তাব করে। কৃষ্ণজীবনের জ্যেষ্ঠতাত রামচরণ মনে করিলেন, এ স্থলে কৃষ্ণজীবনের বিবাহ হইলে জমিদার চাঁদরায় অবশ্যই জামাতাকে প্রচুর যৌতুক প্রদান করিবেন, সুতরাং তিনি আর দ্বিরুক্তি না করিয়া এ স্থলেই কৃষ্ণজীবনের বিবাহ দিলেন। বিবাহের পর চাঁদরায় স্বীয় জমিদারী হইতে কয়েক খানি গ্রাম তনয়ার ভরণপোষণের নিমিত্ত নির্দ্দিষ্ট করিয়া রাখিলেন। সেই সমস্ত গ্রাম এখন লক্ষ্মীপ্রিয়ার নামানুসারে 'তপে লক্ষ্মীদিয়া' নামে আখ্যাত। লক্ষ্মীপ্রিয়া প্রকৃত প্রস্তাবে লক্ষ্মীরূপিণীই ছিলেন। তাঁহার আগমনের সঙ্গে সঙ্গে কৃষ্ণজীবনের সংসার ক্রমে উন্নতি পথে অগ্রসর হইয়া, অবশেষে রাজবল্লভের সময় পূর্ব্ব বাঙ্গালায় অদ্বিতীয় স্থান অধিকার করিয়াছিল।

মহারাজ রাজবল্লভের অভ্যুদয়ের অনেক পূর্ব্বে কৃষ্ণজীবন রাজনগরের পুরাতন হাবেলী ও তন্মধ্যস্থ নবরত্ননামক রমণীয় প্রাসাদ নির্ম্মাণ করেন। যে পুরাতন দীঘির পশ্চিমতটে কালবৈশাখীর মেলা সন্নিবিষ্ট হইত তাহাও কৃষ্ণজীবনের অর্থেই খাত হইয়াছিল।

তদ্দ্বারা ইহার কোন কথাই সমর্থিত হইতেছে না। ইষ্টকলিপিতে কৃষ্ণজীবন "খাস নবীস" বলিয়া বর্ণিত হইয়াছেন। "খাস নবীস" শব্দের প্রকৃত অর্থ নবাবের নিজস্ব মহালের কর্ম্মচারী। "সেঘরা" রাজকীয় কার্য্যালয় ছিল। উহাতে রাজকর্ম্মচারিগণের নাম ভিন্ন দেবিদাস বসুর নিজস্ব কর্ম্মচারীর নাম উৎকীর্ণ হওয়া কদাচ সম্ভবপর নহে। সুতরাং কৃষ্ণজীবন যে দেবিদাস বসুর নিজস্ব কর্ম্মচারী ছিলেন না, ইহাই সিদ্ধান্ত হইতেছে। কেহ কেহ বলেন "খাস নবীস" পদের অর্থ, প্রধান মুহুরী। অবশ্য এরূপ অর্থ কোন অভিধানে পাওয়া যায় না। তর্কস্থলে এই অর্থই যে প্রকৃত তাহা স্বীকার করিয়া লইলেও কৃষ্ণজীবন দেবিদাস বসুর অধীন কর্ম্মচারী ভিন্ন আর কিছুই হইতে পারেন না। সেঘরায় যে তিনটি কক্ষ আছে, তাহাতে বুঝা যায় যে এক কক্ষে কাননগুর সিরিস্তা, এক কক্ষে নাওয়ার এহেৎতমামের সিরিস্তা এবং এক কক্ষে খাস নবীসের সিরিস্তা অবস্থিত ছিল। কৃষ্ণজীবন সম্ভবতঃ খাস নবীসের সিরিস্তায় কাজ করিতেন। সদর কাননগু সিরিস্তার কর্ম্মচারী সংক্রান্ত যে কিংবদন্তীর কথা উল্লেখ করা হইয়াছে তাহাতেও এই উক্তিই সমর্থিত হইতেছে। প্রতাপ বাবুর নিকট যে হস্ত-লিখিত পুস্তক পাওয়া গিয়াছে, তাহাতে এবং উমাচরণরায়প্রণীত রাজবল্লভের জীবনীতে কৃষ্ণজীবন রাজকর্ম্মচারী বলিয়াই বর্ণিত হইয়াছেন। ফলে দেবিদাস ও কৃষ্ণজীবন উভয়েই রাজকর্ম্মচারী ছিলেন এবং পদগৌরবে দেবিদাস যে কৃষ্ণজীবন অপেক্ষা উচ্চআসনে প্রতিষ্ঠিত ছিলেন সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। কিশোরী বাবু ভ্রমসংকুল ধারণার বশবর্ত্তী হইয়াই কৃষ্ণজীবনকে দেবিদাস বসুর দেওয়ান বলিয়াছেন, কিন্তু কৈলাস বাবু রাজবল্লভকে অপ্রতিষ্ঠ করিবার অভিপ্রায়েই তদীয় পিতা কৃষ্ণজীবনকে দেবিদাস বসুর গোমস্তা বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন।

এই সময় আজিমওসান বাঙ্গালার নবাব ছিলেন। মুর্শিদকুলী অভিনব পদ লাভ করিয়া রাজস্ববিভাগের উন্নতি সাধন করিতে প্রাণ-পণে যত্ন করিতে লাগিলেন। তিনি কার্য্যভার গ্রহণ করিয়াই দেখিতে পাইলেন যে, বাঙ্গালাদেশের অধিকাংশ ভূমি জায়গীরভুক্ত হইয়াছে এবং তজ্জন্য রাজস্বের পরিমাণ এত হ্রাস পাইয়াছে যে সংগৃহীত রাজস্ব দ্বারা শাসনসংক্রান্ত সমগ্র ব্যয় সঙ্কুলন হইয়া উঠিতেছে না। এই সমস্যার মীমাংসা উদ্দেশ্যে তিনি এক নূতন উপায় উদ্ভাবন করিলেন। তৎকালে উড়িষ্যাপ্রদেশে অনেক অনুর্ব্বরা ভূমি বিদ্যমান ছিল। মুর্শিদকুলী জায়গীরদারগণকে সেই সমস্ত ভূমি প্রদানে প্রবোধ দিয়া বাঙ্গালা দেশের সমস্ত জায়গীর বাজেয়াপ্ত করিলেন। অতঃপর উড়িষ্যার অবশিষ্ট ভূমি এবং সমগ্র বাঙ্গালা নূতন প্রণালীতে বন্দোবস্ত হইল। মুর্শিদকুলীর বন্দোবস্তের ফলে রাজস্ব অত্যন্ত বৃদ্ধি পাইল এবং রাজস্ব বিভাগের ব্যয় সংক্ষিপ্ত হইল। সম্রাট্ এই ঘটনায় এত প্রীত হইলেন যে, উত্তরোত্তর তিনি মুর্শিদকুলীর প্রতি অনুগ্রহাধিক্য প্রদর্শন করিতে ক্রটি করিলেন না। কিন্তু আজিমওসানের পক্ষে মুর্শিদকুলীর প্রতিপত্তি অসহ্য হইয়া উঠিল এবং তিনি এই নবাগত দেওয়ানের উচ্ছেদ সাধনে কৃতসংকল্প হইয়া নানাবিধ ষড়যন্ত্র করিতে লাগিলেন। *

তৎকালে বাঙ্গালা দেশে "নগদী" নামে এক সেনা সম্প্রদায় বিদ্যমান ছিল। প্রাদেশিক নাজিম কিংবা দেওয়ান সেই সম্প্রদায়ের উপর কোন-রূপ কর্ত্তৃত্ব করিতে পারিতেন না, তাহারা প্রত্যক্ষভাবে সম্রাটেরই অধীন ছিল। আব্দুলওয়াহেদ নামে জনৈক লোক এই সেনাদলের নেতৃত্ব করিতেন। তিনি আজিমওসানের প্ররোচনায় বাধ্য হইয়া মুর্শিদকুলীর জীবনসংহারে ব্রতী হইয়া দাঁড়াইলেন।

* English Translation of Riazoo-Salatin by Abdus Salem, page 249.

দ্বিতীয় অধ্যায়

প্রথম পরিচ্ছেদ

মুর্শিদকুলীখাঁ

মুর্শিদকুলী ব্রাহ্মণবংশে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। হাজিসাফি নামে জনৈক ইস্পাহানদেশীয় মুসলমান তাঁহাকে ইসলামধর্ম্মে দীক্ষিত করিয়া অপত্যস্নেহে প্রতিপালন করেন এবং তদবধি তিনি মহম্মদ হাজি নামে অভিহিত হইতে থাকেন। পালকপিতার মৃত্যুর পর তিনি দাক্ষিণাত্যের অন্তর্গত বেরার প্রদেশের দেওয়ানীবিভাগে এক কার্য্যে নিযুক্ত হইলেন। যুবক এত দক্ষতার সহিত আপন কর্ত্তব্য সম্পাদন করিতে লাগিলেন যে, অচিরে তাঁহার যশঃসৌরভ বিকীর্ণ হইয়া সম্রাট্ আরঙ্গজেবের কর্ণগোচর হইল। সম্রাট্ অতঃপর তাঁহাকে 'করতলপ'খাঁ উপাধি দিয়া হায়দরাবাদের দেওয়ানপদে নিযুক্ত করিলেন। এস্থলেও মহম্মদ হাদির অসামান্য কার্য্যকুশলতা প্রকাশ পাইল এবং সেই কার্য্যকুশলতার ফলেই সম্রাটের নিয়োগমতে তিনি বাঙ্গালার দেওয়ান হইয়া এদেশে আগমন করিলেন। *

* English Translation of Riazoo-Salatin by Abdus Salem, page 244.

মুকসদাবাদে উঠিয়া আসিলেন। এই সময় হইতেই মুর্শিদকুলীর নামানুসারে মুকসদাবাদের নাম মুর্শিদাবাদ হইল।

অচিরে মুর্শিদকুলীর লিখিত বৃত্তান্ত সম্রাট দরবারে পৌঁছিলে, আরঙ্গজেব আজিমওসানকে যৎপরোনাস্তি ভর্ৎসনা করিয়া পাঠাইলেন এবং যত শীঘ্র সম্ভব বাঙ্গালাদেশ পরিত্যাগ করিবার নিমিত্ত তৎপ্রতি আদেশ দিতেও বিস্মৃত হইলেন না। তদনুসারে আজিমওসান, পুত্র ফেরকসিয়ারের প্রতি কার্য্যভার রাখিয়া ঢাকাহইতে পাটনায় প্রস্থান করিলেন।

১৭০৪ খৃষ্টাব্দে মুর্শিদকুলী বাঙ্গলাদেশের প্রতিনিধি নাজিমের পদে নিযুক্ত হইলেন এবং সঙ্গে সঙ্গে তদীয় জামাতা সুজাউদ্দিন উড়িষ্যা প্রদেশের এবং সৈয়দ আকরামউদ্দিন বাঙ্গলাদেশের ডিপুটী দেওয়ানের পদ লাভ করিলেন।

এই সময়ই মুর্শিদকুলী মহালসমূহের প্রকৃত অবস্থা নির্ণয় করিবার উদ্দেশ্যে শিকদার ও আমিন নিযুক্ত করিলেন। শিকদার ও আমিনগণের কার্য্যাবেক্ষণের ভার বিশ্বস্ত আমিনগণের উপর ন্যস্ত হইল। এই সমস্ত কর্ম্মচারিগণের সহায়তায় অল্পদিন মধ্যেই তিনি মহালসমূহের প্রকৃত অবস্থা জ্ঞাত হইতে পারিলেন এবং ভূমি ও উৎপন্ন শস্যের পরিমাণ অনুসারে রাজস্ব ধার্য্য করিয়া সমগ্র বাঙ্গলাদেশের তৌজি প্রস্তুত করিলেন। *

তিনি রায়তওয়ারি বন্দোবস্তের পক্ষপাতী ছিলেন। দুঃস্থ প্রজাগণ তাঁহার নিকট হইতে সাহায্যস্বরূপ তাকাবী প্রাপ্ত হইত। তাঁহার শাসনকালে বাঙ্গলাদেশ কোন বিদেশীয় শত্রুকর্ত্তৃক আক্রান্ত হয় নাই

---

* English Translation of Riazoo-Salatin, page 256.

মুর্শিদকুলী অসতর্ক পুরুষ ছিলেন না। বাহিরে যাইতে হইলে তিনি সর্ব্বদা সশস্ত্র প্রহরী সঙ্গে রাখিতেন। একদা প্রাতঃকালে তিনি অশ্বপৃষ্ঠে নাজিমের দরবারে আসিতেছিলেন, এমন সময় আব্দুলওয়াহেদ নগদী সেনাদলসহ তাঁহার পথরোধ করিয়া দাঁড়াইল এবং বেতন বাকী পড়িয়াছে বলিয়া ক্রমাগত চীৎকার করিতে লাগিল। মুর্শিদকুলী এইরূপ অভাবনীয়ঘটনায় অনুমাত্রও বিচলিত না হইয়া সেনাগণকে বিতাড়িত করিয়া দিলেন এবং স্বয়ং নাজিম এই ষড়যন্ত্রে লিপ্ত আছেন জানিতে পারিয়া, অবিলম্বে নাজিমের দরবারে উপস্থিত হইলেন। দরবারে উপস্থিত হইয়াই তিনি কোষস্থিত তরবারিতে হস্ত রাখিয়া, উপস্থিত ঘটনার নিমিত্ত নাজিমকে যথেচ্ছ ভর্ৎসনা করিতে লাগিলেন। আজিমওসান মনে করিলেন, সম্রাট্ এই বিষয় জানিতে পারিলে তাঁহার আর লাঞ্ছনার পরিসীমা থাকিবে না ; সুতরাং তিনি আব্দুলওয়াহেদের কার্য্যের সহিত তাঁহার কোনরূপ সংশ্রব নাই এই কথা জানাইয়া আব্দুলওয়াহেদকে সতর্ক করিয়া দিলেন। *

নবাব মুর্শিদকুলীকে প্রবোধ দিবার উদ্দেশ্যেই ঐরূপ আচরণ করিলেও মুর্শিদকুলী তাহাতে সন্তুষ্ট হইলেন না। তিনি নাজিমের দরবার হইতে বরাবর “দেওয়ানী আমে” আসিলেন এবং নগদী সেনাগণের সমস্ত প্রাপ্য কড়ায় গণ্ডায় বুঝাইয়া দিয়া তাহাদের সকলকে কার্য্য হইতে অপসৃত করিয়া দিলেন। অতঃপর মুর্শিদকুলী ঐ দিবসের যাবতীয় ঘটনা বিস্তৃতভাবে লিখিয়া সংবাদ বিভাগের যোগে সম্রাট দরবারে পাঠাইলেন। নাজিমের সন্নিধানে অবস্থান করা নিরাপদ নহে মনে করিয়া, তিনি কয়েকদিন পরেই দেওয়ানীবিভাগ সহ ঢাকাহইতে

---

* English Translation of Riazoo-Salatin, page 251.

ক্ষমতা পরিচালনা করেন, জমিদারেরা মুসলমান শাসনের প্রারম্ভে সেই সমস্ত ক্ষমতারই পরিচালনা করিতেন। মুর্শিদকুলী শাসনভার প্রাপ্ত হইয়া জমিদারদিগের ক্ষমতা আরো খর্ব্ব করিয়া দিলেন। তিনি যে নিয়ম প্রচলন করিলেন তদনুসারে জমিদারী হইতে করস্বরূপ যাহা কিছু সংগৃহীত হইত, তাহা হইতে কর সংগ্রহের ব্যয় বাদে অবশিষ্ট সমস্তই রাজকোষে প্রেরণ করিতে হইত। এখন হইতে জমিদারগণ পারিশ্রমিক স্বরূপ জমিদারীর অন্তর্গত কিয়ৎ পরিমাণ ভূমি নিষ্কর ভাবে ভোগ করিতে পাইলেন। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জমিদারেরা মুর্শিদকুলীর সাক্ষাৎলাভ করিতে বঞ্চিত হইলেন। যে সমস্ত হিন্দু জমিদার নবাবের সহিত সাক্ষাৎ করিবার অধিকার লাভ করিলেন, তাঁহাদিগকে শিবিকারোহণের পরিবর্ত্তে পদব্রজে দরবারে উপস্থিত হইতে হইল এবং দরবারে উপস্থিত হইলেও তাঁহারা তথায় উপবেশন করিবার অনুমতি লাভ করিলেন না।

ইংরাজশাসনে বাকি রাজস্বের দায়ে জমিদারী নীলাম হওয়ার বিধি প্রবর্ত্তিত হইয়াছে। কিন্তু তৎকালে সেইরূপ কোন বিধান প্রচলিত ছিল না। কোন হিন্দু জমিদার নির্দ্দিষ্টসময়মধ্যে দেয় রাজস্ব পরিশোধ না করিলে, মুর্শিদকুলী তাঁহার জমিদারী ক্রোক করিতেন এবং বাকী রাজস্ব আদায় না হওয়া পর্য্যন্ত জমিদারকে কারারুদ্ধ করিয়া রাখিতেন। যে স্থলে জমিদারগণ কারারুদ্ধ থাকিতেন তাহা পূতিগন্ধময় আবর্জ্জনা দ্বারা পূর্ণ করিয়া রাখা হইত। ডেপুটি দেওয়ান আকরামআলির পরলোক গমনের পর সৈয়দ রাজিখাঁ সেই পদলাভ করেন। সৈয়দ রাজিখাঁ হিন্দুবিদ্বেষবশে পূর্ব্বোক্ত পূতিগন্ধময় স্থানকে "বৈকুণ্ঠ" অর্থাৎ হিন্দুর স্বর্গ এই আখ্যা প্রদান করিয়াছিলেন। জমিদারগণ যে পূতিগন্ধের আঘ্রাণ-সুখ উপভোগ করিয়াই নিস্তার লাভ করিতেন এমন নহে, তাঁহাদিগকে এই স্থানে অনেক দিন নিরশনেও থাকিতে হইত। কখন কখন কারারুদ্ধ

এবং একমাত্র সীতারাম রায়ের বিদ্রোহ ব্যতীত অন্য কোন অন্তর্বিপ্লবও ঘটে নাই। কথিত আছে যে মুর্শিদকুলীর সময় বাঙ্গলায় শান্তি এরূপ সুপ্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল যে, নাজির আহম্মদ নামক একজনমাত্র পদাতিকের সহায়তায় সমগ্র দেশের রাজস্ব সংগৃহীত হইত।

রিয়াজ্ সেলাতিনপ্রণেতা মুর্শিদকুলীর যথেষ্ট গুণগান করিয়াছেন। রিয়াজ্ সেলাতিনে লিখিত আছে, মুর্শিদকুলী এরূপ ন্যায়পরায়ণ ও চরিত্রবান্ ছিলেন যে, কর্ত্তব্যের অনুরোধে একমাত্র পুত্রের প্রাণদণ্ড করিতেও তিনি কুণ্ঠিত হন নাই এবং সহধর্ম্মিণী ব্যতীত দ্বিতীয় স্ত্রীলোকের মুখাবলোকন কিংবা কোনরূপ মাদকদ্রব্য স্পর্শ করেন নাই।

মুসলমান শাসনের প্রারম্ভে বাঙ্গালাদেশীয় ভূ-স্বামিগণমধ্যে প্রায় সকলেই আপন আপন ভূ-সম্পত্তি হইতে বঞ্চিত হইয়াছিলেন এবং তাঁহাদের ভূ-সম্পত্তিসমূহ মুসলমান বিজেতার অনুচরবর্গমধ্যে বিভাগ করিয়া দেওয়া হইয়াছিল। হিন্দুরাজত্বের সময় ভূ-স্বামীরা ভূমির প্রকৃত স্বত্বাধিকারী ছিলেন। মুসলমানশাসন-নীতিঅনুসারে অনবস্থিত ভূ-স্বামিগণও পূর্ব্বোক্তরূপে অনুগৃহীত অনুচরবর্গ "জমিদার" অর্থাৎ ভূমির ভারপ্রাপ্ত কর্ম্মচারী, এই আখ্যাপ্রাপ্ত হইয়া কেবল কর-সংগ্রাহকের অবস্থায় অবনমিত হইয়াছিলেন। এই সময় হইতে তাঁহারা আপন আপন জমিদারীর আভ্যন্তরিক শান্তি রক্ষা করিতেন এবং অপরাধীকে ধৃত করিয়া বিচারের নিমিত্ত প্রাদেশিক শাসনকর্ত্তার দরবারে পাঠাইয়া দিতেন। অবশ্য গ্রাম্য চৌকীদারেরা জমিদারের অধীন ছিল ও জমিদারের তত্ত্বাবধানে থাকিয়া তাহারা পাহারার কার্য্য সম্পাদন করিত। জমিদারীর মধ্যে যে সমস্ত রাস্তা. খেয়াঘাট ও খোয়াড় ছিল তাহার বন্দোবস্ত জমিদারদিগকেই করিতে হইত। ইংরেজ শাসনের পুলিস কর্ম্মচারী ও Justice of the Peace নামক কর্ম্মচারীরা যে

লাগিল। বৃন্দাবনকে দেখিতে পাইলেই ফকির অধিকতর উচ্চৈঃস্বরে নামাজ আবৃত্তি করিতে প্রবৃত্ত হইত। অনেকদিন পর্য্যন্ত বৃন্দাবন এই-রূপ অত্যাচার সহ্য করিলেন; কিন্তু ফকিরের প্রতিহিংসা তাহাতেও পরিতৃপ্ত হইল না। অবশেষে একদিন তিনি ধৈর্য্যচ্যুত হইয়া স্তূপীকৃত ইষ্টকহইতে কয়েকখণ্ড ইষ্টক সরাইয়া ফেলিলেন এবং ফকিরকে সেস্থান হইতে বিতাড়িত করিয়া দিলেন। ফকির এরূপ ব্যবহারের প্রত্যাশা করিয়াই তথায় অবস্থান করিতেছিল; সুতরাং এক্ষণে মনস্কামনা সিদ্ধ করিয়া সে নবাবদরবারে অভিযোগ করিল যে, বৃন্দাবন তাহার মসজিদ ভাঙ্গিয়া ফেলিয়াছে। অচিরে বৃন্দাবন গ্রেপ্তার হইয়া নবাবদরবারে নীত হইলেন। নবাব সমস্ত অবস্থা অবগত হইলে পর তিনি বৃন্দাবনকে মুক্তি দেওয়া যাইতে পারে কি না, তদ্বিষয়ে কাজির অভিমত জিজ্ঞাসা করিলেন। কাজি উত্তর করিল, বৃন্দাবন মসজিদভঙ্গের অপরাধ করিয়াছে, অতএব তাহাকে মুক্তি দেওয়া যাইতে পারে না। নবাব পুনরায় কাজিকে জিজ্ঞাসা করিলে কাজি বলিল,—"যে কেহ এই হিন্দুর স্বপক্ষে কথা বলিবে, তাহারও প্রাণদণ্ড হওয়া কর্ত্তব্য এবং এই শেষোক্ত ব্যক্তির প্রাণদণ্ড করিতে যে বিলম্ব ঘটে, মাত্র সেইকাল পর্য্যন্তই বৃন্দাবনের প্রাণদণ্ডাজ্ঞা স্থগিত রাখা যাইতে পারে।" অতঃপর কাজি-প্রবর আর মুর্শিদকুলীর অপেক্ষা না করিয়া স্বহস্তেই একটি ধনুর্ব্বাণ ধারণ করিলেন এবং তদ্দ্বারা বৃন্দাবনের প্রতি একটি তীর নিক্ষেপ করিয়া তাহার প্রাণসংহার করিলেন। *

রিয়াজু সেলাতিনপ্রণেতা এই ঘটনা উল্লেখ করিয়া কাজিসাহেবের কর্ত্তব্যনিষ্ঠার ভূয়সী প্রশংসা করিয়াছেন। কিন্তু হিন্দুসাধারণ ইহাকে বিচারবিভ্রাট ভিন্ন আর কিছুই মনে করেন না। এদেশে "কাজির

---

* English Translation of Riazoo Salaten, page 283.

জমিদারগণকে নিম্নমুখ করিয়া বৃক্ষের সঙ্গে ঝুলাইয়া রাখা হইত এবং যাতনার মাত্রা বৃদ্ধি করিবার উদ্দেশ্যে নবাবের নিয়োজিত লোক তাহাদিগকে বেত্রাঘাতে জর্জ্জরিত পর্য্যন্ত করিত। তৎকালে তৃষ্ণায় ছাতি ফাটিয়া গেলেও উৎপীড়িত জমিদারগণ জল পাইতে পারিতেন না; পক্ষান্তরে প্রস্তরসমূহ খণ্ড খণ্ড করিয়া তদ্দ্বারা তাঁহাদের পদযুগল ঘর্ষণ করা হইত। জমিদারগণ এইরূপে লাঞ্ছিত হইয়াও দেয় রাজস্ব পরিশোধ না করিলে তাঁহাদিগকে বলপূর্ব্বক মুসলমান করা হইত। *

পূর্ব্বোক্ত অত্যাচারকাহিনী রিয়াজু সেলাতিনহইতেই সংগৃহীত হইল। অতএব মুর্শিদকুলী যে কিরূপ প্রজারঞ্জক ছিলেন তাহা সহজেই অনুমেয়। সায়র মোতাক্ষরিণে স্পষ্টই লিখিত আছে যে মুর্শিদকুলী সাতিশয় অত্যাচারপরায়ণ ছিলেন। †

মুর্শিদকুলীর সময় কিরূপভাবে বিচারকার্য্য নির্ব্বাহ হইত তাহার আভাসও রিয়াজু সেলাতিনে লিখিত আছে। মুর্শিদকুলী বিচারাসনে উপবিষ্ট হইলে, মহম্মদ সরফ নামে জনৈক কাজি তাঁহার নিকট উপস্থিত থাকিয়া কোরাণসরিফের মর্ম্ম ব্যাখ্যা করিত। এই সময় চুনাখালী গ্রামে কোন ফকির আসিয়া ভিক্ষাবৃত্তিদ্বারা জীবিকানির্ব্বাহ করিতেছিল। বৃন্দাবন নামে জনৈক তালুকদার সেই গ্রামে বাস করিতেন। ফকির একদিন বৃন্দাবনের নিকট আসিয়া ভিক্ষা চাহিলে তিনি ভিক্ষা না দিয়া তাহাকে তাড়াইয়া দিলেন। এই ঘটনায় ফকিরের আর ক্রোধের পরিসীমা রহিল না। অতঃপর সে কয়েকখণ্ড ইষ্টক সংগ্রহ করিয়া, বৃন্দাবনের বাটীহইতে বাহির হইবার রাস্তার উপর তাহা স্তূপীকৃত করিয়া রাখিল এবং তথায় বসিয়া উচ্চৈঃস্বরে নামাজ পড়িতে

---

* Riazoo-Salatin, pages 257, 258, 265.

† Sair, Vol. I, pages 274, 279, 282.

না। সেই অবধিই বাঙ্গলার দেওয়ানী ও নাজিমীপদ একই ব্যক্তির হস্তগত হইয়া পড়িল।

১৭২৪ খ্রীষ্টাব্দে দৌহিত্র সরফরাজকে উত্তরাধিকারী মনোনীত করিয়া মুর্শিদকুলী পরলোক গমন করিলেন। কিন্তু তাঁহার উদ্দেশ্য আর কার্য্যে পরিণত হইতে পারিল না। সরফরাজের পিতা সুজাখাঁ তৎকালে উড়িষ্যাপ্রদেশের শাসনকর্ত্তৃত্বে নিযুক্ত ছিলেন। পূর্ব্ব হইতেই তিনি বাঙ্গালার নাজমীপদের অভিষিক্ত হইবার বাঞ্ছা করিয়া দিল্লীর দরবার হইতে সেই পদের সনন্দ সংগ্রহ করিয়া রাঁখিয়াছিলেন। মুর্শিদকুলীর মৃত্যু সংবাদ শুনিবামাত্রই সুজাখাঁ সসৈন্যে দ্রুতপদে মুর্শিদাবাদে উপস্থিত হইয়া চেহেল-স্থতন অধিকার করিলেন এবং দামামা বাজাইয়া আপনাকে নবাব বলিয়া ঘোষণা করিলেন। সরফরাজ তৎকালে মুর্শিদাবাদে উপস্থিত ছিলেন না। তিনি প্রবাসস্থল হইতে এই সংবাদ শুনিয়া পিতার গতিরোধ করিবার উদ্দেশ্যে সসৈন্যে কাটোয়া পর্য্যন্ত অগ্রসর হইলেন। মুর্শিদকুলীর সহধর্ম্মিণী অসাধারণ বুদ্ধিমতী ছিলেন। তিনি মনে করিলেন, পিতা ও পুত্রে যুদ্ধ হইলে অনর্থক বহুসংক্ষক লোকের প্রাণ নষ্ট হইবে। সুতরাং তিনি দৌহিত্রের নিকট আসিয়া বলিলেন, "বৎস, তোমার জনক বার্দ্ধক্যে পদার্পণ করিয়াছেন, তাঁহার লোকান্তর গমনের পর বাঙ্গালার নাজিমী এবং সমস্ত ধনরত্ন তোমারই হস্তগত হইবে। কি ইহলোক, কি পরলোক, কোন লোকেই পিতৃদ্রোহীর কল্যাণ হইতে পারে না। অতএব তুমি এখন যুদ্ধ না করিয়া বাঙ্গলার দেওয়ানী লাভ করিয়াই সন্তুষ্ট থাক।" সরফরাজ মাতামহীর উপদেশ শিরোধার্য্যপূর্ব্বক পিতার নিকট আসিয়া তাঁহার বশ্যতা স্বীকার করিলেন।

বিচার” এখন যে অবিচারের প্রতিশব্দরূপে ব্যবহৃত হইতেছে তাহার কারণ এই যে, কাজিসম্প্রদায়ের ঈদৃশ বিচারপ্রণালীতে হিন্দুপ্রকৃতিপুঞ্জ অনুমাত্রও তৃপ্তিলাভ করিতে পারে নাই।

১৭০৩ খ্রীষ্টাব্দে সম্রাট্ আওরঙ্গজেব পরলোক গমন করিলে তাঁহার উত্তরাধিকারিগণ মধ্যে দিল্লীর সিংহাসন লইয়া তুমুল বিরোধ উপস্থিত হইল। অবশেষে সম্রাটের জ্যেষ্ঠ পুত্র মহম্মদ মোয়াজেম ভ্রাতৃগণকে যুদ্ধে পরাভূত করিয়া বাহাদুরসাহ নামধারণপূর্ব্বক সিংহাসনে আরোহণ করিলেন। ১৭১২ খ্রীষ্টাব্দে বাহাদুরসাহ কালগ্রাসে পতিত হইলে তদীয় জ্যেষ্ঠপুত্র ময়াজদ্দীন পিতৃত্যক্ত সিংহাসনে সমারূঢ় হইলেন। এই সময়ই বাঙ্গলার ভূতপূর্ব্ব শাসনকর্ত্তা আজিম ওসান ময়াজদ্দিনের প্রতিদ্বন্দ্বী হইয়া যুদ্ধে প্রাণত্যাগ করিয়াছিলেন। আজিম ওসানের পুত্র ফেরক সিয়ার এ নিমিত্ত পিতৃহন্তাকে প্রতিফল দিবার অভিপ্রায়ে এলাহাবাদ ও অযোধ্যার শাসনকর্ত্তৃগণের সাহায্য চাহিয়া পাঠাইলেন। অবশেষে সেই উভয় শাসনকর্ত্তার সেনাদল লইয়া ফেরক সিয়ার ময়াজদ্দিনের বিরুদ্ধে অভিযান করিলেন। যুদ্ধে ময়াজদ্দিনকে নিহত করিয়া ফেরক সিয়ার দিল্লীর সম্রাট হইলেন।

এই অভিযানের সময় ফেরক সিয়ার মুর্শিদকুলীরও সাহায্যপ্রার্থনা করিয়াছিলেন; কিন্তু তিনি তাহাতে কর্ণপাত করেন নাই। ফেরক সিয়ার সিংহাসন লাভ করিলে মুর্শিদকুলী কালবিলম্ব না করিয়া বশ্যতার চিহ্নস্বরূপ প্রচুর উপঢৌকনসহ সমস্ত রাজস্ব সম্রাট্দরবারে পাঠাইয়া দিলেন। ইতিপূর্ব্বে মুর্শিদকুলীর প্রতি বিরূপ থাকিলেও সম্রাট্ এই ঘটনায় মুর্শিদকুলীর সমস্ত অপরাধই মার্জ্জনা করিলেন এবং পুরস্কার-স্বরূপ তাঁহাকে বাঙ্গলার নাজিমীপদে প্রতিষ্ঠিত করিতে বিস্মৃত হইলেন

রাজবল্লভ সাতিশয় রূপবান্ পুরুষ ছিলেন। কি যেন এক অলৌকিক লাবণ্য তাঁহার শরীরে বিরাজমান ছিল। যে কেহ রাজবল্লভকে বাল্যকালে দেখিয়াছেন, তিনিই তাঁহাকে প্রতিভার অবতার মনে করিয়া বলিয়াছেন, এই বালক উত্তরকালে একজন অসাধারণ লোক হইয়া দাঁড়াইবে।

একদা রাজবল্লভ কৃষ্ণজীবনের সহিত মালখানগরে বেড়াইতে গিয়াছিলেন। তৎকালে তাঁহার বয়ঃক্রম অতি অল্পই ছিল। সেই উপলক্ষে একদিন তিনি দেবিদাস বসু মহোদয়ের শয়নকক্ষে প্রবেশ করিয়া তাঁহার শয্যাতলে নিদ্রাগত হইয়া পড়িলেন। বিশ্রামের সময় আগত হইলে দেবিদাস শয়নকক্ষে আসিয়া রাজবল্লভকে নিদ্রিত অবস্থায় দেখিতে পাইলেন। নিকটে যে সমস্ত অনুচর ছিল, তাহাদের মধ্যে কেহ কেহ ত্রস্ত হইয়া বালককে জাগরিত করিবার উদ্যোগ করিল। কিন্তু তিনি সেই অনুচরগণকে প্রতিনিবৃত্ত করিয়া বলিলেন, "বালকের আকার প্রকার দেখিয়া তোমাদের কি বোধ হয় না যে ইনি ভবিষ্যতে একজন প্রধান ব্যক্তি হইবেন? ইহাকে সুখে নিদ্রা যাইতে দেও এবং দেখিও কেহ যেন ইহার নিদ্রার ব্যাঘাত না করে।" সদাশয় বসু মহোদয় এই বলিয়াই শয়নকক্ষ হইতে নিষ্ক্রান্ত হইলেন এবং কৃষ্ণজীবনের সাক্ষাৎ পাইয়া বলিলেন, "দেখ কৃষ্ণজীবন, আমার নিকট তোমার এই প্রতিজ্ঞা করিতে হইবে যে, রাজবল্লভ বড়লোক হইলে আমার বংশের

নাই। মহারাজের উত্তরপুরুষ শ্রীযুক্ত প্রতাপচন্দ্রসেন মহোদয়ের নিকট যে হস্তলিখিত পুস্তক পাওয়া গিয়াছে, তাহাতে ১৭০৭ খৃষ্টাব্দ রাজবল্লভের জন্মসময় বলিয়া বর্ণিত আছে। প্রতাপ বাবু বলেন, তিনি তাঁহার পিতা ও অনেক বৃদ্ধ জ্ঞাতির নিকট শুনিয়াছেন যে, মৃত্যুকালে রাজবল্লভের বয়ক্রম ৫৬ বৎসর ছিল। ১৭৬৩ খৃষ্টাব্দে তাঁহার মৃত্যু হয়। সুতরাং ১৭০৭ খৃষ্টাব্দই রাজবল্লভের জন্মকাল তাহা সিদ্ধান্ত হইয়া দাঁড়ায়।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

কৈশোরে

লক্ষ্মীপ্রিয়ার গর্ভে কৃষ্ণজীবনের ক্রমে ছয় পুত্র জন্মিল। তন্মধ্যে প্রথম দুই পুত্র অতি শৈশবেই কালগ্রাসে পতিত হইল। প্রবাদ এই যে, "দ্বিতীয় পুত্রের জন্মের অব্যবহিত পরে জনৈক সন্ন্যাসী কৃষ্ণজীবনের গৃহে আগমন করিলেন এবং কৃষ্ণজীবনের পুত্রদ্বয়কে দেখিয়া বলিলেন, 'ইহারা মানবদেহধারী অপদেবতা ভিন্ন আর কেহ নহে।' কৃষ্ণজীবন এই কথায় আস্থা স্থাপন করিলেন না দেখিয়া সন্ন্যাসী কয়েকটি মন্ত্রপাঠ করিলেন এবং তাহার ফলে সেই বালকদ্বয় দাঁড়কাকরূপে পরিণত হইল। এই ঘটনায় কৃষ্ণজীবনের আর কষ্টের পরিসীমা রহিল না। অতঃপর সন্ন্যাসী কৃষ্ণজীবনকে একটিলক্ষ্মীনারায়ণচক্র প্রদানপূর্ব্বক বলিলেন,— "তোমার বংশে অচিরে এক মহাপুরুষের জন্ম হইবে।"

১৭০৭ খ্রীষ্টাব্দে সন্ন্যাসীর উক্তি সফল হইল। এই সময় লক্ষ্মীপ্রিয়া একটি রমণীয়কান্তি পুত্ররত্ন প্রসব করিয়া স্বামীর আনন্দ বর্দ্ধন করিলেন। উত্তরকালে এই বালকই মহারাজ রাজবল্লভ নামে বাঙ্গলার ইতিহাসে সুপরিচিত হইলেন। *

---

* উমাচরণরায়প্রণীত জীবনীতে লিখিত আছে, রাজবল্লভ ১৭১৪ খৃষ্টাব্দে জন্ম গ্রহণ করেন। ৺চন্দ্র কুমার রায়ের প্রণীত পুস্তকে ১৬৬৯ খৃষ্টাব্দে রাজবল্লভের জন্ম সময় বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। কিন্তু এসম্বন্ধে কেহই কোন প্রমাণ উদ্ধৃত করেন

ক্লেশ অপেক্ষা তাঁহার মানসিক কষ্ট অধিক হইয়া দাঁড়াইল। উত্তর সাহাবাজপুর পরগণার জমিদার সুপ্রসিদ্ধ চাঁদরায়, একমাত্র তনয়া বলিয়া লক্ষ্মীপ্রিয়াকে শৈশবে অতি যত্নে লালনপালন করিয়াছিলেন। স্বামিগৃহে আসিয়াও তিনি সর্ব্বদা উদারহৃদয় ও স্নেহবপ্রণ স্বামী হইতে সোহাগ ভিন্ন অন্য কোনরূপ ব্যবহার লাভ করেন নাই। সুতরাং এই অপ্রত্যাশিত পরুষ ব্যবহারে লক্ষ্মীপ্রিয়ার দুর্জ্জয় অভিমান হইল এবং অশ্রুবর্ষণ করিতে করিতে তিনি অনিদ্রায় সমস্ত রজনী কাটাইয়া দিলেন। শুভস্বপ্ন দেখিয়া নিদ্রাগত না হইলে সেই স্বপ্ন সফল হয়, এই বিশ্বাস এখনও অনেকের হৃদয়ে বদ্ধমূল আছে। কৃষ্ণজীবনের সময় প্রায় সকলেই এই প্রবাদে আস্থাবান্ ছিলেন। পত্নীর নিকট স্বপ্নবৃত্তান্ত অবগত হইয়াই কৃষ্ণজীবন মনে করিলেন, সন্ন্যাসী যে তাঁহাকে মহাপুরুষের কথা বলিয়াছিলেন, তিনিই এখন লক্ষ্মীপ্রিয়ার গর্ভে জন্মগ্রহণ করিতে আসিয়াছেন। পত্নী পুনরায় নিদ্রামগ্ন হইলে সেই স্বপ্ন নিষ্ফল হইবে এই আশঙ্কা এখন তাঁহার মনে উদয় হইল। অবশেষে তিনি স্থির করিলেন, কোনরূপে দুর্ব্ব্যবহার করিলে লক্ষ্মীপ্রিয়া অভিমানভরে আর নিদ্রা যাইবেন না। সুতরাং তিনি পত্নীকে জাগরিত রাখিবার উদ্দেশ্যে তদীয় গণ্ডে চপেটাঘাত করিলেন। রজনী প্রভাত হইলে কৃষ্ণজীবন সমস্ত বৃত্তান্ত খুলিয়া বলিয়া পত্নীর নিকট ক্ষমা চাহিলেন। ভর্ত্তার প্রকৃত উদ্দেশ্য বুঝিতে পাইয়া লক্ষ্মীরূপিণী লক্ষ্মীপ্রিয়া পুনরায় প্রফুল্লমনে শয়নকক্ষ হইতে নিষ্ক্রান্ত হইলেন। অতঃপর ক্রমে মজুমদার-পত্নীর গর্ভলক্ষণ প্রকাশ পাইতে লাগিল এবং তদবধি দশমমাস অতীতে সুনির্ম্মল চন্দ্রালোকের ন্যায় রূপের ছটার সহিত ভূমিষ্ঠ হইয়া রাজবল্লভ জননীর শুভস্বপ্ন সফল করিলেন।

প্রথম অধ্যায়ের প্রথম পরিচ্ছেদে ভট্টকবির যে কবিতা উদ্ধৃত করা

কোনরূপ অনিষ্টাচরণ করিবে না।" বলা বাহুল্য যে কৃষ্ণজীবন সেই মর্ম্মে প্রতিজ্ঞা করিয়া বসু মহোদয়কে সন্তুষ্ট করিতে আপত্তি করিলেন না। *

রাজবল্লভের জন্ম সম্বন্ধে নিম্নলিখিত কিংবদন্তীটি বাহুল্যরূপে প্রচলিত আছে:—কোন এক ঋতুস্নানের পরবর্ত্তী রজনীতে লক্ষ্মীপ্রিয়া পতিসহ শয়নকক্ষে নিদ্রা যাইতেছিলেন। এমন সময় তিনি স্বপ্নে দেখিলেন, স্বয়ং চন্দ্রমা আকাশ হইতে ভূতলে অবতীর্ণ হইয়া তাঁহার মুখের ভিতর দিয়া উদরে প্রবেশ করিতেছেন। এইরূপ অস্বাভাবিক স্বপ্নে তাঁহার নিদ্রাভঙ্গ হইল এবং তিনি নিদ্রিত স্বামীকে জাগরিত করিয়া তাঁহার নিকট স্বপ্নবৃত্তান্ত বলিলেন। লক্ষ্মীপ্রিয়া আশা করিয়াছিলেন, স্বামী এই বৃত্তান্ত শুনিয়া কতই না বিস্ময় প্রকাশ করিবেন। কিন্তু কৃষ্ণজীবন তাঁহাকে নিরাশ করিয়া পত্নীর গণ্ডদেশে সবলে এক চপেটাঘাত করিলেন। বলিষ্ঠদেহ কৃষ্ণজীবনের বজ্রসম আঘাতে কোমলকায়া লক্ষ্মীপ্রিয়া যে কত বেদনা অনুভব করিলেন তাহা সহজেই অনুমেয়। কিন্তু দৈহিক

---

* দেবিদাস বসু মহোদয়ের উত্তরপুরুষ শ্রীযুক্ত কিশোরীমোহন বসু এই বৃত্তান্ত লিখিয়া জানাইয়াছেন। উমাচরণরায়প্রণীত জীবনীতেও এই কথার উল্লেখ আছে। রাজবল্লভ যে পিতার প্রতিশ্রুতি রক্ষা করিয়াছিলেন তাহা সমর্থন করিতে গিয়া কিশোরী বাবু লিখিয়াছেন:—মালখানগরের অনতিদূরে কাজিরবাগ নামে একটী গ্রাম আছে। এই শেষোক্ত গ্রামে কতিপয় ক্ষমতাশালী মুসলমান বাস করিতেন। ঘটনাচক্রে দেবিদাস বসুর সহিত সেই মুসলমানদিগের বিরোধ উপস্থিত হইল। মুসলমান নবাবের রাজ্যে বাস করিয়া উচ্চপদস্থ মুসলমানদিগের সহিত বিবাদে প্রবৃত্ত হইয়া বসু মহাশয় অন্ধকার দেখিতেছিলেন। তৎকালে রাজবল্লভ উচ্চ রাজপদে প্রতিষ্ঠিত ছিলেন, সুতরাং দেবিদাস আপন বিপদের সংবাদ রাজবল্লভকে লিখিয়া পাঠাইলেন। অবশেষে রাজবল্লভের চেষ্টায় তিনি সেই বিপদ হইতে মুক্ত হইলেন।

রাজবল্লভ ব্যতীত উল্লিখিত অন্য কোন রাজপুরুষসম্বন্ধে এরূপ কোন অলৌকিক কিংবদন্তী প্রচলিত আছে বলিয়া জানা যায় না। যাহাদের চরিত্র কলুষিত, তাহাদিগকে কেহ মহাপুরুষ চন্দ্রমা অথবা জরাসন্ধের অবতার বলিয়া রটনা করিতে সাহস করে না। এবং কোন নির্লজ্জ চাটুকার সেইরূপ কার্য্যে ব্রতী হইলেও লোকসমাজে কখনও ঐরূপ রটনা বদ্ধমূল হইতে পারে না। রাজবল্লভসম্বন্ধীয় পূর্ব্বোক্ত কিংবদন্তীসমূহ বহুকাল যাবৎ বঙ্গসমাজে প্রচলিত আছে এবং এতদ্দেশীয় অনেক প্রাচ্য-ভাবাপন্ন বয়োবৃদ্ধ সেই সমস্ত কিংবদন্তীর বিশুদ্ধতাসম্বন্ধে এখনও আস্থাবান্ রহিয়াছেন। এতদ্দ্বারা ইহাই প্রতীয়মান হয় যে তৎসমকালবর্ত্তী অন্যান্য রাজপুরুষ অপেক্ষা রাজবল্লভের চরিত্রে নিশ্চয়ই একটুকু বিশেষত্ব ছিল এবং সেই বিশেষত্বনিবন্ধনই তৎসম্বন্ধে পূর্ব্বোক্ত জনশ্রুতিসমূহ বঙ্গীয় সমাজে তথাপি প্রচলিত রহিয়াছে।

হইয়াছে তাহাতে লিখিত আছে, মগধের সুপ্রসিদ্ধ অধিপতি জরাসন্ধই রাজবল্লভরূপে লক্ষ্মীপ্রিয়ার গর্ভে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। কথিত আছে যে নবদ্বীপাধিপতি রাজা কৃষ্ণচন্দ্রই সর্ব্বপ্রথম এই তত্ত্ব আবিষ্কার করেন। রাজস্বদায়ে বিপন্ন হইয়া একদা তিনি "করচালনা" প্রক্রিয়ার আশ্রয় লইয়াছিলেন এবং তাহাতে নিম্নলিখিত শ্লোকটি উঠিয়াছিল :—

কিংবা পৃচ্ছসি রে মূঢ় বারং বারং পুনঃ পুনঃ।
পূর্ব্বে রাজা জরাসন্ধ ইদানীং রাজবল্লভঃ॥

পূর্ব্বোক্ত কিংবদন্তীসমূহের মূলে সত্য নিহিত আছে কি না বলা সুকঠিন। তবে, বিশ্বনিয়ন্তা জগদীশ্বরের রাজ্যে কোন বিষয় হঠাৎ অবিশ্বাস করাও ক্ষুদ্র মানবের পক্ষে ধৃষ্টতা ভিন্ন আর কিছুই নহে। পাশ্চাত্য পণ্ডিতেরা এতদিন জন্মান্তরবাদে বিশ্বাস করিতেন না সত্য; কিন্তু এখন প্রাচ্যদর্শনশাস্ত্র পাঠ করিয়া তাঁহারাও জন্মান্তরবাদে ক্রমে আস্থাবান্ হইতেছেন। তবে এ কথা নিঃসঙ্কোচে বলা যাইতে পারে যে রাজবল্লভজননীর স্বপ্নবৃত্তান্ত পাঠ করিলে বাণভট্টপ্রণীত কাদম্বরীনামক গ্রন্থে চন্দ্রাপীড়ের জন্মবৃত্তান্ত যেভাবে বর্ণিত হইয়াছে তাহা স্বতই পাঠকের স্মৃতিপথে উদিত হয়।

একদা এ দেশে হস্তচালনাপ্রক্রিয়ায় লোকের বিশেষ সমাদর ছিল। পাশ্চাত্যজগতের প্লানচেট যে এতদ্দেশীয় হস্তচালনার রূপান্তর মাত্র তাহা বোধ হয় অনেকেই স্বীকার করিবেন। পূর্ব্বোক্ত উভয় প্রক্রিয়ার সহায়তায় সত্যনির্দ্ধারণ হইতে পারে কি না তাহা শিক্ষিত সম্প্রদায়ের বিচার্য্য।

রাজবল্লভের সমকালে তিনিই যে একমাত্র প্রধান রাজপুরুষ ছিলেন, এমন নহে। রামদুর্ল্লভ, জগৎশেঠ, রামনারায়ণপ্রভৃতি অনেকেই রাজবল্লভ অপেক্ষা শ্রেষ্ঠতর রাজপদে প্রতিষ্ঠিত ছিলেন। কিন্তু একমাত্র

একমাত্র শারীরিক শক্তিসঞ্চয়দ্বারা কাহারও পক্ষে পূর্ণ শিক্ষা লাভকরা সাধ্যায়ত্ত নহে। পূর্ণ মনুষ্যত্ব লাভ করিতে হইলে শারীরিক ও মানসিক এই উভয়বিধ শিক্ষারই প্রয়োজন। প্রায়ই দেখিতে পাওয়া যায়, দৃঢ়কায় বলিষ্ঠ পুরুষেরা সুশিক্ষার অভাবে সমাজে নানাবিধ অনর্থ উৎপাদন করে এবং ক্ষীণজীবী সুশিক্ষিত লোকেরা শারীরিক শক্তির অভাবে উদ্যমশূন্য হইয়া রুগ্ন অবস্থায় কালযাপন করিতে বাধ্য হয়। কৃষ্ণজীবন এই তত্ত্ব বিশেষরূপে হৃদয়ঙ্গম করিয়াছিলেন এবং এ নিমিত্ত প্রিয়তম পুত্রের মানসিক শিক্ষাবিষয়েও তিনি অনুমাত্রও ঔদাসীন্য প্রদর্শন করেন নাই। রাজবল্লভ যাহাতে সুশিক্ষিত হইতে পারেন, তিনি সর্ব্বদাই সেই বিষয়ে যত্নবান্ ছিলেন। তৎকালে এ দেশে বাঙ্গলা ও পারসিক ভাষারই বিশেষ প্রচলন ছিল। পিতার আগ্রহে রাজবল্লভ এই দুই ভাষাই শিক্ষা করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। উমাচরণ বাবু লিখিয়াছেন রাজবল্লভ সেই উভয় ভাষায়ই বিলক্ষণ পটুতা লাভ করিয়াছিলেন। দুর্ভাগ্যবশতঃ পুত্রের শিক্ষা সমাপ্ত হইবার পূর্ব্বেই কৃষ্ণজীবন লোকান্তর গমন করিলেন। কিন্তু রাজবল্লভ এই দুর্ঘটনায় ভগ্নোদ্যম না হইয়া অধিকতর উৎসাহসহকারে বিদ্যাভ্যাস করিতে লাগিলেন এবং অচিরে বিদ্যালয়ের সর্ব্বপ্রধান ছাত্র বলিয়া পরিগণিত হইলেন। কলিকাতা হাইকোর্টের ভূতপূর্ব্ব উকিল রায়চাঁদ-প্রেমচাঁদ-বৃত্তিধারী ডাক্তার প্রিয়নাথসেনমহোদয়ের অতিবৃদ্ধ প্রপিতামহের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা রামানন্দ সরকার রাজবল্লভের সহপাঠী ছিলেন। রামানন্দ উত্তরকালে মুর্শিদাবাদের নেজামতে পেস্কারী করিয়া স্বকীয় অবস্থা অনেক উন্নত করিয়াছিলেন। বিদ্যালয়ে রামানন্দেরও যথেষ্ট খ্যাতি ও প্রতিপত্তি ছিল; কিন্তু প্রতিভায় রাজবল্লভ তদপেক্ষা অনেক শ্রেষ্ঠ ছিলেন। এ নিমিত্ত রামানন্দ বাল্যকাল হইতেই রাজবল্লভকে সম্মানের চক্ষে

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

গুরুকুলে

উমাচরণরায়প্রণীত পুস্তকে লিখিত আছে, রাজবল্লভ বাল্যকাল হইতেই ধর্ম্মপরায়ণ, বুদ্ধিমান্, গম্ভীরপ্রকৃতি এবং অত্যন্ত মেধাবী ছিলেন। বোধ হয়, এই সমস্ত কারণেই কৃষ্ণজীবন অন্যান্য পুত্র অপেক্ষা রাজবল্লভকে অধিকতর স্নেহ করিতেন। তিনি স্বয়ং অত্যন্ত বলিষ্ঠ ছিলেন এবং প্রিয়তম পুত্রকেও সর্ব্বদা মল্লক্রীড়া ও অন্যান্য বীরোচিত কার্য্যে উৎসাহ প্রদান করিতেন। যে সময় রাজবল্লভ জন্ম গ্রহণ করেন, তৎকালে কৃষ্ণজীবন অতিশয় সচ্ছল অবস্থাপন্ন ছিলেন। বর্ত্তমান যুগে বাঙ্গলা দেশে বিত্তশালী লোকের পুত্রকলত্রগণ প্রায়ই শ্রমবিমুখ হইয়া আলস্যেরক্রোড়ে কালযাপন করেন, কিন্তু রাজবল্লভ পিতার উৎসাহে বাল্যকালে "আখড়ায়" গিয়া ব্যায়ামচর্চ্চা করিতেন এবং তরবারিসঞ্চালন ও তীরক্ষেপণ প্রভৃতি পুরুষোচিত-কার্য্যে নিযুক্ত হইতেন। তাঁহার উত্তর পুরুষগণের নিকট যে হস্তলিখিত পুস্তক পাওয়া গিয়াছে, তাহাতে লিখিত আছে যে ক্রীড়াসহচর বালকগণমধ্যে এই সমস্ত বিষয়ে তিনি সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠত্ব লাভ করিয়াছিলেন। ফলে বাল্যকালের পুরুষোচিত শিক্ষাই রাজবল্লভকে ভাবী জীবনে নাওয়ার বিভাগের অধ্যক্ষ ও সেনানায়কের পদোচিত কর্ত্তব্যসম্পাদনে সবিশেষ সহায়তা করিয়াছিল।

ছিলেন এ বিষয়ের কোনও বিশ্বাসযোগ্য প্রমাণ নাই। রাজবল্লভের জন্ম সময় কৃষ্ণজীবন সচ্ছল অবস্থাপন্ন ছিলেন এবং মৃত্যুকালেও তিনি যথেষ্ট ভূসম্পত্তি রাখিয়া যান, সুতরাং শিক্ষার ব্যয়সঙ্কুলনজন্য তিনি যে অন্যের গলগ্রহ হইয়াছিলেন, ইহা কদাচ সম্ভবপর নহে। অতি অল্প-কাল যাবৎ মালখানগরে একটি উচ্চশ্রেণীর ইংরাজী বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে; তৎপূর্ব্বে তথায় যে কোনরূপ বিদ্যালয় ছিল তাহা জানা যায় না। স্বয়ং কিশেরী বাবুও বলিয়াছেন, মালখানগরে কখনও কোন মক্তব প্রতিষ্ঠিত ছিল না। অতএব তথায় যে রাজবল্লভ শিক্ষালাভ করেন নাই, ইহাই সিদ্ধান্ত হইতেছে।

কাহারও মতে রাজবল্লভ স্বগ্রাম বিলদাওনিয়াতেই শিক্ষালাভ করিয়া-ছিলেন। রাজবল্লভের বাল্যকালে বিলদাওনিয়া একটি নগণ্য গ্রাম ছিল। রাজবল্লভের উন্নতির সময় সেই বিলদাওনিয়াই "রাজনগরে" পরিণত হইলে তথায় বহুসংখ্যক চতুষ্পাঠী, মক্তব ও পাঠশালা সংস্থাপিত হইয়াছিল সত্য; কিন্তু তৎপূর্ব্বে তথায় লোকসংখ্যা অতি বিরল ছিল এবং বিদ্যাশিক্ষার যে কোনও সুবন্দোবস্ত ছিল না, এ কথা অনেকেই বলেন। সুতরাং বিলদাওনিয়ায় তাঁহার শিক্ষা হওয়া সম্ভবপর বলিয়া বোধ হয় না।

এই সময় সমগ্র বিক্রমপুর পরগণায় জপসা গ্রাম পারসিক ভাষার অধ্যাপনার নিমিত্ত বিশেষ প্রসিদ্ধিলাভ করিয়াছিল। "আভিজাত্য" নামক পরিচ্ছেদে বলা হইয়াছে যে রাজবল্লভের পূর্ব্বপুরুষ বেদগর্ভসেনের জ্যেষ্ঠপুত্র নীলকণ্ঠ সেন সেই স্থানে গিয়া গৃহপ্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন। নীল কণ্ঠের পুত্র রাজেন্দ্র, রাজেন্দ্রের পুত্র শিবরাম এবং শিবরামের পুত্র গোপীরমণ সেন। গোপীরমণের ছয় পুত্রের মধ্যে জ্যেষ্ঠ কৃষ্ণরাম ও রাম মোহন নবাবসরকারে করসংগ্রাহকের কার্য্য করিয়া যথাক্রমে দেওয়ান

নিরীক্ষণ করিতেন এবং আজীবন তাঁহার অনুবর্ত্তী হইয়াই কার্য্য করিয়াছেন। (১)

রাজবল্লভ যে একমাত্র বাঙ্গলা ও পারসিক ভাষাতেই ব্যুৎপত্তি লাভ করিয়াছিলেন, এমন নহে। সংস্কৃত ভাষাতেও তাঁহার প্রগাঢ় অধিকার জন্মিয়াছিল। রাজকার্য্য লাভ করিয়া তিনি কতিপয় ব্রাহ্মণ পণ্ডিতকে পার্শ্বচররূপে নিযুক্ত করিয়াছিলেন এবং তাঁহাদের সহায়তায় প্রৌঢ় বয়সে তিনি সংস্কৃত ভাষা অধ্যয়ন করিবার সুবিধা করিয়া লইয়াছিলেন। অপিচ রাজবল্লভ যে বহুবিধ সামাজিক সংস্কারে হস্তক্ষেপ করেন, তাহা তাঁহার সংস্কৃত শিক্ষার ফল ভিন্ন আর কিছুই নহে।

ইংরেজ বণিক্‌দিগের সংস্রবে আসিয়া তাঁহাকে ইংরেজীভাষাও শিক্ষা করিতে হইয়াছিল। লঙসাহেবের প্রকাশিত ইংরেজ দপ্তরের কাগজে রাজবল্লভের ইংরাজী চিঠিপত্র উদ্ধৃত হইয়াছে। বোধ হয় উপযুক্ত শিক্ষকের অভাবেই এই ভাষায় তাঁহার বিশেষ ব্যুৎপত্তি জন্মিয়াছিল না এবং তজ্জন্যই সেই সমস্ত চিঠিপত্রের ভাষা তাদৃশ পরিমার্জ্জিত হয় নাই।

কোন্ স্থানে রাজবল্লভের বাল্যশিক্ষা হইয়াছিল, তৎসম্বন্ধে মতভেদ দেখিতে পাওয়া যায়। উমাচরণ বাবুর পুস্তকে রাজবল্লভের শিক্ষাস্থান সম্বন্ধে কোনও কথার উল্লেখ নাই। দেবিদাসবসুমহাশয়ের উত্তরপুরুষ কিশোরীবাবু বলেন, রাজবল্লভ প্রথমতঃ মালখানগরে শিক্ষা আরম্ভ করেন ও পরে দেবিদাসবসুমহোদয়ের অর্থসাহায্যে দিল্লী গমন করিয়া পারসিকভাষায় ব্যুৎপন্ন হন। রাজবল্লভ যে কখনও দিল্লী গমন করিয়া-

---

(১) পূর্ব্ব কথিত প্রিয়নাথ বাবুই রাজবল্লভ ও রামানন্দসংক্রান্ত বৃত্তান্ত লিখিয়া জানাইয়াছেন।

পারসিক ভাষার অধ্যাপনার নিমিত্ত প্রসিদ্ধিলাভ করিয়াছিল, রঘুনন্দনের অধ্যাপনাকুশলতাই তাহার একমাত্র কারণ। •

গোপীরমণের আবাসস্থলে "পঞ্চরত্ন" নামে একটি অট্টালিকা বিদ্যমান ছিল। সেই স্থানেই পারসিক ভাষার অধ্যাপনা হইত। অনেকেরই মত ইহাই যে সেই পঞ্চরত্নেই রাজবল্লভের বিদ্যাশিক্ষা হইয়াছিল এবং সমস্ত অবস্থাপর্য্যালোচনা করিলে এই মতই বিশুদ্ধ বলিয়া প্রতীয়মান হয়। বৃদ্ধ বয়সে রঘুনন্দন বারাণসীধামে অবস্থান করিবেন সংকল্প করিয়া মুরশিদাবাদে রাজবল্লভের সহিত সাক্ষাৎ করেন। তৎকালে রাজবল্লভ উচ্চ রাজপদে প্রতিষ্ঠিত ছিলেন। তিনি দেখিলেন বৃদ্ধবয়সেও রঘুনন্দনের কার্য্যক্ষমতার বিশেষ কোন হানি হয় নাই। সুতরাং তিনি রঘুনন্দনকে পুনরায় রাজকার্য্যে প্রবেশ করিতে উপদেশ দিলেন। রঘুনন্দন মনে করিলেন, যত দিন দেহে শক্তি আছে, ততদিন রাজকার্য্যে নিযুক্ত থাকিলে অর্থসঞ্চয়পক্ষে সুবিধা হইবে এবং সঞ্চিত অর্থসহ পরে বারাণসীধামে অবস্থান করিতে পারিলে শেষজীবনে তাঁহাকে আর অর্থকৃচ্ছতার অসুবিধা ভোগ করিতে হইবে না। সুতরাং তিনি কোনও আপত্তি না করিয়া নবাবসরকারে একটি কার্য্যের যোগাড় করিয়া দেওয়ার নিমিত্ত রাজবল্লভকে কহিলেন। শিক্ষাগুরুর কোনরূপ প্রত্যুপকার করিবেন মনস্থ করিয়াই রাজবল্লভ রঘুনন্দনকে নবাবসরকারে প্রবেশ করিতে বলিয়াছিলেন। এখন রঘুনন্দন সম্মত হইলেন দেখিয়া রাজবল্লভ তাঁহাকে রাজমহলের পেস্কারীপদে নিযুক্ত করিয়া দিলেন। কথিত আছে, এই পদে কয়েক বৎসর কার্য্য করিয়া রঘুনন্দন অবশেষে কাশীবাসী হইয়াছিলেন। *

---

* রাজবল্লভ ও রঘুনন্দনসংক্রান্ত বৃত্তান্ত রঘুনন্দনের উত্তরপুরুষগণ হইতে সংগৃহীত হইল।

ও কোরারী উপাধি লাভ করেন। কনিষ্ঠও নবাবসরকারে কার্য্য করিতেন; কোনও কারণে নবাবের বিরাগভাজন হইয়া তিনি রাজকার্য্য হইতে অপসৃত হয়েন এবং তাঁহার শিরশ্ছেদনের অনুজ্ঞা প্রচারিত হয়। এই সময় রঘুনন্দন অনন্যোপায় হইয়া জীবনরক্ষার উদ্দেশে পলায়মান হইলেন। কিন্তু নবাব ইহাতে অধিকতর উত্তেজিত হইয়া রঘুনন্দনকে দরবারে উপস্থিত করিবার নিমিত্ত কৃষ্ণরাম ও রামমোহনের প্রতি আদেশ প্রদান করিলেন। ভ্রাতার জীবনরক্ষার উদ্দেশে কৃষ্ণরাম ও রামমোহনকে অগত্যা কৌশল অবলম্বন করিতে হইল। তৎকালে সংবাদবিভাগের তাদৃশ সুবন্দোবস্ত ছিল না এইং যাহারা সেই বিভাগে কার্য্য করিত তাহারাও উৎকোচ গ্রহণ করিতে কুণ্ঠা বোধ করিত না। কৃষ্ণরাম ও রামমোহন প্রথমতঃ সংবাদবিভাগের কর্ম্মচারিগণকে উৎকোচের সাহায্যে বশীভূত করিলেন এবং পরে রটনা করিয়া দিলেন যে রঘুনন্দন কালগ্রাসে পতিত হইয়াছেন। অতঃপর উভয়ভ্রাতা নবাব দরবারে উপস্থিত হইয়া অশ্রুপূর্ণলোচনে নবাবের নিকট ভ্রাতার পরলোক প্রাপ্তি বৃত্তান্ত নিবেদন করিলেন। সংবাদবিভাগহইতেও এই উক্তি সমর্থিত হইল। সুতরাং রঘুনন্দনের প্রতি ইতিপূর্ব্বে যে প্রাণদণ্ডের আদেশ হইয়াছিল, তাহার প্রত্যাহার ইইয়া গেল। এই কৌশলে রঘুনন্দনের প্রাণরক্ষা হইল বটে, কিন্তু তিনি আর সাহস করিয়া রাজকীয় কার্য্য লাভের চেষ্টা করিতে পারিলেন না। পারসিক ভাষায় রঘুনন্দনের যথেষ্ট ব্যুৎপত্তি ছিল। তিনি এখন নিজ ভদ্রাসনে বসিয়া গোপনে পারসিক ভাষার অধ্যাপনা করিতে লাগিলেন। শিক্ষাকৌশলে রঘুনন্দন সিদ্ধহস্ত ছিলেন। অচিরে তাঁহার যশঃসৌরভ চতুর্দ্দিকে পরিব্যাপ্ত হইল এবং দলে দলে ছাত্র আসিয়া তাঁহার পদপ্রান্তে উপবেশনপূর্ব্বক পারসিক ভাষা অধ্যয়নে নিযুক্ত হইল। সমগ্র বিক্রমপুর পরগণায় জপসাগ্রাম যে

নাওয়ারবিভাগ ঢাকাতেই অবস্থিত ছিল। সরফরাজের ভাগিনেয় মুরাদ আলি এই সময়েই নাওয়ার বিভাগের অধ্যক্ষপদ লাভ করিয়া তথায় উপনীত হইলেন।

১৭২৬ খ্রীষ্টাব্দে ঊনবিংশবৎসরবয়সে রাজবল্লভ পাঠ সমাপন করিয়া পিতৃপদ লাভ করিবার উদ্দেশে ঢাকায় আগমন করিলেন। মালখাঁনগরনিবাসী দেবিদাস বসু এবং জপসানিবাসী রামমোহনকোরারী সেই সময় ঢাকায় অবস্থান করিতেছিলেন। রাজবল্লভ ঢাকায় আসিয়া সর্ব্ব প্রথম তাঁহাদের সহিত সাক্ষাৎ করিলেন। দেবিদাস বাল্যকালে রাজবল্লভকে দেখিয়াছিলেন এবং ভবিষ্যতে রাজবল্লভ যে একজন বড়লোক হইবেন তাহাও তিনি তৎকালে বলিয়াছিলেন। জপসার পারসিক বিদ্যালয়ে রাজবল্লভ একজন বিখ্যাত ছাত্র ছিলেন। সুতরাং দেবিদাস ও রামমোহন উভয়েই রাজবল্লভকে অত্যন্ত সমাদর করিলেন এবং রাজবল্লভকে লইয়া নায়েব নাজিম লতিবুল্লার দরবারে উপস্থিত হইলেন। পূর্ব্বে বলা হইয়াছে যে, কি যেন এক অলৌকিক লাবণ্য রাজবল্লভের শরীরে বিরাজমান ছিল। যুবক রাজবল্লভ দরবারে উপস্থিত হইলেই লতিবুল্লা তৎপ্রতি দৃষ্টিপাত করিতে লাগিলেন। ইত্যবসরে দেবিদাস ও রামমোহন অগ্রসর হইয়া রাজবল্লভ যে ভূতপূর্ব্ব রাজকর্ম্মচারী কৃষ্ণজীবনের পুত্র তাহা নায়েব নাজিমের নিকট করযোড়ে নিবেদন করিলেন। সেই সময় নাওয়ার বিভাগের জমানবীসের পদ শূন্য ছিল। লতিবুল্লা কোনরূপ দ্বিরুক্তি না করিয়া রাজবল্লভকে সেই পদে নিযুক্ত করিলেন।(১)

(১) উমাচরণবাবু লিখিয়াছেন ১৭৩৪খ্রীষ্টাব্দে মুরাদ আলির নায়েব নাজিমি আমলে রাজবল্লভ রাজকার্য্যে প্রবেশ করেন এবং তখন তাঁহার বয়স ১৯ বৎসর মাত্র ছিল।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

রাজকীয়-কার্য্যারম্ভে

"জাহাঙ্গীর নগর" নামক পরিচ্ছেদে বলা হইয়াছে যে বাঙ্গলার রাজধানী মুরশিদাবাদে স্থানান্তরিত হইলে ঢাকা নগরী একজন নায়েব নাজিমের আবাসস্থল বাসে নির্দ্দিষ্ট হইয়াছিল এবং সেই নায়েবনাজিম ঢাকলে জাহাঙ্গীরনগর, শ্রীহট্ট এবং ইসলামাবাদের শাসনদণ্ড পরিচালন করিতেছিলেন। মুরসিদকুলীর নবাবী আমলে যে ব্যক্তি এই পদে নিযুক্ত ছিলেন, তাঁহার নাম মিরজা লতিবুল্লা। তিনি সুরাট বন্দরস্থ জনৈক বণিকের পুত্র ছিলেন এবং মুরসিদকুলীর কন্যার সপত্নীতনয়া দোরদানা বেগমের পাণিগ্রহণ করিয়াছিলেন। ১৭২৪ খৃষ্টাব্দে সুজা খাঁ বাঙ্গলার নবাবীপদে অভিষিক্ত হইয়া মহম্মদতকিনামক পুত্রকে উড়িষ্যার শাসনকর্ত্তৃত্বে নিযুক্ত করেন। মহম্মদ তকি ও দোরদানা একই জননীর গর্ভজাত ছিলেন। ১৭৩৪ খৃষ্টাব্দে মহম্মদ তকি কালগ্রাসে পতিত হইলে লতিবুল্লা উড়িষ্যার এবং সরফরাজ খাঁ ঢাকার নায়েব নাজিমীপদ লাভ করিলেন। পূর্ব্বহইতেই সরফরাজ মুরসিদাবাদের নেজামতে দেওয়ানীপদে নিযুক্ত ছিলেন, সুতরাং তাঁহার পক্ষে মুরশিদা-বাদ পরিত্যাগপূর্ব্বক ঢাকায় আসিয়া অবস্থান করা সম্ভবপর হইল না। অগত্যা তিনি গালিব আলি নামক জনৈক পারস্যদেশীয় সম্ভ্রান্ত মুসল-মানকে প্রতিনিধি নিযুক্ত করিয়া এবং যশোবন্তরায়নামক জনৈক হিন্দুকে দেওয়ানীপদ দিয়া উভয়কে ঢাকায় পাঠাইয়া দিলেন। তৎকালে

১৭৩৯ খ্রীষ্টাব্দে সুজাখাঁ পরলোক গমন করিলে সরফরাজখাঁ বাঙ্গলার নাজিমীপদে অভিষিক্ত হইলেন। মুরাদআলি নায়েবনাজিমীপদ লাভ করার সময় হইতে এ পর্য্যন্ত আর কেহ নাওযার বিভাগের অধ্যক্ষ পদে বরিত হয় নাই। রাজবল্লভই এতদিন পেস্কারী পদে থাকিয়া সেই বিভাগের অধ্যক্ষ পদোচিত কর্ত্তব্য সম্পাদন করিতেছিলেন। সরফরাজ নবাব হইয়া দেখিতে পাইলেন রাজবল্লভের কার্য্যে কোনরূপ ত্রুটি পরিলক্ষিত হইতেছে না, সুতরাং তিনি রাজবল্লভকেই নাওয়ার বিভাগের অধ্যক্ষপদ প্রদান করিয়া গুণগ্রাহিতার পরিচয় দিতে কুণ্ঠিত হইলেন না। ১৭৩৯ খ্রীষ্টাব্দ হইতে ১৭৪১ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত রাজবল্লভ এই পদে নিযুক্ত রহিলেন। (২)

কিরূপে রাজবল্লভ রাজকার্য্যে প্রবেশ লাভ করিলেন এবং কি বলেই বা তাঁহার পদোন্নতি ঘটিল, তৎসম্বন্ধে অনেক কিংবদন্তী প্রচলিত আছে। নিম্নে একে একে সেই সমস্ত কিংবদন্তী উদ্ধৃত করিয়া তৎসম্বন্ধে পর্য্যালোচনা করা হইল।

মহারাজের উত্তরপুরুষ শ্রীযুক্ত বাবু প্রভাতচন্দ্র সেন মহাশয়ের নিকট যে হস্তলিখিত পুস্তক পাওয়া গিয়াছে, তাহাতে লিখিত আছে "রাজবল্লভ অতিঅল্পবয়সে নবাবসরকারে প্রবেশ করিয়া স্বীয়প্রতিভাবলে শীঘ্র শীঘ্র উচ্চরাজকার্য্যে উন্নীত হইলেন। কোনও এক সময় নিকাশ প্রদান উদ্দেশ্যে তাঁহাকে মুর্শিদাবাদে যাইতে হইল। তথায় গিয়া তিনি যে স্থানে আশ্রয় লইলেন, তাহার নিকটে মুদীর দোকান ছিল। একদা রজনী দ্বিতীয় প্রহর অতীত হইলে নবাবের জনৈক খানসামা মুদীর দোকানে দৌড়িয়া আসিয়া দেখিতে পাইল যে দোকানের কবাট ভিতর

(2) Stgarts Histry of Bengal Peges 267. 268, 308,

১৭৩৪ খ্রীষ্টাব্দে যশোবন্তরায় দেওয়ান হইয়া ঢাকায় আসিলে খাস মহাল, জায়গীর, নাওয়ার, গোলন্দাজ, রাজস্ব ও বাণিজ্যশুল্কপ্রভৃতি বিভাগের পর্য্যবেক্ষণভার তাঁহার প্রতি অর্পিত হইল। ১৭৩৮ খৃষ্টাব্দে মুরাদআলি সরফরাজনন্দিনীর পাণিগ্রহণ করিয়া নায়েব নাজিম গালিব আলির পদ লাভ করিলেন। দেওয়ান যশোবন্ত যে কেবল যোগ্য লোক ছিলেন এমন নহে; তিনি অতিশয় গুণগ্রাহীও ছিলেন। যশোবন্ত দেখিলেন রাজবল্লভ নাওয়ার বিভাগের জমানবীসের পদোচিত কর্ত্তব্য অতিশয় নিপুণতার সহিত সম্পাদন করিতেছেন; সুতরাং তিনি মুরাদআলি নায়েবনাজিমীপদে উন্নীত হওয়ার অব্যবহিত পরেই তাঁহার নিকট রাজবল্লভের যোগ্যতার বিষয় বলিলেন। তদনুসারে মুরাদআলি ১৭৩৮ খ্রীষ্টাব্দে রাজবল্লভকে নাওয়ার বিভাগের পেস্কারীপদে উন্নীত করিয়া পুরস্কৃত করিলেন। (১)

ষ্টুয়ার্ট সাহেবের ইতিহাস অনুসারে ১৭৩৪খ্রীষ্টাব্দে মুরাদআলি নাওয়ার বিভাগে অধ্যক্ষ্য ছিলেন এবং ১৭৩৮ খ্রীষ্টাব্দে তিনি নায়েব নাজিমী পদ লাভ করেন। রিয়াজু সেলাতিন ও ষ্টুয়ার্ট সাহেবের ইতিহাসপাঠে অবগত হওয়া যায় যে ১৭৩৪ খ্রীষ্টাব্দে মুরাদআলি নাওযার বিভাগে অধ্যক্ষ হইয়া ঢাকায় আসিবার পূর্ব্বে; রাজবল্লভ সেই বিভাগে জমানবীশ ছিলেন। ১৭০৭ খৃষ্টাব্দে রাজবল্লভের জন্ম হওয়া ধরিয়া লইলে ২৭২৬ খৃঃ তাঁহার ১৯বৎসর বয়স হয়, এই সময় লতিবুল্লাই নায়েবনাজিম ছিলেন। স্থূল কথা এই যে রাজবল্লভ যে বয়সে রাজকার্য্যে প্রবেশ করেন তৎসম্বন্ধে উমাচরণ বাবু ঠিক না লিখিয়া নায়েব নাজিমের নাম গোল করিয়াছেন।

(১) উমাচরণ বাবুর প্রণীত পুস্তকে লিখিত আছে যে, যশোবন্তের অনুগ্রহেই; রাজবল্লভ পেস্কারী পদ লাভ করিয়াছিলেন। ষ্টুয়ার্ট সাহেবের ইতিহাস এবং রিয়াজু সেলাতিনে লিখিত আছে যে রাজবল্লভ মুরাদ আলির সময় ১৭৩৮খ্রীষ্টাব্দে জমানবিশের পদ হইতে পেস্কারী পদে উন্নীত হইয়াছিলেন—Stuarts Histry of Bengal Pages 267. 263. 308. Reazoo Salatin Pages 305.

কিন্তু তিনি দেখিয়া আশ্চর্য্যান্বিত হইলেন যে খানসামার কোনরূপ অনিষ্ট হইল না। তখন তিনি কুতূহলবশে কারণ জিজ্ঞাসা করিয়া জানিলেন যে রাজবল্লভের উপদেশে তৈল পান করিয়াই খানসামা বিপদ্ হইতে রক্ষা পাইয়াছে। নবাব ইতিপূর্ব্বেই রাজবল্লভের বিচক্ষণতার বিষয় শুনিয়াছিলেন, এখন তাহার প্রত্যক্ষ প্রমাণ পাইয়া তৎপ্রতি অধিকতর সন্তুষ্ট হইলেন। পরদিন রাজবল্লভ দরবারে আসিয়া অতি নিপুণতার সহিত নিকাসী কাগজ বুঝাইয়া দিলেন। নবাব এই ঘটনায় এত প্রীতি লাভ করিলেন যে অবিলম্বে রাজবল্লভকে উচ্চ রাজপদে নিযুক্ত করিতে বিস্মৃত হইলেন না।

জপসানিবাসী সুলেখক শ্রীযুক্ত আনন্দনাথ রায় বলেন, "তাঁহার পূর্ব্বপুরুষ কৃষ্ণরাম দেওয়ান এবং তদীয় ভ্রাতা রামমোহন কোরারীর সাহায্যে রাজবল্লভ নবাব সরকারে প্রবেশ করেন। রামমোহন ও কৃষ্ণরাম নবাবসরকারহইতে সম্মানসূচক যে পাঞ্জা পাইয়াছিলেন তাহা প্রদর্শন করিয়াই অবশেষে রাজবল্লভ উচ্চ রাজকার্য্য লাভ করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন।"

১২৯৫ সনের ১৯ আষাঢ় তারিখে লিখিত ঢাকাগেজেট নামক সাপ্তাহিক পত্রে রাজবল্লভসম্বন্ধে একটি প্রবন্ধ প্রকাশিত হইয়াছিল। সেই প্রবন্ধে লিখিত আছে "সোণারগাঁনিবাসী কৃষ্ণদেব রায় দিল্লীর দরবার হইতে রাজোপাধি ও রাজকীয় সনন্দ পাইয়াছিলেন। কৃষ্ণদেব লোকান্তর গমন করিলে সেই সনন্দ তদীয় উত্তর পুরুষগণের হস্তগত হয়। রাজবল্লভ যে সময় মুর্শিদাবাদের নেজামতে খাজাঞ্চির পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন, তৎকালে কৃষ্ণদেবের উত্তরপুরুষ জয়মাণিক্য রায়ের ভ্রাতুষ্পুত্র সেই সিরিস্তায় মহুরীর কার্য্য করিতেন। রাজবল্লভ রাজোপাধি লাভ করিবার উদ্দেশ্যে জয়মাণিক্য রায়ের ভ্রাতুষ্পুত্রদ্বারা কৃষ্ণদেবের রাজকীয়

হইতে রুদ্ধ রহিয়াছে এবং মুদী গাঢ় নিদ্রায় মগ্ন আছে। খানসামা অগত্যা মুদীকে জাগরিত করিবার উদ্দেশ্যে কবাটে সবলে আঘাত করিতে লাগিল। রাজবল্লভও সেই সময় নিদ্রা যাইতেছিলেন। আঘাতের শব্দে জাগরিত হইয়া তিনি ও মুদী উভয়েই দ্বার উন্মোচন করিলেন। খানসামা মুদীকে দেখিবামাত্রই একসের চূণ কিনিতে চাহিল। রাজবল্লভ পূর্ব্ব হইতেই খানসামাকে চিনিতেন। এই গভীর রজনীতে এত অধিক পরিমাণ চূণ ক্রয়ের প্রস্তাব তাহার নিকট অস্বাভাবিক বলিয়া বোধ হইল। সুতরাং তিনি খানসামাকে জিজ্ঞাসা করিয়া জানিলেন যে নবাবের আদেশ অনুসারেই সে ঐ পরিমাণ চূণ ক্রয় করিতে আসিয়াছে। রাজবল্লভ মনে করিলেন নিশ্চয়ই কোনও কারণে নবাব খানসামার উপর রুষ্ট হইয়াছেন এবং তাঁহাকে এই চূণ গলাধঃকরণ করাইয়া শিক্ষা দিবার উদ্দেশেই চূণ ক্রয় করিতে পাঠাইয়াছেন। সুতরাং রাজবল্লভ সেই খানসামাকে বলিলেন, এই চূণ তোমাকেই উদরসাৎ করিতে হইবে, অতএব জীবনের প্রতি মমতা থাকিলে প্রচুর পরিমাণে তৈল-পানে উদর পূর্ণ করিয়া নবাবের নিকট গমন করিও। খানসামা তদনুসারে দোকান হইতে প্রচুর পরিমাণ তৈল পান করিয়া উদর পূর্ণ করিল এবং আদিষ্ট চূণ লইয়া নবাবের সমীপস্থ হইল। খানসামা ইতিপূর্ব্বে নবাবের নিমিত্ত যে পান প্রস্তুত করিয়াছিল তাহাতে অসাবধানতা বশতঃ চূণের মত্রা অধিক দিয়াছিল এবং সেই পাণচর্ব্বণে নবাবের জিহ্বা পুড়িয়া গিয়াছিল। সুতরাং চূণের মাত্রাধিক্য কিরূপ সুস্বাদু তাহা বুঝাইবার নিমিত্ত নবাব খানসামা উপস্থিত হইলেই বলিলেন, এই সমস্ত চূণ এখনি তোমাকে গলাধঃকরণ করিতে হইবে। খানসামা দ্বিরুক্তি না করিয়া নবাবের আদেশ প্রতিপালন করিল। নবাব মনে করিয়াছিলেন চূণ খাওয়া শেষ হইলেই খানসামাকে পঞ্চত্ব পাইতে হইবে।

প্রতিভার অবতার রাজবল্লভের প্রতি চাহিয়া অত্যন্ত মুগ্ধ হইলেন এবং তাঁহাকে মাসিক ৫০৲ টাকা বেতনে জগৎশেঠের সিরিস্তার মহুরীপদে নিযুক্ত করিলেন।

"এই ঘটনার চারি কি পাঁচ বৎসর পর দিল্লী হইতে নবাবের প্রতি আদেশ হইল যে তাঁহাকে একসপ্তাহমধ্যে তেরলক্ষ টাকা সম্রাট্‌দরবারে পাঠাইতে হইবে। তৎকালে নবাবের খাদাঞ্চিখানায় উপযুক্ত পরিমাণ অর্থ সঞ্চিত ছিল না, সুতরাং এই আদেশে নবাব কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হইয়া পড়িলেন। পাঁচ দিনের চেষ্টায় পাঁচলক্ষ টাকা সংগৃহীত হইল এবং দুই দিবসের মধ্যে অবশিষ্ট আটলক্ষ টাকা কিরূপে সংগ্রহ করা যাইতে পারে তাহার ভাবনায় নবাব আকুল হইয়া উঠিলেন।

"এই সময় রাজবল্লভ কথাপ্রসঙ্গে জগৎশেঠকে বলিলেন একদিনের নিমিত্ত নবাবী তক্ত পাইলে আমি তেরলক্ষের তিন গুণ টাকা সংগ্রহ করিতে পারি। জগৎশেঠ সেই কথা নবাবের নিকট বলিলে নবাব পর-দিনই রাজবল্লভকে নবাবী তক্ত ছাড়িয়া দিলেন। রাজবল্লভ তক্তে বসিয়াই সর্ব্বপ্রথম জগৎশেঠকে দরবারে আনাইয়া বলিলেন "আপনি একঘণ্টার মধ্যে পাঁচলক্ষ টাকা না দিলে আপনাকে দুই মাস কারাদণ্ড ভোগ করিতে হইবে।" জগৎশেঠ অনন্যোপায় হইয়া নির্দ্দিষ্টসময়মধ্যে পাঁচ লক্ষ টাকা আনিয়া দিলেন। অতঃপর ভাগ্যমুদীর উপর চারি লক্ষ টাকা দিবার আদেশ প্রচারিত হইলে ভাগ্যমুদী বাঙ্‌নিষ্পত্তি না করিয়া চারি লক্ষ টাকা দরবারে উপস্থাপিত করিল। নগরে যে সমস্ত ধনবান্ লোক বাস করিত, পরে তাহাদের সম্বন্ধেও ঐরূপ কৌশল অবলম্বিত হইল এবং প্রত্যেকেই আদিষ্ট অর্থ প্রদান করিয়া অব্যাহতি লাভ করিল। এইরূপে সর্ব্বশুদ্ধ ছাব্বিশ লক্ষ টাকা সংগ্রহ করিয়া দিয়া রাজ-বল্লভ মধ্যাহ্নের পূর্ব্বেই জগৎশেঠের আলয়ে প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন।

সনন্দ সংগ্রহ করেন এবং নবাবের নিকট তাহা উপস্থিত করিয়া বলেন, সনন্দের লিখিত কৃষ্ণদেব রায়ই তাঁহার জনক। নবাব রাজবল্লভের প্রতারণা বুঝিতে অক্ষম হইয়া সেই সনন্দের অনুবলে রাজবল্লভকে রাজোপাধি প্রদান করেন।”

বরিশালনিবাসী পুরাণ ও বর্ষীয়ান্ মোক্তার শ্রীযুক্ত হরনাথঘোষ মহাশয় প্রচলিত গল্প সংগ্রহ করিয়া “বিবিধ গল্প” নামে একখানি পুস্তক প্রচারিত করিয়াছেন। সেই পুস্তকের একটি গল্পে লিখিত আছে “বিক্রম-পুরের অন্তর্গত মালখাঁনগরনিবাসী নরসিংহদাস বসু নবাব সরকারে কাননগুর কার্য্য করিতেন। একবার সাল তামামী দেওয়া উপলক্ষে তিনি রাজবল্লভকে সঙ্গে লইয়া মুর্শিদাবাদে গমন করিলেন। সেই সময় রাজবল্লভ অল্পবয়স্ক ছিলেন এবং কাননগুর সিরিস্তায় শিক্ষানবিসের কার্য্য করিতেন। যথাসময়ে নবাবদরবারে কাননগুর নিকাস পেশ হইলে নবাব তাহা দৃষ্টি করিয়া নিকাস লেখকের নাম জানিতে চাহিলেন। কাননগুর আদেশক্রমে রাজবল্লভই সেই নিকাস লিখিয়াছিলেন। নরসিংহ মনে করিলেন, বালসুলভচপলতাবশতঃ রাজবল্লভ নিকাস লিখিতে কোনরূপ ভ্রম করিয়াছে এবং তজ্জন্যই নবাব লেখকের নাম জানিতে চাহিতেছেন। এখন সত্যকথা বলিলে রাজবল্লভের অনিষ্ট হইতে পারে আশঙ্কা করিয়া নরসিংহ প্রশ্নের উত্তর দিতে কিয়ৎকাল ইতস্ততঃ করিলেন, অবশেষে সত্যকথা বলাই ভাল মনে করিয়া রাজ-বল্লভকে দেখাইয়া করজোড়ে নিবেদন করিলেন “জাহাপনা, এই বালকই আমার নিকাশ লিখিয়া দিয়াছে; নিকাশে কোন ভ্রম থাকিলে লেখকের অল্পবয়স্কতার প্রতি দৃষ্টি করিয়া অপরাধ মাপ করিতে আজ্ঞা হয়। ফলে নবাব নিকাশলেখকের লিপিকুশলতা দেখিয়াই নাম জানিতে চাহিয়াছিলেন। নরসিংহ বসুর কথা শেষ হইলে তিনি

যাইতে পারে না। লেখক তাহার উক্তিসম্বন্ধে কোন প্রমাণই উদ্ধৃত করেন নাই। রাজবল্লভের ন্যায় লোকের পক্ষে পিতার নাম পরিবর্ত্তন করা অতি অস্বাভাবিক ব্যাপার। বাঙ্গলাদেশ অধঃপাতে গিয়াছে সত্য; কিন্তু এই অধঃপাতিত বাঙ্গালী জাতির মধ্যে পিতার নাম পরিবর্ত্তন করিতে পারে এরূপ লোক এখনও অতি বিরল। নবাবী আমলে রাজোপাধি লাভ করিতে হইলে যে পূর্ব্ব পুরুষের সম্মানসূচক নিদর্শন পত্র প্রদর্শন করিতে হইত তাহার কোন বিশ্বাস যোগ্য প্রমাণ নাই। সেইরূপ কোন নিয়ম থাকিলে, দুর্ল্লভরামের পিতা জানকীরাম, পাটনার গবর্ণর রামনারায়ণ, পলাসীযুদ্ধের নায়ক মোহনলাল-প্রভৃতি কখনই রাজোপাধিতে ভূষিত হইতে পারিতেন না। ইহারা সকলেই জীবনের প্রারম্ভে অতি সামান্য অবস্থাপন্ন ছিলেন এবং ক্রমে প্রতিভাবলে উন্নত-পদবীতে আরোহণ করিয়া রাজা মহারাজপ্রভৃতি মহোচ্চ উপাধি লাভ করিয়াছিলেন। মুসলমানশাসনকালে অনেক নিম্নশ্রেণীস্থ হিন্দু যে উচ্চ রাজসম্মান লাভ করিয়াছেন, তাহার ভূরি ভূরি দৃষ্টান্ত বাঙ্গলার ইতিহাসে বিদ্যমান রহিয়াছে। অতএব রাজবল্লভের রাজোপাধি লাভ করিবার উদ্দেশ্যে কেন যে সুদূরবর্ত্তী সোণারগাঁর রাজসনন্দ সংগ্রহ করা আবশ্যক হইয়া পড়িয়াছিল, তাহার কোন কারণই দেখা যায় না। রাজবল্লভের জন্মস্থান রাজনগর হইতে জপসাগ্রাম অতি নিকটবর্ত্তী। রাজবল্লভের নিকটজ্ঞাতি জপসানিবাসী দেওয়ান কৃষ্ণরাম ও রামমোহন কোরারীর গৃহে রাজকীয় পাঞ্জা বিদ্যমান ছিল। আবশ্যক হইলে রাজবল্লভ জপসা হইতে পাঞ্জা সংগ্রহ না করিয়া কেন যে মেঘনাদ নদের তটস্থিত সুদূর-বর্ত্তী সোণারগাঁয়ে যাইবেন তাহার কারণ নির্দ্দেশ করা সহজ নহে। ফলে রাজবল্লভসম্বন্ধীয় অনেক বৃত্তান্তই পর্য্যালোচনার অভাবে লোক-সমাজে অবিদিত রহিয়াছে। প্রবন্ধলেখক সেই সুযোগ উপলক্ষ

পাঁচ লক্ষ টাকা দিতে হইয়াছে বলিয়া জগৎশেঠ অত্যন্ত মর্ম্মপীড়িত হইয়াছিলেন। সুতরাং রাজবল্লভকে দেখিয়াই তিনি অনুযোগ করিতে লাগিলেন ; রাজবল্লভ বলিলেন, আপনি নবাবের ধনাধ্যক্ষপদে প্রতিষ্ঠিত আছেন ; এ অবস্থায় আপনার নিকট হইতে টাকা আদায় না করিলে ন্যায়ের মর্য্যাদা লঙ্ঘন করা হইত। তের লক্ষের স্থলে আমি ছাব্বিশ লক্ষ টাকা সংগ্রহ করিয়া আসিয়াছি। এই সমস্ত টাকাই এখন আপনার ধনাগারে আসিবে। আপনি এই টাকা হইতে তের লক্ষ দিল্লীতে পাঠাইয়া সর্ব্বপ্রথম আপনার প্রদত্ত পাঁচ লক্ষ টাকা পরিশোধ করিবেন এবং অন্য যে যে ব্যক্তি হইতে টাকা সংগ্রহ করা হইয়াছে, ক্রমে তাহাদিগের পাওনা পরিশোধসম্বন্ধেও উপযুক্ত ব্যবস্থা করিতে বিস্মৃত হইবেন না।

"নবাব রাজবল্লভের কৌশলে উপস্থিত বিপদ হইতে মুক্ত হইয়া পুরস্কারস্বরূপ তাঁহাকে দেওয়ানীপদে নিযুক্ত করিলেন এবং সঙ্গে সঙ্গে রাজোপাধি প্রদানে রাজবল্লভের মর্য্যাদা বৃদ্ধি করিয়া দিলেন।"

শ্রীযুক্ত বাবু কৈলাসচন্দ্র সিংহ ১২৮৯ সনের বান্ধব পত্রিকায় লিখিয়াছেন "রাজবল্লভ প্রথমতঃ পৈত্রিক প্রভু বসুদিগের আশ্রয়ে থাকিয়া পারস্যভাষা শিক্ষা করেন, তৎপর তিনি মুরসিদাবাদে যাইয়া জগৎশেঠের সরকারে এক মোহরের কার্য্যে নিযুক্ত হন এবং পরে সুযোগক্রমে নবাব সরকারে প্রবেশলাভ করেন। ১৬৫১ শকাব্দে মুরাদ আলি ঢাকার নবাব হইয়া প্রেরিত হন, সেই সময় রাজবল্লভ তাঁহার সহিত নাওয়ার মহালের পেস্কার হইয়া আসেন।" *

ঢাকা গেজেটের লিখিত বৃত্তান্তে অণুমাত্রও আস্থা স্থাপন করা

---

* ১২৮৯ সনের বান্ধব ৭৬ পৃঃ।

পদে প্রতিষ্ঠিত ছিলেন। কিন্তু "বিবিধগল্পে" লিখিত আছে ছাব্বিশলক্ষ টাকা সংগ্রহের সময় রাজবল্লভ জগৎশেঠের সিরিস্তায় মোহরীগিরী কার্য্য করিতেন। বোধ হয় উমাচরণ বাবুর লিখিত বৃত্তান্ত অবলম্বন করিয়াই কিয়ৎপরিমাণ অলঙ্কার সংযোগে হরনাথ বাবুর প্রকাশিত গল্প বিরচিত হইয়াছে। ফলে নরসিংহদাস বসু নামে মালখাঁনগরবসুবংশে কোনও ব্যক্তিরই অস্তিত্ব ছিল না।

কৈলাসবাবু যাহা লিখিয়াছেন তাহা যে "বিবিধগল্পের" লিখিত গল্পকে ভিত্তিস্বরূপ অবলম্বন করিয়া বিরচিত হইয়াছে, সে বিষয়ে সন্দেহ-মাত্রই নাই। অবশ্য "বিবিধগল্প" নামক পুস্তক কৈলাসবাবুর লিখিত প্রবন্ধের অনেক পরে প্রচারিত হইয়াছে। কিন্তু হরনাথবাবু বলেন তিনি যে সমস্ত গল্প প্রকাশ করিয়াছেন তাহা বাল্যকাল হইতেই তিনি শুনিতেছেন। অতএব কৈলাসবাবু যে সেই গল্প শুনিয়াই প্রবন্ধের খসড়া করিয়াছেন তাহা সহজেই অনুমেয়। ষ্টুয়ার্টসাহেবপ্রণীত বাঙ্গলার ইতিহাস এবং রিয়াজুসেলাতিনে স্পষ্ট লিখিত আছে, ১৭৩৪ খ্রীষ্টাব্দে মুরাদআলি নাওয়ার বিভাগের অধ্যক্ষপদ পাইয়া ঢাকায় আসিবার পূর্ব্ব হইতেই রাজবল্লভ ঢাকা নগরীতে সেই বিভাগের জমানবীসের-পদে নিযুক্ত ছিলেন। কৈলাসবাবু স্বীয় উক্তিসমর্থনোদ্দেশে কোন প্রমাণ উদ্ধৃত করেন নাই। অতএব কৈলাসবাবুর কথা বিশ্বাস করিবার উপায় কি আছে?

শ্রীযুক্ত আনন্দনাথ রায় যাহা লিখিয়াছেন, তৎসম্বন্ধে কিংবদন্তী শুনিতে পাওয়া যায় সন্দেহ নাই। রাজবল্লভের অভ্যুদয়ের সময় তিনি বর্ষে বর্ষে রামমোহন কোরারীর বাটীতে ভেট প্রেরণ করিতেন বলিয়া অনেকেই বলেন। পক্ষান্তরে কৃষ্ণরামদেওয়ানসম্বন্ধে রাজবল্লভ যে এরূপ কোনও কৃতজ্ঞতার চিহ্ন প্রদর্শন করিয়াছেন তাহা কেহই বলে না।

করিয়াই কৃষ্ণদেবরায়ের মর্য্যাদা বৃদ্ধি করিবার আশায় একটি আজগুবী গল্পের অবতারণা করিয়াছেন।

"বিবিধ গল্প" প্রণেতা খানসামাসংক্রান্ত কিংবদন্তী উদ্ধৃত করেন নাই সত্য; কিন্তু তিনি সেই গল্প অনেকের নিকট মুখে মুখে বলিয়াছেন। উমাচরণ বাবু লিখিয়াছেন "একদা আলিবর্দ্দীখাঁ রায়রাইয়ার নিকট সাতলক্ষ টাকা চাহিলে, তিনি বলিলেন জগৎশেঠের তহবিলে এখন টাকা নাই, সুতরাং আদিষ্ট অর্থ কোনক্রমেই সংগ্রহ করা যাইতে পারে না। নবাব এই ঘটনায় অত্যন্ত অসন্তুষ্ট হইয়া দেওয়ান নিবাইস মহম্মকে ডাকাইলেন, নিবাইস আসিয়া বলিলেন রাজবল্লভের প্রতি আদেশ প্রদান করিলে সে কোন কৌশলে টাকা সংগ্রহ করিতে পারিবে। তদনুসারে রাজবল্লভের উপর টাকা সংগ্রহের ভার অর্পিত হইল। রাজবল্লভ কৌশলক্রমে ভয় ও অভয় দেখাইয়া সমগ্র সাতলক্ষ টাকা জগৎশেঠের গোমস্তা হইতে সংগ্রহ করিলেন। এই ঘটনায় নবাব প্রীত হইয়া রাজবল্লভকে মহারাজ-উপাধি-প্রদানপূর্ব্বক শাসনকর্তৃত্বে নিযুক্ত করিলেন।"*

উমাচরণ বাবুর প্রণীত জীবনীতে লিখিত আছে যে সময় রাজবল্লভ সাত লক্ষ টাকা সংগ্রহ করিয়া দিয়াছিলেন, তৎকালে তিনি দেওয়ানী

---

* সায়র মোতাক্ষরীণে লিখিত আছে, সিরাজউদ্দৌলার পিতা জয়নদ্দিনহসেন আফগানসেনাকর্ত্তৃক নিহত হইলে আলিবর্দ্দী তাহাদের হস্ত হইতে পাটনানগরী উদ্ধার করিতে কৃতসংকল্প হয়েন। তৎকালে রাজকোষে এমন অর্থ ছিল না যে তদ্দ্বারা উপযুক্ত সেনা সংগ্রহ করা যাইতে পারে। এই সময় নিবাইসমহম্মদ, ঘেসেটিবেগম, জগৎশেঠ এবং মুর্শিদাবাদের প্রায় সমস্ত ধনবান্ ব্যক্তি আলিবর্দ্দীকে এত অর্থ সাহায্য করেন যে তদ্দ্বারা আবশ্যক ব্যয় নির্ব্বাহিত হইয়াও প্রচুর টাকা উদ্বৃত্ত থাকে।—Sair Vol 2 pages 46.

তৃতীয় অধ্যায়

প্রথম পরিচ্ছেদ

আলিবর্দ্দিখাঁ

রাজবল্লভ নাওয়ার বিভাগের অধ্যক্ষপদে উন্নীত হওয়ার অল্পকাল পরেই বাঙ্গলার রাজনৈতিক জগতে এক ঘোরতর বিপ্লব উপস্থিত হইল। সেই বিপ্লবতরঙ্গাঘাতে সরফরাজখাঁ সিংহাসন হইতে বিচ্যুত হইয়া প্রাণ বিসর্জ্জন করিলেন এবং আলিবর্দ্দীখাঁ বাঙ্গলার সিংহাসন অধিকার করিয়া তথায় সুদৃঢ় হইয়া বসিলেন। নিম্নে তৎসম্বন্ধীয় স্থূল স্থূল ঘটনা বিবৃত করা গেল।

পূর্ব্বে বলা হইয়াছে, মুর্শিদকুলীর পর সুজাখাঁ বাঙ্গলার সিংহাসনে অধিরোহণ করেন। তিনি অতি সদাশয় পুরুষ ছিলেন। মুর্শিদকুলীর শাসনকালে যে সমস্ত জমিদার "বৈকুণ্ঠে"(?) বাস করিতেছিলেন, সুজাখাঁ তাঁহাদিগকে মূল্যবান্ খিলাতসহ মুক্তি প্রদান করিয়া সৌজন্য প্রদর্শন করিলেন। এই সময় এক সচিবসমাজ গঠিত হইল এবং আলিবর্দ্দীখাঁ, হাজিআহামদ, রায়রায়ান আলামচাঁদ ও জগৎশেঠ ফতেচাঁদ সেই সভার সদস্যপদ লাভ করিলেন। শাসনসংক্রান্ত কোন সমস্যা উপস্থিত হইলে সচিবসমাজে তাহার মীমাংসা হইতে লাগিল। কিন্তু

উমাচরণবাবুর পুস্তকে রামমোহন কোরারী এবং দেবিদাসবস্থ রাজ-বল্লভকে নবাব সরকারে প্রবেশবিষয়ে সাহায্য করার কথা লিখিত আছে। পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে যে রাজোপাধি লাভ করিতে হইলে নবাবী আমলে যে পূর্ব্ব পুরুষের গৌরবস্থচক নিদর্শনপত্রের প্রদর্শন করিতেই হইত তাহার কোন প্রমাণ নাই। অতএব জপসাহইতে রাজবল্লভ কোন পাঞ্জা নিয়া রাজোপাধি লাভ করিয়াছিলেন কিনা তাহা নির্ণয় করা স্থকঠিন।

খানসামা-সংক্রান্ত যে কিংবদন্তীর কথা উল্লেখ করা হইল, তাহার মূলে সত্য নিহিত থাকিলে সেই ঘটনা সরফরাজ খাঁর আমলে হওয়াই সম্ভবপর। পূর্ব্বে বর্ণিত হইয়াছে, সরফরাজের সময়ই রাজবল্লভ নাওয়ার বিভাগের অধ্যক্ষপদে বরিত হইয়াছিলেন। উমাচরণবাবুর মতে নবাব আলিবর্দ্দীর আমলেই রাজবল্লভ রাজোপাধি লাভ করিয়াছিলেন। নবাব আলিবর্দ্দি যেরূপ ধীরপ্রকৃতিসম্পন্ন ছিলেন, তাহাতে তিনি যে তুচ্ছ চূণাধিক্যের নিমিত্ত খানসামার প্রাণসংহারে উদ্যত হইবেন ইহা বিশ্বাস করিতে আদৌ প্রবৃত্তি হয় না।

"বিধাতার নির্ব্বন্ধে আমাকে এমন একটি ঘোটকী পোষণ করিতে হইতেছে যে সদা সর্ব্বদাই তাহার ক্ষুধা-নিবৃত্তি-কল্পে বিব্রত থাকিতে হয়।" এই ঘোটকী যে নবাবের রমণীসঙ্গলিপ্সা ভিন্ন আর কিছুই নহে তাহা বলা বাহুল্য মাত্র।

যে সময় সুজাখাঁ উড়িষ্যা প্রদেশের নবাবনাজিমীপদে নিযুক্ত ছিলেন সেই সময় মিরজামহম্মদ নামে জনৈক সম্ভ্রান্ত মুসলমান তাঁহার সভায় আগমন করেন। মিরজামহম্মদ সুজাখাঁর দূরসম্পর্কীয়া কোন মহিলার পাণিগ্রহণ করিয়াছিলেন এবং সেই মহিলার গর্ব্ভে হাজি আহাম্মদ ও মিরজা মহম্মদআলি নামে মির্জা মহম্মদের দুইটি পুত্র জন্মিয়াছিল। মির্জা মহম্মদ আজিমওশানের অধীন কোন এক কার্য্যে নিযুক্ত ছিলেন। আজিমওশানের মৃত্যুর পর তাঁহার দুরবস্থার পরিসীমা রহিল না এবং দুর্ভাগ্যের তাড়না সহ্য করিতে অক্ষম হইয়া তিনি অবশেষে উড়িষ্যায় আসিয়া সুজাখাঁর আশ্রয় গ্রহণ করিলেন। মহানুভব সুজা খাঁ কৃপা করিয়া এই দরিদ্র আত্মীয়কে একটি রাজকীয় পদে নিযুক্ত করিলেন এবং তাহার ফলে মিরজা মহম্মদের অর্থাভাব বিদূরিত হইল। কিয়ৎ-কাল পরে মির্জা মহম্মদ আলিও পিতার পদাঙ্ক অনুসরণ করিয়া তথায় আসিয়া উপস্থিত হইলেন। এই যুবক অতিশয় তীক্ষ্ণবুদ্ধিসম্পন্ন এবং সাহসী ছিলেন। ক্রমে শাসনসংক্রান্ত কার্য্যে ও রণনৈপুণ্যে তাঁহার এতদূর দক্ষতা প্রকাশ পাইল যে তিনি অল্পকালমধ্যেই সুজাখাঁর বিশেষ প্রিয়পাত্র হইয়া উঠিলেন। সুজাখাঁর অনুগ্রহে ক্রমেই তাঁহার পদোন্নতি হইতে লাগিল; অবশেষে সুজাখাঁর অধীন যে সমস্ত রাজপদ ছিল তিনি তন্মধ্যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠপদ লাভ করিলেন। মহম্মদআলি এইরূপ সুদৃঢ় হইয়া জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা হাজিআহম্মদকে উড়িষ্যায় আসিবার জন্য লিখিয়া পাঠাইলেন। হাজি আহাম্মদ তৎকালে সাহজানাবাদে অবস্থান করিতে-

বিচারকার্য্যে সেই সভার কোনরূপ সংস্রব রহিল না। সুজাখাঁ স্বয়ং অর্থী ও প্রত্যর্থীর আবেদননিবেদন স্বকর্ণে শুনিয়া ন্যায়পরতাসহকারে প্রত্যেকের অভিযোগ নিষ্পত্তি করিতে লাগিলেন।*

সুজাখাঁ অতিশয় আড়ম্বরপ্রিয় ছিলেন। মুর্শিদকুলীর নবাবী আমলের বহুসংখ্যক প্রাসাদ এই সময় ভূমিসাৎ করা হইল। এবং তৎস্থলে সুপ্রশস্ত নূতন নূতন এমারত নির্ম্মিত হইয়া মুর্শিদাবাদ নগরের সৌন্দর্য্য বৃদ্ধি করিল। পূর্ব্বে যে ক্ষুদ্র ও অপ্রশস্ত তোরণ ছিল, তাহার চিহ্ন পর্য্যন্ত বিলুপ্ত হইয়াগেল। নূতন নবাবের প্রযত্নে এখন সেই স্থলে সুবিশাল ও রমণীয় তোরণদ্বার শোভা পাইতে লাগিল। পুরাতন দেওয়ানখানা, চেহেলস্তুন, খিলাতখানা, অন্দরমহল, জৌলসখানা, খালিসা কাছারী এবং ফরমানবাড়ী-প্রভৃতি সমস্তই ভূমিসাৎ করিয়া সুজাখাঁ সুনিপুণ শিল্পীর সহায়তায় সুন্দর সুন্দর নূতন প্রাসাদসমূহ নির্ম্মাণ করাইয়া সুরুচির পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করিলেন। ফলে, এখন বহুসংখ্যক রমণীয় অট্টালিকার সমবায়ে মুর্শিদাবাদনগরী অপূর্ব্ব শ্রী-ধারণ করিয়া অমরাবতীর ন্যায় প্রতীয়মান হইতে লাগিল। †

কিন্তু প্রজারঞ্জনে সুনাম সত্ত্বেও নৈতিকচরিত্রবিষয়ে সুজাখাঁর তাদৃশ যশঃ ছিল না। চরিত্রহীনতার নিমিত্তই সরফরাজজননী সাধ্বী জিন্নতন্নেছা স্বামীকে সমুচিত শ্রদ্ধা করিতে পারিতেন না। ক্রমাগত চারিঘণ্টাকালও রমণীসঙ্গ ব্যতীত অবস্থান করা তাঁহার পক্ষে কষ্টসাধ্য ছিল। দরবারে বসিয়া তিনি অনেক সময় হঠাৎ উঠিয়া যাইতেন ও প্রায় অর্দ্ধঘণ্টাকাল যবনিকার অন্তরালে অবস্থান করিয়া ফিরিয়া আসিতেন এবং আসিয়া ক্ষমা প্রার্থনার ছলে সভাসদ্‌গণকে বলিতেন

---

* Sair vol 1 Page 279.

† Reazoo Salatin 290.

সিংহাসন লাভ করিতে পারেন তদ্বিষয়ে পরামর্শ জিজ্ঞাসা করিলেন। তাঁহারা জনৈক বুদ্ধিমান্ ও বাকপটু আত্মীয়ের নাম উল্লেখ করিয়া বলিলেন এই লোকটিকে প্রতিনিধিস্বরূপ সম্রাট্‌দরবারে প্রেরণ করিলে সংকল্প সিদ্ধ হওয়ার বিলক্ষণ সম্ভাবনা আছে। সুজাখাঁ সেই প্রস্তাবে সম্মত হইলে হাজিআহাম্মদ ও মহম্মদআলি পরামর্শ করিয়া সম্রাট্ ও তদীয় প্রধান প্রধান অমাত্য ও সভাসদ্‌গণের ববাররে কয়েকখানা আবেদন পত্র অতি সুন্দর ভাষায় রচনা করিয়া দিলেন। পূর্ব্বোক্ত আত্মীয় সেই সমস্ত আবেদন পত্র লইয়া সম্রাট্‌দরবারে প্রেরিত হইলেন। এদিকে সেই ভ্রাতৃযুগলের পরামর্শে সুজাখাঁ বহুসংখ্যক বিশ্বস্ত সৈনিককে ছদ্মবেশে মুর্শিদাবাদের প্রাসাদের সন্নিকটে অবস্থান করিবার উপদেশ দিয়া পাঠাইয়া দিলেন। প্রত্যহ উড়িষ্যা হইতে যে আদেশ আসিতে লাগিল তাহা সেই সমস্ত ছদ্মবেশধারী সেনাগণ প্রতিপালন করিতে পরাঙ্মুখ হইল না। যে সময় মুর্শিদকুলী মৃত্যুশয্যায় শয়ান ছিলেন তৎকালে বর্ষার সমাগম হইয়াছিল। সুজাখাঁ এখন মুর্শিদকুলীর মৃত্যুর অব্যবহিত পরেই মুর্শিদাবাদে উপস্থিত হইবার উদ্দেশ্যে বহুসংখক নৌকা সংগ্রহ করিয়া কটক হইতে মুর্শিদাবাদ পয্যন্ত গমনাগমনের সুবন্দোবস্ত করিলেন। বলা বাহুল্য যে এই সমস্ত উপায় অবলম্বনের ফলেই সুজাখাঁ মুর্শিদকুলীর মৃত্যু অতি সন্নিকট জানিতে পারিয়া মুর্শিদকুলীর মৃত্যুর পাঁচ কি ছয়দিন পুর্ব্বে কটক হইতে মুর্শিদাবাদে রওনা হইতে এবং রাজকীয় সনন্দ সংগ্রহ করিয়া বিনা রক্তপাতে বাঙ্গলার সিংহাসনে অধিরোহণ করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন।*

সুজাখাঁ সিংহাসনে আরোহণ করিলে সরফরাজখাঁ বাঙ্গলার দেওয়ানী

* Sari vol. 1 Page 277.

ছিলেন, ভ্রাতার পত্র পাইয়া তিনি স্ত্রীপুত্রসহকারে উড়িষ্যায় আগমন করিলেন। হাজি আহাম্মদও অত্যন্ত কার্য্যক্ষম লোক ছিলেন; সুতরাং কার্য্যকুশলতা প্রদর্শন করিয়া তিনিও অতি শীঘ্র সুজাখাঁর প্রীতি আকর্ষণ করিতে সমর্থ হইলেন। ফলে, সেই উভয় ভ্রাতার উপর সুজা-খাঁর এরূপ প্রগাঢ় শ্রদ্ধা জন্মিল যে শাসনসংক্রান্ত প্রায় সমস্ত কার্য্যভারই তাঁহাদের হস্তে অর্পণ করিয়া তিনি নিশ্চিন্তমনে অবস্থান করিতে লাগিলেন।*

মুর্শিদকুলীর মৃত্যুর অনেক পূর্ব্বে হইতেই সুজাখাঁ মুর্শিদাবাদের নবাবীপদে অভিষিক্ত হইবার সংকল্প করিয়াছিলেন। মুর্শিদকুলী দৌহিত্র সরফরাজকে উত্তরাধিকারী মনোনীত করিলে সুজাখাঁ মহম্মদ আলি ও হাজিআহম্মদকে ডাকিয়া কি উপায়ে তিনি মুর্শিদাবাদের

---

* Sair vol 1 Page 275, 276.

কিন্তু রিয়াজু সেলাতিনে লিখিত আছে "মিরজামহম্মদ সম্রাট্ আরঙ্গজেবের পুত্র আজিমওশানের পানপাত্র বাহক ছিলেন। মিরজামহম্মদ পরলোক গমন করিলে তাঁহার জ্যেষ্ঠপুত্র হাজিআহাম্মদ সেই পদ লাভ করেন। যুদ্ধে আজিমওশান নিহত হইলে হাজিআহাম্মদ ও তাহার কনিষ্ঠ ভ্রাতা মিরজাবান্দি (মিরজামহম্মদ আলি) রাজধানীপরিত্যাগপূর্ব্বক দক্ষিণাপথে গমন করেন এবং তথা হইতে উড়িষ্যায় আসিয়া সুজাখাঁর অধীন রাজকার্য্যে নিযুক্ত হন। ভ্রাতৃযুগল সাতিশয় কৌশলী ছিলেন। তাঁহারা চাটুবাক্যদ্বারা সুজাখাঁর মনোরঞ্জন করিয়া ক্রমে সুজাখাঁর প্রিয়পাত্র হইয়া উঠেন। সুজাখাঁ নবাবীপদে অভিষিক্ত হইলে হাজিআহাম্মদ নেজামতের প্রধান অমাত্যপদে ও মিরজাবান্দি রাজমহলের ফৌজদারপদে নিযুক্ত হন। এই সময়েই মিরজাবান্দির আলিবর্দ্দী খাঁ উপাধি লাভ হয়।"—Riazoo Salatin Pages 293,294.

আর্ম্ম সাহেবের মতে হাজিআহাম্মদ সামান্য ভৃত্যরূপে ও মহম্মদআলি অশ্বারোহি সেনার পরিচারকরূপে সুজাখাঁর সরকারে প্রবেশ লাভ করিয়া ক্রমে উন্নত পদবীতে আরোহণ করিয়াছিলেন।—Ormes Indooston Vol 2 pages 27.

একখানা তরবারি এবং কিয়ৎপরিমাণ ধনরত্ন উপঢৌকনস্বরূপ দিতে বিস্মৃত হইলেন না।*

আলিবর্দ্দী বেহারের শাসনকর্ত্তৃত্ব লাভ করিবার অল্প কয়েকদিন পূর্ব্বে কনিষ্ঠা তনয়া আমনা মহম্মদ আলি নামে একটি পুত্র প্রসব করিয়াছিলেন। আলিবর্দ্দী মনে করিলেন এই নবজাত কুমারই তাঁহার উপস্থিত সৌভাগ্যের মূলীভূত কারণ। সুতরাং তিনি এই শিশুটির প্রতি অতিশয় স্নেহবান্ হইয়া পড়িলেন এবং তাহাকে পোষ্যপুত্ররূপে গ্রহণ করিয়া লালনপালন করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। কালে সেই বালকই বাঙ্গলার ইতিহাসে সিরাজউদ্দৌলা নামে প্রসিদ্ধি লাভ করিল।†

১৭৩৯ খ্রীষ্টাব্দে সুজাখাঁ লোকান্তরিত হইলে সরফরাজখাঁ সিংহাসনে আরোহণ করিলেন। মুসলমানধর্ম্মে সরফরাজের প্রগাঢ় নিষ্ঠা ছিল। তিনি প্রত্যহ নিয়মিতরূপে নেমাজ পাঠ করিতেন। কোরাণের মর্ম্মানুসারে যে যে পর্ব্বাহে যে যে অনুষ্ঠান করিতে হয়, সরফরাজ তাহা সমস্ত

---

* সায়র মতাক্ষরীণপাঠে অবগত হওয়া যায় যে হিজরি ১১৪০ সনের পাঁচ বৎসর পরে অর্থাৎ হিজরি ১১৪৫ সনে আলিবর্দ্দী বেহারের শাসনকর্ত্তৃত্ব লাভ করেন।—(Sair Vol 1 Pages 272 to 282). সায়র মোতাক্ষরীণে বর্ণিত হইয়াছে যে হিজরি ১১৭০ সনে পলাসীর যুদ্ধ হইয়াছে। (Sair Vol 2 pages 240)। ১৭৫৭ খৃষ্টাব্দে যে সেই যুদ্ধ সংঘটিত হইয়াছিল তৎসম্বন্ধে মতভেদ নাই। অতএব এই হিসাবে হিজরি অব্দ হইতে খৃষ্টাব্দ ৫৮৭ বৎসর অগ্রবর্ত্তী হইয়া দাঁড়ায়। সুতরাং সায়র মোতাক্ষরীণ অনুসারে ১৭৩২ খৃষ্টাব্দেই আলিবর্দ্দী বেহারের শাসন কর্ত্তৃত্ব লাভ করেন।

কিন্তু অর্ম্মসাহেব বলেন ১৭২৯ খৃষ্টাব্দে আলিবর্দ্দী সেই পদে নিযুক্ত হইয়াছিলেন।—Orme's Indooston vol 4 pages 28.

† Sair vol 1 pages 282.

পদে, মহম্মদ তকী উড়িষ্যার শাসনকর্তৃত্বে, রাজজামাতা দ্বিতীয় মুর্শিদ-কুলী ঢাকার নায়েবীপদে ও মহম্মদআলি এবং হাজি আহাম্মদ সচিবের পদে নিযুক্ত হইলেন। মহম্মদ আলির কোন পুত্র সন্তান জন্মিয়াছিল না। ঘেসেটি, যোষিতী এবং আমনা নামে তাঁহার তিনটি মাত্র কন্যা ছিল। জ্যেষ্ঠা ঘেসেটি হাজিআহাম্মদের জ্যেষ্ঠ পুত্র নিবাইস আহাম্মদের সহিত মধ্যমা যোষিতী হাজিআহাম্মদের মধ্যম পুত্র সৈয়দ আহাম্মদের সহিত এবং কনিষ্ঠা আমনা হাজিআহাম্মদের কনিষ্ঠ পুত্র জয়নদ্দিন আহাম্মদের সহিত পরিণয়সূত্রে আবদ্ধ হইয়াছিলেন। মহানুভব সুজাখাঁ নবাব-তক্ত লাভ করিয়া নিবাইসকে সমরবিভাগের বকসির পদে, সৈয়দআহম্মদ ও জয়নদ্দিনকে যথাক্রমে রঙ্গপুর ও রাজমহলের ফৌজদারপদে নিযুক্ত করিলেন।

এ পর্য্যন্ত বিহার প্রদেশ বাঙ্গলার নবাবের শাসনাধীন ছিল না। যে সময় সুজাখাঁ বাঙ্গলার সিংহাসনে আরোহণ করেন তৎকালে ফকরু-উদ্দৌল্লা নামে জনৈক মুসলমান বেহারের শাসনদণ্ড পরিচালনা করিতে-ছিলেন। কিন্তু তিনি যে কেবল নিরক্ষর ছিলেন এমন নহে, শাসন-সংক্রান্ত কার্য্যেও তাঁহার কোনরূপ পটুতা ছিল না। সম্রাট্ মহম্মদসাহ এই শাসনকর্ত্তার অযোগ্যতায় অসন্তুষ্ট হইয়া তাঁহাকে কার্য্যহইতে অপসৃত করিলেন এবং বিহার প্রদেশ বাঙ্গলার নবাবের শাসনাধীন করিয়া দিলেন। কাহার উপর শাসনভার অর্পণ করিলে বিহারের সুবন্দোবস্ত হইতে পারে এখন তাহাই সমস্যা হইয়া দাঁড়াইল। অবশেষে সুজাখাঁ স্থির করিলেন যে আলিবর্দ্দী ব্যতীত অন্য কেহ এইরূপ একটি দায়িত্বপূর্ণ কার্য্য সুসম্পন্ন করিতে সমর্থ হইবে না। সুতরাং আলিবর্দ্দীই এই পদে নিযুক্ত হইলেন। স্বয়ং জিন্নতন্নেসা স্বহস্তে আলিবর্দ্দীকে নিয়োগ-পত্র প্রদান করিয়া তাঁহার গৌরব বৃদ্ধি করিলেন এবং নবাবও তাঁহাকে একটি হস্তী,

হইল। অবশেষে নিকাশ উপস্থিত করিবার নিমিত্ত আলিবর্দ্দীও নবাব দরবার হইতে আদেশ লাভ করিলেন। এই সমস্ত ঘটনায় হাজিআহাম্মদের পক্ষে ধৈর্য্য রক্ষা করা কঠিন হইয়া দাঁড়াইল এবং তিনি সরফরাজের অত্যাচার কাহিনী অতিরঞ্জিতভাবে লিখিয়া ভ্রাতার নিকট পাঠাইয়া দিলেন। তদনুসারে আলিবর্দ্দী গোপনে সেনা সংগ্রহ করিয়া সরফরাজের বিরুদ্ধে অভিযান করিবার নিমিত্ত উদ্যোগ করিতে প্রবৃত্ত হইলেন।*

সরফরাজ যে দিল্লীর দরবার হইতে বাঙ্গলা, বিহার ও উড়িষ্যার শাসনকর্ত্তৃত্বে নিযুক্ত হইয়াছিলেন তাহা আলিবর্দ্দী বিলক্ষণরূপে অবগত ছিলেন। তিনি মনে করিলেন সম্রাটের অনুজ্ঞা ব্যতীত সরফরাজের বিরুদ্ধে অভিযান করিলে তাঁহাকে রাজদ্রোহ অপরাধে অভিযুক্ত হইয়া ভবিষ্যতে বিপন্ন হইতে হইবে। সুতরাং তিনি সর্ব্বাগ্রে দিল্লী হইতে শাসনকর্ত্তৃত্বের সনন্দ সংগ্রহ করিবার সংকল্প করিলেন। তৎকালে ইশাখখাঁ নামে আলিবর্দ্দীর জনৈক আত্মীয় সম্রাটের সভাসদ্‌পদে নিযুক্ত

---

* Sair vol 1 pages 327 & 328.

কিন্তু রিয়াজু সেলাতিনে লিখিত আছে "সুজাখাঁর মৃত্যুকালীন আদেশ প্রতিপালন করিয়া সরফরাজখাঁ হাজিআহাম্মদ প্রমুখ প্রবীণকর্ম্মচারিগণকে স্ব স্ব পদে প্রতিষ্ঠিতই রাখিয়াছিলেন। কিন্তু হাজিআহাম্মদ, জগৎশেঠ ফতেচাঁদ এবং রায়রায়ান আলামচাঁদ পূর্ব্ব আমল অপেক্ষা অধিকতর প্রভুত্ব পরিচালনা করিবার উদ্দেশে সরফরাজের পার্শ্বচর ও কর্ম্মচারিগণকে নানাউপায়ে অপ্রতিভ করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। ফলে এই সচিবত্রয়ের কৌশলে সরফরাজ ইচ্ছা করিলেও তাঁহার পার্শ্বচর ও কর্ম্মচারিগণের কোনরূপ উপকার করিতে সমর্থ হইলেন না। অবশেষে হাজিমহম্মদ, ফতেচাঁদ ও আলামচাঁদ গোপনে পরামর্শ করিয়া স্থির করিলেন যে আলিবর্দ্দী নবাবের সহিত সাক্ষাৎ করিবার ছলে সসৈন্যে মুর্শিদাবাদে উপস্থিত হইবেন, এবং যুদ্ধে সরফরাজকে পরাভূত করিয়া দিয়া সিংহাসন অধিকার করিবেন।—Riazoo-Salatin pages 308,

রীতিমতে সম্পাদন করিতে কখনও বিস্মৃত হইতেন না। রমজানের সময় তিনি উপবাসে কাটাইতেন এবং এতদ্ভিন্ন প্রতিবৎসর আরো তিন মাস অনশনে থাকিয়া ধর্ম্মানুরাগ প্রদর্শন করিতেন। সংসারবিরাগী ফকিরের পক্ষে পূর্ব্বোক্ত নিয়মনিষ্ঠা প্রশংসনীয় হইতে পারে; কিন্তু বাঙ্গলার নবাবের পক্ষে সেই সমস্ত বিধান নিয়মিতরূপে প্রতিপালন করিতে হইলে শাসনকার্য্য সুচারুরূপে নির্ব্বাহিত হইতে পারে না। ফলে হাজিলোৎফেআলি, মর্দ্দান আলিখাঁ মীরমর্ত্তুজা প্রভৃতির উপর বাঙ্গলা শাসনের গুরুভার ন্যস্ত হইল এবং সরফরাজখাঁ কেবল ধর্ম্মানুষ্ঠান লইয়াই ব্যস্ত রহিলেন।

পরলোকগত নবাবের প্রধান প্রধান কর্ম্মচারী, রায়রায়ান আলামচাঁদ জগৎশেঠ ফতেচাঁদ এবং সচিবপ্রবর হাজিআহাম্মদ স্ব স্ব পদে প্রতিষ্ঠিত থাকিলেও তাঁহাদের আর পূর্ব্বের ন্যায় প্রভুত্ব রহিল না। নবাবের প্রিয়পাত্র হাজিলোৎফেআলিপ্রমুখ নবীনকর্ম্মচারিগণ ঠাট্টাবিদ্রূপ করিয়া সেই সমস্ত প্রবীণ কর্ম্মচারিগণের মনে আঘাত দিতে লাগিল। সুজাখাঁর সময় হাজিআহাম্মদ তাঁহাকে সুন্দরী সুন্দরী রমণী সংগ্রহ করিয়া দিতেন। সেই ছল করিয়া সরফরাজখাঁ এখন হাজিআহাম্মদকে "কুটনী" উপাধি প্রদান করিলেন। কয়েকদিনমধ্যে হাজিমহম্মদ রাজকার্য্য হইতে অপসৃত হইলেন এবং মর্ত্তুজা সাহেব তাঁহার পদ লাভ করিলেন। সৈযদ আহাম্মদের জামাতা আতাউল্লা এতদিন রাজমহলের ফৌজদারপদে নিযুক্ত ছিলেন, তাঁহাকেও এখন সেই কার্য্য ইস্তাফা দিতে হইল। সৈয়দ আহাম্মদ ও জয়নদ্দিনকে কারারুদ্ধ করিবার নিমিত্ত গোপনে ষড়্‌যন্ত্র চলিতে লাগিল। সুজাখাঁর আমলে যে সমস্ত রাজকীয়সেনা আজিমাবাদে আলিবর্দ্দীর অনুগমন করিয়াছিল, তাহাদিগের উপর মুর্শিদাবাদে প্রত্যাগমন করিবার নিমিত্ত আদেশ প্রচারিত

সরফরাজ এই সমস্ত ষড়্‌যন্ত্রের বিষয় অণুমাত্রও অবগত ছিলেন না। ইতিপূর্ব্বে হাজিআহাম্মদের পরামর্শপরিচালিত* হইয়া তিনি সৈন্যসংখ্যা হ্রাস করিয়া দিয়াছিলেন এবং পদচ্যুত সেনাগণ গোপনে হাজিআহাম্মদের অনুরোধ পত্র লইয়া গিয়া আলিবর্দ্দীর সেনাদলে প্রবেশ করিয়াছিল। সম্রাটের আদেশ অনুসারে আলিবর্দ্দী সসৈন্যে রাজমহল পর্য্যন্ত আসিলে সরফরাজের নিদ্রা ভঙ্গ হইল। তিনি এখন নগররক্ষার সুবন্দোবস্ত করিয়া বিদ্রোহী নায়েবকে শিক্ষা দিবার নিমিত্ত বহুসংখ্যক সেনাসহ রাজমহলের দিকে অগ্রসর হইতে লাগিলেন।

তৃতীয় দিবসে নবাবসেনা থামরা পর্য্যন্ত অগ্রসর হইল এবং সরফরাজ সেনাদল পর্য্যবেক্ষণ করিতে গিয়া দেখিতে পাইলেন, গোলন্দাজ বিভাগের কর্ম্মচারিগণ হাজিআহাম্মদের সহিত ষড়্‌যন্ত্র করিয়া গোলার পরিবর্ত্তে ইষ্টক সংগ্রহ করিয়া রাখিয়াছে এবং শুরকির সাহায্যে কামানের মুখ রুদ্ধ করিয়া দিয়াছে। এই ঘটনায় অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইয়া তিনি গোলন্দাজবিভাগের অধ্যক্ষ সাহারিয়ারকে পদচ্যুত করিলেন এবং তৎপদে জনৈক পর্ত্তুগিজ নিযুক্ত হইল।

অপরিচিত পুরুষ সমক্ষে বধূর অবগুণ্ঠন উন্মোচিত হইলে যে জগৎশেঠকে স্বজাতি সমাজে অবনমিত হইতে হইবে তাহা নবাব বিলক্ষণরূপে জ্ঞাত ছিলেন। তথাপি তিনি একদিন সন্ধ্যার প্রাক্কালে জগৎশেঠের প্রতিবাদ উপেক্ষা করিয়া সেই বালিকা বধূকে বলপূর্ব্বক রাজপ্রাসাদে আনাইয়া স্বীয় কুতুহল চরিতার্থ করেন! এই ঘটনায় জগৎশেঠকে অতিশয় সামাজিক গ্লানি উপভোগ করিতে হইয়াছিল। পূর্ব্ব হইতেই হাজিআহাম্মদের সহিত নবাবের মনোমালিন্য ঘটিয়াছিল। আলামচাঁদ জগৎশেঠের অবমাননার পর হাজিআহাম্মদ সুযোগ পাইয়া তাঁহাদের সহিত ষড়্‌যন্ত্রে লিপ্ত হন এবং সেই ষড়্‌যন্ত্রের ফলেই আলিবর্দ্দী সসৈন্তে মুর্শিদাবাদ আক্রমণ করেন।—Orme's Indoostan, vol 2, pages 29 & 30.

ছিলেন এবং দরবারে তাঁহার বিলক্ষণ প্রতিপত্তিও ছিল। আলিবর্দ্দী ইশাখখাঁকে গোপনে লিখিয়া পাঠাইলেন—"আমাকে বাঙ্গলার নবাবীপদ প্রদান করিলে আমি বার্ষিক রাজস্ব নিয়মিত মতে আদায় করিব এবং তদতিরিক্ত সরফরাজের সমস্ত ধনরত্ন ও নগদ এককোটি টাকা সম্রাট্ দরবারে পাঠাইয়া দিব। এই সময় নাদের সাহার আক্রমণে মোগল সাম্রাজ্য টল মল হইয়া পড়িয়াছিল এবং নবাব সরফরাজখাঁ হাজিআহাম্মদ-প্রমুখ স্বার্থপর ও কুটমন্ত্রিগণের প্ররোচনায় বাঙ্গলা দেশে নাদিরসাহা নামাঙ্কিত মুদ্রা প্রচলিত করিয়াছিলেন ও মোগল সম্রাটের নামে খোতয়া না পড়াইয়া নাদের সাহার নামে খোতয়া পড়াইতেছিলেন।* ইশাখখাঁ এই সমস্ত ঘটনা উল্লেখ করিয়া সম্রাট্‌দরবারে প্রচার করিলেন যে সরফরাজ বিদ্রোহী হইয়া নাদেরসাহার পক্ষাবলম্বন করিয়াছে। সম্রাট্ কোনরূপ অনুসন্ধান না করিয়াই সরফরাজকে পদচ্যুত করিলেন এবং আলিবর্দ্দীকে নবাব নিযুক্ত করিয়া তৎপ্রতি আদেশ দিলেন যে তিনি যেন সসৈন্যে মুর্শিদাবাদে উপস্থিত হইয়া সরফরাজের হস্ত হইতে অগোণে শাসনদণ্ড গ্রহণ করেন।†

---

* Riazao-Salatin pages 309.

† Sair Motakharin pages 328 & 329.

অর্ম্মসাহেব বলেন "শাসনকার্য্যে সরফরাজের অণুমাত্রও দক্ষতা ছিল না। শাসন কর্ত্তৃত্ব লাভ করার পর হইতে তিনি কেবল পাপানুষ্ঠানেই লিপ্ত থাকিতেন। আলাম চাঁদ নামক জনৈক বৃদ্ধ হিন্দু সচিব ভূতপূর্ব্ব নবাব সুজাখাঁর অতি প্রিয়পাত্র ছিলেন। সরফরাজের উচ্ছৃঙ্খলতা দেখিয়া তিনি তাঁহাকে উপদেশচ্ছলে কয়েকটি কথা বলেন। সরফরাজ হিতে বিপরীত বুঝিয়া সেই বৃদ্ধ অমাত্যকে অকথ্য ভাষায় যদৃচ্ছা ভর্ৎসনা করেন। আলামচাঁদের অবমাননার অব্যবহিত পরে জগৎশেঠ ফতেচাঁদের জ্যেষ্ঠপুত্র একটি পরমাসুন্দরী বালিকার সহিত পরিণয় সূত্রে আবদ্ধ হন। সরফরাজ নববধূর অলৌকিক সৌন্দর্য্যের কথা শুনিয়া স্বচক্ষে তাহাকে দেখিবার জন্য ব্যগ্র হইয়া উঠেন।

পাঠাইয়া দিলেন। সরফরাজ হাজিআহাম্মদের জীবন সংহার করিবেন আশঙ্কা করিয়া আলিবর্দ্দী এতদিন নবাবের সহিত সংগ্রামে লিপ্ত হইতে ইতস্ততঃ করিতেছিলেন। সরফরাজের অপরিণামদর্শিতার ফলে তাঁহার সেই আশঙ্কা এখন বিদূরিত হইল। তিনি একখণ্ড ইষ্টক রত্ন খচিত বেষ্টনে আবৃত করিয়া উহা সরফরাজের প্রেরিত লোকদিগের নিকট কোরাণ বলিয়া প্রকাশ করিলেন এবং তাহা স্পর্শ করিয়া শপথ করিলেন, "আমি আগামী কল্য প্রাতে গলবস্ত্র হইয়া নবাবের নিকট গমন করিব এবং গত দুষ্কৃতির নিমিত্ত তাঁহার নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করিব।" সুজা কুলী খাঁ এবং খোজাবসন্ত নবাবশিবিরে প্রত্যাবৃত্ত হইয়া এই সমস্ত কথা বলিলে, নবাব সন্তুষ্ট হইয়া ভোজের আয়োজন করিয়া দিলেন এবং সমস্ত চিন্তা দূর করিয়া দিয়া নিদ্রার কোমল ক্রোড়ে আশ্রয় লইলেন। নবাবসেনাগণ মনে করিল এখন আর কোন গোল-যোগ উপস্থিত হইবে না; সুতরাং তাহারাও সুরাদেবীর অর্চ্চনায় নিযুক্ত হইয়া আমোদপ্রমোদে মত্ত হইয়া উঠিল।

নবাবের দূতগণ প্রস্থান করিলেই আলিবর্দ্দী আপন সেনাগণকে প্রোৎসাহিত করিতে লাগিলেন এবং নবাবের কতিপয় বিশ্বাসহন্তা সেনানীর সহিত গোপনে কথাবার্ত্তা চালাইতেও বিস্মৃত হইলেন না। নবাবসেনাপতিগণ মধ্যে গয়াস খাঁ ও মীর সরফউদ্দিন অত্যন্ত প্রভুভক্ত ছিলেন। তাহারা আলিবর্দ্দীর চাতুরী বুঝিতে পারিয়া রজনীযোগে নবাবশিবিরে আগমন করিলেন এবং আলিবর্দ্দী যে কপটাচারে প্রবৃত্ত হইয়াছেন ইহা নবাবকে বুঝাইয়া বলিলেন। তাঁহারা আরও নিবেদন করিলেন, "এখানে থাকিলে জাঁহাপনার বিপদ অবশ্যম্ভাবী। এ জন্য আমরা আপনাকে আমাদের শিবিরে লইয়া যাইতে আসিয়াছি। আপনি এ প্রস্তাবে সম্মত হইলে আমরা প্রাণপণ করিয়া আপনাকে রক্ষা

তৎকালে আলিবর্দ্দীর সেনাদল স্থতিনদীর মোহনার নিকট বৃত্তাকারে সন্নিবিষ্ট ছিল। চতুর্থ দিবসে নবাব সেনাদল প্রচণ্ডবেগে ধাবমান হইয়া আলিবর্দ্দীর সেনাদলকে ছিন্ন ভিন্ন করিয়া দিলেন। আলিবর্দ্দী ইহাতে প্রমাদ গণিয়া সমরাঙ্গণ হইতে পলায়ন করিবার উদ্যোগ করিলেন। আর অল্পকাল যুদ্ধ চলিলেই আলিবর্দ্দীকে যুদ্ধে পরাভূত হইতে হইত। কিন্তু বিশ্বাসহন্তা রায় আলামচাঁদ সরফরাজের সম্মুখে আসিয়া বলিলেন, "এখন্ বেলা দ্বিতীয় প্রহর অতীত হইয়া গিয়াছে। সেনা ও অশ্বগণ রবির উত্তপ্ত কিরণে জর্জ্জরিত হইয়া পড়িয়াছে। যুদ্ধ আরো চলিলে সকলকেই তৃষ্ণায় মৃত্যুমুখে পতিত হইতে হইবে। অতএব এখন যুদ্ধ হইতে নিবৃত্ত হইয়া আগামী কল্য প্রাতে যুদ্ধারম্ভ করিলে সকল দিকেই মঙ্গল হইবে।" সরফরাজের বিশ্বস্ত সেনানীগণ রায়রায়ানের পরামর্শে কর্ণপাত করিতে নিষেধ করিলেন। কিন্তু নবাব আলামচাঁদেরই উপদেশ শিরোধার্য্য করিয়া সেনাগণকে যুদ্ধ হইতে বিরত হইবার নিমিত্ত সঙ্কেত করিলেন। নবাব সেনা নিতান্ত অনিচ্ছার সহিত এই আদেশের বশবর্ত্তী হইল। রায় রায়ানের বিশ্বাসঘাতকতায় আলিবর্দ্দী এ যাত্রায় রক্ষা পাইলেন।

অতঃপর সরফরাজ গিরীয়ার প্রান্তরে আসিয়া সেনা সন্নিবেশ করিলেন। সুচতুর আলিবর্দ্দী এই সময় তাঁহার নিকট লিখিয়া পাঠাইলেন "আমি যুদ্ধের অভিপ্রায়ে এ স্থলে আগমন করি নাই। জাঁহাপনার সহিত সাক্ষাৎ করাই আমার প্রধান উদ্দেশ্য।" সরফরাজের অণুমাত্রও সাংসারিক অভিজ্ঞতা ছিল না। তিনি পত্র পাঠ করিয়া মনে করিলেন, আলিবর্দ্দী সত্য সত্যই তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিবার নিমিত্ত আসিয়াছেন। সুতরাং তিনি আলিবর্দ্দীকে শিবিরে আনিবার জন্য হাজিআহম্মদ; সুজাকুলীখাঁ এবং বসন্তকে আলিবর্দ্দীর নিকট

হও।” এই সময় দিগ্‌দিগন্ত প্রতিধ্বনিত করিয়া ভীষণরবে আবার বিপক্ষের কামান গর্জ্জন করিয়া উঠিল;এবং আলিবর্দ্দীর সেনাগণ রণ-সজ্জা করিয়া কালান্তক যমের ন্যায় ক্রমেই সম্মুখীন হইতে লাগিল। নবাবশিবিরে কোন সেনাই যুদ্ধের নিমিত্ত প্রস্তুত ছিল না; তাহাদের অধিকাংশই জীবন রক্ষার উদ্দেশ্যে ব্যাকুল হইয়া পলায়নের পথ খুজিতে লাগিল। তৎকালে আলিবর্দ্দীর সেনাদল অবিশ্রান্ত গোলা বর্ষণ করিতে-ছিল; সুতরাং পলায়মান সেনাগণ গোলার আঘাতে চির নিদ্রায় অভি-ভূত হইল। শিবিরাভ্যন্তরে এখন কেবল অস্ত্রের ঝন্‌ঝনা, আহতের আর্ত্তনাদ এবং কামানের গুড়ুম্ গুড়ুম্ রব ভিন্ন আর কিছুই শ্রুতি-গোচর হইতেছিল না। আগ্নেয়াস্ত্র হইতে ধূমবাষ্প উৎগীর্ণ হইয়া সমস্ত শিবিরকে প্রেতপুরীর ন্যায় প্রতীয়মান করিতেছিল। এই সময়ার সময় কতিপয় প্রভুভক্ত অনুচর নবাবের সম্মানরক্ষার্থ জীবন পণ করিয়া যুদ্ধার্থ প্রস্তুত হইল। আলিবর্দ্দী কিরূপ অভিবাদন করিবার উদ্দেশ্যে এখানে আগমন করিয়াছেন তাহা স্বয়ং নবাবও এখন বুঝিতে পারিলেন। সুতরাং তিনিও প্রাতঃকৃত্য সম্পাদন করিয়া যোদ্ধৃবেশ ধারণ করিলেন এবং একটি দ্রুতগামী করীতে আরোহণ পূর্ব্বক সমরাঙ্গণে অগ্রসর হইলেন। কিয়ৎকাল উভয় পক্ষে তুমুল যুদ্ধ চলিল এবং বহুসংখ্যক সেনা, অশ্ব ও হস্তী আহত হইয়া প্রাণত্যাগ করিল। অবশেষে নবাব সেনানী মর্দ্দান আলী খাঁ বিপক্ষের বেগ সহ্য করিতে অক্ষম হইয়া পৃষ্ঠভঙ্গ দিলেন এবং সঙ্গে সঙ্গে নবাবপক্ষীয় অধিকাংশ সেনা তাঁহার পদাঙ্ক অনুসরণ করিল। যে অল্প সংখ্যক সেনা মর্দ্দান আলির অনুসরণ করিল না, তাহারা সরফরাজকে রক্ষা করিবার উদ্দেশ্যে প্রাণপণে শত্রুসেনার গতিরোধ করিতে লাগিল। শত্রুসেনা যুদ্ধে প্রায় জয়লাভ করিয়াছে দেখিয়া সরফরাজের মাহুত প্রভুকে বলিল, “অনুমতি হইলে আমি এখনও

করিব।" সরফরাজ সেই প্রভুভক্ত সেনাপতিদ্বয়কে রুক্ষস্বরে বলিলেন, "তোমরা স্বার্থসাধনোদ্দেশ্যেই আলিবর্দ্দীর সহিত বিবাদে প্রবৃত্ত হইবার নিমিত্ত আমার প্রবৃত্তি জন্মাইতে আসিয়াছ, আলিবর্দ্দী কখনও আমার অমঙ্গল আকাঙ্ক্ষা করে না। অতএব আমি তোমাদের কথা শুনিতে প্রস্তুত নই।" অগত্যা সেনানীদ্বয় ক্ষুণ্ণমনে স্ব স্ব শিবিরে প্রস্থান করিয়া উপযুক্ত সতর্কতা অবলম্বনপূর্ব্বক শত্রুর আগমন প্রতীক্ষা করিতে লাগিলেন।

এক ঘণ্টা রাত্রি থাকিতে আলিবর্দ্দী আপন সেনদলকে দুইভাগে বিভক্ত করিলেন এবং নন্দলালনামক সেনানীর অধ্যক্ষতায় একভাগ সেনা গয়াস খাঁ ও মীর সরফউদ্দিনের শিবির আক্রমণ করিবার উদ্দেশ্যে পাঠাইয়া দিলেন। দ্বিতীয় ভাগ সেনাদল লইয়া তিনি স্বয়ং রজনীর অন্ধকারের সহায়তায় অলক্ষ্যে সরফরাজের শিবিরাভিমুখে অগ্রসর হইতে লাগিলেন।

সরফরাজের সেনাগণ তৎকালে সুরাদেবীর প্রসাদে সংজ্ঞাহীন হইয়া পড়িয়াছিল এবং স্বয়ং নবাব নিদ্রার কোমল ক্রোড়ে অবস্থান করিয়া নানাবিধ সুখের স্বপ্ন দেখিতেছিলেন। রজনী অবসান হইতে না হইতেই আলিবর্দ্দীর সেনাদল নবাবশিবিরে আপতিত হইয়া চতুর্দ্দিক বেষ্টন করিয়া ফেলিল এবং কামান দাগাইয়া গুরুগম্ভীররবে আপনাদের আগমনবার্ত্তা প্রচার করিল। নবাবের জনৈক অনুচর সেই রবে জাগরিত হইয়া প্রকৃত অবস্থা বুঝিতে পারিল এবং প্রভুর নিকট গিয়া উপস্থিত বিপদের বৃত্তান্ত বলিল। কিন্তু সরফরাজ তখনও অনুচরের কথায় আস্থা স্থাপন করিতে না পারিয়া উত্তর করিলেন, "আলিবর্দ্দী আমার সহিত সাক্ষাৎ করিবার জন্যই এখানে আসিয়াছেন; অতএব তোমরা নিশ্চিন্তমনে ভোজের আয়োজন করিয়া আনন্দোৎসবে লিপ্ত

এই সময় একটি বন্দুকের আওয়াজ করিলে বন্দুকের গুলি আসিয়া গয়াস খাঁর বক্ষঃস্থলে বিদ্ধ হইল। বীরবর গয়াস খাঁ সেই আঘাতে সমরাঙ্গণে নিপতিত হইলেন। কুতুব ও বাবর নামে গয়াস খাঁর পুত্রদ্বয় পিতার পার্শ্বে দাঁড়াইয়া যুদ্ধ করিতেছিল। তাহারা এখন সংহার মূর্ত্তি ধারণ করিয়া বহুসংখ্যক বিপক্ষ সেনার প্রাণনাশ করিল এবং পিতৃহন্তা ছিদাম হাজারীর সাক্ষাৎ পাইয়া তাহাকে কয়েকটি আঘাত করিতে বিস্মৃত হইল না। কিন্তু সেই যুবকদ্বয় অনেকক্ষণ এরূপ অলৌকিক বীরত্ব প্রদর্শন করিতে পারিল না। অবিলম্বে বিপক্ষপক্ষ হইতে কয়েকটি গোলা আসিয়া তাহাদিগকে সংহার করিল।

তৎকালে মীর সরফউদ্দিনও নিশ্চেষ্ট ছিলেন না। তিনি সাতজন অশ্বারোহী লইয়া আলিবর্দ্দীর দিকে ধাবমান হইলেন এবং সাক্ষাৎ পাইয়া তাঁহাকে লক্ষ্য করিয়া তীর নিক্ষেপ করিলেন। দুর্ভাগ্যক্রমে তীর আলিবর্দ্দীর বক্ষ বিদীর্ণ না করিয়া তাঁহার পার্শ্বদেশে বিদ্ধ হইল। এই সময় তিনি আর একটি তীরের সন্ধান করিতেছিলেন, কিন্তু ইত্যবসরে জাহান ইয়ার ও জনফিকির নামে আলিবর্দ্দীর দুইজন সেনানী সরফ উদ্দিনের সম্মুখে আসিয়া বলিলেন, "নবাব সরফরাজ খাঁ যুদ্ধে প্রাণ বিসর্জ্জন করিয়াছেন; এখন যুদ্ধে লিপ্ত থাকিলে স্বীয় প্রাণ বিসর্জ্জন ভিন্ন আপনার অন্য কোন লাভ হইবে না।" সরফউদ্দিন উত্তর করিলেন, "আমি এতক্ষণ নিমকের স্বত্ব প্রতিপালন করিবার উদ্দেশ্যেই যুদ্ধ করিয়াছি। এখন হইতে আত্মসম্মান রক্ষা করিবার অভিপ্রায়ে যুদ্ধ করিব।" আলিবর্দ্দীর সেনানীদ্বয় এই কথা শুনিয়া পুনরায় বলিলেন, "আমরা প্রতিশ্রুত হইতেছি যে কেহই আপনার সম্মান হানি করিবে না। অতএব আপনি আর বৃথা রক্তপাত করিবেন না।" অগত্যা মহামতি সরফউদ্দিন অনুচরবর্গসহ সমরাঙ্গণপরিত্যাগপূর্ব্বক

বীরভূমের দিকে হাতী চালাইয়া নিয়া আপনার জীবন রক্ষা করিতে পারি।” নবাব মাহুতের গণ্ডদেশে চপেটাঘাত করিয়া বলিলেন, “হস্তীর পদসকল সুদৃঢ়রূপে শৃঙ্খলাবদ্ধ কর। আমি কোন ক্রমেই এই সমস্ত কুক্কুরদিগকে আমার পৃষ্ঠদেশ প্রদর্শন করিতে পারিব না।” অগত্যা মাহুত সমর ক্ষেত্রাভিমুখে আবার হস্তি চালাইয়া দিল। তৎকালেও আলিবর্দ্দীর গোলন্দাজসেনা অবিশ্রান্ত অগ্নিবৃষ্টি করিতেছিল। ক্রমে সরফরাজের বিশ্বস্ত অনুচরগণ একে একে বিপক্ষের গোলাঘাতে প্রাণ বিসর্জ্জন দিল। এই সময় স্বপক্ষীয় কোন বিশ্বাসঘাতকের হস্তস্থিত বন্দুকের গোলায় ললাটে আহত হইয়া সরফরাজ প্রাণত্যাগ করিলেন। মীর হবিব-প্রমুখ কতিপয় সেনানী দূরে অবস্থান পূর্ব্বক নিশ্চেষ্টভাবে সমরাভিনয় দর্শন করিতেছিল, প্রভুকে এইরূপে নিপতিত হইতে দেখিয়াই তাহারা বেগে প্রস্থান করিল।

এ দিকে নন্দলাল গয়াস খাঁ ও মীর সরফউদ্দিনের দিকে অভিযান করিলে তাঁহারা মনে করিলেন, স্বয়ং আলিবর্দ্দীই তাঁহাদিগকে আক্রমণ করিতে আসিয়াছেন। সুতরাং তাঁহারাও প্রাণপণে যুদ্ধ করিয়া নন্দলালকে নিহত করিলেন। অনন্তর উভয়ে একযোগে সরফরাজের অনুসন্ধানোদ্দেশ্যে দ্রুতপদে অগ্রসর হইতে লাগিলেন। সরফরাজ ইতি পূর্ব্বেই আহত হইয়া প্রাণত্যাগ করিয়াছিলেন। কিন্তু আলিবর্দ্দীর সেনাদলকে যুদ্ধক্ষেত্রে অটলভবে অবস্থান করিতে দেখিয়া তাঁহারা মনে করিলেন, সরফরাজ খাঁ এখনও জীবিত আছেন। সেনানীদ্বয় আর অপেক্ষা না করিয়া আলিবর্দ্দীর সেনাদলের উপর আপতিত হইলেন এবং সেনাগণকে ছত্রভঙ্গ করিয়া দিয়া কেন্দ্রাভিমুখে অগ্রসর হইতে লাগিলেন। তাঁহাদের বীরোচিত উদ্যমে বিপক্ষের সেনা জর্জ্জরিত হইয়া প্রস্থানের উদ্যোগ করিল। কিন্তু আলিবর্দ্দীর গোলন্দাজ ছিদাম হাজারি

স্বীয় জীবন যে ক্রমেই বিপন্নতর হইতেছে, সে দিকে জালিম সিংহের অণুমাত্রও লক্ষ্য রহিল না। তিনি কেবল তরবারি ঘূর্ণিত করিয়া অমিততেজে পিতার মৃতদেহ রক্ষা করিতে লাগিলেন। আলিবৰ্দ্দী এই অলৌকিক দৃশ্য দেখিয়া মুগ্ধ হইলেন। অনন্তর তিনি শিশুটির অসামান্য বীরত্বের প্রশংসা করিয়া অনুচরবর্গকে তাঁহার প্রাণ বিনাশ করিতে নিষেধ করিলেন ও বীর শিশুকে বলিলেন, রজঃপূত ভিন্ন অন্য কেহ তাঁহার পিতার শব স্পর্শ করিবে না। জালিমসিংহ এই কথায় বিশ্বাস করিয়া অস্ত্র ত্যাগ করিলেন। আলিবৰ্দ্দীর হিন্দুসেনাগণ এইরূপ বীরত্ব দেখিয়া এত বিস্ময়াবিষ্ট হইল যে, তাহাদের কেহ বীর শিশুকে ক্রোড়ে লইয়া এবং কেহ বিজয়সিংহের মৃত দেহ বহন করিয়া গঙ্গাতীরে লইয়া গিয়া মৃতের সংকার করিল।

নবাব যুদ্ধে নিহত হইলে পূৰ্ব্বোক্ত মাহুত প্রভুর শবদেহ সহ সত্বরপদে মুর্শিদাবাদে উপনীত হইল। সরফরাজের আদেশক্রমে মুর্শিদাবাদের ফৌজদার ইয়াসিন খাঁ ও নবাবপুত্র হাফিজুল্লা তৎকালে নগর রক্ষায় নিযুক্ত ছিলেন। তাঁহারা উভয়ে নওয়াখালীতে শবদেহ সমাহিত করিয়া যুদ্ধার্থ প্রস্তুত হইলেন। কিন্তু পরাজিত সেনাগণমধ্যে কেহই তাঁহাদিগকে সাহায্য করিতে অগ্রসর হইল না। অগত্যা আলিবৰ্দ্দীর বশ্যতা স্বীকার করা ভিন্ন তাহাদের আর গত্যন্তর রহিল না। ১৮৪০ খৃষ্টাব্দে এই ঘটনা সংঘটিত হইল।*

---

* Riazoo-Salatin, pages, 311 to 320

বীরভূমের দিকে অগ্রসর হইলেন। যতক্ষণ তিনি সমরে লিপ্ত ছিলেন, ততক্ষণ পর্টুগীজ গোলন্দাজ পায়ু অবিশ্রান্ত অগ্নি বৃষ্টি করিয়া তাহার পৃষ্ঠদেশ রক্ষা করিতেছিল। মীরসাহেব রণস্থল হইতে প্রস্থান করিলেই আলিবর্দ্দীর আফগান সেনাগণ অগ্রসর হইয়া পায়ু গোলন্দাজের জীবন সংহার করিল।

বিজয়সিংহনামক জনৈক রাজপুত এই যুদ্ধে নবাবসেনার পৃষ্ঠদেশ রক্ষা করিবার উদ্দেশ্যে অনুচরবর্গসহ খামরায় অবস্থান করিতেছিলেন। নবাব সমরক্ষেত্রে নিপতিত হইয়াছেন শুনিয়া সেই ক্ষত্রিয়বীর এক হস্তে বর্ষা ধারণ করিয়া অশ্বপৃষ্ঠে শত্রু সেনারদিকে অগ্রসর হইলেন এবং যে স্থানে আলিবর্দ্দী সসৈন্যে অবস্থান করিতেছিলেন, তথায় আসিয়া প্রচণ্ড বেগে শত্রুসেনাগণকে আক্রমণ করিলেন। আলিবর্দ্দী তৎকালে হস্তিপৃষ্ঠে আরূঢ় ছিলেন। তাঁহাকে বর্ষার আঘাতে হস্তিপৃষ্ঠ হইতে বিচ্যুত করিয়া শমনভবনে প্রেরণ করিবেন, এই সংকল্পে বিজয় সিংহ বর্ষা উত্তোলন করিলেন। আলিবর্দ্দী তাহা দেখিতে পাইয়া গোলন্দাজসেনার অধ্যক্ষ দাউদকুলীকে সেই রাজপুত যোদ্ধার গতিরোধ করিতে বলিলেন। নিমেষমধ্যে দাউদকুলী অগ্রসর হইল এবং বিজয় সিংহকে লক্ষ্য করিয়া একটি পিস্তল ছুড়িল। পিস্তলের গোলা তৎক্ষণাৎ বিজয়সিংহের হৃদয় বিদ্ধ করিয়া তাঁহাকে শমনভবনে প্রেরণ করিল। এই সময় বিজয় সিংহের নয় বৎসর বয়স্ক পুত্র জালিম সিংহ পিতার পার্শ্বে দণ্ডায়মান ছিলেন। পিতাকে সংগ্রামক্ষেত্রে নিপতিত হইতে দেখিয়া বালক জালিম সিংহ পবিত্র ক্ষত্রিয়তেজে উদ্দীপিত হইয়া উঠিলেন। তিনি এখন কোষস্থিত তরবারি উন্মুক্ত করিয়া সিংহশাবকের ন্যায় গর্জ্জন করিতে করিতে পিতার মৃতদেহ রক্ষা করিতে লাগিলেন। আলিবর্দ্দীর সেনাগণ ইতিমধ্যে চতুর্দ্দিক হইতে আসিয়া তাঁহাকে বেষ্টন করিয়া ফেলিল।

সরফরাজজননী যবনিকার অন্তরালহইতে এই সমস্ত কপট অনুতাপ শুনিয়া কোনরূপ উত্তর প্রদান করিলেন না। অনন্তর আলিবর্দ্দী তথা হইতে রাজপথ দিয়া দরবারগৃহে উপস্থিত হইলেন। এস্থলে তিনি মসনদে উপবেশন করিলে তাঁহার সম্মানার্থ বাদ্যোদম হইতে লাগিল এবং প্রধান প্রধান নাগরিক ও রাজকর্ম্মচারিগণ সম্মুখে আসিয়া নজর প্রদান করিল। প্রকাশ্যে সকলেই বিজেতার প্রতি সম্মান প্রদর্শন করিলেও কেহই এই কৃতঘ্ন প্রভুহন্তাকে মনে মনে শ্রদ্ধা করিতে পারিল না।*

সরফরাজের একটিও ধর্ম্মপত্নী ছিল না। তিনি বহুসংখ্যক উপপত্নী রাখিয়া এপর্য্যন্ত তাহাদের সহবাসেই কালযাপন করিতেছিলেন এবং কোন কোন উপপত্নীর গর্ভে সরফরাজের কয়েকটি পুত্রসন্তানও জন্মিয়াছিল। আলিবর্দ্দী নবাব হইয়া সরফরাজের পুত্রবতী উপপত্নীগণকে সন্তানসহ ঢাকায় পাঠাইয়া দিলেন এবং তাহাদের গ্রাসাচ্ছাদনের নিমিত্ত উপযুক্ত পরিমাণ মাসিক বৃত্তিরও ব্যবস্থা করিলেন। রাজমাতা জিন্নতন্নেছা নিবাইস মহম্মদের রক্ষণে অর্পিতা হইলেন।* এই সময় ভূতপূর্ব্ব নবাবের জামাতা মুরাদআলি ঢাকার শাসনকর্ত্তৃত্বে নিযুক্ত ছিলেন; আলিবর্দ্দী তাঁহাকে পদচ্যুত করিয়া নিবাইস মহম্মদকে ঢাকা, শ্রীহট্ট ও ইসলামাবাদের শাসনকর্ত্তৃত্ব ও মুর্শিদাবাদে নেজামতের দেওয়ানীপদ প্রদান করিলেন। সুজাখাঁর আমলে উড়িষ্যার শাসনকর্ত্তৃত্ব মুরসিদ কুলীর উপর ন্যস্ত ছিল। আলিবর্দ্দী এখন সেই শাসনকতৃত্ব সৈয়দ আহম্মদকে দিবার সংকল্প করিলেন। মুরসিদকুলী বিনা যুদ্ধে শাসনভার ত্যাগ করিতে প্রস্তুত ছিলেন না; সুতরাং আলিবর্দ্দীর সংকল্প তখন আর

---

* Sair, vol 1 pages 340 to 343.

অর্ম্মসাহেবও এই উক্তি সমর্থন করিয়াছেন—Orme's Indoostan, vol 1 page 82.

* Sair, vol 1 page 356.

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

গিরিয়ার যুদ্ধাবসানে

যুদ্ধের পরদিন হাজি আহাম্মদ মুর্শিদাবাদে গিয়া শান্তি প্রচার করিলেন এবং ফৌজদার ইয়াসিন রাজকোষ এবং ভূতপূর্ব্ব নবাবের অন্তঃপুররক্ষাকার্য্যে নিযুক্ত হইলেন। বিজয়োৎফুল্ল সেনাদলকর্ত্তৃক সরফরাজের ধনাগারলুণ্ঠনকার্য্য প্রত্যক্ষ করিতে না হয়, এই উদ্দেশ্যে আলিবর্দ্দী পরবর্ত্তী তিন দিবস পর্য্যন্ত গোবরা নদীর তীরে শিবির সন্নিবেশ করিয়া রহিলেন। চতুর্থ দিবসে তিনি ধীরে ধীরে নগরাভিমুখে অগ্রসর হইতে লাগিলেন। রাজপ্রাসাদের সমীপস্থ হইয়া আলিবর্দ্দী দক্ষিণদিকে গতি পরিবর্ত্তিত করিয়া সরফরাজ-জননী জিন্নতন্নেছার আবাসস্থলের সমীপস্থ হইলেন। রাজ-জননীর গৃহদ্বারে আসিয়াই তিনি প্রথমতঃ ভূমিষ্ঠ হইয়া সেই মহিলার উদ্দেশ্যে অভিবাদন করিলেন এবং পরে বাষ্পাকুলিতকণ্ঠে বলিলেন, "বিধাতার নির্ব্বন্ধ কেহই খণ্ডন করিতে পারে না। আপনার এই অধম ভৃত্য অকৃতজ্ঞতার পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করিয়া যে দুরপনের কলঙ্ক অর্জন করিল তাহা ইতিহাসের পৃষ্ঠায় চিরকালের নিমিত্ত উৎকীর্ণ হইয়া রহিল। আমি শপথপূর্ব্বক বলিতেছি যত দিন এ পাপ দেহে জীবন থাকিবে ততদিন অনুগত ভৃত্যের ন্যায় আপনার সম্মান রক্ষা করিব এবং কখনও আপনার আদেশ অবহেলা করিব না। আপনি ক্ষমাগুণে এই পামর ভৃত্যের দুষ্কার্য্য বিস্মৃত হইয়া তাহাকে আপনার পরিচর্য্যা করিতে অনুমতি প্রদান করেন, ইহাই আমার শেষ প্রার্থনা জানিবেন।"

এইরূপে কর্ম্মচারিনিয়োগ শেষ করিয়া আলিবর্দ্দী সরফরাজের সমস্ত সম্পত্তি হস্তগত করিলেন। সনন্দসংগ্রহ করিবার সময় আলিবর্দ্দী যে প্রতিশ্রুতি দিয়াছিলেন তদনুসারে এখন তিনি মূল্যবান্ উপঢৌকনসহ নগদ এককোটী টাকা ও সরফরাজের সম্পত্তির কিয়দংশ সম্রাট্ দরবারে পাঠাইয়া দিলেন। স্বপদে সুদৃঢ় হইবার কিয়ৎকাল পরে তিনি সেনাদল সহ মুরসিদকুলীর বিরুদ্ধে উড়িষ্যাভিমুখে যাত্রা করিলেন। পক্ষান্তরে মুরসিদকুলীও রণসজ্জা করিতে বিরত হইলেন না। কিন্তু আলিবর্দ্দীর বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হইতে পারেন, মুরসিদকুলীর এমন সেনাবল ছিল না। সুতরাং তিনি যুদ্ধে পরাভূত হইয়া উড়িষ্যা পরিত্যাগ করিলেন এবং সমগ্র উড়িষ্যা প্রদেশ আলিবর্দ্দীর হস্তগত হইল। পূর্ব্ব সংকল্পানুসারে আলিবর্দ্দী এখন সৈয়দ আহাম্মদকে উড়িষ্যার শাসনকর্ত্তৃত্বে নিযুক্ত করিয়া মুরসিদাবাদে প্রত্যাবৃত্ত হইলেন।*

প্রভুপুত্র সরফরাজের সর্ব্বনাশ সাধন এবং তাঁহার পরিবারবর্গকে ঢাকায় নির্ব্বাসিত করিয়া দিয়া আলিবর্দ্দী সুজাখাঁর অনুগ্রহের প্রতিদান করিয়াছিলেন। এজন্য রাজ্যের প্রধান প্রধান ব্যক্তি ও ভূতপূর্ব্ব নবাবের আমলের কর্ম্মচারিগণ তাঁহাকে নিরতিশয় ঘৃণার চক্ষে নিরীক্ষণ করিতেছিলেন। কিন্তু আলিবর্দ্দীর চরিত্রগুণে তাঁহাদের সেই ঘৃণার ভাব অধিককাল স্থায়ী হইতে পারে নাই। সিংহাসনে আরোহণ করিয়াই

আছে যে নেফিছা বেগমই নিবাইস মহম্মদের রক্ষণে অর্পিতা হইয়াছিলেন। সরফরাজ জননীর নাম যে জিন্নতন্নেছা তাহা মোতাক্ষরীণ পাঠেই অবগত হওয়া যায় (Sair, vol 1 p. 282.)। বোধ হয় সায়র মোতাক্ষরীণ ভ্রমে জিন্নতন্নেছার স্থলে নেফিছা বেগম নাম লিখিয়াছেন এবং রিয়াজু সেলাতিনপ্রণেতা সেই ভ্রম সংশোধন না করিয়া তাহারই অনুসরণ করিয়াছেন।

* Sair, vol 1 pages 347 to 352.

কার্য্যে পরিণত হইতে পারিল না। কনিষ্ঠ ভ্রাতা জয়নদ্দিন এতদিন আজিমাবাদের প্রতিনিধি শাসনকর্ত্তা ছিলেন ; আলিবর্দ্দী এখন তাঁহাকে সেই প্রদেশের শাসনকর্ত্তৃত্বে নিযুক্ত করিলেন। জয়নদ্দিনের জেষ্ঠপুত্র মিরজামহম্মদ সিরাজউদ্দৌলা উপাধি পাইয়া ঢাকার নৌসেনা বিভাগের অধ্যক্ষপদে বরিত হইলেন। হাজি আহাম্মদের জামাতা আতাউল্লা খাঁ এতদিন রাজমহলের ফৌজদারপদে নিযুক্ত ছিলেন ; আলিবর্দ্দী তাঁহাকে ভাগলপুরের ফৌজদারপদে উন্নীত করিলেন। ভূতপূর্ব্ব নবাবের রাজস্ব সচিব রায়রায়ান আলামচাঁদ গিরীয়ার যুদ্ধের সময় আলিবর্দ্দী সহ ষড়যন্ত্রে লিপ্ত ছিলেন। যুদ্ধাবসানে তিনি স্বীয় বিশ্বাসঘাতকতার নিমিত্ত অনুতপ্ত হইয়া প্রায়শ্চিত্তস্বরূপ গরলাধার হীরক অঙ্গুরীর চুম্বনে আত্মহত্যা করেন।† সুতরাং আলিবর্দ্দী এখন আলামচাঁদের পেস্কার চাঁদরায়কে রাজস্বসচিবের পদে নিযুক্ত করিলেন। জানকীরাম এ পর্য্যন্ত বিহার প্রদেশের দেওয়ান ছিলেন। আলিবর্দ্দী নবাব হইলে তিনি সমরবিভাগের দেওয়ানী পদে বরিত হইলেন। মীরজাফরপ্রমুখ আত্মীয়বর্গও এই সময় নূতন নবাবের প্রসাদ হইতে বঞ্চিত হইলেন না।‡

---

† Riazoo Salatin, page 320.

‡ Sair, vol 1 pages 344 to 347.

কিন্তু রেয়াজু সেলাতিনে লিখিত আছে "হাজি আহাম্মদ ও তাঁহার পুত্রগণ সরফরাজের ১৫০০ সুন্দরী উপপত্নীকে হস্তগত করিলেন এবং আলিবর্দ্দী তাঁহার পরিণীতা বেগমদিগকে সন্তানসহ ঢাকায় নির্ব্বাসিত করিয়া দিয়া তাহাদের গ্রাসাচ্ছাদনের নিমিত্ত খাস তালুকের আয় হইতে সামান্য পরিমাণ বৃত্তি নির্দ্ধারণ করিলেন—Riazoo-Salatin, page 321. এস্থলে সায়র মোতাক্ষরীণ সরফরাজ জননীর নাম নেফিছাবেগম লিখিয়াছেন। ফলে সায়র মোতাক্ষরীণে অন্যত্র নেফিছাবেগম সরফরাজের ভগ্নী বলিয়াই বর্ণিত হইয়াছেন (Sair, vol I page 282.)। রিয়াজু সেলাতিনে লিখিত

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

উন্নতির সোপানে

পূর্ব্বে বলা হইয়াছে যে আলিবর্দ্দী সিংহাসনে আরোহণ করিয়া নিবাইসকে ঢাকাবিভাগের শাসনকর্ত্তৃত্বে এবং মুর্শিদাবাদে নেজামতের দেওয়ানী পদে নিযুক্ত করেন। নেজামতের দেওয়ানী পদোচিত কর্ত্তব্য নির্ব্বাহের নিমিত্ত নিবাইসকে সর্ব্বদা মুর্শিদাবাদে অবস্থান করিতে হইত; সুতরাং তিনি হোসেনকুলীখাঁ নামক জনৈক বিশ্বস্ত মুসলমানকে আলিবর্দ্দীর অনুমতিগ্রহণে ঢাকা, শ্রীহট্ট ও ইসলামবাদের নায়েব নাজিমী পদে নিযুক্ত করিয়া ঢাকায় পাঠাইয়া দিলেন। তৎকালে রায় গোকুল চাঁদনামে জনৈক হিন্দু হোসেন কুলীর কর্ম্মচারী ছিলেন। রাজস্ববিষয়ে এই হিন্দুকর্ম্মচারীর বিশেষ পারদর্শিতা আছে জানিয়া হোসেনকুলী তাঁহাকে ঢাকাবিভাগের দেওয়ানী পদ দিবার নিমিত্ত নিবাইস মহম্মদকে অনুরোধ করিলেন। নিবাইস তদনুসারে রায় গোকুলচাঁদকে দেওয়ানী ও সেনাবিভাগের রেসলদারীপদে নিযুক্ত করিয়া হোসেনের সহিত ঢাকায় পাঠাইয়া দিলেন।

হোসেনকুলী ঢাকায় আসিবার কালে আলিবর্দ্দী তাঁহাকে "বাহাদুর" উপাধি ও তিন সহস্র অশ্বারোহী সেনার অধ্যক্ষ পদ দিয়া সম্মানিত করিলেন। আর গোকুলচাঁদ অতি বিচক্ষণ লোক ছিলেন; ঢাকায় আগমন করিয়া তিনি এরূপ যোগ্যতার সহিত দেওয়ানী পদোচিত কর্ত্তব্য সম্পাদন করিতে প্রবৃত্ত হইলেন যে অচিরে মুর্শিদাবাদদরবারে তাঁহার অসাধারণ প্রতিপত্তি হইয়া উঠিল।

তিনি ন্যায়পরতাসহকারে শাসনদণ্ড পরিচালনা করিতে লাগিলেন। রাজ্যে যে সমস্ত প্রধান ব্যক্তি ছিল তাহাদিগের প্রতি উপযুক্ত সম্মান প্রদর্শন করিতেও তিনি বিস্মৃত হইলেন না। পরিচিত অপরিচিত সকলকেই তিনি যোগ্যতা অনুসারে অনুগ্রহ প্রদর্শন করিতে লাগিলেন। অত্যাচার প্রপীড়িত লোকদিগের আবেদন নিবেদন স্বকর্ণে শুনিয়া তিনি উপযুক্ত প্রতীকার করিতে উদ্যত হইলেন। ক্ষমা প্রদর্শন করা সম্ভবপর হইতে তিনি কাহাকেও ক্ষমা করিতে কুণ্ঠিত হইলেন না। সমগ্র রাজ্যে যাহাতে শান্তি প্রতিষ্ঠিত হইতে পারে তদ্বিষয়ে তিনি আগ্রহসহকারে চেষ্টা করিতে লাগিলেন। এই সমস্ত কারণে অল্পদিন মধ্যেই রাজ্যের সমস্ত লোক আলিবর্দ্দীর পূর্ব্ব অপরাধ বিস্মৃত হইলেন এবং তৎপ্রতি শ্রদ্ধাবান্ হইয়া ভগবানের নিকট তাঁহার দীর্ঘজীবন কামনা করিতে লাগিলেন।*

---

* Sair, vol 1 page 342.

নগরের সমস্ত রাজপথেই বিচরণ করিত এবং কোন সুস্থকায় সুন্দর পুরুষ তাহাদের নয়নপথে পতিত হইলে তাহাকে যে কোন উপায়ে নবাব নন্দিনীর নিকট আনিয়া দিত। *

হোসেন কুলী সুচতুর, বুদ্ধিমান্ এবং অতিশয় রূপবান্ পুরুষ ছিলেন। তিনি মনে করিলেন, কোন উপায়ে ঘেসীটি বিবীকে বশীভূত করিতে পারিলে সহজেই অভীষ্ট সিদ্ধ হইয়া যাইবে। সুতরাং কাল বিলম্ব না করিয়া তিনি সর্ব্বাগ্রে মূল্যবান্ উপঢৌকনপ্রদানে ঘেসীটি বিবির সহিত পরিচয় করিয়া লইলেন এবং পরে রূপের ফাঁদ পাতিয়া তাহার চিত্তাকর্ষণ করিলেন। রূপযৌবনসম্পন্না নবাব-তনয়া মনের অনুরূপ নায়ক পাইয়া হোসেনের করে সহজেই বিক্রীত হইলেন। †

এক্ষণে ঘেসীটি বিবী স্বামী ও পিতার নিকট পদচ্যুত শাসনকর্ত্তার স্বপক্ষে কথা বলিতে লাগিলেন। নিবাইস ও আলিবর্দ্দী উভয়েরই নিকট সেই মহিলার বিশেষ প্রতিপত্তি ছিল; সুতরাং তাঁহারা ঘেসীটি বিবীর অনুরোধে হোসেনকুলীকে পুনরায় স্বপদে প্রতিষ্ঠিত করিলেন।

হোসেন পদচ্যুত হইলে ফৌজদার ইয়াসিন খাঁ তৎপদে নিযুক্ত হইয়া ঢাকায় আসিয়াছিলেন। এখন তিনি স্থানান্তরিত হইয়া ভাগলপুরের ফৌজদারের অধীন কোন এক কার্য্যে নিযুক্ত হইলেন। হোসেন পুনরায় ঢাকায় আসিয়া কেবল রায় গোকুল চাঁদের ছিদ্রান্বেষণ করিতে লাগিলেন। রায় গোকুলচাঁদ বিলক্ষণ সুচতুর ও সুযোগ্য কর্ম্মচারী ছিলেন; সুতরাং হোসেনকুলী সহজে সফলকাম হইতে পারিলেন না। অবশেষে নিকাশবিভাগের কর্ম্মচারগিণকে বশীভূত করিয়া তিনি দেওয়ানের নিকাশ তলব করাইলেন। গোকুলচাঁদ নিকাশ প্রদান করিলে, নিকাশ

* Sair, vol. I pages 422.
† Sair, vol I pages 422.

শাসনকর্ত্তৃত্বলাভের অব্যবহিত পরেই হোসেন কুলীর আত্মবিস্মৃতি ঘটিল। তিনি এখন প্রভুর আদেশ অপেক্ষা না করিয়াই স্বেচ্ছানুরূপ শাসনদণ্ড পরিচালনা করিতে লাগিলেন। ক্রমে তাঁহার স্বেচ্ছাচারের মাত্রা এতদূর বৃদ্ধি পাইল যে রায় গোকুলচাঁদ আর তাহা সহ্য করিতে না পারিয়া মুর্শিদাবাদদরবারে তাহার বিরুদ্ধে অভিযোগ উপস্থিত করিলেন।

রায় গোকুল চাঁদ পূর্ব্বে হোসেন কুলীরই কর্ম্মচারী ছিলেন এবং হোসেন কুলীরই অনুরোধে দেওয়ানীপদে নিযুক্ত হইয়াছিলেন; সুতরাং দরবারে সেই অভিযোগ সত্য বলিয়াই পরিগৃহীত হইল। অবিলম্বে হোসেন কুলী পদচ্যুত হইলেন এবং ফৌজদার ইয়াসিনখাঁ তৎপদে নিযুক্ত হইয়া ঢাকায় আগমন করিলেন।

এক্ষণে হোসেনকুলী পুনরায় মুর্শিদাবাদে আসিয়া নষ্টগৌরব পুনরুদ্ধার করিবার উদ্দেশ্যে নানারূপ কৌশলজালবিস্তারে প্রবৃত্ত হইলেন।*

আলিবর্দ্দীর জ্যেষ্ঠা তনয়া ঘেসেটি বিবির চরিত্র নিষ্কলঙ্ক ছিল না। স্বামী নিবাইস মহম্মদ ক্লীব ছিলেন বলিয়া নবাবনন্দিনী তাঁহার নিকট হইতে যৌবনসুলভবাসনার পরিতৃপ্তি লাভ করিতে সমর্থ হইতেন না। এ নিমিত্ত তিনি সর্ব্বদাই পরপুরুষের সহিত আমোদ প্রমোদ করিবার জন্য ঔৎসুক্য প্রকাশ করিতেন। ক্রমে এই মহিলার চরিত্রের এতদূর অধঃপতন হইয়াছিল যে কোন সুপুরুষ তাহার অনুগ্রহপ্রার্থী হইলেই তিনি তাহার প্রার্থনা পূরণ করিতে অনুমাত্রও দ্বিধা বোধ করিতেন না। সায়রমোতাক্ষরীণের অনুবাদক হাজিমস্তাফা সাহেব লিখিয়াছেন, সুন্দর সুন্দর নায়ক সংগ্রহ করিবার উদ্দেশ্যে ঘেসেটি বিবীর চর মুর্শিদাবাদ

---

* Sair, vol 1 pages 345, 357. 422.

দাবাদে যাইবার কালে যশোবন্ত রায় রাজবল্লভকে সঙ্গে লইয়া গিয়াছিলেন। সুতরাং তিনি পরদিন রাজবল্লভকে লইয়া নবাব দরবারে উপস্থিত হইলেন। রাজবল্লভ রীতিমতে অভিবাদন করিয়া নবাবের সম্মুখীন হইলে নবাব তাঁহার বিদ্যাবুদ্ধি পরীক্ষা করিবার উদ্দেশ্যে নানাবিধ প্রসঙ্গের অবতারণা করিলেন। রাজবল্লভ এরূপ নিপুণতার সহিত প্রত্যেক প্রশ্নের উত্তর দিলেন যে, নবাব তাঁহার যোগ্যতাবিষয়ে পরিতৃপ্ত হইয়া তাঁহাকে খেবাতসহ যশোবন্ত রায়ের পদে নিযুক্ত করিলেন। (১)

রায় গোকুলচাঁদের পদচ্যুতির পর হোসেনকুলীর প্রতিপত্তির আর পরিসীমা রহিল না। এখন লোকের মনে সংস্কার হইল যে হোসেনের বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হইলে কাহারও পক্ষে সহজে অব্যাহতিলাভ করা সম্ভবপর নহে। সুতরাং সকলেই ভয়ে তাঁহার আদেশ নিরাপত্তিতে প্রতিপালন করিতে লাগিল। সুচতুর হোসেনকুলী মনে করিলেন, ঢাকায় অবস্থান করিতে হইলে তিনি সর্ব্বদা ঘেসেটি বিবির মনোরঞ্জন করিতে পারিবেন না এবং তাঁহার অনুপস্থিতিসুযোগে গোকুলচাঁদের

---

১ রিয়াজু সেলাতিনে লিখিত আছে, মুরাদআলি ঢাকার শাসনকর্ত্তৃত্ব লাভ করিলে যশোবন্ত রায় তাঁহার অত্যাচারে ত্যক্ত হইয়া দেওয়ানীপদে ইস্তাফা দিলেন এবং মুরশিদাবাদ দরবারে আসিয়া অবস্থান করিতে লাগিলেন। পরে সরফরাজ খাঁ রায় আলমচাঁদের প্রতি বিতশ্রদ্ধ হইয়া যশোবন্ত রায়কে বাঙ্গলার রাজস্ব সচীবের পদ প্রদান করিতে ইচ্ছুক হইলেন—Riazoo Salatin, pages 305, 410.

রিয়াজু সেলাতিন বিশ্বাস করিতে হইলে যশোবন্ত রায় কখনও এই সময় ঢাকার দেওয়ানীপদে প্রতিষ্ঠিত থাকিতে পারেন না। সায়র মোতাক্ষরীণের মতে তৎকালে রায় গোকুলচাঁদই ঢাকার দেওয়ান ছিলেন। বোধ হয় হোসেনকুলীর চক্রান্তে গোকুল চাঁদ পদচ্যুত হইলে মুর্শিদাবাদ দরবারে যশোবন্ত রায়কে ঢাকার দেওয়ানীপদে নিযুক্ত করিবার প্রস্তাব হইয়াছিল এবং তখন তিনি বার্দ্ধক্যনিবন্ধন কার্য্য গ্রহণ করিতে অস্বীকার করিয়া রাজবল্লভকে সেই পদে নিযুক্ত করিয়াছিলেন।

বিভাগের কর্ম্মচারিগণ হোসেনের ইঙ্গিত মতে নিকাশে লিখিত অনেক টাকা অন্যায় মতে বাজেয়াপ্ত করিল; সুতরাং সুযোগ্য দেওয়ান এখন অতি অযোগ্য বলিয়া প্রতিপন্ন হইলেন। অগৌণে মুরশিদাবাদদরবার তাঁহাকে পদচ্যুত করিয়া তহবিল তসরূপ অপরাধে তাঁহার যথাসর্ব্বস্ব রাজকোষভুক্ত করিল।

তৎকালে রাজবল্লভ নাওয়ার বিভাগের অধ্যক্ষপদে প্রতিষ্ঠিত ছিলেন। গোকুলচাঁদ পদচ্যুত হইলেই তিনি ঢাকা, চট্টগ্রাম ও শ্রীহট্ট প্রদেশের দেওয়ানী ও সেনাবিভাগের রেসলদারী পদ লাভ করিলেন। *

উমাচরণ বাবু প্রণীত জীবনীতে লিখিত আছে, "ভূতপূর্ব্ব রায় দেওয়ান যশোবন্ত রায় স্থবিরাবস্থানিবন্ধন তীর্থাশ্রমে অবস্থান করিবার উদ্দেশ্যে পদত্যাগের অভিপ্রায় প্রকাশ করিলে, নবাব দেওয়ানীপদোচিত কর্ত্তব্যসম্পাদনক্ষম দ্বিতীয় লোক না পাওয়া পর্য্যন্ত তাঁহাকে অবসর প্রদান করিতে অসম্মত হইলেন। তখন রায় দেওয়ান বলিলেন, নাওয়ার বিভাগের অধ্যক্ষ রাজবল্লভ সেন রাজস্ববিষয়ক কার্য্যে বিলক্ষণ পারদর্শিতা লাভ করিয়াছে। এই যুবক অতি কর্ম্মক্ষম এবং সদ্বংশজাত। ইহার পিতা কৃষ্ণজীবন মজুমদার ভূতপূর্ব্ব নবাবের আমলে নিকাশ প্রস্তুত করিয়া দিয়া একলক্ষ টাকা পুরস্কার লাভ করিয়াছিলেন। রাজবল্লভকে দেওয়ানীপদে নিযুক্ত করিলে রাজস্ববিভাগের কার্য্য যে সুচারুরূপে নির্ব্বাহিত হইবে তদ্বিষয়ে সন্দেহ নাই।" এই কথা শুনিয়া নবাব রাজবল্লভকে দেখিবার নিমিত্ত ইচ্ছা প্রকাশ করিলেন। মুর্শি-

---

* Sair, vol 1 page 423.

উমাচরণ বাবুর মতে রাজবল্লভ ১৭৪২ খৃষ্টাব্দে সেই পদ লাভ করিয়াছিলেন। বোধ হয় রাজবল্লভ দেওয়ানী পদে উন্নীত হইলেই সিরাজউদ্দৌলা নাওয়ার বিভাগের অধ্যক্ষ পদ পাইয়াছিলেন।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ
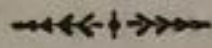
জন্মভূমির উৎকর্ষসাধনে

রাজবল্লভের ভূমিষ্ঠ হওয়ার সময় তাঁহার জন্মভূমি 'দাওনীয়া' নামে আখ্যাত হইত। 'দাওনীয়া' বিক্রমপুরের মধ্যে অতি নগণ্য গ্রাম ছিল। ভূমির নিম্নতাহেতু বৎসরের অধিকাংশ সময় উহা জলে নিমগ্ন থাকিত বলিয়া লোকে এই গ্রামকে 'বিলদাওনীয়া' আখ্যা দিয়াছিল। দাওনীয়ায় অতি অল্পসংখ্যক লোক বাস করিত এবং অধিবাসীদিগের মধ্যে কাহারও অবস্থা তাদৃশ সচ্ছল ছিল না। রাজবল্লভের পিতা কৃষ্ণজীবন মজুমদার স্বীয় আবাসস্থলে "নবরত্ন" নামে একটি প্রাসাদ নির্ম্মাণ করাইয়াছিলেন, তাহাই তৎকালে দাওনীয়া গ্রামের গৌরবস্থল ছিল। কৃষ্ণজীবনের অর্থে 'পুরাতন দীঘি' নামে যে সরোবর খাত হইয়াছিল তদ্ভিন্ন সেই গ্রামে অন্য কোন উল্লেখযোগ্য জলাশয় বিদ্যমান ছিল না। রাস্তা, ঘাট এবং উপযুক্তসংখ্যক জলাশয়ের অভাবনিবন্ধন গ্রামবাসিগণকে সর্ব্বদাই অসুবিধা ভোগ করিতে হইত। গ্রামের অভ্যন্তরে কিংবা নিকটবর্ত্তী স্থলে কোন বন্দর, হাট অথবা বাজার ছিল না বলিয়া অধিবাসী সমস্ত লোককেই অতিকষ্টে সুদূরবর্ত্তী স্থানে গিয়া আবশ্যকবস্তু সংগ্রহ করিতে হইত। বিদ্যালয়ের অভাবে গ্রামবাসী অনেক ভদ্রসন্তান উপযুক্ত শিক্ষালাভ করিতে পারিত না। বিল অঞ্চলের স্রোতবিহীন অপরিষ্কৃত জলে যে নানাবিধ সংক্রামকরোগের বীজাণু নিহিত থাকে, তাহা সকলেই অবগত আছেন। সুতরাং দাও

ন্যায় অন্য কোন ব্যক্তি অনিষ্টসাধনে কৃতকার্য্য হইলে ভবিষ্যতে ঘেসীটি বিবির অনুগ্রহলাভ করাও সম্ভবপর, পক্ষান্তরে সর্ব্বদা নবপ্রণয়িনীর নিকট উপস্থিত থাকিতে পারিলে কেহই তাঁহার বিরুদ্ধাচরণ করিতে সাহস করিবে না। অতএব তিনি ভ্রাতুষ্পুত্র হাসনুদ্দীনকে প্রতিনিধি স্বরূপ ঢাকায় রাখিয়া স্বয়ং মুর্শিদাবাদে অবস্থান করিতে লাগিলেন। নিত্য নূতন নূতন প্রেমাভিনয় করিয়া প্রভুপত্নীর চিত্তবিনোদনে ব্যাপৃত রহিলেন। এই সময় হইতেই ঢাকা বিভাগের শাসনকর্তৃক হাসনুদ্দীন ও রাজবল্লভের প্রতি ন্যস্ত হইল। *

উমাচরণ বাবু লিখিয়াছেন, "দেওয়ানীপদে বরিত হইয়া রাজবল্লভ সাতিশয় যোগ্যতার সহিত কর্ত্তব্য সম্পাদন করিতে লাগিলেন। এই সময় রাজস্ববিভাগের সুবন্দোবস্ত উদ্দেশ্যে অনেক নূতন নূতন বিধান প্রবর্ত্তিত হইল। রাজকর্ম্মচারিগণের অমনোযোগিতার ফলে যে সমস্ত ভূমির উপর কর ধার্য্য হয় নাই, রাজবল্লভ সেই সমস্ত ভূমির কর ধার্য্য করিয়া রাজকোষের আয় অনেক পরিমাণে বৃদ্ধি করিলেন।"

---

* Sair vol 1, page 423.

এই নূতন আবাসস্থল বহুসংখ্যক তোরণদ্বার ও পঞ্চরত্ন, সপ্তদশরত্ন প্রভৃতি রমণীয় হর্ম্ম্যরাজিতে পরিশোভিত হইল। ব্যবসায়িজাতিসমূহ রাজবল্লভের উৎসাহে স্বীয় স্বীয় ব্যবসায়ের উৎকর্ষ সাধন করিয়া অল্পকাল মধ্যে সমৃদ্ধিসম্পন্ন হইয়া উঠিল এবং আপন আপন বাসস্থলে সুন্দর সুন্দর অট্টালিকা নির্ম্মাণ করাইয়া গ্রামের সৌষ্ঠব বৃদ্ধি করিল। যে সমস্ত লোক রাজবল্লভের গৃহে রজক অথবা ক্ষৌরকারের কার্য্য করিত, তাহাদের আবাসস্থলেও ইষ্টকনির্ম্মিত গৃহ প্রস্তুত হইল। ক্রমে তিনি বহুসংখ্যক দেবালয় নির্ম্মাণ করাইয়া তন্মধ্যে দেবতা প্রতিষ্ঠাপিত করিলেন এবং উপযুক্ত পরিমাণে বৃত্তি নিদ্ধারিত করিয়া প্রত্যেক দেবালয়ের ব্যয় নির্ব্বাহের সুবন্দোবস্ত করিয়া দিলেন। জগন্নাথদেব ও মহাপ্রভু রাজসাগরের পশ্চিমতটে সংস্থাপিত হইলেন; বাসুদেব, কাত্যায়নী, রাজরাজেশ্বরী ও লক্ষ্মীগোবিন্দ রাজাবাসের বিভিন্ন অংশে প্রতিষ্ঠাপিত হইয়া রাজবল্লভের প্রগাঢ় ধর্ম্মানুরাগ সপ্রমান করিলেন। সন্ন্যাসী হইতে "লক্ষ্মীনারায়ণ" নামে যে চক্র কৃষ্ণজীবন উপঢৌকন লইয়াছিলেন, তাহা এখন "রাজলক্ষ্মীনারায়ণ" আখ্যা লাভ করিয়া "পঞ্চরত্ন" নামক রমণীয় প্রাসাদে অধিষ্ঠিত হইলেন। শিববাড়ীর দীঘির উত্তরতটে সাতটি মঠ প্রতিষ্ঠা করিয়া তিনি প্রত্যেক মঠে এক একটি পাষাণময় শিবলিঙ্গ সংস্থাপন করিলেন ও প্রত্যেক শিবলিঙ্গে নিয়মিত সেবার নিমিত্ত সুবন্দোবস্ত করিয়া দিতে বিস্মৃত হইলেন না।

গ্রামের ভিন্ন ভিন্ন পল্লীতে রাজবল্লভের ব্যয়ে পাঠশালা, মক্তব ও চতুষ্পাঠী সংস্থাপিত হইল। চতুষ্পাঠীর প্রতিভাসম্পন্ন ছাত্রগণ পাঠ সমাপন করিবার উদ্দেশ্যে নবদ্বীপে প্রেরিত হইতে লাগিল এবং যে সমস্ত ছাত্র নবদ্বীপ হইতে পাঠ সমাপনান্তে উপাধি লাভ করিয়া গৃহে প্রত্যাগমন করিল, রাজবল্লভ তাহাদিগকে উপযুক্ত অর্থ সাহায্য করিয়া

নীয়ার লোকে কিরূপ সুস্থশরীরে জীবনযাপন করিত, তাহা সহজেই অনুমান করা যাইতে পারে। ফলে এই সময় গ্রামের অবস্থা নিতান্তই শোচনীয় ছিল।

রাজবল্লভ উচ্চ রাজপদে প্রতিষ্ঠিত হইয়া জন্মভূমির উৎকর্ষসাধনে মনোভিনিবেশ করিলেন। তাঁহার প্রযত্নে ও ব্যয়ে দাওনীয়া গ্রামের মধ্য দিয়া উত্তরসংস্থিত "রথখোলা" নদী পর্য্যন্ত একটি খাল খাত হইল। ইতিপূর্ব্বে যে সমস্ত জলরাশি সঞ্চিত হইয়া গ্রামের স্বাস্থ্য বিনষ্ট করিতেছিল, তাহা এখন এই খাল দিয়া নির্গত হইতে লাগিল। লোকের পানীয় জলের অভাব দূরীকরণ এবং নিম্নভূমির উচ্চতাসাধনোদ্দেশ্যে তিনি গ্রামের বিভিন্ন অংশে "রাজসাগর," "রাণীসাগর," "মতিসাগর" ও "মহাসাগর" প্রমুখ বহুসংখ্যক সরোবর খনন করাইয়া কেবল যে পানীয়জলের অভাব দূর করিলেন, এমন নহে; খননলব্ধ মৃত্তিকার সাহায্যে বিলের অনেকাংশ সমুন্নত হইয়া সুন্দর সুন্দর ভদ্রাসন ও রাস্তায় পরিণত হইল। তিনি হিন্দুসমাজের বিভিন্নশ্রেণীস্থ লোকদিকের দাওনীয়ায় আসিয়া গৃহ প্রতিষ্ঠা করিবার নিমিত্ত আহ্বান করিলেন। অতএব দাওনীয়া বিভিন্ন পল্লিতে বিভক্ত হইল এবং এক এক জাতীয় লোক এক এক পল্লীতে শ্রেণীবদ্ধভাবে বাস করিতে লাগিল। রাজসাগরের উত্তর তটে একটি বন্দর সংস্থাপিত হইল এবং বিবিধ প্রকারের পণ্য দ্রব্যের আমদানী ও রপ্তানী-দ্বারা তাহা অচিরে সমৃদ্ধিসম্পন্ন হইয়া উঠিল।

কৃষ্ণজীবন ছয়টি পুত্র রাখিয়া কালগ্রাসে পতিত হইয়াছিলেন। তিনি যে ভদ্রাসনে বাস করিতেন, তথায় সমস্ত পুত্রকলত্রসহ রাজবল্লভের অবস্থান করিবার স্থান সঙ্কুলন হইয়া উঠিল না। এইজন্য রাজবল্লভ সেই স্থান হইতে উঠিয়া আসিয়া দক্ষিণদিকে গৃহপ্রতিষ্ঠা করিলেন।

কোটি শিব কুরাশি, তুল্য প্রায় কাশী
দৃষ্টি কর কলির জীব॥

দাওনীয়া নাম রাজনগরে পরিবর্ত্তিত হওয়া সম্বন্ধে যে একটি কিংবদন্তী প্রচলিত আছে তাহা নিম্নে লেখা গেল।

যে সময় জন্মভূমির উৎকর্ষ সাধিত হইতেছিল, তৎকালে রাজবল্লভ রাজকার্য্যাপলক্ষে মুর্শিদাবাদে অবস্থান করিতেছিলেন। নগণ্য "বিল দাওনীয়া" সমৃদ্ধ ও সৌষ্ঠব সম্পন্ন রাজনগরে পরিণত হইলে তিনি জন্মভূমি দর্শন করিবার অভিপ্রায়ে মুর্শিদাবাদ পরিত্যাগ করিলেন। গ্রামের নিকটবর্ত্তী হইয়া রাজবল্লভ ছদ্মবেশধারণপূর্ব্বক রজনীযোগে পদব্রজে অগ্রসর হইতে লাগিলেন এবং পথে কাহারও সাক্ষাৎ পাইলে তাহার নিকট বিল দাওনীয়া কোন পথে যাইতে হয় তাহা জিজ্ঞাসা করিতেও ত্রুটি করিলেন না। সকলেই উত্তর করিল "বিল দাওনীয়া নামে কোন গ্রামের অস্তিত্ব নাই, যদি রাজনগরের পথ জানিতে চাহেন তবে তাহা দেখাইয়া দিতে পারি।" রাজবল্লভ তাঁহাদের প্রদর্শিত পথে ক্রমে নিজালয়ের প্রথম তোরণদ্বারে উপনীত হইলেন। জনৈক প্রহরী সেই দ্বার রক্ষা করিতেছিল, তিনি তাহা অতিক্রম করিতে উদ্যত হইলেই দ্বারবান্ ছদ্মবেশধারী রাজবল্লভকে চিনিতে না পারিয়া তাঁহার গতিরোধ করিয়া দাঁড়াইল। অগত্যা তিনি উৎকোচের সাহায্যে দ্বারবান্‌কে বশীভূত করিয়া প্রথম দ্বার অতিক্রম করিলেন। ক্রমে আরও দুইটি দ্বারে দ্বাররক্ষকগণ তাঁহার গতিরোধ করিল এবং তিনি তাহাদিগকেও উৎকোচ দিয়া উভয় দ্বারেই প্রবেশ করিতে সমর্থ হইলেন। চতুর্থ দ্বারের নিকট আসিয়া তাহাও অতিক্রম করিতে উদ্যত হইলেন, কিন্তু দ্বারবান্ এবার তাঁহাকে কোন ক্রমেই অগ্রসর হইতে দিল না। এবারেও তিনি উৎকোচের লোভ প্রদর্শন করিলেন, কিন্তু বিশ্বস্ত দ্বারবান্ তাহাতে

চতুষ্পাঠীস্থাপনের সুবিধা করিয়া দিলেন। এইরূপে নগণ্য বিলদাওনীয়া গ্রাম একটি প্রধান পণ্ডিতসমাজে পরিণত হইল। নীলকণ্ঠ সার্ব্বভৌম, কৃষ্ণদেব বিদ্যাবাগীশ ও কৃষ্ণকান্ত সিদ্ধান্ত প্রমুখ যে সমস্ত ব্রাহ্মণ পণ্ডিত বঙ্গদেশে সবিশেষ খ্যাতি লাভ করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন, তাঁহারা সকলেই রাজবল্লভের উৎসাহে ও অর্থ সাহায্যে নবদ্বীপে গিয়া পাঠ সমাপন করিয়াছিলেন।

চতুঃপার্শ্বস্থ বিলের অধিকাংশ স্থান গ্রামের অন্তর্ভুক্ত হইলে দাওনীয়ার আয়তন অনেক পরিমাণে বৰ্দ্ধিত হইল। এখন হইতে দাওনীয়া নাম উঠিয়া গেল এবং এই উন্নতিশীল জনপদ "রাজনগর" আখ্যা ধারণ করিল। রাজবল্লভের সময় "রাজনগর" যে অবস্থায় উন্নীত হইয়াছিল তাহা প্রথম অধ্যায়ের প্রথম পরিচ্ছেদে বর্ণনা করা হইয়াছে। ভট্ট কবি সত্যই গাহিয়াছেন—

বিল দাওনীয়া ভরি, অট্টালিকা পুরী
নির্ম্মাইল নরেশ্বর।
সব দালান পাকা, চক মিলান পাকা
যেন অমর নগর॥
শত রত্নবিধি, পঞ্চ রত্ন আদি
একুশ রত্ন মনোহর॥
দোল মঞ্চ শোভা, আহামরি কিবা
সুমেরুর চূড়া প্রায়।
দীঘি সরোবর, সব প্রায় সাগর
স্থানে স্থানে দেখা যায়॥
কত স্থানে স্থান দেবালয় নির্ম্মাণ
শিবালয়ে স্থাপিত শিব।

বাঙ্গালাদেশের বৈদ্য সম্প্রদায় পঞ্চকোট, রাঢ় বারেন্দ্র, বঙ্গ ও পূর্ব্ব-কুল এই কয় মেলে বিভক্ত আছেন। রাজবল্লভের প্রথমা দুই পত্নী বঙ্গীয় মেলের, তৃতীয়া পত্নী বরেন্দ্র মেলের এবং চতুর্থ পত্নী রাঢ়ীয় মেলের বৈদ্যবংশে সমুদ্ভূত হইয়াছিলেন।

প্রথমা পত্নীর নাম শশিমুখী দেবী। কৃষ্ণজীবন মজুমদারের জীবিতাবস্থায়ই এই মহিলার সহিত রাজবঃভের পরিণয় সম্পন্ন হইয়াছিল। বয়ঃপ্রাপ্তির পর রাজকার্য্যে প্রসিদ্ধি লাভ করিয়া তিনি ক্রমে অপর তিন মহিলার পাণিগ্রহণ করিয়াছিলেন।

রাজবল্লভের অভ্যুদয়ের কিয়ৎকাল পূর্ব্বহইতেই বৈদ্য-সমাজে পূর্ব্বোক্ত পাঁচমেলের মধ্যে আদান প্রদান প্রথা রহিত হইয়া গিয়াছিল। প্রতাপ বাবু লিখিয়া জানাইয়াছেন, সেই সমস্ত মেলের মধ্যে আদান প্রদান প্রথা প্রবর্ত্তিত করিবার উদ্দেশ্যেই রাজবল্লভ নাটোর ও শ্রীখণ্ড অঞ্চলে বিবাহ করেন।

শ্রীখণ্ডসমাজস্থ কোন বৈদ্য-কন্যা যে রাজবল্লভের সহিত পরিণীতা হইয়াছিলেন, এ কথা শ্রীখণ্ডনিবাসী শ্রীযুক্ত দুর্গাচরণ চৌধুরী মহাশয় অস্বীকার করেন। শ্রীখণ্ড রাঢ়সমাজের অন্তর্ভুক্ত। আচারনিষ্ঠার শ্রেষ্ঠতানিবন্ধন রাঢ়ীয় বৈদ্যেরা বঙ্গীয় বৈদ্যকে সমশ্রেণীতে আসন প্রদান করিতে প্রস্তুত নহে। বোধহয় এইজন্যই দুর্গাচরণ বাবু রাঢ়ীয় সমাজে যে রাজবল্লভ বিবাহ করিয়াছিলেন, একথা স্বীকার করিতে কুণ্ঠিত হইতেছেন। ফলে বিক্রমপুর বৈদ্য সমাজে সেই বিবাহের কথা এতদূর রাষ্ট্র যে, একমাত্র দুর্গাচরণ বাবুর উক্তির প্রতি নির্ভর করিয়া তৎসম্বন্ধে অবিশ্বাস করা সঙ্গত নহে। শ্রীখণ্ড গ্রামে অদ্যাপি মহারাজ রাজবল্লভের প্রতিষ্ঠাপিত ভূতনাথ দেবের মন্দির বিদ্যমান রহিয়াছে। বিক্রমপুর সমাজস্থ বৈদ্যসম্প্রদায়ের মতে সেই মন্দির মহারাজের শ্বশুরালয়েই

বশীভূত না হইয়া স্থিরভাবে তাঁহার গতিরোধ করিয়া দাঁড়াইল। এখন আত্মপরিচয় দেওয়া ভিন্ন রাজবল্লভের আর গত্যন্তর রহিল না দ্বারবান্ প্রভুকে চিনিতে না পারিয়া তাঁহার প্রবেশ পথে বাধা প্রদান করিয়াছিল। রাজবল্লভ আত্মপরিচয় দিলে প্রভুভক্ত দ্বারবান্ নতজানু হইয়া ক্ষমা প্রার্থনা করিল এবং বিনীতভাবে দ্বার ছাড়িয়া দিয়া সসভ্রমে এক পাশ্বে আসিয়া দাঁড়াইল। শেষোক্ত দ্বারবানের কর্ত্তব্যনিষ্ঠা দেখিয়া রাজবল্লভ নিরতিশয় প্রীত হইলেন এবং পরদিন তাহাকে পুরস্কৃত ও অপর তিনজনকে পদচ্যুত করিয়া ন্যায়ের মর্য্যাদা রক্ষা করিলেন।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

পুত্রকলত্রে

রাজবল্লভ ক্রমে চারিটি দ্বার পরিগ্রহ করিয়াছিলেন। প্রথমা পত্নী বিক্রমপুরের মধ্যগত হাতারভোগগ্রাম নিবাসী গণবংশে, দ্বিতীয়া পত্নী ফরিদপুর জিলার অন্তর্গত বাণীবহগ্রামনিবাসী মাধববংশে, তৃতীয়া পত্নী নাটোর অঞ্চলে এবং চতুর্থ পত্নী বৰ্দ্ধমান জেলার অন্তর্গত শ্রীখণ্ড গ্রামনিবাসী সুপ্রসিদ্ধ গোস্বামী বংশে জন্মগ্রহণ করেন। (১)

১। শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রমোহন রায় বলেন, রাজবল্লভ নাটোর অঞ্চলে কোন বিবাহ করেন নাই; তাঁহার তৃতীয়া পত্নী যসোহর জিলার অন্তর্গত ইতিনাগ্রামবাসী নয়দাশ বংশোদ্ভবা ছিলেন। কিন্তু মহারাজবংশপ্রভব শ্রীযুক্ত প্রতাপ বাবু নাটোর অঞ্চলে বিবাহের কথাই সমর্থন করেন।

জনৈক ব্রাহ্মণের প্রার্থনানুসারে তিনি শশিমুখীকে সেই ব্রাহ্মণের করে অর্পণ করিতে বাধ্য হন। রাজবল্লভের দ্বিতীয় পুত্র কৃষ্ণদাস তৎকালে দ্বাররক্ষাকার্য্যে নিযুক্ত ছিলেন। ব্রাহ্মণ শশিমুখীকে লইয়া সিংহদ্বার পর্য্যন্ত আসিলে কৃষ্ণদাস একলক্ষ টাকা দিয়া জননীকে ব্রাহ্মণের কবল হইতে উদ্ধার করেন। রাজবল্লভ দত্তাপহারী হইবার ভয়ে তদবধি শশিমুখীর সংসর্গ পরিত্যাগ করিতে কৃতসংকল্প হইয়া বাণীবহ গ্রামে বিবাহ করেন।”

মেল-বন্ধন-নিবন্ধন যে বঙ্গীয় হিন্দুসমাজের অনেক অবনতি ঘটিয়াছে তাহা এখন অনেকেই স্বীকার করেন। কিন্তু এক পত্নী বিদ্যমান থাকিতে দ্বিতীয় দার পরিগ্রহ করিলে যে সমাজের বিবিধ প্রকার অনিষ্ট হইতে পারে, একথা কি কেহ অস্বীকার করিতে পারেন? হিন্দু শাস্ত্রে একাধিক দারপরিগ্রহণ-বিষয়ে কোনরূপ নিষেধ-বিধি প্রচলিত না থাকিলেও, সনাজের অনিষ্ট চিন্তা করিয়া হিন্দুসাধারণ রাজবল্লভের পূর্ব্ব হইতে এক পত্নী বিদ্যমানে দ্বিতীয় দার বিবাহ করিতে বিরত হইয়াছিল। রাজবল্লভের সময় বাঙ্গলাপ্রবাসী প্রধান প্রধান মুসলমানগণ একাধিক পত্নী গ্রহণ করিতে অণুমাত্রও কুণ্ঠিত হইতেন না এবং তাঁহাদের পদাঙ্ক অনুসরণ করিয়া বঙ্গীয় প্রধান প্রধান হিন্দু রাজপুরুষগণও বহুবিবাহরূপ কুপ্রথা অবলম্বন করিতে দ্বিধা বোধ করেন নাই। ফলে তৎকালে হিন্দুসমাজ এতদূর অধঃপাতে গিয়াছিল যে, সম্পন্ন লোকেরা একাধিক পত্নী গ্রহণ করা শ্লাঘার বিষয় মনে করিতেন। রাজবল্লভ সর্ব্বদা মুসলমান আমির ওমরাহের সংসর্গেই কালযাপন করিয়াছেন। বোধহয় এই নিমিত্তই তাঁহার ন্যায় বিচক্ষণ ব্যক্তিও, বহুবিবাহ যে সমাজে অনিষ্টকর, তাহা লক্ষ্য করিতে না পারিয়া মেলভঙ্গের উদ্দেশ্যে এই কুপ্রথার আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছিলেন।

সংস্থাপিত হইয়াছে। প্রতাপ বাবু বলেন, তাঁহার স্বর্গীয় পিতৃদেব রাজবল্লভের রাঢ়দেশীয় পত্নীকে স্বচক্ষে দেখিয়াছিলেন এবং তিনি সময় সময় প্রতাপ বাবুর নিকট সেই মহিলাসংক্রান্ত অনেক কথা বলিয়াছেন। কলিকাতা হাইকোর্টের ভূতপূর্ব্ব উকিল, রায়চাঁদ প্রেমচাঁদ বৃত্তিধারী ডাক্তার প্রিয়নাথ সেন বলিয়া গিয়াছেন, রাজবল্লভের অনুসরণ করিয়া তাঁহার পূর্ব্বপুরুষ রামানন্দ সরকার গোবিন্দপ্রিয়া নামে শ্রীখণ্ডসমাজ প্রভব জনৈক মহিলার পাণিগ্রহণ করিয়াছিলেন এবং সেই মহিলার হস্তাক্ষর অদ্যাপি তাঁহাদের গৃহে বিদ্যমান আছে। প্রিয়বাবুর মতে সেই সমস্ত হস্তলিপি এত সুন্দর যে তাহা আদর্শ হস্তলিপি বলিয়া পরিগণিত হইতে পারে। দুর্গাচরণ বাবু বলেন রাজবল্লভ যজ্ঞোপবীত-পদ্ধতি জানিবার উদ্দেশ্যে শ্রীখণ্ড গিয়া ভূতনাথ দেবের মন্দির প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন। কিন্তু মন্দিরের প্রাচীরে যে শ্লোক উৎকীর্ণ রহিয়াছে তাহা এই পুস্তকের যথাস্থানে উদ্ধৃত করা গিয়াছে। সেই শ্লোকেই লিখিত আছে, মন্দির প্রতিষ্ঠাতা রাজবল্লভ অগ্নিষ্টোমী ও বাজপেয়ী ছিলেন। যাঁহারা উপনীত নহেন, হিন্দুশাস্ত্র-মতে তাঁহাদের অগ্নিষ্টোম ও বাজপেয় যজ্ঞ করিবার অধিকার নাই। এতদ্দ্বারা ইহাই সিদ্ধান্ত হয় যে, ভূতনাথ-দেবের মন্দির প্রতিষ্ঠা করিবার পূর্ব্বেই রাজবল্লভ উপনয়ন সংস্কার লাভ করিয়াছিলেন। অতএব তিনি যে যজ্ঞোপবীতপদ্ধতি জ্ঞাত হইবার উদ্দেশ্যে শ্রীখণ্ডে গিয়া সেই মন্দির প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন. তাহা সত্য বলিয়া পরিগৃহীত হইতে পারে না।

রাজবল্লভ কেন যে প্রথমা পত্নী বিদ্যমানেও বাণীবহগ্রামে বিবাহ করেন, তৎসম্বন্ধে কোন সন্তোষজনক কারণ দেখিতে পাওয়া যায় না। তবে প্রতাপ বাবুর নিকট যে হস্তলিখিত পুস্তক পাওয়া গিয়াছে, তাহাতে লিখিত আছে, "কোন সময় রাজবল্লভ কল্পতরুব্রতের অনুষ্ঠান করিলে

চতুর্থ অধ্যায়

প্রথম পরিচ্ছেদ

রাজোপাধিলাভে

১৭৪০ খৃষ্টাব্দে প্রভুর নির্দ্দেশ অনুসারে রাজবল্লভ ঢাকা-বিভাগের নিকাশসহ মুর্শিদাবাদে আগমন করিলেন। এই সময় পুত্র রামদাস ও কৃষ্ণদাস এবং ভ্রাতুষ্পুত্র রায় মৃত্যুঞ্জয় তাঁহার অনুগামী হইয়াছিলেন। বিক্রমপুরের অন্তর্গত জপ্‌সা নিবাসী লালা রামপ্রসাদ তৎকালে মুর্শিদাবাদে অবস্থান করিতেছিলেন, তিনি রাজবল্লভের আগমন বার্ত্তা শুনিয়াই তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসিলেন। রামপ্রসাদ জ্ঞাতিত্ব সম্পর্কে রাজবল্লভের ভ্রাতুষ্পুত্র হইতেন, সুতরাং অপরিচিত স্থানে এরূপ একটি আত্মীয়ের সাক্ষাৎ পাইয়া রাজবল্লভের আর আনন্দের সীমা রহিল না। তিনি রামপ্রসাদের নিকট জিজ্ঞাসা করিয়া মুর্শিদাবাদ দরবারের বর্ত্তমান অবস্থা সম্যকরূপে অবগত হইলেন এবং তাঁহারই পরামর্শ মতে উপযুক্ত সময়ে নবাব দরবারে নিকাশ উপস্থাপিত করিয়া উদ্বৃত সমস্ত রাজস্ব কোষাধ্যক্ষ জগৎশেঠের আলয়ে প্রেরণ করিলেন। (১)

এই নিকাশে রাজবল্লভের যথেষ্ট যোগত্যা প্রকাশ পাইল এবং নিবাইস অতিশয় সন্তুষ্ট হইয়া রাজবল্লভকে স্বীয় সভাসদরূপে কিয়ৎকাল মুর্শিদাবাদে অবস্থান করিবার নিমিত্ত আদেশ প্রদান করিলেন।

(১) উমাচরণ রায় প্রণীত জীবনী।

প্রথমা পত্নী শশিমুখীর গর্ভে রাজবল্লভের সাতটি পুত্র ও দুইটি কন্যা জন্মিয়াছিল। পুত্রগণের নাম যথাক্রমে রামদাস, কৃষ্ণদাস, গঙ্গাদাস, রতনকৃষ্ণ, গোপালকৃষ্ণ, রাধামোহন এবং কেবলরাম। তাঁহার প্রথমা তনয়া বর্ত্তমান খুলনা জিলার অন্তর্গ সেনহাটি গ্রামে অরবিন্দ-বংশোদ্ভব গোবিন্দরাম দাসের সহিত পরিণীতা হইয়াছিলেন। গোবিন্দরামের পুত্রের নাম রামদুলাল। রামদুলাল নবকুমার নামে পুত্র বিদ্যমান রাখিয়া পরলোক গমন করেন। নবকুমারের পুত্র প্যারিমোহন অদ্যাপি জীবিত আছেন।

রাজবল্লভের দ্বিতীয়া কন্যা সম্বন্ধীয় বৃত্তান্ত পরবর্ত্তী পরিচ্ছেদে বিস্তৃতভাবে আলোচিত হইবে। সুতরাং দ্বিরুক্তির ভয়ে এস্থলে সে বিষয়ে কোন কথার অবতারণা করা হইল না।

পিতা কৃষ্ণজীবনের পদাঙ্ক অনুসরণ করিয়া রাজবল্লভও আপন পুত্রগণের সুশিক্ষা নিমিত্ত বিস্তর প্রয়াস পাইয়াছিলেন। রাজবল্লভের উত্তরপুরুষগণের বর্ত্তমান আবাস স্থলে অদ্যাপি কতিপয় ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কামান দেখিতে পাওয়া যায়। লোকে বলে রাজবল্লভের পুত্রগণ সেই সমস্ত কামানের সাহায্যে কৃত্রিম যুদ্ধাভিনয় করিত। চতুর্থ পুত্র রতনকৃষ্ণ অশ্বারোহণে সবিশেষ নৈপুণ্য লাভ করিয়াছিলেন এবং দেওয়ালের উপরিভাগের ন্যায় অপ্রশস্ত স্থান দিয়াও তিনি অনায়াসে দ্রুতবেগে অশ্বচালনা করিতে পারিতেন।

রহিয়াছে। মাহাতাপ ভ্রাতার উক্তির প্রতিবাদ না করিয়া কয়েক দিন পরে রাজবল্লভকে লইয়া জগৎশেঠের দরবারে উপস্থিত হইলেন। এস্থলে উভয়ের সাক্ষাৎ সম্বন্ধে আলাপ পরিচয় হইল এবং জগৎশেঠ রাজবল্লভের বাক্‌পটুতায় সন্তুষ্ট হইয়া তদবধি তাঁহাকে প্রীতির চক্ষে নিরীক্ষণ করিতে লাগিলেন।

নিবাইস এই সময় নেজামতের দেওয়ানী পদে প্রতিষ্ঠিত ছিলেন। সহকারী অভাবে তিনি সেই পদোচিত কর্ত্তব্য সুচারুরূপে নির্ব্বাহ করিয়া উঠিতে পারিতেছিলেন না। এজন্য তিনি আলিবর্দ্দীর নিকট জনৈক সহযোগী নিয়োগের প্রস্তাব করিয়া পাঠাইলেন। জগৎশেঠের অনুরোধ উপেক্ষা করিতে না পারিয়া আলিবর্দ্দী রাজবল্লভকেই সেই পদ প্রদান করিলেন। এই অভিনব পদে বরিত হওয়ার অব্যবহিত পরেই রাজবল্লভ নবাবদরবারহইতে রাজোপাধিতে ভূষিত হইলেন এবং স্বয়ং জগৎশেঠ ভ্রাতৃসখাকে স্বহস্তে রাজভূষণ পরিধান করাইয়া দিয়া আত্মীয়তাপ্রদর্শন করিলেন। এই উপলক্ষে রাজবল্লভকে নবাবসরকারে এক সহস্র স্বর্ণমুদ্রা নজরস্বরূপ প্রদান করিতে হইল এবং তিনি বহুসংখ্যক ব্রাহ্মণপণ্ডিত, দীনদরিদ্র ও আত্মীয় স্বগণকে উপঢৌকন দিয়া আনন্দোৎসব করিলেন। (১)

---

(১) উমাচরণ বাবু লিখিয়াছেন, "উপযুক্ত পাত্রের অভাবে আলিবর্দ্দীর দেওয়ানী পদ অনেক দিন পর্য্যন্ত শূন্য ছিল এবং নিবাইস ঐ পদোচিত কর্ত্তব্য সম্পাদন করিয়া আসিতেছিলেন। রাজবল্লভ মুর্শিদাবাদে আসিলে, আলিবর্দ্দী রাজবল্লভের যোগ্যতায় মুগ্ধ হইয়া তাঁহাকেই জগৎশেঠের অনুরোধে রাজোপাধি দিয়া সেই পদে নিযুক্ত করিলেন।

সায়র মোতাক্ষরীণে লিখিত আছে যে, আলিবর্দ্দী নবাব হইয়া নিবাইস মহম্মদকে নেজামতের দেওয়ানীপদ প্রদান করেন এবং তিনি আজীবন সেই পদে প্রতিষ্ঠিত

উমাচরণ বাবুর মতে এই সময়ই রাজবল্লভ জগৎশেঠের সহিত সৌহার্দ্দসূত্রে আবদ্ধ হইলেন। যে ঘটনা উপলক্ষে এই আত্মীয়তার সূত্রপাত হইল তাহা উমাচরণ বাবু নিম্নলিখিতরূপে বর্ণনা করিয়াছেন—

"মুর্শিদাবাদ অবস্থান কালে রাজবল্লভ একদিন ভাগীরথীর সৈকতে বসিয়া নানাবিধ উপহারে সুরধুনীদেবীর অর্চ্চনা করিতেছিলেন। তৎকালে জগৎশেঠের কনিষ্ঠ ভ্রাতা মহাতাপচাঁদ (১) সেই স্থলের নিকটে জল-বিহারে বহির্গত হইয়াছিলেন। শেঠনন্দন নৌকা হইতে দেখিলেন, পূজা শেষ করিয়া রাজবল্লভ দেবীর উদ্দেশ্যে প্রণাম করিলে, কঙ্কণ পরিহিত একখানি রমণীহস্ত ভাগীরথীর সলিলরাশির অভ্যন্তর হইতে উত্থিত হইয়া রাজবল্লভের মস্তকোপরি নির্ম্মাল্য স্থাপন করিতেছে। এই ঘটনা প্রত্যক্ষ করিয়া তিনি নিরতিশয় বিস্ময়াবিষ্ট হইলেন। তৎকালে রাজবল্লভের সহিত মহাতাপচাঁদের আলাপ পরিচয় না থাকিলেও অর্চ্চনাকারী যে সামান্য লোক নহেন, ইহা মনে করিয়া তিনি জনৈক পার্শ্বচরের সাহায্যে রাজবল্লভকে ডাকিয়া পাঠাইলেন। রাজবল্লভ নৌকায় আসিলে মহাতাপচাঁদ তাঁহার সহিত আলাপ করিয়া এতদূর প্রতিলাভ করিলেন যে, উভয়ে সেই সময় শপথপূর্ব্বক বন্ধুতাসূত্রে আবদ্ধ হইলেন।

মহাতাপ অতঃপর স্বগৃহে প্রত্যাগমনপূর্ব্বক জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার নিকট এই সত্যবন্ধনের কথা বলিলে, জগৎশেঠ তাঁহাকে বলিলেন, অজ্ঞাতকুলশীল লোকের সহিত ঘনিষ্ঠতাদ্বারা পদে পদে বিপদের সম্ভাবনা

(১) লঙ্ সাহেবের প্রকাশিত ইংরাজ দপ্তরের কাগজ অনুসারে মহাতাপচাঁদ স্বয়ংই জগৎশেঠ ছিলেন এবং তাঁহার কোন সহোদর বিদ্যমান ছিল না। সেই সমস্ত কাগজে লিখিত আছে যে, মহাতাপচাঁদের খুল্লতাতভ্রাতা স্বরূপচাঁদ একজন উচ্চপদস্থ রাজপুরুষ ছিলেন এবং আলিবর্দ্দি হইতে "মহারাজ" উপাধি পাইয়াছিলেন।

Long's Unpublished Records, Pages, 518 & 519

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

রামদাস ও কৃষ্ণদাস

যে সময় রামদাস পিতার প্রতিনিধিস্বরূপ ঢাকায় প্রেরিত হইলেন, তৎকালে তাঁহার বয়ঃক্রম চতুর্দ্দশ বৎসর অতিক্রম করে নাই। বয়সে বালক হইলেও বিচক্ষণতায় তিনি প্রবীণ অপেক্ষা কোন অংশে ন্যূন ছিলেন না।

পূর্ব্বে রাজনগর হইতে নৌকাপথে ঢাকায় আসিতে হইলে রথখোলা, মেঘনা এবং ধলেশ্বরী নামক তিনটি নদী ক্রমে অতিক্রম করিতে হইত এবং তাহাতে কোন রূপেই তিন দিবসের কম সময়ে ঢাকায় উপস্থিত হওয়া যাইত না। প্রত্যহ প্রত্যূষে রাজনগর হইতে যাত্রা করিয়া কার্য্যারম্ভের সময় কিরূপে নৌকাপথে ঢাকায় উপস্থিত হইবেন, রামদাস

লালা রামপ্রসাদের জনক। রাজবল্লভের উত্তরপুরুষগণের মতে রামপ্রসাদ রাজবল্লভের নিজস্ব মহালের প্রধান কর্ম্মচারী ছিলেন। কিন্তু রামপ্রসাদের অতিবৃদ্ধ প্রপৌত্র সুলেখক শ্রীযুক্ত আনন্দনাথ রায় মহাশয় বলেন, রামপ্রসাদ রাজবল্লভের কর্ম্মচারী ছিলেন না; তিনি প্রথমতঃ নবাব সরকারে ওহদাদারী কার্য্য করিতেন ও পরে নেজামতের পেস্কারীপদে নিযুক্ত হইয়াছিলেন। জপসার ছয় হাবেলীর অধিকাংশ লোকের মতে রামপ্রসাদ রাজবল্লভেরই কর্ম্মচারী ছিলেন। রাজবল্লভের উত্তরপুরুষগণ মধ্যে বিরোধের ফলে যে রাজনগর পরগণা টমসন সাহেব বাটোয়ারা করিয়া দিয়া রাজবল্লভের বিধবা পত্নীগণের মাসিক বৃত্তির নিমিত্ত রেভিনিউ বোর্ডে যে চিঠি লিখেন, তাহা পরিশিষ্টে উদ্ধৃত করা হইল। সেই চিঠিতে স্পষ্ট লিখিত আছে যে, রামপ্রসাদ রাজবল্লভেরই কর্ম্মচারী ছিলেন।

রাজবল্লভ নেজামতের দেওয়ানী-বিভাগে প্রবেশ লাভ করিলেও ঢাকা-বিভাগের দেওয়ানীপদ তাঁহারই হস্তে অর্পিত রহিল। কিন্তু মুর্শিদাবাদে অবস্থান করিয়া সুদূরবর্ত্তী ঢাকা-বিভাগের দেওয়ানীপদোচিত সমস্ত কর্ত্তব্য নির্ব্বাহ করা কাহারও সাধ্যায়ত্ত ছিল না। ঢাকার নায়েব নাজিম হোসেনকুলী খাঁ ইতিপূর্ব্বে ভ্রাতুষ্পুত্র হাসনউদ্দিনকে প্রতিনিধিস্বরূপ ঢাকায় রাখিয়া মুর্শিদাবাদ হইতেই পদোচিত কর্ত্তব্য সম্পাদন করিতেছিলেন। রাজবল্লভ মনে করিলেন, পুত্র রামদাসকে প্রতিনিধিস্বরূপ ঢাকায় রাখিতে পারিলে তিনিও হোসেন কুলীর ন্যায় ঢাকা-বিভাগের দেওয়ানী-পদোচিত কর্ত্তব্য সম্পাদন করিতে পারিবেন। সুতরাং তিনি নবাবদরবারে রামদাসকে প্রতিনিধিস্বরূপ ঢাকায় রাখিবার প্রস্তাব উপস্থাপিত করিলেন। নবাব সেই প্রস্তাবে অনুমোদন করিলে রামদাস প্রতিনিধি দেওয়ান হইয়া ঢাকায় প্রেরিত হইলেন। এই সময় বাল্যসহচর রামানন্দ সরকার রাজবল্লভের সেরেস্তাদারী-পদ এবং ভ্রাতুষ্পুত্র রায় মৃত্যুঞ্জয় ঢাকার নাওয়ার বিভাগের পেস্কারী পদ লাভ করিলেন।

উমাচরণ বাবু লিখিয়াছেন, লালারামপ্রসাদ এই সময় নবাবসরকারের কার্য্যে ইস্তাফা করিয়া রাজবল্লভের অমাত্যপদে বরিত হইলেন। (১)

ছিলেন। রাজবল্লভ যে কখনও নেজামতের দেওয়ান হইয়াছিলেন, এ কথা সায়র মোতাক্ষরীনে পাওয়া যায় না। বোধ হয় আমোদপ্রিয় নিবাইস মহম্মদ দেওয়ানী পদোচিত কঠোর কর্ত্তব্যভার লঘু করিবার উদ্দেশ্যে রাজবল্লভকে সহকারিরূপে নিযুক্ত করাইয়া তদ্দ্বারা সেই বিভাগের কার্য্য পর্য্যবেক্ষণ করাইতেছিলেন এবং উমাচরণ বাবু তাহাতেই ভ্রমে পতিত হইয়া রাজবল্লভের দেওয়ানীপদ পাওয়ার কথা লিখিয়াছেন।

(১) লালা রামপ্রসাদ অতিশয় বিখ্যাত লোক ছিলেন। বেদগর্ভসেনের নীলকণ্ঠনামক যে পুত্র জপসাগ্রামে গৃহপ্রতিষ্ঠা করেন, তাঁহার বৃদ্ধ প্রপৌত্র কৃষ্ণরামসেনেই

বলে, রামদাস ঢাকা আসিবার পথে তালতলার সমীপবর্ত্তী হইলে সেই মন্দিরে গিয়া প্রাতরর্চনা সম্পাদন করিতেন। এই জনশ্রুতির মূলে যে সত্য নিহিত আছে তদ্বিষয়ে সন্দেহ নাই। রাজবল্লভের উত্তরপুরুষগণ মধ্যে তৎপরিত্যক্ত সম্পত্তিসম্বন্ধে বিরোধ উপস্থিত হইলে টমসন সাহেব তাহা ভিন্ন ভিন্ন অংশে বিভক্ত করিয়া দিয়াছিলেন। টমসন সাহেব কৃত বাটারার কাগজপত্রপাঠে প্রতীয়মান হইবে যে, রাজবল্লভই এই মন্দির ও দেবতামূর্ত্তির প্রতিষ্ঠা করিয়া "আনন্দময়ী দেবীর" সেবার নিমিত্ত প্রায় তিন শত বিঘা ভূমি উৎসর্গ করিয়া দিয়াছিলেন। অদ্যাপি সেই সমস্ত ভূমি "আনন্দময়ীর বৃত্তি" নামে অভিহিত হইতেছে।*

উমাচরণ বাবু লিখিয়াছেন "রামদাস অতিশয় কর্ম্মঠ লোক ছিলেন। তিনি সর্ব্বদা ন্যায়পথে থাকিয়া দৃঢ়তাসহকারে পদোচিত কর্ত্তব্য সম্পাদন করিতেন। রাজকার্য্যে প্রতিষ্ঠিত হইয়াই রামদাস ঢাকা বিভাগের সমস্ত ভূম্যধিকারীকে আহ্বান করিলেন। ভূম্যধিকারিগণ তদনুসারে রামদাসের দরবারে উপস্থিত হইলে তিনি তাঁহাদিগকে বলিলেন, 'আপনাদের অধিকারমধ্যে যে সমস্ত দস্যু ও তস্কর বাস করে তাহাদিগকে অবিলম্বে নির্ব্বাসিত করিতে হইবে।' ভূম্যধিকারিগণ সেই প্রস্তাবে সম্মত হইয়া প্রতিজ্ঞাপত্রে সাক্ষর করিলে তিনি তাঁহাদিগকে বিদায় প্রদান করিলেন। ফলতঃ রামদাসের সুশাসনে অল্পকাল-মধ্যেই ঢাকা

---

* তালতলা বন্দরের নিকট খালের উপর দিয়া একটি ইষ্টকনির্ম্মিত সুদৃঢ় সেতু ও সেতুর পশ্চিমভাগে একটি ইষ্টকনির্ম্মিত পঞ্চরত্ন এবং পঞ্চরত্নের অভ্যন্তরে একটি সুবৃহৎ পাষাণময় শিবলিঙ্গ দেখিতে পাওয়া যায়। সমীপবর্ত্তী লোকেরা বলেন, রাজবল্লভই সেই সেতু, শিবলিঙ্গ ও পঞ্চরত্ন প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন। পঞ্চরত্ন ও শিবলিঙ্গ অদ্যাপি অবিকৃত অবস্থায় বিদ্যমান আছে।

প্রতিনিধি দেওয়ান হইয়া তাহার উপায় উদ্ভাবনে কৃতসংকল্প হইলেন। বর্ত্তমান সময়ে "তালতলার খাল" নামে যে পয়ঃপ্রণালী বিক্রমপুরের বক্ষ বিদীর্ণ করিয়া কীর্ত্তিনাশা নদীকে ধলেশ্বরীর সহিত সংযুক্ত করিয়াছে, তৎকালে সেই খালের অস্তিত্ব ছিল না। রামদাস কল্পনা-নেত্রে দেখিতে পাইলেন, এইরূপ একটি খাল খনন করাইতে পারিলে তাঁহার সংকল্প সহজেই কার্য্যে পরিণত হইতে পারিবে এবং সঙ্গে সঙ্গে বাণিজ্যেরও অশেষ উন্নতি সাধিত হইবে। সুতরাং তিনি পিতার নিকট সেইরূপ একটি খাল খননের প্রস্তাব করিয়া পাঠাইলেন। রাজবল্লভ সেই প্রস্তাবে অনুমোদন করিলে রামদাস খালখননকার্য্যে ব্রতী হইলেন। অচিরে রাজবল্লভের ব্যয়ে (১) রাজনগর হইতে বরাবর ঢাকা অভিমুখে বিক্রমপুরের মধ্য দিয়া একটি সুদীর্ঘ খাল খাত হইল। এক্ষণে সেই খালই "তালতলার খাল" নামে অভিহিত হইতেছে। খালের দক্ষিণ ভাগ দিয়া অনেক দূর পর্য্যন্ত কীর্ত্তিনাশার কুক্ষিগত হইলেও যে অংশ অদ্যাপি বিদ্যমান রহিয়াছে তাহার দৈর্ঘ্য ১৫ মাইলের ন্যূন হইবে না।

জনশ্রুতি এই যে, রামদাস রাজনগর হইতে প্রত্যহ প্রত্যূষে এক-বিংশতিক্ষেপণীযুক্ত নৌকায় সেই খালপথে ঢাকা অভিমুখে যাত্রা করিতেন এবং তাঁহার নৌকা তালতলা বন্দরের নিকটবর্ত্তী হইলেই রজনী প্রভাত হইয়া যাইত। তালতলার বিপরীত দিকে ও খালের পূর্ব্বতটে অদ্যাপি একখানি ইষ্টক-নির্ম্মিত মন্দির ও তাহার অভ্যন্তরে এক পাষাণময় শিবলিঙ্গ ও একটি পাষাণময়ী কালিকামূর্ত্তি প্রতিষ্ঠাপিত রহিয়াছে। কালিকা মূর্ত্তি "আনন্দময়ী দেবী" নামে আখ্যাত। লোকে

---

(১) Hunter's Statistical Account of Dacca, Page 25.
উমাচরণ বাবুর লিখিত জীবনীতেও এই খালের কথার উল্লেখ আছে।

উপর অত্যন্ত অসন্তুষ্ট হইয়াছিলেন, সুতরাং তিনি রামদাসকে দেখিয়াই তাঁহার নিকট সেই অভিযোগসম্বন্ধে কৈফিয়ৎ তলপ করিলেন। সুচতুর রামদাস বিনীতভাবে করযোড়ে উত্তর করিলেন, "অধমের এই দক্ষিণ কর জগদীশ্বর ও জাহাপনার পরিচর্য্যার নিমিত্ত উৎসর্গীকৃত হইয়াছে। সুতরাং সেই হস্তের উপর আমার কোন অধিকার নাই বলিয়াই আমি অন্যান্য লোকদিগকে বাম করে অভিবাদন করিয়া আসিতেছি।" * নবাব এই উত্তরে এতদূর সন্তুষ্ট হইলেন যে, তিনি রামদাসকে পুরস্কৃত করিয়া সসম্মানে বিদায় প্রদান করিলেন। রাজবল্লভ পুত্রের অমঙ্গল আশঙ্কা করিয়া তৎকালে দরবারে অনুপস্থিত ছিলেন। রামদাস নবাব দরবার হইতে বিদায় লাভ করিয়া পিতার

---

* রিয়াজুসেলাতিনে লিখিত আছে—মুরসিদ কুলীর নবাবী আমলের প্রথম ভাগে জেওনদ্দিন নামে জনৈক সম্ভ্রান্ত মুসলমান হুগলীর ফৌজদারপদে নিযুক্ত ছিলেন। হিন্দু রামকিঙ্কর সেন তাঁহার পেস্কারী করিতেন। তৎকালে হুগলীর ফৌজদারী মুরশিদাবাদ নেজামতের অন্তর্ভুক্ত ছিল না। মুরসীদ কুলীর চেষ্টায় হুগলী তাঁহার নেজামতের অন্তর্গত হইলে জেওনদ্দিন কার্য্য হইতে অবসৃত হইয়া রামকিঙ্কর সেন সহ দিল্লীতে গমন করিলেন। কিয়ৎকাল পরে জেওনদ্দিন পরলোক গমন করিলে রামকিঙ্কর স্বদেশে প্রত্যাগমন করিয়া মুরসীদ কুলীর দরবারে উপস্থিত হইলেন এবং তাঁহাকে দক্ষিণ করে অভিবাদন না করিয়া বাম করে অভিবাদন করিলেন। মুরসীদ কুলী এইরূপ অশ্রুতপূর্ব্ব ব্যবহারের কারণ জিজ্ঞাসা করিলে রামকিঙ্কর বলিলেন, আমি দক্ষিণ করে দিল্লীশ্বরকে অভিবাদন করিয়াছি, সুতরাং সেই করে তাঁহার নায়েবকে অভিবাদন করিলে দিল্লীশ্বরের অবমানা করা হইবে। কুটিলবুদ্ধি মুরসীদ কুলী কোনরূপ প্রত্যুত্তর না দিয়া রামকিঙ্করকে নেজামতের এক কার্য্যে নিযুক্ত করিলেন এবং কয়েক দিন পরে নিকাশের ছলে তাঁহাকে লৌহপিঞ্জরে আবদ্ধ করিয়া রাখিয়া অনশনে তাঁহার ভবলীলা শেষ করিয়া দিলেন—

Riazoo Salatin, poge

বিভাগে শান্তি সুপ্রতিষ্ঠিত হইল এবং দস্যু ও তস্করগণ লোকালয় পরিত্যাগপূর্ব্বক অরণ্যমধ্যে আশ্রয় গ্রহণ করিল।

"অপরভদ্রনামক জনৈক লোকের কিয়ৎ পরিমাণ ভূমি রাজবল্লভের ইষ্টদেবতা অন্যায়রূপে হস্তগত করিয়াছিলেন। অপরভদ্র সেই ভূমির উদ্ধারকল্পে রামদাসের দরবারে রাজগুরুর বিরুদ্ধে অভিযোগ উপস্থাপিত করিলে রামদাস প্রমাণমূলে বুঝিতে পারিলেন যে, অপরভদ্রের অভিযোগ অণুমাত্রও মিথ্যা নহে। তখন তিনি গুরুর পক্ষপাত না করিয়া মোকর্দ্দমা অপরভদ্রের অনুকূলে নিষ্পত্তি করিলেন।"

রামদাসের কার্য্যপ্রণালীসম্বন্ধে অনেক গল্প প্রচলিত আছে। তন্মধ্যে একটি মাত্র গল্প নিম্নে উদ্ধৃত হইল।

সকলেই অবগত আছেন এখন ঢাকা নগরীতে বহুসংখ্যক প্রধান প্রধান মুসলমান বাস করেন। রামদাসের সময়েও তথায় অনেক সম্ভ্রান্ত মুসলমান বাস করিতেন। রামদাস প্রতিনিধি দেওয়ান হইয়া কার্য্যভার গ্রহণ করার পর সেই সমস্ত মুসলমান তাঁহাকে অভিবাদন করিলেই, তিনি দক্ষিণ করে তাঁহাদিগকে প্রত্যভিবাদন না করিয়া বাম করে প্রত্যভিবাদন করিতেন। সম্ভ্রান্ত মুসলমানগণ রামদাসের এইরূপ ব্যবহারে অপমানিত বোধ করিয়া তাঁহার বিরুদ্ধে মুরশিদাবাদদরবারে অভিযোগ উপস্থাপিত করিলেন। অনতিবিলম্বে সেই অভিযোগের উত্তর দিবার নিমিত্ত নবাবের আদেশক্রমে তাঁহাকে মুরশিদাবাদদরবারে উপস্থিত হইতে হইল। সকলেই মনে করিল এবার রামদাসের ভাগ্যে লাঞ্ছনাভোগ অবশ্যম্ভাবী। কিন্তু তিনি অণুমাত্রও বিচলিত না হইয়া নির্দ্দিষ্ট সময়ে নবাবের সমীপবর্ত্তী হইলেন এবং প্রচলিত রীতি অনুসারে কুর্ণিশ করিয়া নবাবকে অভিবাদন করিলেন। পূর্ব্বোক্ত অভিযোগের বৃত্তান্ত শুনিয়া নবাব রামদাসের

কেহ কেহ বলেন, "অনিয়মিত ইন্দ্রিয় পরিচালনার ফলে রামদাসের ইন্দ্রিয়বৃত্তি অত্যন্ত শিথিল হইয়া পড়িয়াছিল। এজন্য তিনি কোন সন্ন্যাসীর নিকট হইতে কয়েকটি উত্তেজক বটিকা সংগ্রহ করেন। সন্ন্যাসী রামদাসকে এক একটি বটিকার অর্দ্ধাংশ মাত্র এক এক দিন সেবন করিতে বলিয়াছিলেন। কিন্তু তিনি বটিকার ক্ষুদ্রায়তন দেখিয়া একবারে দুইটি বটিকাই সেবন করিলেন। প্রত্যেকটি বটিকা অত্যুগ্র উপাদানে নির্ম্মিত হইয়াছিল। সুতরাং এইরূপ অপরিণামদর্শিতায় হিতে বিপরীত ঘটিল।

একবারে এত অধিক পরিমাণ তেজ সহ্য করিতে না পারিয়া রামদাস তীব্র জ্বালা অনুভব করিতে লাগিলেন। অবশেষে আত্মীয়বর্গ একখানি নৌকা নবনীতে পূর্ণ করিয়া তন্মধ্যে রামদাসকে শয়ান করাইয়া রাজনগর অভিমুখে রওনা হইল। দুর্ভাগ্য বশতঃ রাজনগরে উপস্থিত হইবার পূর্ব্বেই পথিমধ্যে রামদাস মানবলীলা সংবরণ করিলেন।" (১)

১৭৫০ খৃঃ রামদাস পরলোক গমন করিলে রাজবল্লভ পুত্রশোকে অতিশয় মর্ম্মাহত হইয়া পড়িলেন। সহৃদয় নিবাইস এই সময় কৃষ্ণদাসকে রামদাসের-পদে নিযুক্ত করিয়া প্রিয়তম কর্ম্মচারীর পুত্রশোকের অপনোদন করিবার প্রয়াস পাইলেন। কৃষ্ণদাস তৎকালে ঊনবিংশবৎসরবয়স্ক ছিলেন। যৌবনের উন্মেষণে স্বাধীনভাবে কার্য্য পরিচালনার অবসর পাইলে লোকের কিরূপ শোচনীয় পরিণাম হয়, তাহা রাজবল্লভ রামদাসের দৃষ্টান্তে বিলক্ষণরূপে বুঝিয়াছিলেন। সুতরাং তিনি পরিণত-বয়স্ক ভ্রাতুষ্পুত্র মৃত্যুঞ্জয়কে কৃষ্ণদাসের সহকারিপদে নিযুক্ত করিয়া তাঁহারই তত্ত্বাবধানে কৃষ্ণদাসকে ঢাকায় প্রেরণ করিলেন।

---

(১) উমাচরণ বাবু রামদাসের শোচনীয় পরিণাম এই ভাবেই বর্ণনা করিয়াছেন।

সহিত সাক্ষাৎ করিবার অভিপ্রায়ে তাঁহার বাসায় আসিয়া উপস্থিত হইলেন। রাজবল্লভ পুত্রকে দেখিয়াই পূর্ব্বোক্ত ব্যবহারের নিমিত্ত ভর্ৎসনা করিতে লাগিলেন। পিতার বক্তব্য শেষ না হওয়া পর্য্যন্ত রামদাস অবনতমস্তকে তথায় দণ্ডায়মান রহিলেন ও পরে অন্তরালে গিয়া অনুচরবর্গকে বলিলেন, "পিতামহ কৃষ্ণজীবন মজুমদার সামান্য রাজকর্ম্মচারী ছিলেন। বিধাতার বিড়ম্বনায় পিতৃদেব তাঁহার ঔরসে জন্মগ্রহণ করিয়া নিতান্তই সাহসশূন্য হইয়াছেন। কিন্তু আমার ন্যায় যে ব্যক্তি মহারাজ রাজবল্লভের ঔরসে জন্মগ্রহণ করিয়াছে তাহার পক্ষে সাহসশূন্য হওয়া কদাচ শ্লাঘায় বিষয় বলিয়া পরিগণিত হইতে পারে না।"

রাজকার্য্যে বিচক্ষণ হইলেও রামদাস নিরতিশয় ইন্দ্রিয়পরায়ণ ছিলেন। অপরিণতবয়সে প্রভূত ক্ষমতা লাভ করিয়াই তিনি আর সংযম শিক্ষার অবসর প্রাপ্ত হন নাই। ফলে ক্রমাগত ইন্দ্রিয়পরিচালনা করিয়া তিনি নানাবিধ কুৎসিৎ রোগে আক্রান্ত হইয়া পড়িলেন। যখন তাঁহার জীবন প্রদীপ নির্ব্বাণোন্মুখ হইল, তখন অনুচরবর্গ তাঁহাকে নৌকাযোগে ঢাকা হইতে রাজনগর লইয়া চলিল। কিন্তু তিনি আর রাজনগর পর্য্যন্ত উপস্থিত হইতে পারিলেন না, পথিমধ্যেই তাঁহার প্রাণপাখী দেহপিঞ্জর ছাড়িয়া অনন্তধামে প্রস্থান করিল। রামদাস সাত বৎসরকাল মাত্র প্রতিনিধি দেওয়ানের পদে নিযুক্ত ছিলেন এবং মৃত্যুকালে তাঁহার বয়ঃক্রম ২২ বৎসরও অতিক্রম করে নাই। *

---

* শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র সেন ১৩০৬ সনের জ্যৈষ্ঠ সংখ্যক "নির্ম্মাল্য" নামক পত্রিকায় লিখিয়াছেন, "রামদাসের উচ্ছৃঙ্খলতার বৃত্তান্ত অবগত হইয়া রাজবল্লভ পুত্রকে উপযুক্ত শিক্ষা দিবার অভিপ্রায়ে এক অন্ধকারময় কক্ষে আবদ্ধ করিয়া রাখিয়াছিলেন। রামদাসের জননী এই ঘটনায় মর্ম্মাহত হইয়া লালা রামপ্রসাদের যোগে নবাব দরবারে পুত্রের কারামুক্তির নিমিত্ত আবেদন করেন। নবাব স্নেহপরায়ণা জননীর কাতর প্রার্থনায় বিচলিত হইয়া অবশেষে রামদাসকে মুক্তি প্রদান করিয়াছিলেন।"

পঞ্চম অধ্যায়

প্রথম পরিচ্ছেদ

বঙ্গীয় অম্বষ্ঠব্রাহ্মণ বা বৈদ্যসমাজে পুনঃ যজ্ঞোপবীত-প্রবর্ত্তনের উদ্যোগ

বাঙ্গলা দেশের বৈদ্যসম্প্রদায় পঞ্চকোটি, রাঢ়, বারেন্দ্র, বঙ্গ ও পূর্ব্বকুল, এই পাঁচ সমাজে বিভক্ত।

মানভূম, সিংহভূম, ধলভূম, বরাহভূম, শিখরভূম এবং মঙ্গলকোট প্রভৃতি স্থান লইয়া পঞ্চকোট সমাজ গঠিত। এই সমস্ত স্থানের সাধারণ নাম সেনভূম প্রদেশ এবং তাহা একদা মহারাজ শ্রীহর্ষ সেনের শাসনাধীন ছিল।

পশ্চিমে দামোদর ও রূপনারায়ণ নদ, পূর্ব্বে ভাগীরথী, দক্ষিণে সুন্দরবন এবং উত্তরে পদ্মানদী, এই সীমাবিশিষ্ট স্থান রাঢ় সমাজের অন্তর্গত। রাঢ় সমাজ আবার শ্রীখণ্ড, সাতসৈকা, সপ্তগ্রাম নামক তিনটি উপবিভাগে বিভক্ত। শ্রীখণ্ড বর্দ্ধমান জিলায় কাটোয়ার নিকটে অবস্থিত। সাতসৈকার উত্তরে কাটোয়া, পূর্ব্বে কালনা, দক্ষিণে পাণ্ডুয়া এবং পশ্চিমে বর্দ্ধমান। ত্রিবেণী, গুপ্তিপাড়া, নাটাগড়, কাঁচরাপাড়া, কুমারহট্ট, সোমড়া, সুকড়ে, গরিভা, বলাগড় প্রভৃতি স্থান সপ্তগ্রাম উপবিভাগের অন্তর্ভুক্ত।

বারেন্দ্র সমাজের একদিকে করতোয়া ও অপর দিকে মহানন্দা নদী।

যে সময় কৃষ্ণদাস এই পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন, তৎকালে মীর আবুতালী নামে তাঁহার জনৈক নায়েব ১৭৫৫ খৃষ্টাব্দে ওলন্দাজ বণিক্ সম্প্রদায়ের নিকট নজারাণার টাকা তলপ করিয়াছিলেন। কিন্তু ওলন্দাজ বণিক্ সম্প্রদায় প্রথমতঃ সেই আদেশ প্রতিপালন করিতে সম্মত হন নাই। অবশেষে তাঁহাদের কুঠীর জনৈক কর্ম্মচারী নায়েবের আদেশে ঢাকার দুর্গে কারারুদ্ধ হইলে, কুঠীর অধ্যক্ষ আদিষ্ট অর্থ প্রদান করিবার অঙ্গীকার করিয়া কারারুদ্ধ কর্ম্মচারীর উদ্ধারসাধন করিয়াছিলেন। এই ঘটনায় পাশ্চাত্য বণিক্ সম্প্রদায় উত্তেজিত হইয়া আলিবর্দ্দীর নিকট প্রতীকার প্রার্থী হইবেন বলিয়া স্থির করেন; কিন্তু সেইরূপ কোন আবেদন পত্র পরে নবাবদরবারে প্রেরিত হইয়াছিল কি না তাহা জানা যাইতেছে না। *

* On the 12th instant we received a letter from Mr. Nicholas Claren Bault, Chief &c. Council at Dacca, dated the 7th, informing us Mir Abu Taleb, Naib to Nawab Kissen Das on a pretence of a demand of some considerable present from the Dutch factory there, had seozed a writer belonging to the Dutch and confined him in the Killa, till the Dutch Chief made a promise of complying with their demand &c. &c.—Consultation, July 14, 1755—Long's Unpublished Records, page 59.

জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন এবং রাজবল্লভকে পূর্ব্ব হইতেই চিনিতেন; সুতরাং তিনি আশীর্ব্বাদ না করিয়া রাজবল্লভকে প্রতিনমস্কার করিলেন এবং সঙ্গে সঙ্গে যজ্ঞোপবীত-হীনতার নিমিত্ত বঙ্গীয় বৈদ্যসমাজের প্রতি কটাক্ষপাত করিতেও ত্রুটি করিলেন না। এই ঘটনায় রাজবল্লভ অবমাননা বোধ করিয়া মনে মনে সংকল্প করিলেন, যে রূপেই হউক বঙ্গীয় বৈদ্যসমাজে যজ্ঞোপবীত প্রথা পুনরায় প্রবর্ত্তিত করিতে হইবে।"

শ্রীখণ্ডনিবাসী শ্রীযুক্ত দুর্গাচরণ চৌধুরী মহাশয় বলেন, 'যে সময় রাজবল্লভ মুরশিদাবাদে অবস্থান করিতেছিলেন, তৎকালে শ্রীখণ্ডসমাজস্থ ফকিরচাঁদ চৌধুরী নামে জনৈক বৈদ্যসন্তান মুরশিদাবাদের নেজামতে কোন এক কার্য্যে নিযুক্ত ছিলেন। শ্রীখণ্ডসমাজস্থ অন্য বৈদ্যের ন্যায় ফকিরচাঁদেরও উপনয়ন সংস্কার হইয়াছিল। কিন্তু তৎকালে বঙ্গীয় বৈদ্যসমাজে উপবীত ধারণ প্রথা তিরোহিত হইয়া গিয়াছিল বলিয়া রাজবল্লভ অনুপবীত ছিলেন। বিদ্রূপপ্রিয় ফকিরচাঁদ যজ্ঞোপবীত উপলক্ষ করিয়া প্রায় সর্ব্বদাই রাজবল্লভের উপর কটাক্ষপাত করিতেন। রাজবল্লভ ফকিরচাঁদের বাক্যযন্ত্রণার হস্ত হইতে অব্যাহতি লাভ করিবার অভিপ্রায়ে বঙ্গীয় বৈদ্যসমাজে পুনরায় উপনয়নপ্রথাপ্রবর্ত্তনে উদ্যোগী হইয়াছিলেন।'

মহারাজ-বংশপ্রভব শ্রীযুক্ত প্রতাপ বাবুর নিকট যে হস্তলিখিত পুস্তক পাওয়া গিয়াছে তাহাতে লিখিত আছে, "অগ্নিষ্টোম যজ্ঞোপাসক ভারতবর্ষের বিভিন্ন প্রদেশস্থ ব্রাহ্মণ পণ্ডিত রাজনগরে সমাগত হইলে রাজবল্লভ অভ্যর্থনার উদ্দেশ্যে তাঁহাদের নিকট গমন করেন। তৎকালে তিনি অনুপবীত ছিলেন। কান্যকুব্জ-দেশীয় কোন পণ্ডিত তাহা লক্ষ্য করিয়া বলিলেন, তুমি ভিষক্‌কুলজ বলিয়াই আমরা তোমার নিমন্ত্রণ গ্রহণ করিয়াছি, কিন্তু এখন দেখিতেছি তুমি শূদ্রাচারী; অতএব

চব্বিশ পরগণার নিকটবর্ত্তী স্থানে যশোহর, খুলনা, ফরিদপুর, বাকরগঞ্জ, ঢাকা ও ময়মনসিংহের পশ্চিম ভাগ বঙ্গসমাজের অন্তর্গত।

ময়মনসিংহের পূর্ব্বভাগ শ্রীহট্ট, চট্টগ্রাম, নোয়াখালী এবং ত্রিপুরা জিলায় পূর্ব্বকুল সমাজ বিস্তৃত।

রাজবল্লভের অভ্যুদয়ের সময় বঙ্গ, বারেন্দ্র এবং পূর্ব্বকুল সমাজ ব্যতীত অপর দুইটি বৈদ্যসমাজে যজ্ঞোপবীতধারণের প্রথা প্রবর্ত্তিত ছিল এবং অদ্যাপি রাঢ় ও পঞ্চকোট সমাজে সেই প্রথা পূর্ব্ববৎ প্রচলিত রহিয়াছে। বঙ্গ, বারেন্দ্র এবং পূর্ব্বকুল সমাজেও একদা বৈদ্যসন্তানগণ শাস্ত্রীয় বিধানানুসারে উপবীত ধারণ করিতেন। কিন্তু একটি গুরুতর সমাজবিপ্লবের ফলে শেষোক্ত তিন সমাজ হইতে ক্রমে সেই প্রথা তিরোহিত হইতেছিল। যে সময় রাজবল্লভ উন্নতির পথে অগ্রসর হইতে ছিলেন, তৎকালে বঙ্গ, বারেন্দ্র ও পূর্ব্বকুল সমাজের অধিকাংশ বৈদ্য নিরুপবীত ছিলেন।

রাজবল্লভ নেজামতের সহকারী দেওয়ান পদে উন্নীত হইলে বঙ্গ, বারেন্দ্র ও পূর্ব্বকুল সমাজস্থ বৈদ্যসন্তানগণের উপবীত-হীনতা বিষয়ে তাঁহার দৃষ্টি আকৃষ্ট হইল এবং কিরূপে উপবীতপ্রথা পুনঃ প্রবর্ত্তিত করিয়া এই তিন সমাজকে রাঢ় ও পঞ্চকোট সমাজের অবস্থায় উন্নীত করিবেন, তিনি তাহার উপায় উদ্ভাবনে নিযুক্ত হইলেন।

যে ঘটনা উপলক্ষে রাজবল্লভ এই কার্য্যে ব্রতী হইয়াছিলেন তৎসম্বন্ধে বিভিন্ন মত প্রচলিত আছে। কেহ কেহ বলেন, মুর্শিদাবাদ অবস্থান কালে তিনি একদা কোন সরোবরে স্নান করিতে গিয়াছিলেন, তৎকালে সেই সরোবরের সোপানাবলীর উপর যজ্ঞোপবীতধারী একজন অপরিচিত ভদ্রলোককে উপবিষ্ট দেখিয়া রাজবল্লভ তাঁহাকে ব্রাহ্মণ-জ্ঞানে প্রণাম করিলেন। সেই ভদ্রলোকটি ভাজনঘাট গ্রামে বৈদ্যবংশে

জাতো বৈশ্যএব ইত্যাদি শব্দস্মরণাৎ তৎক্ষত্রিয়াদিধর্ম্মপ্রাপ্ত্যর্থং নতু ক্ষত্রিয়াদি জাতিপ্রাপ্ত্যর্থং। অতশ্চ মূর্দ্ধাবসিক্তাদীনাং ক্ষত্রিয়াদেরুক্তেরেব দণ্ডাজিনোপবীতাদিভিঃ সংস্কারঃ কার্য্য ইতি।

অত্রচ মূর্দ্ধাবসিক্তাদীনামিত্যাদি পদাৎ পারশবস্য তত্তৎসংস্কারপ্রাপ্তৌ তস্যৈব নিষেধমাহ, মনুঃ—"স পারয়ন্নেব শবস্তস্মাৎ পারশবঃ স্মৃতঃ।" অন্যচ্চ বিপ্রাদিত্যাদি বচনব্যাখ্যানে দীপকলিকায়াং বিপ্রাৎ ক্ষত্রিয়ায়ামূঢ়ায়াং মূর্দ্ধাবসিক্তঃ, বিপ্রাদূঢ়ায়াং বিশঃ স্ত্রিয়ামম্বষ্ঠঃ এবং শূদ্রায়াং নিষাদঃ, অনূঢ়ায়াং তস্যাং পারশবঃ। পারশব ইতি সংজ্ঞান্তরং বিশিষ্টসংস্কারাধিকারার্থং এতেন মূর্দ্ধাবসিক্তাম্বষ্ঠনিষাদানামেব সংস্কারঃ। পুনরপি মনুঃ—"স্ববীজঞ্চৈব সুক্ষেত্রে জাতং সম্পদ্যতে যথা। তথার্য্যাজ্জাত আর্য্যায়াং সর্ব্বসংস্কার মর্হতি।" কুল্লুকভট্টো যথা—শোভনং বীজং শোভনক্ষেত্রে জাতং সমৃদ্ধং ভবতি এবং দ্বিজাৎ দ্বিজাতিস্ত্রিয়াং সবর্ণায়ামানুলোম্যেন চ ক্ষত্রিয়বৈশ্যয়োর্জাতঃ ক্ষত্রিয়বৈশ্যসংস্কারং শ্রৌতং স্মার্ত্তঞ্চ সর্ব্বমর্হতি নচ পারশবচণ্ডালাদিভিঃ অত্রার্য্যপদং ব্রাহ্মণক্ষত্রিয়বৈশ্যপরং। এতেনাম্বষ্ঠানামুপনয়নাদি সংস্কার ইতি মনুনা মুক্তকণ্ঠেনোক্তং। যেষান্তু পিত্রাদয়োঽপ্যনুপনীতা স্তেষামাপস্তম্বোক্তং—যস্য পিতাপিতামহৌ অনুপনীতৌ স্যাতাং তস্য সংবৎসরং ত্রৈবিদ্যং ব্রহ্মচর্য্যং যস্য প্রপিতামহাদের্নানুস্মরণং তস্য ষড়্‌বার্ষিকং ত্রৈবিদ্যং ব্রহ্মচর্য্যমিতি যাজ্ঞবল্ক্য তৃতীয়াধ্যায় মিতাক্ষরাদি প্রমাণানুসারেণ। শ্রীমদ্বল্লালাদ্যম্বষ্ঠানাং যজ্ঞোপবীত মাসীদিতি লৌকিকাখ্যায়িকা তৎপ্রমাণমপ্যস্তি। পশ্চাৎ তৎপুত্রেণ লক্ষ্মণসেনেন পিত্রা সহ লৌকিকবিরোধাৎ কেষাঞ্চিদ্দূরীকৃতং কেষাঞ্চিদদ্যাপি পৌর্ব্বাপর্য্যেণ বর্ত্ততে তথা দৃশ্যতে চ কড়ইধাত্রী গ্রাম নিবাসিনাং অম্বষ্ঠানাং যজ্ঞোপবীতাদিকমিতি লোকদর্শনেন চ। অনুপনীতাম্বষ্ঠজাতানামনুপনীতাম্বষ্ঠানাং প্রপিতামহাদীনামুপনয়নাত্মক

আমরা আর এস্থলে অবস্থান করিব না। রাজবল্লভ তখন সবিনয়ে নিবেদন করিলেন, 'মহারাজ বল্লালসেনের অত্যাচারে তৎপুত্র লক্ষ্মণসেনের নির্দ্দেশানুসারে অনেক বৈদ্যসন্তানকে যজ্ঞোপবীত পরিত্যাগপূর্ব্বক জাতিরক্ষা করিতে হইয়াছিল। আমরা সেই সমস্ত বৈদ্যগণের উত্তরপুরুষ বলিয়াই আমাদের উপনয়ন সংস্কার অপ্রচলিত হইয়া গিয়াছে।' অতঃপর পণ্ডিতমণ্ডলী বলিলেন, তোমাকে শাস্ত্রীয় বিধানানুসারে প্রায়শ্চিত্ত করিয়া উপবীত গ্রহণ করিতে হইবে; অন্যথা হিন্দুশাস্ত্রানুসারে তোমার কোনরূপ যজ্ঞানুষ্ঠান করিবার অধিকার নাই। রাজবল্লভ তদনুসারে পণ্ডিতমণ্ডলীহইতে ব্যবস্থাপত্র লইয়া যজ্ঞোপবীতানুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হইলেন।" (১)

কারণ যাহাই হউক না কেন, এই উদ্দেশ্য সাধন করিতে যে রাজবল্লভকে ভারতবর্ষের বিভিন্ন প্রদেশীয় ব্রাহ্মণ পণ্ডিতের ব্যবস্থাপত্র সংগ্রহ করিতে হইয়াছিল সে বিষয়ে অনুমাত্রও সন্দেহ নাই। এমন কি সুদূরবর্ত্তী কাশী, কাঞ্চী, দ্রাবিড়, মহারাষ্ট্র, উড়িষ্যা ও কান্যকুব্জ প্রভৃতি স্থান হইতেও ব্রাহ্মণ পণ্ডিতগণ এই উপলক্ষে রাজনগরে সমবেত হইয়াছিলেন। তাঁহারা পরস্পর তর্ক বিতর্ক করিয়া নিরুপবীত বৈদ্যসন্তানগণের পুনরুপনয়ন সম্বন্ধে যে ব্যবস্থাপত্র প্রদান করিলেন তাহা নিম্নে উদ্ধৃত করা গেল :—

"বিপ্রান্মূর্দ্ধাবসিক্তোহি ক্ষত্রিয়ায়াং বিশঃস্ত্রিয়াং অম্বষ্ঠঃ শূদ্র্যাং নিষাদো জাতঃ পারশবোঽপিবেতি যাজ্ঞবল্ক্যবচনান্মূর্দ্ধাবসিক্তাম্বষ্ঠনিষাদানাং যজ্ঞোপবীতাদিসংস্কারঃ প্রাপ্তঃ। তথাহুক্তৈতদ্বচনব্যাখ্যা মিতাক্ষরায়াং— যত্তু বিপ্রেণ ক্ষত্রিয়ায়াং জাতঃ ক্ষত্রিয় এব, এবং ক্ষত্রিয়েণ বৈশ্যায়াং

(১) উমাচরণবাবুর লিখিত জীবনীতে এই ভাবই সমর্থিত হইয়াছে।

রাজনগরনিবাসিনাম্	নবদ্বীপনিবাসিনাম্
শ্রীনীলকণ্ঠশর্ম্মণাম্	শ্রীগোপালন্যায়ালঙ্কারস্য
শ্রীকৃষ্ণদাসশর্ম্মণাম্	শ্রীতিতুরামতর্কপঞ্চাননস্য
শ্রীকৃষ্ণদেবশর্ম্মণাম্	শ্রীরামকৃষ্ণন্যায়ালঙ্কারস্য

অবিবাহিতা শূদ্রা রমণীতে পারশবের উৎপত্তি হইয়াছে। 'পারশব' এই পৃথক্ সংজ্ঞাদ্বারা বিশিষ্ট সংস্কারের অনধিকারত্ব প্রতিপাদিত হইয়াছে। এতদ্দ্বারা মূর্দ্ধাব সিক্ত, অম্বষ্ঠ এবং নিষাদজাতিত্রয়ের সংস্কার প্রমাণিত হইতেছে। মনু পুনরায় বলিয়াছেন, সুক্ষেত্রে সুবীজ রোপিত হইলে যেমন উত্তম ফল প্রসব করে, তেমন আর্য্য হইতে আর্য্যাতে জাত সন্তান সমস্ত সংস্কার পাইতে অধিকারী হয়। কুল্লূকভট্ট বলেন, যেমন সুন্দর বীজ উত্তমক্ষেত্রে রোপিত হইলে সমৃদ্ধিশালী হয়, তদ্রূপ দ্বিজ হইতে আনুলোম্যক্রমে অসবর্ণ দ্বিজাতিস্ত্রীতে অর্থাৎ ক্ষত্রিয়, বৈশ্যজাতীয়া স্ত্রীতে উৎপন্ন সন্তান যে ক্ষত্রিয়, বৈশ্যাদি জাতীয় সর্ব্বপ্রকার সংস্কার প্রাপ্ত হইয়া থাকে তাহা শ্রুতি ও স্মৃতিতে লিখিত আছে। কিন্তু চণ্ডাল ও পারশব জাতির ঐরূপ সংস্কার পাওয়ার কথা তথায় লিখিত নাই। এই স্থলে 'আর্য্য' এই পদ ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্যজাতিত্রয়কে বুঝাইতেছে। এতদ্দ্বারা অম্বষ্ঠজাতির উপনয়নাদি সংস্কার মনু মুক্ত-কণ্ঠে স্বীকার করিয়াছেন। যাঁহারা পিতৃপুরুষ হইতে অনুপবীত, তাঁহাদের সম্বন্ধে আপস্তম্ব বলিয়াছেন—যাঁহাদের পিতৃপিতামহ পর্য্যন্ত অনুপবীত, তাঁহাদের ছয় বৎসর কাল ত্রৈবিদ্য ব্রহ্মচর্য্য করা বিধেয়। যাজ্ঞবল্ক্যের তৃতীয় অধ্যায় এবং মিতাক্ষরাদি প্রমাণানুসারেও ইহা সমর্থিত হইতেছে। শ্রীমদ্বল্লালাদি অম্বষ্ঠদিগের যে যজ্ঞোপবীত ছিল, তাহা লোকে বলিয়া আসিতেছে। ইহা যে প্রকৃত কথা তদ্বিষয়ে সন্দেহ নাই। পরে পুত্র লক্ষ্মণের সহিত বল্লালের লৌকিক বিরোধ উপস্থিত হইলে কোনও কোনও অম্বষ্ঠসন্তানের যজ্ঞোপবীত লক্ষ্মণসেনকর্ত্তৃক দূরীকৃত হয় এবং কোনও কোনও অম্বষ্ঠের পূর্ব্বাপর নিয়মানুসারে অদ্যাপি উপনয়ন প্রচলিত আছে। আমরা এখনও দেখিতে পাই যে কড়ই ও ধাত্রীপ্রভৃতি গ্রামনিবাসী অম্বষ্ঠদিগের যজ্ঞোপবীতাদি প্রচলিত রহিয়াছে। অনুপনীত অম্বষ্ঠহইতে উৎপন্ন যে সমস্ত অনুপনীত অম্বষ্ঠের প্রপিতামহের অনুপনয়ন

সংস্কারাস্মরণেন ব্রাত্যাতিপাতক ক্ষয়ার্থিনাং ষড়্ বার্ষিক ব্রতাদ্যাচরণা-শক্তৈর্নবতি ধেনুদানরূপং প্রায়শ্চিত্তং তদশক্তৌ আঢ্যানাং পঞ্চদশাধিক চতুঃশতকার্ষাপণী মধ্যানান্তু সপ্তত্যধিক শতদ্বয় কার্ষাপণী, দরিদ্রাণাঞ্চ নবতি কার্ষাপণী দেয়েতি। তদনন্তরং যজ্ঞোপবীতাদিভিঃ সংস্কারঃ কার্য্য ইতি। উপনীতাম্বষ্ঠানাং তৎসন্ততীনাঞ্চ বৈশ্যবদশৌচাদ্যাচরণং তেষাঞ্চ সম্পূর্ণাশৌচং পঞ্চদশাহ মিতি বিদুষাং পরামর্শঃ। পতিতসাবিত্রিক উদ্দালকব্রতঞ্চরেদিতি বশিষ্ঠসূত্রাদ্যনুসারেণ পতিতসাবিত্রিকেণ উদ্দালকব্রতাদ্যাচরণাশক্তৌ আঢ্যেন চতুঃপণাধিকাষ্টচত্বারিংশৎকার্ষাপণী মধ্যেন দ্বাদশপণাধিকসপ্তবিংশতিকার্ষাপণী, দরিদ্রেণ চ চতুঃপণাধিক নবকার্ষাপণী দেয়েতি। তেষাং তদনন্তরমুনয়নাদি সংস্কারঃ কার্য্য ইতি বিদুষাং পরামর্শঃ। (১)

---

(১) 'ব্রাহ্মণের ঔরসে ক্ষত্রিয়া স্ত্রীর গর্ভজাত সন্তান মূর্দ্ধাবসিক্ত, বৈশ্যা স্ত্রীর গর্ভ জাত সন্তান অম্বষ্ঠ, শূদ্রা স্ত্রীর গর্ভজাত সন্তান নিষাদ ও পারশব নামে খ্যাত।" এই যাজ্ঞবল্ক্যবচনানুসারে মূর্দ্ধাবসিক্ত অম্বষ্ঠ ও নিষাদপ্রভৃতির যজ্ঞোপবীতাদি সংস্কার প্রাপ্ত হইয়াছে। মিতাক্ষরায় ঐ বচনের সেইরূপ ব্যাখ্যাই উক্ত হইয়াছে। শঙ্খ লিখিত গ্রন্থে যে লিখিত আছে, "বিপ্রহইতে ক্ষত্রিয়াতে জাত সন্তান ক্ষত্রিয় এবং বৈশ্যাতে জাত সন্তান বৈশ্য" ইহা কেবল তাহাদের ধর্ম্মপ্রাপ্তি-সূচক, ক্ষত্রিয়াদি জাতিত্বসূচক নহে। অতএব মূর্দ্ধাবসিক্তাদি জাতির ক্ষত্রিয়াদি জাতির ন্যায় উপনয়ন, দণ্ড, অজিন, উপবীত ধারণ প্রভৃতি সংস্কার কর্ত্তব্য। এ স্থলে মূর্দ্ধাবসিক্তাদির 'আদি' পদদ্বারা পারশব জাতিরও ঐ সংস্কার সিদ্ধ হইতে পারে। কিন্তু মনু তাহা নিষেধ করিয়াছেন। স্মৃতি অনুসারে ঐ জাতি 'পারয়ণ' অর্থাৎ শক্তি সত্ত্বেও 'শব' (মৃত)। অন্যত্র দীপকলিকা নামক গ্রন্থে 'বিপ্রাৎ' ইত্যাদি বচনের ব্যাখ্যায় লিখিত আছে যে, ব্রাহ্মণের বিধিপূর্ব্বক বিবাহিত ক্ষত্রিয়া পত্নীতে মূর্দ্ধাবসিক্ত, ও বিধি পূর্ব্বক বিবাহিত বৈশ্যা পত্নীতে অম্বষ্ঠ, বিধিপূর্ব্বক বিবাহিত শূদ্রা পত্নীতে নিষাদ এবং

শ্রীশ্রীকৃষ্ণদীক্ষিতস্য
শ্রীগোবিন্দরামদীক্ষিতস্য
শ্রীগৌরদীক্ষিতস্য

কনোজনিবাসিনঃ

শ্রীরসালশুক্লস্য

মিথিলানিবাসিনাম্

শ্রীজীবতারাত্রিবেদিনঃ
শ্রীকৃষ্ণদাসউপাধ্যায়স্য
শ্রীগিরিজানাথপাঠকস্য

পুঠিয়ানিবাসিনঃ

শ্রীরতিনাথন্যায়বাচস্পতেঃ

বাঁশবেড়িয়ানিবাসিনাম্

শ্রীরামভদ্রসিদ্ধান্তস্য
শ্রীরমানাথবাচস্পতেঃ
শ্রীআত্মারামন্যায়ালঙ্কারস্য

পাটুলিগ্রামনিবাসিনোঃ

শ্রীবাসুদেববিদ্যাবাগীশস্য
শ্রীপ্রাণকৃষ্ণপঞ্চাননস্য

বাকলানিবাসিনঃ

শ্রীকৃপারামতর্কসিদ্ধান্তস্য

সাইকুলনিবাসিনাম্

শ্রীবলরামভট্টাচার্য্যস্য
শ্রীশঙ্করবাচস্পতেঃ
শ্রীহরগোবিন্দবিদ্যাবাগীশস্য

লৌহজঙ্গনিবাসিনঃ

শ্রীউদয়রামবিদ্যাভূষণস্য

চকগ্রামনিবাসিনঃ

শ্রীরমাপতিতর্কপঞ্চাননস্য

দমদমানিবাসিনোঃ

শ্রীদুলালবিদ্যালঙ্কারস্য
শ্রীপঞ্চাননন্যায়ালঙ্কারস্য

বর্দ্ধমাননিবাসিনাম্

শ্রীজগন্নাথপঞ্চাননস্য
শ্রীশম্ভুরামবিদ্যালঙ্কারস্য
শ্রীমধুসূদনবাচস্পতেঃ
শ্রীরুদ্রনারায়ণবিদ্যাবাগীশস্য
শ্রীরাধাকান্তন্যায়ালঙ্কারস্য

বীরভূমনিবাসিনোঃ

শ্রীশ্রীকণ্ঠতর্কবাগীশস্য
শ্রীরামগোবিন্দন্যায়ালঙ্কারস্য

সেনভূমিনিবাসিনঃ

শ্রীহরিহরতর্কভূষণস্য

লেঙটাখালিনিবাসিনোঃ

শ্রীআনন্দচন্দ্রন্যায়বাগীশস্য
শ্রীত্রিলোচনন্যায়বাগীশস্য

শ্রীশিবরামবাচস্পতেঃ
শ্রীকৃষ্ণকান্তবিদ্যালঙ্কারস্য
শ্রীরামন্যায়বাগীশস্য
শ্রীশরণতর্কালঙ্কারস্য
শ্রীরামহরিবিদ্যালঙ্কারস্য
শ্রীবিশ্বনাথন্যায়ালঙ্কারস্য
শ্রীসদাশিবন্যায়ালঙ্কারস্য
শ্রীকৃপারামতর্কভূষণস্য
শ্রীবিশ্বেশ্বরতর্কপঞ্চাননস্য
শ্রীরামকান্তন্যায়ালঙ্কারস্য
শ্রীরামচন্দ্রবিদ্যাবাগীশস্য
শ্রীশঙ্করতর্কবাগীশস্য

শ্রীক্ষেত্রনিবাসিনাম্
শ্রীবিন্দুহরণমিশ্রস্য
শ্রীকালিকাপ্রসাদমিশ্রস্য
শ্রীদামোদরমিশ্রস্য
শ্রীপ্রভাকরমিশ্রস্য
শ্রীদুর্গাদাসমিশ্রস্য

মহারাষ্ট্রনিবাসিনঃ
শ্রীভাস্করপণ্ডিতস্য

দ্রাবিড়নিবাসিনঃ
শ্রীহলায়ুধব্রহ্মচারিণঃ

কাশীক্ষেত্রনিবাসিনঃ
শ্রীমণিরামদীক্ষিতস্য

হেতু ব্রাত্যদোষ সংঘটিত হইয়াছে, তাহা ক্ষয় করিবার নিমিত্ত ষড়্‌বার্ষিক ব্রতাদি আচরণ করা কর্ত্তব্য। কেহ তাহাতে অসমর্থ হইলে তাহাদের নবতিসংখ্য ধেনু দান করিয়া প্রায়শ্চিত্ত করিতে হইবে; যাঁহারা ঐরূপ প্রায়শ্চিত্ত করিতে অক্ষম তাঁহারা ধনবান্ হইলে চারিশত পঞ্চাশ কাহন, মধ্যবিত্ত হইলে দুইশত সত্তর কাহন এবং দরিদ্র হইলে নব্বই কাহন কড়ি দান করিবে। এইরূপ প্রায়শ্চিত্ত হইলে যজ্ঞোপবীতাদি সংস্কার করিতে হইবে। উপনীত অম্বষ্ঠ ও তাহার সন্তানসন্ততিগণ বৈশ্যের ন্যায় অশৌচাদি আচরণ করিবেন। তাঁহাদের সম্পূর্ণ অশৌচ পঞ্চদশ দিবস ব্যাপী। ইহাই পণ্ডিতদিগের অভিমত। বশিষ্ঠ বলেন, পতিতসাবিত্রীক ব্যক্তির উদ্দালকব্রত আচরণীয়। যাঁহারা এই ব্রত আচরণ করিতে অশক্ত, তাঁহারা ধনবান্ হইলে ছয়চল্লিশ কাহন চারি পণ, মধ্যবিত্ত হইলে সাতাইশ কাহন বার পণ এবং দরিদ্র হইলে নয় কাহন চারি পণ কড়ি দান করিয়া উপনয়নাদি সংস্কার গ্রহণ করিবেন। ইহাই পণ্ডিতমণ্ডলীর মত।

সেনহাটীভগিলহাটীনিবাসিনাম্

শ্রীরূপরামভট্টাচার্য্যস্য
শ্রীবিষ্ণুরামভট্টাচার্য্যস্য
শ্রীকামদেবভট্টাচার্য্যস্য
শ্রীরাধাকান্তভট্টাচার্য্যস্য
শ্রীরামমোহনভট্টাচার্য্যস্য
শ্রীগঙ্গাপ্রসাদভট্টাচার্য্যস্য
শ্রীরাজবল্লভভট্টাচার্য্যস্য
শ্রীরাধাকান্তভট্টাচার্য্যস্য
শ্রীনন্দরামভট্টাচার্য্যস্য
শ্রীজয়রামভট্টাচার্য্যস্য
শ্রীরামকিশোর ভট্টাচার্য্যস্য
শ্রীবীরেশ্বরভট্টাচার্য্যস্য
শ্রীরামশঙ্করভট্টাচার্য্যস্য
শ্রীকৃষ্ণদেবভট্টাচার্য্যস্য
শ্রীরুক্মিণীকান্তভট্টাচার্য্যস্য
শ্রীরাজারামভট্টাচার্য্যস্য
শ্রীবাণেশ্বরভট্টাচার্য্যস্য
শ্রীভবাণীপ্রসাদভট্টাচার্য্যস্য
শ্রীরামপ্রসাদভট্টাচার্য্যস্য
শ্রীরামেশ্বরভট্টাচার্য্যস্য
শ্রীপ্রাণবল্লভভট্টাচার্য্যস্য
শ্রীদেবীপ্রসাদভট্টাচার্য্যস্য
শ্রীমৃত্যুঞ্জয়ভট্টাচার্য্যস্য
শ্রীগঙ্গাপ্রসাদভট্টাচার্য্যস্য

কাচাদিয়ানিবাসিনঃ

শ্রীরামচন্দ্রসিদ্ধান্তপঞ্চাননস্য
শ্রীরূপরামন্যায়বাগীশস্য

সোমকোটনিবাসিনোঃ

শ্রীকৃষ্ণদাসসার্ব্বভৌমস্য
শ্রীরঘুনাথসিদ্ধান্তস্য

ধানুকানিবাসিনোঃ

শ্রীকৃষ্ণদাসসার্ব্বভৌমস্য
শ্রীকৃষ্ণনাথতর্কভূষণস্য

খাগটিয়ানিবাসিনোঃ

শ্রীশ্রীরামবাচস্পতেঃ
শ্রীকৃষ্ণদাসন্যায়ালঙ্কারস্য

পুরুলিয়ানিবাসিনঃ

শ্রীরতিরামবাচস্পতেঃ

কাঞ্চীনিবাসিনোঃ

শ্রীকাশীপ্রসাদদোবেদিনঃ
শ্রীপ্রভাকরচৌবেদিনঃ

এই ব্যবস্থাপত্রলাভ হইলে রাজবল্লভ বঙ্গসমাজস্থ সমস্ত বৈদ্য-সন্তানকে বিধিমতে প্রায়শ্চিত্ত করিয়া যজ্ঞোপবীত ধারণ করিবার নিমিত্ত

রাজবাটীনিবাসিনোঃ

শ্রীনরসিংহবিদ্যালঙ্কারস্য

শ্রীরাজেন্দ্রবিদ্যাবাগীশস্য

ভূষণানিবাসিনঃ

শ্রীহরিনাথশিরোমণেঃ

সায়েদাবাদনিবাসিনাম্

শ্রীচিরঞ্জীবপঞ্চাননস্য

শ্রীহলায়ুধতর্কপঞ্চাননস্য

শ্রীগোবিন্দরামন্যায়ালঙ্কারস্য

শ্রীপীতাম্বরন্যায়বাগীশস্য

ত্রিবেণীনিবাসিনাম্

শ্রীজগন্নাথতর্কপঞ্চাননস্য

শ্রীরামানন্দন্যায়ালঙ্কারস্য

শ্রীরামশঙ্করবাচস্পতেঃ

শ্রীকৃষ্ণচন্দ্রতর্কসিদ্ধান্তস্য

কামালপুরনিবাসিনঃ

শ্রীবলরামতর্কভূষণস্য

মানকরগোরকনিবাসিনঃ

শ্রীরঘুরামন্যায়ালঙ্কারস্য

চরাগ্রামনিবাসিনোঃ

শ্রীরামকিশোরন্যায়ালঙ্কারস্য

শ্রীরাধাকান্তন্যায়বাগীশস্য

মামুদপুরনিবাসিনাম্

শ্রীঘনশ্যামতর্কালঙ্কারস্য

শ্রীগোবিন্দরামসার্ব্বভৌমস্য

শ্রীদুর্গাপ্রসাদতর্কসিদ্ধান্তস্য

শ্রীরাধাকান্ততর্কসিদ্ধান্তস্য

শ্রীশিবপ্রসাদতর্কপঞ্চাননস্য

শ্রীরঘুনন্দনবাচস্পতেঃ

বাকলানিবাসিনাম্

শ্রীকান্তবিদ্যালঙ্কারস্য

শ্রীরামরত্নবিদ্যাবাগীশস্য

শ্রীকালীপ্রসাদতর্কসিদ্ধান্তস্য

শ্রীকালীশঙ্করবিদ্যাবাগীশস্য

লক্ষ্মীনারায়ণসিদ্ধান্তস্য

শ্রীকমলাকান্তবিদ্যাভূষণস্য

শ্রীজগন্নাথপঞ্চাননস্য

শ্রীহরিপ্রসাদন্যায়ালঙ্কারস্য

শ্রীপুরুষোত্তমন্যায়ালঙ্কারস্য

শ্রীচন্দ্রশেখরতর্কসিদ্ধান্তস্য

শ্রীমাধবসিদ্ধান্তস্য

বিক্রমপুরনওহাটানিবাসিনঃ

শ্রীরামদাসসিদ্ধান্তপঞ্চাননস্য

ধরগ্রামনিবাসিনঃ

শ্রীরামকিশোরন্যায়বাগীশস্য

এই ব্যাপারে রাজবল্লভের বহু অর্থব্যয় হইয়াছিল। অনেকেই অনুমান করেন, যজ্ঞোপবীতপ্রথার পুনঃ প্রবর্ত্তন করিতে তাঁহার যে ব্যয় হইয়াছিল তাহার পরিমাণ দশলক্ষ টাকার ন্যূন নহে।

হাণ্টারপ্রমুখ কতিপয় ইংরেজলেখক বলেন যে পূর্ব্বে বৈদ্যজাতি অনুপনীত ছিল এবং রাজবল্লভ দশলক্ষ টাকা মূল্যে ব্রাহ্মণগণহইতে বৈদ্যজাতির নিমিত্ত যজ্ঞোপবীতধারণের অধিকার ক্রয় করিয়াছিলেন (১)।

একথা স্বীকার্য্য যে ভারতীয় আর্য্যজাতির শৈশব অবস্থায় তাঁহাদের সমাজে উপবীতধারণপ্রথা প্রচলিত ছিল না। যে সময় প্রাচীন আর্য্য-ঋষিগণ পবিত্র পঞ্চনদ প্রদেশে আসিয়া উপনির্বিষ্ট হইতেছিলেন, তৎকালে তাঁহারা কেবল যাগযজ্ঞোপলক্ষেই উপবীত ধারণ করিতেন এবং যাগ-যজ্ঞ শেষ হওয়া মাত্রই সেই উপবীত পরিত্যাগ করা হইত। কালক্রমে শিক্ষার প্রারম্ভে প্রত্যেক আর্য্যসন্তানের নিয়মিতরূপে উপবীতগ্রহণ প্রথা প্রবর্ত্তিত হইয়াছিল। ফলতঃ এই অবধিই উপবীতধারণ আর্য্যত্বের অন্যতম লক্ষণমধ্যে পরিগণিত হইয়াছিল এবং ভারতীয় আর্য্যজাতীয় যে সম্প্রদায় বৈদ্যসংজ্ঞায় অভিহিত হইতেছেন তাঁহারাও এই প্রথার প্রবর্ত্তন হইতে নিয়মিতরূপে উপনয়নসংস্কার গ্রহণ করিয়া আসিতে ছিলেন। জনশ্রুতি এই যে মহারাজ বল্লালসেন পদ্মিনীনাম্নী কোন এক নীচ-জাতীয়া রমণীতে আসক্ত হইলে রাজকুমার লক্ষ্মণ সেনের সহিত তাঁহার বিরোধ ঘটিয়াছিল এবং সেই উপলক্ষে কতিপয় বৈদ্যসন্তান জাতিরক্ষা করিবার উদ্দেশ্যে লক্ষ্মণসেনের উপদেশ অনুসারে যজ্ঞোপবীতপরিত্যাগপূর্ব্বক বল্লালের সহিত পংক্তিভোজনের দায়

---

(১) Hunter's Statistical Account of Dacca, Page 25.

আহ্বান করিলেন এবং যে কেহ বায়সংকুলনে অসমর্থ হইবেন তাঁহার ব্যয়ভার স্বয়ং বহন করিবেন বলিয়া ঘোষণা করিয়া দিলেন।

তৎকালে বিক্রমপুরবৈদ্যসমাজে নিমদাশবংশোদ্ভব নিধিরাম, গঙ্গারাম, রামরাম; মহীপতিগুপ্তবংশোদ্ভব সুবলসরকার; রামসেন বংশজ দুর্গাপ্রসাদকবীন্দ্রপ্রভৃতির বিশেষ প্রতিপত্তি ছিল এবং নওপাড়ার চৌধুরীবংশীয় মনোহররায় সমাজপতির আসনে প্রতিষ্ঠিত ছিলেন। একমাত্র গঙ্গারাম ব্যতীত পূর্ব্বোক্ত অপর সমস্ত ব্যক্তিই রাজবল্লভের আহ্বানে কর্ণপাত না করিয়া বিরুদ্ধাচরণে প্রবৃত্ত হইলেন। তাঁহাদের উত্তেজনার ফলে বঙ্গীয় বৈদ্যসমাজের প্রায় অর্দ্ধাংশ পরিমাণ লোক এই অনুষ্ঠানে যোগদান করিল না। এই সময় রাজবল্লভ রাজকীয় উচ্চপদে প্রতিষ্ঠিত ছিলেন। ইচ্ছা করিলে তিনি রাজকীয় ক্ষমতার পরিচালনা করিয়া "বিরুদ্ধবাদী লোকদিগকে অনায়াসে" অপদস্থ করিতে পারিতেন। কিন্তু সামাজিক ব্যাপারে রাজকীয় ক্ষমতার অপব্যবহার করা তাঁহার প্রকৃতিসিদ্ধ ছিল না; সুতরাং তিনি পাশবশক্তির আশ্রয় গ্রহণ না করিয়া স্বমতাবলম্বী সমস্ত বৈদ্যসন্তানগণের সহিত যজ্ঞোপবীত গ্রহণ করিলেন। সমগ্র বঙ্গীয় সমাজকে স্বমতে আনিতে না পারিয়া রাজবল্লভ যে মনে মনে অত্যন্ত ক্ষুণ্ণ হইয়াছিলেন সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। তিনি মনে করিয়াছিলেন কালে বিরুদ্ধবাদিগণ যুক্তিতর্কে পরাভূত হইয়া তাঁহারই মত অবলম্বন করিবেন। দুর্ভাগ্যবশতঃ রাজবল্লভের জীবনে সেই আশা আর পূর্ণ হইতে পারে নাই। মীরকাশীমের নৃশংসতায় তাঁহাকে ৫৬ বৎসর বয়ঃক্রমের সময় প্রাণবিসর্জ্জন দিতে হইল। যদি তাঁহার এইরূপ অকালমৃত্যু সংঘটিত না হইত, তবে নিশ্চিতই তিনি সমগ্র বঙ্গীয় বৈদ্যসমাজকে স্বমতে আনয়ন করিয়া মনের আশা পূর্ণ করিতেন।

যে কালে মহম্মদসাহ দিল্লীর পালক।
নবাব মহবৎজঙ্গ বঙ্গাদিশাসক॥
দেখে বৈদ্য বহুতর যজ্ঞসূত্রহীন।
কোন কোন বৈদ্য সদাচারেতে প্রবীণ॥
স্বজাতিরে ছিন্ন ভিন্ন দেখিয়া রাজন।
পণ্ডিতনিকটে করে পত্রিকাপ্রেরণ॥
অগ্নিষ্টোমঅত্যগ্নিষ্টোমযজ্ঞকারী।
মহারাজ রাজবল্লভ দাতা শুদ্ধাচারী॥ (১)

উদ্ধৃতস্থলের "কোন কোন বৈদ্য সদাচারেতে প্রবীণ" এই অংশ হইতে প্রতীয়মান হইতেছে, রাজবল্লভের সময় বৈদ্যজাতির কিয়দংশ উপনীত এবং কিয়দংশ অনুপনীত ছিল। অনুপনীত বৈদ্যগণমধ্যে যে পূর্ব্বে উপনয়নপ্রথা প্রবর্ত্তিত ছিল, তাহা রামজীবনের নিম্নলিখিত উক্তি দ্বারাও সমর্থিত হইতেছে :—

বৈদ্যেতে মহারাজ রাজবল্লভ নাম।
সাকিম বিক্রমপুর রাজনগর গ্রাম॥
দেশে দেশে ছিল যত পণ্ডিত প্রধান।
সবে আনি জিজ্ঞাসেন শাস্ত্রের প্রমাণ॥
দ্বিজের আজ্ঞায় বৈদ্য পুনঃ উপনীত।
পুনঃ করে দ্বিজভাব যথা পূর্ব্বরীত॥

বর্দ্ধমানের অন্তর্গত শ্রীখণ্ডগ্রামনিবাসী শ্রীযুক্তদুর্গাচরণচৌধুরী মহাশয় লিখিয়াছেন—

---

(১) এতদ্দ্বারা ইহাও প্রমাণিত হয় যে নবাব আলিবর্দীর আমলেই রাজবল্লভ যজ্ঞোপবীতপ্রথা প্রবর্ত্তিত করিতে ব্রতী হইয়াছিলেন। বলা বাহুল্য যে আলিবর্দী ও মহবৎজঙ্গ অভিন্নব্যক্তি।

হইতে অব্যাহতিলাভ করিয়াছিলেন। বৈদ্যকুলপঞ্জিকাপাঠে অবগত হওয়া যায়, কোনও কোনও বৈদ্যসন্তান এই সময় বল্লালের সহিত পংক্তি ভোজন করিয়া সমাজের উচ্চতর স্তরহইতে নিম্নতর স্তরে অবনমিত হইয়াছিলেন। এবং কেহ কেহ জাতি ও মান রক্ষা করিবার উদ্দেশ্যে জন্মভূমিপরিত্যাগপূর্ব্বক চট্টগ্রাম, ত্রিপুরা, শ্রীহট্ট ও ময়মনসিংহপ্রভৃতি স্থানে আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছিলেন।

এই সমাজবিপ্লবের ফলে কতিপয়সংখ্যক বৈদ্যসন্তানমধ্যে যজ্ঞোপবীতপ্রথা ক্রমে তিরোহিত হইতেছিল। কিন্তু সমগ্র বৈদ্যজাতিই যে এইরূপে নিরুপবীত হইয়াছিল এমন নহে। পঞ্চকোট ও রাঢ়ীয়সমাজস্থ বৈদ্যগণ কখনও যজ্ঞোপবীত পরিত্যাগ করেন নাই। যাঁহরা সমাজের অবস্থা অবগত আছেন, তাঁহরা সকলেই একবাক্যে স্বীকার করিবেন যে রাজবল্লভের সময় পূর্ব্বোক্ত দুই সমাজের বৈদ্যগণ নিরুপবীত ছিলেন না। কাশীকাঞ্চীপ্রভৃতি দেশনিবাসী বিখ্যাত পণ্ডিতগণ বৈদ্যজাতির উপনয়নবিষয়ে রাজবল্লভকে যে ব্যবস্থাপত্র দিয়াছিলেন, তাহা পূর্ব্বেই উদ্ধৃত করা হইয়াছে। সেই ব্যবস্থাপত্রে যাহা (১) লিখিত আছে তদ্দ্বারাও প্রমাণিত হইতেছে যে রাজবল্লভের সময় সমগ্র বৈদ্যজাতি অনুপবীত ছিল না। রাজবল্লভের মৃত্যুর অব্যবহিত পরেই গোপালকৃষ্ণ ও রামজীবনকর্ত্তৃক দুইখানি কুলপঞ্জিকা বিরচিত হইয়াছিল। গোপালকৃষ্ণকৃত কুলপঞ্জিকায় লিখিত আছে —

---

(১) শ্রীমদ্বল্লালাদ্যম্বষ্ঠানাং যজ্ঞোপবীত মাসীদিতি লোকাখ্যায়িকা তৎপ্রমাণমপ্যস্তি...কড়ইধাত্র্যাদিগ্রামনিবাসিনাম্ অম্বষ্ঠানাং যজ্ঞোপবীতাদিকমিতি লোক দর্শনেন চ।

রাঢ়ীয় সমাজের সহিত তাঁহার সংস্রব ছিল না তথায় সমস্ত বৈদ্যসন্তানগণ উপনীত হইতেন না।

শ্রীযুক্তনিখিলনাথরায় তাঁহার "মুর্শিদাবাদের ইতিহাসের" ৩২৩ ও ৩২৪ পৃষ্ঠায় লিখিয়াছেনঃ—'বঙ্গদেশের প্রাচীনহিন্দুঅধিবাসিগণমধ্যে ব্রাহ্মণেরা ও কোন কোন স্থানে বৈদ্যেরা উপনয়ন (১) ধারণ করিয়া থাকেন। কিন্তু রঘুনন্দনের সময় বৈদ্যগণ যে শূদ্ররূপে গণ্য ছিলেন তাহা তাঁহার শুদ্ধিতত্ত্ব হইতে অবগত হওয়া যায়। বৈদ্যগণ আপনাদিগকে ব্রাহ্মণের ঔরসে ও বৈশ্যার গর্ভজাত অম্বষ্ঠ বলিয়া পরিচয় দিয়া থাকেন। রঘুনন্দনের মতে কলিযুগে ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, অম্বষ্ঠ সকলেই শূদ্র; সেই জন্য তিনি ব্রাহ্মণ ভিন্ন বঙ্গদেশের অন্যান্য সকল জাতিরই ত্রিশদিন অশৌচ ব্যবস্থা করিয়াছেন। রঘুনন্দনের পর রাঢ়ীয় ব্রাহ্মণদিগের কুলাচার্য্য নুলোপঞ্চাননের উক্তি হইতে জানা যায় যে রাঢ়, বঙ্গ, সকল স্থানের বৈদ্যগণই শূদ্র ছিলেন; কান্যকুব্জাগত ব্রাহ্মণেরা তাঁহাদের যাজনাদি করিতেন না। রাঢ়ীয় বৈদ্যগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ পণ্ডিত ও কুলাচার্য্য ভরতমল্লিক রঘুনন্দনের মত অবলম্বন করিয়া বৈদ্যগণের শূদ্রত্ব প্রতিপাদন করিয়াছেন। সুতরাং সে সময়ও বৈদ্যগণ শূদ্রবৎই ছিলেন। ভরতমল্লিক প্রায় দুইশত বৎসর পূর্ব্বে প্রাদুর্ভূত হইয়াছিলেন। সুতরাং দুইশত বৎসরের পর হইতে বৈদ্যেরা উপনয়ন গ্রহণ করিতেছেন, ইহা প্রতিপন্ন হইতেছে। রাজা রাজবল্লভের সময় হইতে বৈদ্যেরা উপনয়ন গ্রহণ করিতে আরম্ভ করেন। বৈদ্যেরা অম্বষ্ঠ কিনা বুঝা কঠিন। মহাভারতের মতে শূদ্রের ঔরসে বৈশ্যার গর্ভজাত সন্তান বৈদ্য। বৈদ্যেরা অম্বষ্ঠ হইলেও মনু ও বৌধায়নের মতে তাঁহারা দ্বিজ নহেন। মনু ও

---

(১) বোধ হয় "উপনয়ন" শব্দ যজ্ঞোপবীতের" প্রতিশব্দরূপে ব্যবহৃত হইয়াছে। বলা বাহুল্য যে সংস্কারাত্মক অনুষ্ঠানবিশেষের নাম উপনয়ন।

সবিনয় নিবেদনম্ আমাদের পূর্ব্বপুরুষ ৺ফকিরচাঁদচৌধুরী মহাশয়ের সহিত নবাবসরকারে উভয়ের (রাজবল্লভ ও ফকির চাঁদের) সদ্ভাব হয়। ফকিরচাঁদের সহিত তাঁহার যে পত্রলেখালেখী হইয়াছিল, ঐ সকল পত্রের আসল আমাদের বাটীতে ছিল। স্কুল ইনস্পেক্টর ৺ পরমানন্দ মুখোপাধ্যায় মহাশয় উঁহার জীবনী লিখিবেন বলিয়া পত্রগুলি লইয়া আর ফেরত দেন নাই। অনুসন্ধানে জেনেছি পত্রগুলি নষ্ট হইয়াছে। রাজা বাহাদূরের সময় বঙ্গজবৈদ্যদের যজ্ঞোপবীত ছিল না। শ্রীখণ্ডের বৈদ্যদের আচারব্যবহার জানিবার জন্যে ও যজ্ঞোপবীতের পদ্ধতিসংগ্রহ জন্য তিনি শ্রীখণ্ডে আগমন করেন। এখান হইতে পদ্ধতি লইয়া গিয়া দেশে বৈদ্যের পৈতা দেওয়ান। ইতি ১৩১০। ১৭ জৈষ্ঠ

শ্রীদুর্গাচরণ চৌধুরী, শ্রীখণ্ড, বর্দ্ধমান।

এই পত্রের মর্ম্মানুসারে দেখা যাইতেছে যে রাজবল্লভের সময় শ্রীখণ্ড বৈদ্যসমাজে যজ্ঞোপবীতপ্রথা প্রবর্ত্তিত ছিল এবং সেই সমাজকে আদর্শ স্বরূপ গ্রহণ করিয়া রাজবল্লভ বঙ্গীয়বৈদ্যসমাজে উপনয়নপ্রথার পুনঃ প্রবর্ত্তন করিবার প্রয়াস পাইয়াছিলেন।

রাজবল্লভের সময়হইতে যে সমগ্র বৈদ্যসমাজ উপবীত ধারণ করিতে প্রবৃত্ত হয় নাই, তাহা আর একটি অবস্থার প্রতি লক্ষ্য করিলেও স্পষ্ট প্রতীয়মান হইবে। পঞ্চকোট ও রাঢ়ীয় সমাজের সমস্ত বৈদ্যসন্তানই নিয়মিতরূপে উপবীত গ্রহণ করিতেছেন; কিন্তু যে বঙ্গীয়বৈদ্যসমাজে রাজবল্লভ জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন, সেই সমাজে এখনও অনেক বৈদ্য সন্তান অনুপনীত রহিয়াছেন। যদি রাজবল্লভই সর্ব্ব প্রথম বৈদ্যসমাজে উপনয়নপ্রথার প্রবর্ত্তন করিতেন, তাহা হইলে কখনও তাঁহার নিজ সমাজে অনেক বৈদ্যসন্তান অনুপনীত থাকিত না এবং যে পঞ্চকোট ও

দিষ্ট শূদ্র কর্ম্মশূদ্রের নামান্তর মাত্র। এই সকল প্রমাণমূলে উপবীত-ত্যাগী অম্বষ্ঠগণ অতিদিষ্ট শূদ্রমধ্যে পরিগণিত হইতে পারেন সন্দেহ নাই। রঘুনন্দন পূর্ব্ববঙ্গের বৈদ্যগণের আচারভ্রষ্টতা দেখিয়াই সমগ্র বৈদ্যগণের আচারভ্রষ্টতা সিদ্ধান্ত করিয়া লইয়া তাঁহাদিগকে অতিদিষ্ট শূদ্র বলিয়া গিয়াছেন। ফলতঃ তিনি যে পঞ্চকোট ও রাঢ়ীয়সমাজস্থ বৈদ্যগণের সামাজিক অবস্থা অবগত ছিলেন না সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। হিন্দু সমাজের ইতিহাস আলোচনায় অবগত হওয়া যায় যে একমাত্র মনু ও যাজ্ঞবল্ক্য প্রভৃতি ঋষিগণই উচ্চ বর্ণকে নীচবর্ণে অবনমিত করিয়াছেন। রঘুনন্দন অবশ্য সেই শ্রেণীর লোক নহেন, সুতরাং তাঁহার পক্ষে কিয়দংশ বৈদ্যের আচারভ্রষ্টতার নিমিত্ত সমগ্র বৈদ্যজাতিকে শূদ্রে পরিণত করার চেষ্টা করা ধৃষ্টতা ভিন্ন আর কি হইতে পারে? রঘুনন্দনের সময় বঙ্গদেশীয় অধিকাংশ ব্রাহ্মণই হীনক্রিয় এবং বেদজ্ঞানবিবর্জ্জিত হইয়া-ছিলেন। তাঁহার জন্মের বহু পূর্ব্বে সপ্তশতী ব্রাহ্মণগণের ক্রিয়ালোপ ঘটিয়াছিল। উপবীতহীনতার নিমিত্ত বৈদ্যজাতির কর্ম্মশূদ্রত্ব সংঘটিত হইলে হীনক্রিয় ও বেদজ্ঞানবিবর্জ্জিত ব্রাহ্মণগণেরও অতিদিষ্ট শূদ্রত্ব হওয়া উচিত। কিন্তু স্বজাতিপক্ষপাতবশতঃ রঘুনন্দন সেই সমস্ত ব্রাহ্মণগণের ব্রাহ্মণত্ব অম্লানবদনে অক্ষুণ্ণ রাখিয়া গিয়াছেন। মনুর সময় সামাজিক শাসন অনেক কঠোর ছিল এবং সেই কঠোরতার ফলে অনেক উচ্চজাতি হীনক্রিয়তাবশতঃ জাতিভ্রষ্ট হইয়াছিলেন। কিন্তু তৎপর সামাজিকশাসন অনেক পরিমাণে শিথিল হইয়া পড়িয়াছিল। এবং তজ্জন্যই হীনক্রিয় সপ্তশতী ব্রাহ্মণগণ মনুর ১০ম অধ্যায়ের ২৪শ শ্লোক অনুসারে শূদ্রত্ব প্রাপ্ত হইয়াও ব্রাহ্মণ বলিয়াই পরিগৃহীত হইতেছিলেন। বর্ত্তমানযুগে বঙ্গদেশে মনুর বিধির আদর্শানুযায়ী ব্রাহ্মণের সংখ্যা মুষ্টিমেয় বলিলেও অত্যুক্তি হয় না, কিন্তু তথাপি এদেশে ক্রিয়াবর্জ্জিত, বেদবর্জ্জিত

বৌধায়নের মতে সজাতিজ ও অনন্তরজ সন্তান দ্বিজ হন। অম্বষ্ঠ একান্তরজ হওয়ায় তাঁহারা দ্বিজপদবাচ্য নহেন। অমরকোষে অম্বষ্ঠগণ শূদ্র বলিয়াই উল্লিখিত হইয়াছেন। সুতরাং বৈদ্যেরা অম্বষ্ঠ হইলেও শূদ্র।"

নিখিলবাবু পূর্ব্বোক্তরূপে বৈদ্যজাতিসম্বন্ধে যে সমস্ত মন্তব্য প্রকাশ করিয়াছেন তাহা সম্পূর্ণ ভ্রমাত্মক। অনেকে বলেন, তিনি বৈদ্যবিদ্বেষে ঐরূপ উক্তি করিয়াছেন। বস্তুতঃ নিখিলবাবুর ন্যায় সুশিক্ষিত ব্যক্তি বিদ্বেষবশে বিকৃত তত্ত্ব প্রকাশ করা প্রকৃত হইলে দেশের দুর্ভাগ্য বলিতে হইবে। তবে একথা নিঃসঙ্কোচে বলা যাইতে পারে যে উদ্ধৃত স্থানের অনেকাংশই যে সত্যের প্রতিকূল তদ্বিষয়ে সন্দেহ নাই। নিম্নে তৎসম্বন্ধে পর্য্যালোচনা করা হইল :—

রঘুনন্দনের পূর্ব্ব নিবাস শ্রীহট্টজিলায় অবস্থিত ছিল। শ্রীহট্ট পূর্ব্বকুলবৈদ্যসমাজের অন্তর্ভুক্ত। পূর্ব্বে বলা হইয়াছে এই সমাজস্থ বৈদ্যগণ বল্লাললক্ষ্মণের বিরোধপ্রসূত বিপ্লবে উপবীত পরিত্যাগ করিয়াছিলেন। মন্বাদি শাস্ত্র অনুসারে শূদ্রগণ জন্মশূদ্র ও কর্ম্মশূদ্র এই দুই শ্রেণীতে বিভক্ত। জন্মশূদ্রের মধ্যে মুখ্য ও গৌণ এই দুইটি শ্রেণী বিদ্যমান আছে। যাহারা শূদ্রকুলপ্রসূত তাহারা মুখ্য এবং যাহাদের জননী শূদ্রকুলসম্ভবা অথবা যাহারা শূদ্রহইতে কোনও মিশ্রবর্ণোদ্ভূতা রমণীর গর্ত্তে জন্মগ্রহণ করিয়াছে তাহারা গৌণশূদ্রপদবাচ্য। অম্বষ্ঠগণ ব্রাহ্মণের ঔরসে বৈশ্যজাতীয়া পত্নীর গর্ভে উৎপন্ন হইয়াছেন, সুতরাং তাঁহারা জন্মশূদ্র বলিয়া পরিগণিত হইতে পারেন না। মনুর ১০ম অধ্যায়ের ২৪শ শ্লোকে লিখিত আছে স্বকর্ম্ম ত্যাগ করায় লোকের বর্ণসঙ্করত্ব সংঘঠিত হয় (১)। স্মৃতি অনুসারে বর্ণসঙ্করগণ শূদ্রবৎ (২)। অতি-

(১) স্বকর্ম্মণাঞ্চ ত্যাগেন জায়ন্তে বর্ণসঙ্করাঃ

(২) শৌচাশৌচং প্রকুর্ব্বীরন্ শূদ্রবৎ বর্ণসঙ্করাঃ।

অধ্যায়ের ৪৩ম শ্লোক। পরবর্ত্তী ৪৪ম শ্লোকে (২) মনু যাহা লিখিয়াছেন তাহা পাঠে অবগত হওয়া যায়, যে সমস্ত পৌণ্ড, যবন,দ্রবিড়.কম্বোজ,শক, পারদ, কিরাত ও দরদপ্রভৃতি ক্ষত্রিয়গণ ক্রিয়ালোপে পূর্ব্বেই বৃষলত্ব প্রাপ্ত হইয়াছিলেন, তিনি তাঁহাদের শূদ্রত্বের কথাই ৪৩ম শ্লোকে বলিয়াছেন। ফলে মনুকৃত গ্রন্থ অধ্যয়ন করিলে রঘুনন্দন কখনও এই শ্লোকদ্বারা বর্ত্তমান যুগের ক্ষত্রিয়দিগের বৃষলত্ব ঘটাইবার প্রয়াস পাইতেন না। কালমাহাত্ম্যে ব্রাহ্মণের ন্যায় ক্ষত্রিয়,বৈশ্য ও অম্বষ্ঠগণ যে কিয়ৎপরিমাণে আচারভ্রষ্ট হইয়াছিলেন সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। কিন্তু আচারভ্রষ্টতা সত্ত্বেও ব্রাহ্মণগণ যে কারণে ব্রাহ্মণ বলিয়া পরিগৃহীত হইতেছিলেন, ঠিক সেই কারণেই অম্বষ্ঠ, ক্ষত্রিয়, ও বৈশ্যগণ আপন আপন জাতি রক্ষা করিতে সমর্থ হইয়াছেন। রঘুনন্দন এস্থলে স্বজাতিপক্ষপাতী হইয়া ন্যায় ও যুক্তির মস্তকে পদাঘাত করিয়াছেন এবং বোধ হয় তাঁহার একদেশদর্শিতার নিমিত্তই বাঙ্গালার সর্ব্বত্র রঘুনন্দনের স্মৃতি প্রমাণ বলিয়া পরিগৃহীত হয় নাই। (১) মন্বাদি কি এমন কোনও বিধি প্রণয়ন করিয়া গিয়াছন যে আমাদের সন্তানেরা হীনক্রিয় হইলেও শূদ্র হইবে না?

শূদ্রো ব্রাহ্মণতা মেতি
ব্রাহ্মণ শ্চৈতি শূদ্রতাম্। ৬৫—১০ম অঃ

ইহা কি মনুরই বচন নহে? ভরতমল্লিকের উক্তিসম্বন্ধে নিখিল বাবু যাহা লিখিয়াছেন তাহাও ঠিক হয় নাই। ভরত মল্লিক বলিয়াছেন—

---

(২) পৌণ্ড্রকা শ্চৌড্র দ্রবিড়াঃ কম্বোজা যবনাঃ শকাঃ।
পারদাঃ পহ্লবাশ্চীনাঃ কিরাতা দরদাঃ খসাঃ॥

(১) মহামহোপাধ্যায় চন্দ্রকান্ত তর্কলঙ্কার মহাশয় তৎপ্রণীত গোভিলগৃহ্যসূত্রের টীকায় রঘুনন্দনের অনেক কথাই অকর্ম্মণ্য বলিয়াছেন।

বেয়াল্লিশকর্ম্মা অসংখ্য লোক সমাজে ব্রাহ্মণ বলিয়া পূর্ব্ববৎ পরিগৃহীত হইতেছেন। সুতরাং প্রতীয়মান হইতেছে যে মনুর ১০ম অধ্যায়ের ২৪শ শ্লোক পরবর্ত্তী সময়ে সমাজে প্রযুক্ত হয় নাই।

রঘুনন্দন "শুদ্ধিতত্ত্ব" নামক যে পুস্তক রচনা করিয়াছেন, তাহা পাঠ করিলে বুঝা যায় যে তিনি মন্বাদিকৃত গ্রন্থ আদৌ পাঠ করেন নাই। তিনি যে মনুর ১০ম অধ্যায়ের ২৪শ শ্লোকের অনুবলে বৈদ্যজাতিকে শূদ্র বলিয়া প্রতিপাদন করিয়াছেন এমন নহে। তিনি স্বীয় মত প্রতিপাদনার্থ শুদ্ধিতত্ত্বে লিখিয়াছেন ঃ—

"ইদানীন্তন ক্ষত্রিয়াণামপি শূদ্রত্বমাহ মনুঃ
শনকৈস্তু ক্রিয়ালোপাৎ ইমাঃ ক্ষত্রিয়জাতয়ঃ।
বৃষলত্বং গতা লোকে ব্রাহ্মণাদর্শনেন চ॥

অতএব বিষ্ণুপুরাণং মহানন্দিসুতঃ শূদ্রাগর্ব্ভোদ্ভবঃ অতিলুব্ধো মহাপদ্মোনন্দঃ পরশুরাম ইবাপরঃ অখিলক্ষত্রিয়ান্তকারী ভবিতা। ততঃ প্রভৃতি শূদ্রাঃ ভূপালা ভবিষ্যন্তি ইতি। তেন মহানন্দিপর্য্যন্তং ক্ষত্রিয় আসীৎ এবং চ ক্রিয়ালোপাৎ বৈশ্যানামপি তথা এবম্ অম্বষ্ঠাদীনামপি চ জাতিপ্রসঙ্গাৎ উক্তম্।" (১)

ফলে "শনকৈস্তু.........দর্শনেনচ" এই শ্লোকদ্বারা মনু ইদানীন্তন ক্ষত্রিয়দিগের শূদ্রত্ব প্রাপ্তির কথা বলেন নাই। এই শ্লোকটি মনুর ১০ম

---

(১) নিখিল বাবু রঘুনন্দনের দোহাই দিয়া বলেন, প্রায় দুইশত বৎসর পূর্ব্বে বৈদ্যগণ শূদ্র ছিলেন এবং পরে কেহ কেহ দ্বিজাতির আচার অবলম্বন করিয়াছেন। কিন্তু রঘুনন্দন উদ্ধৃত স্থানে যাহা লিখিয়াছেন তদ্দ্বারা ইহাই বুঝা যায় যে অম্বষ্ঠগণ পূর্ব্বে দ্বিজাতি ছিলেন এবং পরে ক্রিয়ালোপহেতু অতিদিষ্ট শূদ্র হইয়াছেন।

সজাতিজা নন্তরজাঃ ষট্ সুতা দ্বিজ ধর্ম্মিণঃ।

শূদ্রাণাস্তু সধর্ম্মাণঃ সর্ব্বেপধ্বংসজাঃ স্মৃতাঃ॥ ৪১—১০অং

তত্র মেধাতিথিঃ—অনন্তরজাঃ অনুলোমাঃ ব্রাহ্মণাৎ ক্ষত্রিয়া বৈশ্যয়োঃ, ক্ষত্রিয়াৎ বৈশ্যায়াং জাতাঃ তেপি দ্বিজধর্ম্মাণঃ উপজেয়াঃ উপনীতাশ্চ দ্বিজাতিধর্ম্মৈঃ সর্ব্বৈঃ অধিক্রিয়ন্তে।

অর্থাৎ ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, সজাতিজ এই তিন ও মূর্দ্ধাবসিক্ত, অম্বষ্ঠ ও মাহিষ্য অনন্তরজ এই তিন, মোট্ এই ছয় জন দ্বিজ ধর্ম্মা, ইহা ছাড়া শূদ্রমাতৃক পারশব, উগ্র, করণ (কায়স্থ) ও বর্ণসঙ্করজগণ শূর্দ্রধর্ম্মা।

অবশ্য অম্বষ্ঠগণ একান্তরজ, কিন্তু একান্তরজ ও দ্ব্যন্তরজগণও অনন্তরজ সংজ্ঞার বিষয়ীভূত। তবে ইঁহারা মূর্দ্ধাবসিক্ত, মাহিষ্য ও করণের ন্যায় আজন্ম অনন্তরজ নহেন। কিন্তু করণগণ শূদ্রমাতৃকত্ব নিবন্ধন (৬৭। ৬৮।৬৯।১০ অঃ) উপনয়নাদি সংস্কারে অনধিকারী। ফলতঃ বর্ত্তমান মনুর ৭ম বচন প্রক্ষিপ্ত। এই স্থলে মূর্দ্ধাবসিক্ত, মাহিষ্য ও করণগণের জন্মবিষয়ক যে বচন ছিল তাহা বিলুপ্ত হওয়ায় কে এই নূতন বচন রচিয়া বসাইয়া দিয়াছেন। তাই অন্য কেহ ১৪শ বচন রচিয়া অম্বষ্ঠ ও উগ্র প্রভৃতি সকলকেই অনন্তরজো বা অনন্তরজ শব্দে বিশেষিত করিয়াছেন, নতুবা ৪১ বচনে দোষ পড়িত। সুতরাং আর্য্য হইতে আর্য্যাতে জাত অম্বষ্ঠ যে দ্বিজ ও একতর ব্রাহ্মণ ইহা ধ্রুবই।

সামাজিক অবস্থার প্রতি লক্ষ্য করিলেও প্রতীয়মান হইবে যে, রঘুনন্দন কিংবা ভরতমল্লিকের সময় সমগ্র বৈদ্যজাতি শূদ্রত্বে পরিণত হয় নাই। আমরা দেখিতে পাই বৈদ্যগণ এই সময়েও ব্রাহ্মণের ন্যায় রীতিমতে সংস্কৃত শাস্ত্রের অধ্যয়ন ও অধ্যাপনা করিতেছিলেন। কুল-পঞ্জিকাপাঠে ইহাও অবগত হওয়া যায় যে, রঘুনন্দন এবং ভরত মল্লিকের

যুগে জঘন্যে দ্বে জাতী ব্রাহ্মণঃ শূদ্র এব চ।

শনকৈস্তু ক্রিয়ালোপাদিমাঃ ক্ষত্রিয়জাতয়ঃ।

বৃষলত্বং গতা লোকে ব্রাহ্মণাদর্শনেন চ॥

ইতি মনুবচনং ধৃত্বা এবমষ্ঠাদীনামপি কলৌ শূদ্রত্বমিতি স্বস্বগ্রন্থেষু বাচস্পতিমিশ্রাদিভিস্তথা শুদ্ধিতত্ত্বে স্মার্ত্তভট্টাচার্য্যেণাপ্যুক্তং অতএব কুলপঞ্জিকায়ামুক্তং :—

অতিদিষ্টং হি বৈদ্যস্য শূদ্রত্বং ক্ষত্রিয়াদিবৎ।

তস্মাৎ ক্ষত্রবিশোস্তল্যো বৈদ্যঃ শূদ্রস্য পূজিতঃ॥

এস্থলে ভরতমল্লিক কখনও বৈদ্যগণের শূদ্রত্ব প্রতিপাদন করেন নাই। বরং তিনি বলিয়াছেন, বৈদ্যগণকে আচারভ্রষ্টতার নিমিত্ত অতিদিষ্ট শূদ্র বলা যাইতে পারে বটে, কিন্তু তাঁহারা ক্ষত্রিয় ও বৈশ্যের ন্যায় শূদ্রের পূজ্য। এতদ্দ্বারা ইহাই বরং প্রতিপন্ন হয় যে রঘুনন্দনের উক্তি সত্ত্বেও ভরতমল্লিক বৈদ্যগণকে শূদ্র বলিতে প্রস্তুত নহেন। অতএব ভরত মল্লিকের পর হইতে বৈদ্যগণ যে উপবীত ধারণ করিতেছেন এইরূপ সিদ্ধান্ত কোন্ যুক্তির অনুবলে হইতে পারে তাহা নিখিলবাবু ভিন্ন আর কেহ বুঝিবেন না। বোধ হয় মল্লিক মহাশয়ের সময় মনুকৃত গ্রন্থ সহজে পাওয়া যাইত না, এজন্য তিনি এই গ্রন্থ পাঠ করিবার সুবিধা পান নাই। মনুকৃত গ্রন্থ পাঠ করিলে তিনি নিশ্চিতই রঘুনন্দনের ভ্রমপূর্ণ উক্তির উপর নির্ভর না করিয়া তাহার অশুদ্ধতা প্রদর্শন করিতেই প্রয়াস পাইতেন। নিখিলবাবুও মনু ও বৌধায়নস্মৃতি তলাইয়া পড়িয়া দেখিলে এরূপ বলিতেন না। মনু ও বৌধায়নই বরং অম্বষ্ঠকে দ্বিজ ও ব্রাহ্মণ বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। "অনন্তরজ" পরিভাষার প্রকৃত তাৎপর্য্য হৃদয়ঙ্গম করিতেও নিখিলবাবু অসমর্থ হইয়াছেন। ফলতঃ অনুলোমজ সন্তান মাত্রই অনন্তরজ। মনু বলিতেছেন—

উত্তরিল মহেশাদি যতেক সুকৃতি।
নিত্য যাজ্যে রত নহি, নৈমিত্তিকে ব্রতী ॥
অজ্ঞ হল দশকর্ম্মা, শ্রাদ্ধে পিণ্ডভোজী।
দ্বিজের স্থগুলে ঋত্বিক, নহি শূদ্রযাজী ॥
আদিশূর রাজা বৈদ্য, বৈদ্যে তার জাতি।
একচ্ছত্রী রাজা ছিল, ক্ষত্রবৎ ভাতি ॥
ইন্দ্রদ্যুম্ন বৌদ্ধ রাজা, জগন্নাথে কীর্ত্তি।
সাম্যবাদী, তবু বলায় ক্ষত্রিয় বৃত্তি ॥
রাজা হলে রাজন্য সে না ভাবে অন্যথা।
পতিত কম্বোজাদি গৌড় ক্ষত্র যথা ॥
ভূপাল অনঙ্গপাল, আর মহীপাল।
জাতিভ্রষ্ট ক্ষত্র নহে রাজন্য প্রবল ॥
তারাও বিভা করিত তিন জাতির মেয়ে।
ব্রাহ্মণ পুরোধা সাতশতী দেখ চেয়ে ॥
তাই তারা ক্রিয়াকাণ্ডে বেদজ্ঞানহীন।
যাজক, পিণ্ডভোজী, প্রথা ত অপ্রাচীন ॥
বল্লাল লয় যবে পদ্মিনী জাতিহীনা।
লক্ষ্মণ কহে দ্বিজে এ প্রথা ত দেখি না ॥
তাই বল্লাল ত্যজে কুপুত্র বলি সুতে।
লক্ষ্মণ ত্যজে পৈতা বৈদ্যকুল রক্ষিতে ॥
ইথে উভয় পক্ষের বৈদ্য পতিত ও ব্রাত্য।
ক্রমশঃ বৃষলে গণ্য অত্রত্য তত্রত্য ॥
তাই কান্যকুব্জ বৈদ্যযাজন না করে।
পূর্ব্বে ও অগ্ন্যাধানে স্বধা মাত্র ধরে ॥

সমকালবর্ত্তী অথবা পূর্ব্ববর্ত্তী বৈদ্যসন্তানগণ বাচস্পতি, কর্ণপুর, সার্ব্বভৌম শিরোমণি, কণ্ঠহার, বিদ্যাভূষণ ও কণ্ঠাভরণপ্রভৃতি উপাধিদ্বারা ভূষিত হইতেন। (১)

মহাত্মা বিদ্যাসাগর মহাশয়ের প্রযত্নে মাত্র ১৮৪৮ খৃষ্টাব্দে শূদ্রজাতি কলিকাতা সংস্কৃত কলেজে পাঠ করিবার অধিকার লাভ করিয়াছেন। তৎপূর্ব্বে সামাজিক নিয়মানুসারে একমাত্র ব্রাহ্মণ ও বৈদ্যগণই তথায় পাঠ করিতে পাইতেন। বৈদ্যগণ শূদ্রজাতিতে পরিণত হইয়া থাকিলে ব্রাহ্মণপণ্ডিতোচিত উপাধি লাভ ঘটিয়া উঠিত না। নিখিলবাবু নুলো পঞ্চাননের উক্তির দোহাই দিয়া বলেন, নুলো পঞ্চাননের মতে রাঢ় ও বঙ্গের বৈদ্যগণ শূদ্র ছিলেন। নিম্নে নুলো পঞ্চাননের উক্তি উদ্ধৃত করা হইল। তদ্দৃষ্টে প্রতীয়মান হইবে যে নুলো পঞ্চানন বরং বৈদ্যজাতির দ্বিজাতিত্বই সপ্রমাণ করিয়া গিয়াছেন। নুলো পঞ্চানন বলেন :—

"একদিন রাজা জিজ্ঞাসিল পঞ্চগোত্রীয়ে।
মহাবংশ কুলীন, আর সিদ্ধ শ্রোত্রিয়ে॥
কহ, সভাসদ আছ, যতেক পণ্ডিত।
কি হেতু ত্যজিলে বৈদ্যে ছিলে পুরোহিত॥

---

(১) (ক) ঈশ্বরগুপ্তের পূর্ব্ব পুরুষ বিজয়রাম বাচস্পতি (বঙ্কিমবাবুকৃত ঈশ্বর গুপ্তের জীবনী)।

(খ) ভরদ্বাজ কুলোদ্ভূতঃ কর্ণপুর সুতাসুতঃ। কণ্ঠহার

(গ) জগাম ভবনগরে পুণ্যাত্মা চন্দ্রশেখরঃ।
রমানাথ সার্ব্বভৌমঃ কন্যামস্য ব্যুবাহ চ॥ কণ্ঠহার

(ঘ) কর্ণপুরাৎ সুতোজাতো রামচন্দ্রঃ শিরোমণিঃ। "

(ঙ) জ্যেষ্ঠাসৌ কণ্ঠাভরণো মধ্যমঃ কবিভারতী। "

(চ) কনীয়ান্ কণ্ঠহারশ্চ কন্যয়োস্ত ভয়োঃপতী। "

বৈদ্যরাজা আদিশূর ক্ষত্রিয় আচার।
বেদে ব্রহ্মবৎ, কার্য্যে মাতৃ ব্যবহার॥
রাজপুত ক্ষত্র বল্‌তে বদ্ধপরিকর।
আজি শুদ্ধ ক্ষত্র নাই বর্ণের সঙ্কর॥
আদিশূর বৈদ্য বটে, ক্ষত্রকন্যা পত্নী।
শূদ্র কন্যা ব্রহ্মজায়া না লানে অরত্নি॥"

উদ্ধৃত স্থলে নূলো পঞ্চানন বলিতেছেন, "আদিশূর বৈদ্য ছিলেন এবং তাঁহার আচার ক্ষত্রিয়ের ন্যায় এবং ব্যবহার বৈশ্যের ন্যায় ছিল। বল্লাল পদ্মিনী নাম্নী কোন নীচজাতীয়া রমণীতে আসক্ত হইলে লক্ষ্মণ সেনের সহিত তাঁহার বিরোধ উপস্থিত হইয়াছিল এবং তদুপলক্ষে রাজকুমার লক্ষ্মণসেন বৈদ্যকুল রক্ষা করিবার উদ্দেশে যজ্ঞোপবীত পরিত্যাগ করিয়াছিলেন। এই কারণে যজ্ঞোপবীতপরিত্যাগকারী বৈদ্যগণের শূদ্রত্ব এবং বল্লালসংস্পৃষ্ট বৈদ্যগণের বৃষলত্ব সংঘটিত হইয়াছিল।" উদ্ধৃত স্থলে এমন কথা লিখিত নাই যে, রাঢ় বঙ্গের সমস্ত স্থলের বৈদ্যগণই শূদ্র ছিলেন। বরং এই উক্তিদ্বারা ইহাই প্রমাণ হইতেছে যে, বল্লাল ও লক্ষ্মণের সময় বৈদ্যগণ উপবীত ধারণ করিতেন এবং তাঁহারা দ্বিজ বলিয়াই পরিচিত ছিলেন। ফলে নূলো পঞ্চাননের উক্তি সমগ্র বৈদ্যসমাজকে লক্ষ্য করে নাই—মাত্র বল্লাল ও লক্ষ্মণ সংস্পৃষ্ট বৈদ্যগণই তদ্দ্বারা লক্ষিত হইয়াছেন।

বৈদ্যগণের অম্বষ্ঠত্বসম্বন্ধেও নিখিলবাবু কটাক্ষপাত করিয়াছেন। নিম্নে যাহা লিখিত হইল তাহা পাঠ করিলে বোধ হয় তাঁহার আর বৈদ্যগণের অম্বষ্ঠত্ব সম্বন্ধে কোনও সন্দেহ থাকিবে না।

ভরত মল্লিকের ভট্টি টীকা ১৫৯৭শকে অর্থাৎ ১৬৭৫ খৃষ্টাব্দে বিরচিত হইয়াছে। সেই গ্রন্থে তিনি আত্মপরিচয় দিতে গিয়া লিখিয়াছেন :—

পুরোধা যজ্ঞযাজক পিণ্ডভোজী নয়।
আধুনিক অজ্ঞ দ্বিজ ভোজ্য মাত্র লয়॥
শ্রাদ্ধে সংকল্পে মৃতের স্বর্গোদ্দেশ্যে দান।
নিমন্ত্রিত বিপ্রে দেন পুরোধা না খান॥
এ উদ্দেশ্য না থাকিলে যাজক পূজক।
ক্রিয়াকাণ্ডে লোভী হত সর্ব্বভক্ষক॥
যজমানো অল্পমাত্র দক্ষিণা যে দিয়া।
উৎসৃষ্ট ভোজ্যে ঋত্বিকে দিত পুষিয়া॥
অসৎ প্রতিগ্রহে দ্বিজ পতিত অগ্রদানী।
তাহা দেখি বৈদ্যে ত্যজে জ্ঞানী দ্বিজমানী॥
পৈত্রকার্য্যে পিণ্ডভোজী পৌরাহিত্যে দোষ।
দৈবে আর্ষে পৈত্রে স্বধা করয়ে প্রতোষ॥
সবন্ধু বল্লাল পতিত বৃষলে গণ্য।
বৈদ্যকুল পৈতা ত্যজি শূদ্রবৎ অধন্য॥
সৎক্ষত্রিয় আর যে কুলীন তনয়ে।
যাজন ত্যজে রাজার শূদ্র বলে ভয়ে॥
যদবধি বৈদ্যকুল দ্বিজত্ববিহীন।
তদা পবিত্র দ্বিজ বৈদ্যে ত্যজে প্রবীণ॥
কন্দুপক্ক, পয়পক্ক আর ঘৃতপক্ক।
দ্বিজগ্রাহ্য শূদ্রপাকে এই মাত্র সম্পর্ক॥
শূদ্রের আমান্ন শ্রাদ্ধে পক্ক বলি গণ্য।
বৈদ্য ও বৃষল শ্রাদ্ধে আম মাত্র মান্য॥
নিবেদিল রাজা মম পূর্ব্ব পিতামহে।
বৈদ্য হলেও রাজন্যআচরণে রহে॥

তেতোঽভবৎ কাঞ্চণরাশিগৌরঃ।

বালোঽতিসৌম্যাকৃতিরেব তস্যাঃ ॥

ক্রোড়ে বিলোক্যৈব শিশুং মুনীন্দ্রাঃ

প্রাপুর্ম্মুদং বেদতয়ৈব জাতঃ ॥

বৈদ্যস্ততোয়ং জননীকুলেচ

খ্যাতা ততোঽম্বষ্ঠ ইতি প্রসিদ্ধঃ ॥

অগ্নিবেশ বলেন :—

অম্বষ্ঠাস্তেন তে সর্ব্বে দ্বিজা বৈদ্যাঃ প্রকীর্ত্তিতাঃ।

রাজা রাধাকান্তদেবের প্রকাশিত শব্দকল্পদ্রুমে লিখিত আছে :—

অম্বষ্ঠঃ-বিপ্রাৎ বৈশ্যায়ামুৎপন্ন ইতি মেদিনী

অয়ং চিকিৎসাবৃত্তিঃ বৈদ্য ইতি খ্যাতঃ।

রামকমলবিদ্যালঙ্কারকৃত প্রকৃতিবাদ অভিধানে অম্বষ্ঠ শব্দের অর্থ লিখিত হইয়াছে :—

ব্রাহ্মণের ঔরসে বৈশ্যাগর্ভজাত বৈদ্য।

কায়স্থ শ্রীযুক্ত গোবিন্দমোহন রায় "অষ্টাদশ বিদ্যা" নামক পুস্তকে লিখিয়াছেন :—

অম্বষ্ঠজাতি চিকিৎসাবৃত্তিদ্বারা জীবিকা নির্ব্বাহ করিয়া থাকেন। এই জাতির প্রচলিত নাম বৈদ্য।

বঙ্গজ কায়স্থ শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র রায় চৌধুরী বি, এল, মহাশয় "বঙ্গীয় সমাজ" নামক প্রবন্ধে লিখিয়াছেন :—

ব্রাহ্মণ কায়স্থ ব্যতীত, ক্ষত্রিয়, বৈদ্য, নবশাখপ্রভৃতি অন্যান্য নানাজাতির নানা সমাজ বঙ্গের নানা স্থানে বিদ্যমান আছে। উল্লিখিত আছে, ব্রাহ্মণের ঔরসে বৈশ্যার গর্ভজাত পুত্র অম্বষ্ঠ বা বৈদ্য নামে খ্যাত।

কায়স্থ যতীন্দ্রবাবু ১২৮০ সনের বঙ্গদর্শনে লিখিয়াছেন :—

নত্বাশঙ্করমম্বষ্ঠো গৌরাঙ্গমল্লিকাত্মজঃ।
ভট্টিটীকাং প্রকুরুতে ভরতো মুগ্ধবোধিনীম্ ॥ (১)

ভরত মল্লিক কৃত চন্দ্রপ্রভা নামক কুলপঞ্জিকায় বৈদ্যগণ পুনঃ পুনঃ অম্বষ্ঠ বলিয়া আখ্যাত হইয়াছেন। এ বিষয়ে কাহারও সন্দেহ থাকিলে তিনি চন্দ্রপ্রভা পাঠ করিয়া সংশয়নিরাকরণ করিতে পারেন। বৃহদ্ধর্ম্ম পুরাণের উত্তর খণ্ডের নবম অধ্যায়ে লিখিত আছে :—

তস্মাদম্বষ্ঠনামাতু সংকরোয়ং ধরাপতে।
অস্মাভিরস্য সংস্কারঃ কর্ত্তব্যো বিপ্রজন্মনঃ ॥
যেনাসৌ সংস্কৃতো ভূত্বা পুনর্জাতইবাস্তু চ।
ইত্যুক্ত্বা তে দ্বিজগণাঃ স্মৃত্বা নাসত্যদস্রকৌঃ ॥
তয়োরনুগ্রহাদ্ বিপ্রা দয়াবন্তো দ্বিজাতয়ঃ।
আয়ুর্ব্বেদং দদুস্তস্মৈ বৈদ্যনাম চ পুষ্কলম্ ॥
তেনাসৌ পাপশূন্যোঽভূৎ অম্বষ্ঠখ্যাতিসংযুতঃ ॥

শঙ্খ বলিয়াছেন :—

বেদাৎ জাতোঽহি বৈদ্যঃ স্যাদম্বষ্ঠো ব্রহ্মপুত্রকঃ।

স্কন্দপুরাণে লিখিত আছে :—

---

(১) গৌরাঙ্গ মল্লিকের পুত্র অম্বষ্ঠ ভরত শঙ্কর দেবকে প্রণাম করিয়া মুগ্ধবোধন ব্যাকরণানুযায়িনী ভট্টিটীকা রচনা করিতেছেন।

কৈলাসবাবু লিখিয়াছেন, "রাজবল্লভ অর্থবলে বৈদ্যকে অম্বষ্ঠে পরিণত করিয়াছিলেন।" রাজবল্লভ ১৭০৭ খৃষ্টাব্দে অর্থাৎ ভট্টিটীকার অন্ততঃ ৭৮ বৎসর পরে জন্মগ্রহণ করেন। রাজবল্লভের অর্থবল বৈদ্যের অম্বষ্ঠত্বের কারণ হইলে তাঁহার জন্মের বহুপূর্ব্বে ভরত কেন বৈদ্যগণকে অম্বষ্ঠ বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন তাহার কারণ কৈলাসবাবু বলিবেন কি? রাজবল্লভের ২৫০ শত বৎসরের পূর্ব্ববর্ত্তী রঘুনন্দন আসন শুদ্ধিতত্ত্বেও কি বাঙ্গালার বৈদ্যগণকে অম্বষ্ঠ বলিয়া যান নাই?

যাজ্ঞবল্ক্য লিখিয়াছেন ঃ—

বিপ্রাৎ মূৰ্দ্ধাবসিক্তোঽহি ক্ষত্রিয়ায়াং বিশস্ত্রিয়াম্।
অম্বষ্ঠঃ শূদ্র্যাং নিষাদোজাতঃ পারশবোঽপিবা॥
বৈশ্যাশূদ্র্যোস্তু রাজন্যাৎ মাহিষ্যোগ্রৌ সুতৌ স্মৃতৌ।
বৈশ্যাত্তু করণঃ শূদ্র্যাং বিন্নাস্বেষ বিধিঃ স্মৃতঃ॥

উশনার মতে ঃ—

বৈশ্যায়াং বিধিনা বিপ্রাৎ জাতোঽম্বষ্ঠ উচ্যতে
কৃষ্যাজীবো ভবেৎ সোঽপি তথৈবাগ্নেয়বৃত্তিকঃ।
ধ্বজিনীজীবিকশ্চৈব চিকিৎসাশাস্ত্রজীবিকঃ॥

পরশুরাম সংহিতায় লিখিত আছে ঃ—

বৈশ্যায়াং ব্রাহ্মণাৎ জাতঃ অম্বষ্ঠো মুনিসত্তম।
ব্রাহ্মণানাং চিকিৎসার্থং নির্দ্দিষ্টা মুনিপুঙ্গবৈঃ॥

বৃদ্ধ হারীত বলেন ঃ—

বিপ্রাৎ মূৰ্দ্ধাবসিক্তস্তু ক্ষত্রিয়ায়ামজায়ত।
বৈশ্যায়াস্তু তথাম্বষ্ঠো নিষাদঃ শূদ্রয়া তথা॥

এক্ষণে মহাভারতে শান্তিপৰ্ব্ব হইতে নিম্নে যে কয়টি শ্লোক উদ্ধৃত করা গেল, তদ্দৃষ্টে প্রতীয়মান হইবে যে, মহর্ষি দ্বৈপায়নের মতে যে অম্বষ্ঠ জাতি পূর্ব্বোক্তরূপে জন্মগ্রহণ করিয়াছে, তাহাদের পদমর্য্যাদা ব্রাহ্মণের অপেক্ষা বড় অধিক ন্যূন নহে ঃ—

জনক উবাচ—বর্ণোবিশেষো বর্ণানাং মহর্ষে কেন জায়তে।
এতদিচ্ছাম্যহং জ্ঞাতুং তদ্ ব্রূহি বদতাং বর॥
যদেতৎ জায়তেঽপত্যাং স এবায় মিতি শ্রুতিঃ।
কথং ব্রাহ্মণতো জাতো বিশেষগ্রহণং গতঃ॥

সচরাচর অম্বষ্ঠ বৈদ্যবর্ণের নামান্তর বলিয়া গণ্য হইয়া থাকে।

অম্বষ্ঠ যে বৈদ্য জাতির নামান্তর মাত্র তাহা বঙ্গীয় হিন্দুসমাজের আবাল বৃদ্ধ বনিতা সকলেই অবগত আছেন। তবে নিখিলবাবু যে এ বিষয়ে সন্দিহান হইয়াছেন, তাহা দেশের দুর্ভাগ্য বলিতে হইবে। বিগত জনসংখ্যাগণনার সময় সরকার বাহাদুরের আদেশ অনুসারে বৈদ্য ও কায়স্থ এই উভয় জাতির মধ্যে কোন জাতি শ্রেষ্ঠ এ বিষয়ে প্রশ্ন উঠিয়াছিল। অনেকে বলেন, সেই প্রশ্ন উপলক্ষে যে আন্দোলন উপস্থিত হইয়াছিল, তাহার ফলেই নিখিলবাবু স্থৈর্য্য রক্ষা করিতে সমর্থ হন নাই।

নিখিলবাবু বলেন, "মহাভারতের মতে শূদ্রের ঔরসে বৈশ্যার গর্ভজাত সন্তান বৈদ্য।"

প্রকৃত প্রস্তাবে মহাভারতে যাহা লিখিত আছে তাহা এই :—

চণ্ডালো ব্রাত্যবৈদ্যৌচ ব্রাহ্মণাং ক্ষত্রিয়াসুচ।
বৈশ্যায়াং চৈব শূদ্রস্য লক্ষ্যন্তেঽপসদাস্ত্রয়ঃ॥ অনুশাসন পর্ব্ব।

এ স্থলে আমাদের স্মরণ রাখা কর্ত্তব্য যে বৈদ্য চারি প্রকার যথা,—রোগহর, বিষহর, শল্যহর ও কৃত্যাহর। অম্বষ্ঠ বৈদ্যগণ রোগহর বৈদ্য। মনুযাজ্ঞবল্ক্যপ্রভৃতি ঋষিগণের মতে অম্বষ্ঠগণ ব্রাহ্মণ পিতা ও বিধিপূর্ব্বক বিবাহিতা বৈশ্যা জননী হইতে উদ্ভূত।

অনন্তরাসু জাতানাং বিধিরেষ সনাতনঃ।
দ্ব্যেকান্তরাষু জাতানাং ধর্ম্ম্যং বিদ্যা দিমং বিধিম্॥ ৭
ব্রাহ্মণাৎ বৈশ্যাকন্যায়ামম্বষ্ঠো নাম জায়তে।
নিষাদঃ শূদ্রকন্যায়াং যঃ পারশব উচ্যতে॥ ৮।১০ম অঃ।

কুল্লূকভট্ট এ স্থলের অর্থ করিতে গিয়া বলেন, "কন্যা গ্রহণাদত্র উঢ়ায়ামিত্যধ্যাহার্য্যং। বিন্নাস্বেষ বিধিঃ স্মৃত—ইতি যাজ্ঞবল্ক্যেন স্ফুটী কৃতত্বাচ্চ। ব্রাহ্মণাৎ বৈশ্যকন্যায়ামূঢ়ায়াং অম্বষ্ঠাখ্যো জায়তে।"

এতদ্দ্বারা স্পষ্টই প্রমাণিত হইতেছে যে, মহাভারতের "চণ্ডালো * * * অপ সদাস্ত্রয়ঃ" এই শ্লোকে যে সমস্ত বৈদ্যের কথা লিখিত হইয়াছে তাহারা অম্বষ্ঠ বৈদ্য নহে। যে সমস্ত বৈদ্য বঙ্গীয় সমাজে অম্বষ্ঠ বলিয়া পরিচিত হইতেছেন, তাঁহাদের যাজক ব্রাহ্মণ এবং ভৃত্য জলাচরনীয় শূদ্র এবং তাঁহারা বঙ্গীয় হিন্দুসমাজের উচ্চ আসনে আসীন আছেন। শূদ্রের ঔরসে বৈশ্যার গর্ভজাত যে বৈদ্যের কথা মহাভারতে লিখিত আছে, তাহাদিগকে চণ্ডালের সহিত সমশ্রেণীস্থ করা হইয়াছে। মহাভারতের সেই বৈদ্য এবং অম্বষ্ঠ বৈদ্যগণ এক হইলে তাঁহারা কখনও সমাজের উচ্চ আসনে আসীন হইতে পারিতেন না এবং ব্রাহ্মণেরা কখনও তাঁহদিগকে জলাচরণীয় মনে করিতেন না। ফলে, "বেদীয়া" প্রভৃতি যে সমস্ত নীচজাতীয় লোক "মালবৈদ্য" নামে আখ্যাত, তাহারাই মহাভারতোক্ত শূদ্রের ঔরসে বৈশ্যাগর্ভজাত বৈদ্য বলিয়া লক্ষিত হইয়াছে। যদি তর্কস্থলে বলা যায় যে, মহাভারতের লিখিত এই বৈদ্য অম্বষ্ঠ বৈদ্য জাতিকেই লক্ষ্য করিতেছে, তবে তাহার উত্তর এই যে মনু, যাজ্ঞবল্ক্য, উশনা প্রভৃতির বচন বিদ্যমান থাকিতে মহাভারত নামক পুরাণের উক্তি প্রমাণ বলিয়া গ্রহণ করা যাইতে পারে না। কেন না,

শ্রুতিস্মৃতিপুরাণানাং বিরোধো যত্র দৃশ্যতে।
তত্র শ্রৌতং প্রমাণং হি তয়োর্দ্বৈধে স্মৃতির্ব্বরা॥ (১)

ব্রাহ্মণের সন্তানও ব্রাহ্মণ হইয়া থাকে। ব্রাহ্মণের ঔরসে শূদ্রাপত্নীতে জাত সন্তান ব্রাহ্মণ হইতে পারে না। ফলে ব্রাহ্মণের ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় ও বৈশ্যজাতীয় পত্নীজাত সন্তান ব্রাহ্মণই হইয়া থাকে।

(১) কোন বিষয়ে শ্রুতি, স্মৃতি ও পুরাণের মধ্যে মতভেদ উপস্থিত হইলে শ্রুতির মত বলবৎ হইবে। স্মৃতি ও পুরাণের মধ্যে মতভেদ হইলে স্মৃতির মতই প্রামাণ্য বলিয়া গ্রহণ করিতে হইবে।

পরাশর উবাচ—এবমেতন্ মহারাজ! যেন জাতঃ স এব সঃ।
তপসস্তপকর্ষেণ জাতিগ্রহণতাং গতঃ॥
সুক্ষেত্রাৎ চ সুবীজাৎ চ পুণ্যোভবতি সম্ভবঃ।
অতোঽন্যতরতোহীনাদবরো নাম জায়তে॥ (১)

মহাভারতের অনুশাসন পর্ব্বে লিখিত আছে :—
ত্রিস্রোভার্য্যা ব্রাহ্মণস্য দ্বে ভার্য্যে ক্ষত্রিয়স্য তু।
বৈশ্যঃ স্বজাত্যাং বিন্দেত তাস্বপত্যং সমং ভবেৎ।
ব্রাহ্মণ্যাং ব্রাহ্মণাৎজাতো ব্রাহ্মণঃ স্যাৎ ন সংশয়ঃ
ক্ষত্রিয়ায়াং তথৈব স্যাৎ বৈশ্যায়ামপি চৈব হি॥
অব্রাহ্মণং তু মন্যন্তে শূদ্রা পুত্রম্ অনৈপুণ্যাৎ
ত্রিষু বর্ণেষু জাতোহি ব্রাহ্মণাৎ ব্রাহ্মণোভবেৎ। (২)

---

(১) জনক বলিলেন :—হে মহর্ষি! শ্রুতিতে লিখিত আছে, যে যাহা হইতে সমুদ্ভূত সে তদ্বৎ হইয়া থাকে। তবে কেন একবর্ণ হইতে নানাবর্ণের উৎপত্তি হইল? ব্রাহ্মণের পুত্রেরাই বা কেন ভিন্ন ভিন্ন বর্ণে স্থান গ্রহণ করিল?

পরাশর উত্তর করিলেন :—মহারাজ! আপনি যাহা বলিতেছেন তাহা ঠিক। প্রকৃত প্রস্তাবে পিতা ও পুত্রের বর্ণে কোন বিভিন্নতা থাকিতে পারে না। পূর্ব্বকালে সবর্ণজ ও অসবর্ণজ সমস্ত পুত্রই পিতার জাতি প্রাপ্ত হইত। কিন্তু ক্রমে অসবর্ণজ পুত্রেরা হীনক্রিয়া ও গুণে লঘীয়ান্ হইতে আরম্ভ করিলে তাহারা স্বতন্ত্রজাতি বলিয়া পরিগৃহীত হইল। কিন্তু এ স্থলেও উচ্চবর্ণের পিতার ঔরসে অগরীয়সী অথচ উচ্চবর্ণের জননী গর্ত্তজাত সন্তান পবিত্র এবং অনুচ্চ পিতৃমাতৃ সম্ভূত সন্তানেরা অপকৃষ্ট বলিয়া পরিগৃহীত হইবে।

(২) ব্রাহ্মণের ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বৈশ্য এই তিন জাতীয়া পত্নী, ক্ষত্রিয়ের ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য এই দুই জাতীয়া ভার্য্যা এবং বৈশ্যের একমাত্র সজাতীয় পত্নী। এইরূপে উৎপন্ন সন্তানগণ পিতার জাতি প্রাপ্ত হয়। ব্রাহ্মণের ঔরসে ব্রাহ্মণীর গর্ভজাত সন্তান যে ব্রাহ্মণ সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। কিন্তু ক্ষত্রিয়া ও বৈশ্যাস্ত্রীর গর্ভজাত

এস্থলে মনু স্পষ্টই বলিয়াছেন যে, অনন্তরজ, একান্তরজ ও দ্ব্যন্তরজ সন্তান সম্বন্ধে একই প্রকার নিয়ম প্রবর্ত্তিত হইবে। ফলতঃ বৈদ্যগণ যে দ্বিজ ভিন্ন শূদ্র নহেন তাহা একটি অবস্থা দ্বারা স্পষ্ট প্রতীয়মান হয়।

"ন শূদ্রায় মতিং দদ্যাৎ"

মনুর এই বচনানুসারে শূদ্রগণ সংস্কৃতপাঠে অনধিকারী। কিন্তু আমরা দেখিতে পাই সাহিত্যদর্পণ, বাগভট্ট অলঙ্কার, কলাপের পরিশিষ্ট ও পঞ্জিকা, কবিকল্পদ্রুম, সুপদ্ম ব্যাকরণ, সংক্ষিপ্তসার ব্যাকরণ. পিঙ্গল, ছন্দোমঞ্জরী, হারাবলী, ত্রিকাণ্ডশেষ, বিশ্বকোষ, একাক্ষর কোষ ও মেদিনী প্রভৃতি বহুসংখ্যক সংস্কৃতগ্রন্থ বিদ্যাসাগর মহাশয়ের জন্মের বহুপূর্ব্বে বৈদ্যসন্তানকর্ত্তৃক বিরচিত হইয়াছে। পূর্ব্বে বলা হইয়াছে, বিদ্যাসাগর মহাশয়ের অনুগ্রহেই শূদ্রগণ সংস্কৃতপাঠে অধিকারী হইয়াছেন। বৈদ্যগণ শূদ্র হইলে তাঁহারা কখনও বিদ্যাসাগর মহাশয়ের জন্মের পূর্ব্বে পূর্ব্বোক্ত গ্রন্থসমূহ রচনা করিয়া সংস্কৃতসাহিত্যভাণ্ডারের পুষ্টিসাধন করিতে সমর্থ হইতেন না।

এখন অমরকোষের উল্লিখিত অম্বষ্ঠের কথা লিখিয়াই নিখিলবাবুর উক্তি সম্বন্ধে মন্তব্য শেষ করা হইবে। অমরকোষ শাস্ত্র নহে, উহা একখানি অভিধান মাত্র। অমরসিংহ প্রধানতঃ অগ্নিপুরাণ হইতে উপাদান সংগ্রহ করিয়া এই অভিধান প্রণয়ন করিয়াছেন। অগ্নিপুরাণেই লিখিত আছে—

"আনুলোম্যেন বর্ণানাং জাতি র্মাতৃসমাস্মৃতা।"

অমরকোষপ্রণেতা বৌদ্ধশ্রমণক ছিলেন; সুতরাং হিন্দুসমাজের পুঙ্খানুপুঙ্খ তত্ত্বসংগ্রহবিষয়ে তাঁহার বিশেষ আগ্রহ না করাই সম্ভবপর। তাঁহার সময়ে কোন কোন অম্বষ্ঠসন্তান যে লিপিবৃত্তি অবলম্বন করিয়া

নিখিলবাবু মনু ও বৌধায়নের দোহাই দিয়া বলিয়াছেন, অম্বষ্ঠগণ দ্বিজ নহেন। কিন্তু নিখিলবাবুর শ্বশুর, কায়স্থপ্রবর, প্রত্নতত্ত্ববিৎ ৺রাম দাস সেন মহাশয় বৈদ্য বা অম্বষ্ঠগণকে অম্লানবদনে দ্বিজ বলিয়া স্বীকার করিতে কুণ্ঠিত হন নাই। রামদাস সেন মহাশয়ের ন্যায় ভূয়োদর্শন থাকিলে অথবা লোকসংখ্যা গণনা উপলক্ষে বৈদ্য ও কায়স্থজাতি মধ্যে কোন জাতি শ্রেষ্ঠ সেই বিষয়ে আন্দোলন উপস্থিত না হইলে, নিখিলবাবু যে এরূপ উক্তি করিতেন না তাহা নিঃসঙ্কোচে বলা যাইতে পারে। তিনি বলেন, মনুর মতে সজাতিজ ও অনন্তরজ সন্তান দ্বিজ, কিন্তু অম্বষ্ঠগণ একান্তরজ বলিয়া দ্বিজ নহেন। বোধ হয় নিখিলবাবু মনুসংহিতা পাঠ না করিয়া এবং অন্যের মুখে শুনিয়া এ কথা লিখিয়াছেন। মনুসংহিতা পাঠ করিলে তাঁহার কদাচ এরূপ ভ্রম হইত না। সজাতীয়া পত্নীতে জাত সন্তান সজাতিজ, অব্যবহিত পরবর্ণে জাত স্ত্রীর গর্ত্তজাত সন্তান অনন্তরজ এবং তৎপরবর্ত্তী বর্ণেজাত পত্নীর গর্ভজাত সন্তান একান্তরজ বলিয়া অভিহিত হইয়া থাকে। অম্বষ্ঠগণ ব্রাহ্মণের বৈশ্যাপত্নীর গর্ভজাত, সুতরাং তাঁহারা একান্তরজ। কিন্তু মনু ১০ অধ্যায়ের ৬ষ্ঠ ও ৭ম শ্লোকে বলিতেছেন—

স্ত্রীষনন্তরজাতাসু দ্বিজৈরুৎপাদিতান্ সুতান্।
সদৃশানেব তানাহুর্মাতৃদোষবিগর্হিতান্॥
অনন্তরাসু জাতানাং বিধিরেষ সনাতনঃ।
দ্ব্যেকান্তরাসু জাতানাং ধর্ম্ম্যং বিদ্যাদিমং বিধিম্॥ (১)

---

(১) ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য এই ত্রিবিধ দ্বিজগণের স্ব স্ব বর্ণের অব্যবহিত পরবর্ত্তী বর্ণের স্ত্রীতে অর্থাৎ ব্রাহ্মণের ক্ষত্রিয়াস্ত্রীতে, ক্ষত্রিয়ের বৈশ্যাস্ত্রীতে এবং বৈশ্যের শূদ্রাস্ত্রীতে জাত সন্তান মাতৃকুলের হীনতাবশতঃ পিতার তুল্যজাতীয় বলিয়া গণ্য হইবেন না, পিতার তুল্য হইবেন মাত্র। একান্তর ও দ্ব্যন্তর বর্ণাস্ত্রীতে জাত সন্তানদিগের সম্বন্ধেও ঐরূপ নিয়মই প্রবর্ত্তিত হইবে।

ক্ষত্রিয়ায়াং বৈশ্যায়াঞ্চ উৎপন্নস্ত সাক্ষাৎ বা কতিপয়পুরুষব্যবধানাৎ বা ব্রাহ্মণ্যলাভো দৃশ্যতে।"

অনুশাসন পর্ব্ব—৪৭ অধ্যায়, ৯ টীকা।

হারীত বলিয়াছেন ঃ—

ব্রহ্মমূর্দ্ধাবসিক্তশ্চ বৈশ্যঃ ক্ষত্রবিশাবপি।
অমী পঞ্চ দ্বিজা এষাং যথাপূর্ব্বঞ্চ গৌরবম্॥

(শব্দকল্পদ্রুমধৃত)

পূর্ব্বোক্ত অবস্থাসমূহের প্রতি লক্ষ্য করিলে দেখা যাইবে যে, রাজবল্লভের সময় হইতে যে বৈদ্যগণ যজ্ঞোপবীত গ্রহণ করিতে আরম্ভ করিয়াছেন, একথার কোন মূল্য নাই। ফলে বল্লাল লক্ষ্মণের বিরোধেই বৈদ্যসম্প্রদায়ভুক্ত কোন কোন সমাজ হইতে উপনয়নপ্রথা তিরোহিত হইয়াছিল। মাননীয় রাজেন্দ্রলাল মিত্র মহাশয়ের পূর্ব্বে বঙ্গদেশের কেহই বল্লালকে বৈদ্যেতর জাতিভুক্ত বলিয়া জানিতেন না। মিত্র মহোদয় স্বয়ংও স্বীকার করিয়া গিয়াছেন যে, বাঙ্গালাদেশে বল্লাল বৈদ্য বলিয়াই পরিচিত। (১) বল্লাল বৈদ্যবংশজ না হইলে সমগ্র বাঙ্গালা দেশীয় লোকে মিত্র মহাশয়ের সময়ে একবাক্যে তাঁহাকে কখনও বৈদ্য বলিয়া মনে করিত না। রামকান্ত কবিকণ্ঠহার, ভরত মল্লিক প্রভৃতি বৈদ্যকুলপঞ্জিকাকারগণ বল্লালকে বৈদ্য বলিয়াই নির্দ্দেশ করিয়াছেন। ব্রাহ্মণ ও কায়স্থ প্রভৃতির কুলপঞ্জিকায়ও এই উক্তি সমর্থিত হইয়াছে। (২) ভরত মল্লিক ২২৫ এবং রামকান্ত ২৫০ বৎসরের কিছু

---

(১) Indo-Aryans by Dr. Rajendra Lal Mitra. Page 325.

(২) (ক) পুরা বৈদ্যকুলোদ্ভব বল্লালেন মহীভুজা
ব্যবস্থাপি চ কৌলীন্যং দ্বুহী সেনাদি বংশজে। কবিকণ্ঠহার।

বৃষলত্বপ্রাপ্ত হইয়াছিলেন, সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। এখনও পশ্চিম ভারতে একশ্রেণীর লোক অম্বষ্ঠকায়স্থ নামে পরিচিত। ফলে, এই জাতি যে পূর্ব্বে অম্বষ্ঠ ছিল এবং পরে লিপিবৃত্তি অবলম্বন করিয়া শূদ্রজাতিতে পরিণত হইয়াছে, তাহা তাহাদের নামদ্বারাই স্পষ্ট বুঝা যায়। বোধ হয় অমরসিংহ যে দেশে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন, তথায় জাতিস্থিত চিকিৎসক অম্বষ্ঠ বাস করিত না, অম্বষ্ঠাখ্য লিপিবৃত্তিক কায়স্থগণ বাস করিত, তিনি তাহাদের শূদ্রাচার দেখিয়া ভ্রমক্রমে শূদ্রবর্ণে সমগ্র অম্বষ্ঠ জাতিকে স্থান প্রদান করিয়া বসিয়াছেন। অমরের জন্মভূমি হইতে বাঙ্গালাদেশ বহুদূরে অবস্থিত। বর্ত্তমান সময়ের ন্যায় অমরের জীবনকালে তাঁহার জন্মভূমি হইতে বাঙ্গালাদেশে যাতায়াত করার সুবিধা ছিল না এবং এ নিমিত্ত তিনি নিশ্চয়ই এদেশে পদার্পণ করেন নাই। অতএব তিনি যে বঙ্গদেশীয় অম্বষ্ঠগণকে শূদ্রবর্ণে স্থান দান করিয়াছেন তাহা কদাচ সম্ভবপর নহে। সুপ্রসিদ্ধ মোক্ষমূলার সাহেব স্বর্গীয় রাজেন্দ্রলাল মিত্র মহাশয়কে উচ্চশ্রেণীস্থ ব্রাহ্মণ বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। মিত্র মহোদয় যে ব্রাহ্মণেতরজাতিভুক্ত তাহা তাঁহার মিত্রোপাধিদ্বারা লক্ষিত হইলেও, পাশ্চাত্যপণ্ডিত মোক্ষমূলার সাহেব এতদ্দেশীয় সমাজবিষয়ে অনভিজ্ঞতানিবন্ধন বুঝিতে পারেন নাই। অমর সিংহ যে অম্বষ্ঠকে শূদ্রবর্ণে স্থান দান করিয়া ঠিক সেইরূপ একটি ভ্রম করিয়াছেন এবিষয়ে সন্দেহ নাই। অম্বষ্ঠগণের দ্বিজাতিত্ব মহাভারতের টীকাকার সুপ্রসিদ্ধ নীলকণ্ঠ মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করিয়াছেন। তিনি বলেন :—

> অম্বষ্ঠাদীনাং স্বরূপং জাতিবিবেকাৎ বিবেক্তব্যম্
> সবর্ণা ব্রাহ্মণান্ সূতে রাজ্ঞী মূর্দ্ধাবসিক্তম্॥

শান্তিপর্ব্ব, মোক্ষ—২৯৬ অধ্যায়, ৮ টীকা।

বৈদ্যজাতিতে পরিণত হওয়ার কথা লিখিয়াছেন। (১) নিখিলবাবু যে নুলোপঞ্চাননের দোহাই দিয়া বৈদ্যজাতিকে শূদ্র বলিয়া প্রতিপন্ন করিবার প্রয়াস পাইয়াছেন, সেই নুলোপঞ্চাননের উক্তি পূর্ব্বে উদ্ধৃত করা গিয়াছে। নুলোপঞ্চানন বৈদ্যকে ব্রাহ্মণ ও বল্লালপ্রভৃতি সেনরাজগণকে স্পষ্টাক্ষরে বৈদ্য বলিয়াই স্বীকার করিয়াছেন।

তবে রাজা রাজেন্দ্রলাল মিত্র প্রমুখ আধুনিক গ্রন্থকারগণ তাম্রশাসন ও প্রস্তরফলকের অনুবলে সেনরাজগণের ক্ষত্রিয়ত্বপ্রতিপাদন করিতে প্রয়াস পাইতেছেন সন্দেহ নাই। তাম্রশাসন ও প্রস্তরফলকসমূহ বহুশতাব্দী পর্য্যন্ত জল ও মৃত্তিকাতলে প্রোথিত ছিল বলিয়া তন্মধ্যস্থ অনেক অক্ষর বিকৃত হইয়া গিয়াছে। অতএব সেই সমস্ত ফলকের প্রকৃত পাঠোদ্ধার হইয়াছে কিনা তাহা নিশ্চিত বলা সুকঠিন। রাজসাহীর প্রস্তর ফলকের যেরূপ পাঠোদ্ধার হইয়াছে তদনুসারে লিখিত আছে :—

তস্মিন্ সেনান্ববায়ে প্রতিসুভটশতোৎসাদনব্রহ্মবাদী
স ব্রহ্মক্ষত্রিয়াণামজনি কুলশিরোদাম সামন্তসেনঃ।

এস্থলে রাজেন্দ্র বাবু "ব্রহ্মক্ষত্রিয়াণামজনি কুলশিরোদাম" বাক্যের অর্থ করিয়াছেন, "মহান্ ক্ষত্রিয় জাতির মস্তকের মণিস্বরূপ।" প্রকৃত

(ঞ) অথ বল্লালভূপশ্চ অম্বষ্ঠকুলনন্দনঃ
কুরুতে হতি প্রযত্নেন কুলশাস্ত্রনিরূপণম্।

রামানন্দ কৃত কায়স্থ কুলপঞ্জী।

(ট) বল্লালসেন নৃপতি হইল পশ্চাৎ
অম্বষ্ঠবংশেতে জন্ম ব্রহ্মপুত্রজাত। কায়স্থঘটককারিকা।

(১) History of Ancient Civilisation in India, by R. C. Dutt, page 241 & 257.

পূর্ব্বে জন্মগ্রহণ করিয়াছেন এবং তাঁহারা প্রত্যেকেই পূর্ব্ব পূর্ব্ব কুলপঞ্জীর অনুসরণ করিয়াছেন। শ্রদ্ধাস্পদ রমেশবাবুও সেনবংশীয় রাজগণকে

(খ) ত্রয়োমণ্ডল দাশস্য পুত্রা উদ্ধরণোগ্রজঃ
বল্লালসেন নৃপতেস্তনুজাগর্ভসম্ভবঃ
ষষ্ঠ দাশস্য তনয়ৌ জাতে বিনয়াম্বিতৌ
ধর্ম্মদাশঃ কর্ম্মদাশঃ বল্লালসেদ সূনুজৌ। ভরতকৃত চন্দ্রপ্রভা।

(গ) শ্রীমদ্বল্লালনামা ক্ষিতিপতিরতুলোবৈদ্য বংশাবতংসো
যেনাকারি দ্বিজানাং সুগুণগণ ধনোৎকৃষ্টতা মান্যতা চ। অম্বষ্ঠাচার চন্দ্রিকা

(ঘ) কলিতে ক্ষেত্রজ পুত্রের নাহি ব্যবহার।
কিন্তু বৈদ্যবংশে পাই এক সমাচার॥
আদিশূরের বংশ ধ্বংস সেনবংশ তাজা।
বিষক্‌সেনের ক্ষেত্রজ পুত্র বল্লাল সেন রাজা॥ রামজয় কৃত সম্বন্ধ নির্ণয়

(ঙ) শ্রীমদ্রাজাদিশূরোঽভবদবনিপতি স্তত্র বঙ্গাদিদেশে
সল্লোকঃ সদ্বিচারৈরদিতিসুতপতিঃ স্বর্যথাসীৎ তথাসীৎ।
অম্বষ্ঠানাং কুলেঽসৌ প্রথম নরপতি বীর্য্য শৌর্য্যাদিযুক্ত
স্তস্মাৎ নাম্নাদি শূরো বিমল মতি রিতখ্যাতি যুক্তো বভূব॥
ধনঞ্জয়কৃত ব্রাহ্মণের রাঢ়ীয় পঞ্জী।

(চ) অম্বষ্ঠ কুলসম্ভূত আদিশূর নৃপেশ্বরঃ।
শব্দকল্পদ্রুমধৃত রাঢ়ীয় ব্রাহ্মণ কুলপঞ্জিকায় দেবীবর ঘটকের উক্তি।

(ছ) ততো বহুতিথে কালে গৌড়ে বৈদ্য কুলোদ্বহঃ
বল্লালসেন নৃপতিরজায়ত গুণোত্তরঃ। বারেন্দ্র ব্রাহ্মণ কুলপঞ্জি।

(জ) শ্রীমদ্বল্লালসেনঃ প্রকৃতি সুচতুরঃ পুণ্যবানেক ধাতা
সদ্বৈদ্যো বৈদ্যবংশোদ্ভব ভুবনপতিঃ পাতি পুত্রং পিতৈব।
গৌড়ে বাহ্মণধৃত বারেন্দ্র ব্রাহ্মণ কুলপঞ্জী।

(ঝ) শ্রীল শ্রীআদিশূর নামা রাজা সদ্বৈদ্য কুলোদ্ভবঃ পরম ধার্ম্মিক আসীৎ
বারেন্দ্র ব্রাহ্মণপঞ্জী।

প্রকৃতরূপে পাঠোদ্ধার হওয়া মানিয়া লইলে কোন কোন তাম্রফলকের "কর্ণাটক্ষত্রিয়াণাং "ওষধি, নাথবংশে" অথবা "সোমবংশ প্রদীপ" এই কথাগুলি সত্য বলিয়া স্বীকার করিতে হয়। এবং তাঁহারা চন্দ্রবংশজ ক্ষত্রিয় ইহাও স্বীকৃত হইতে পারে। কিন্তু সেই সমস্ত ফলকে যে "রাজন্যধর্ম্মাশ্রয়" ও "সেনকুল-কমলবিকাশ" প্রভৃতি কথার সংযোগ দেখিতে পাওয়া যায়, তাহাতে প্রতীয়মান হয়, সেনরাজগণ ক্ষত্রিয়ধর্ম্মা ছিলেন বটে, কিন্তু জাতিতে প্রকৃত ক্ষত্রিয় ছিলেন না। সেনরাজগণ যে বৈদ্য হইয়াও ক্ষত্রিয়ত্বের ভাণ করিতেন, তাহা নুলোপঞ্চাননের পূর্ব্বোদ্ধৃত নিম্নলিখিত কথা কয়টিদ্বারাও সপ্রমাণ হইতেছে :—

আদিশূর রাজা বৈদ্য, বৈশ্যে তার জাতি।
একচ্ছত্রী রাজা ছিল, ক্ষত্রবৎ ভাতি।
ইন্দ্রদ্যুম্ন বৌদ্ধ রাজা জগন্নাথে কীর্ত্তি।
সাম্যবাদী তবু বলায় ক্ষত্রিয়বৃত্তি॥
রাজা হলে রাজন্য সে নাভাবে অন্যথা।
পতিত কম্বোজ আদি গৌড়ক্ষত্র যথা॥

সুপ্রসিদ্ধ বৌদ্ধ রাজা অশোক যে শূদ্র ছিলেন, এ কথা অনেকেই জানেন। কিন্তু তিনি স্বীয় সহধর্ম্মিণীকে বলিয়া ছিলেন, "আমি ক্ষত্রিয় হইয়া কিরূপে পলাণ্ডু ভক্ষণ করিব" (১)। শ্রদ্ধাস্পদ রমেশ বাবু লিখিয়াছেন, "পাল বংশীয়েরা যোদ্ধা ও রাজা বলিয়া ক্ষত্রিয়ত্বের দাবি করিতে পারেন। যে সময় হিন্দুগণ জীবন্ত জাতি বলিয়া পরিগণিত ছিল, তৎকালে অনেক নিম্নশ্রেণীস্থ যুদ্ধকুশল লোক গৌরবসূচক ক্ষত্রিয় উপাধি ধারণ

---

(1) Ashoka replied, "Queen I am a Khatrya, how can I eat onion." Ashoka. by Vincent A. Smith page, 192 & 193.

প্রস্তাবে "ব্রহ্মক্ষত্রিয়" শব্দ কথনও মহান্ ক্ষত্রিয় জাতির প্রতিশব্দরূপে ব্যবহৃত হইতে পারে না। শ্রীযুক্ত উমেশচন্দ্র বিদ্যারত্ন মহাশয় ঐ শ্লোকের নিম্নলিখিত অর্থ করিয়াছেন এবং বোধ হয় তাহাই সঙ্গতার্থ।

"সেনবংশে সামন্তসেন জন্মগ্রহণ করেন। তিনি ব্রহ্মবাদী ছিলেন বলিয়া ব্রাহ্মণগণের এবং প্রতিপক্ষীয় শত শত যোদ্ধার উচ্ছেদ সাধন করিয়াছেন বলিয়া ক্ষত্রিয়দিগের শিরোভূষণস্বরূপ ছিলেন।" ফলতঃ "ব্রহ্মক্ষত্রিয়াণাম্" এই পদদ্বারা "ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয়দিগের" এই অর্থই হওয়া সঙ্গত, রাজেন্দ্র বাবুর অর্থ কষ্টকল্পনাপ্রসূত। উমেশ বাবুর অর্থ প্রকৃত হইলে রাজসাহীর ফলকদ্বারা সেনরাজগণের ক্ষত্রিয়ত্ব সপ্রমাণ হয় না। বল্লাল স্বয়ং যে "দানসাগর" রচনা করিয়াছেন তাহাতেও তিনি নিম্নলিখিতরূপে আত্মপরিচয় দিয়াছেন ঃ—

ইন্দোর্বিশ্বৈক বন্দ্যে শ্রুতিনিয়মগুরুক্ষত্রিয়াচারচর্য্যা
মর্য্যাদাগোত্রশৈলঃ কলিচকিতসদাচারসঞ্চারসীমা।
সদ্‌বৃত্তস্বচ্ছবর্ত্মোজ্জ্বলপুরুষগুণাচ্ছিন্নসন্তানধারা
বৃন্দৈর্মুক্তামরশ্রীনিরগমদবনের্ভূষণং সেনবংশঃ॥

এস্থলে দেখা যায় বল্লাল "ক্ষত্রিয়াচারচর্য্যা" অর্থাৎ ক্ষত্রিয়দিগের আচারসম্পন্ন বলিয়া আত্মপরিচয় দিয়াছেন। স্বয়ং ক্ষত্রিয় হইলে তিনি কেন তাহা না বলিয়া আপনাকে ক্ষত্রিয়ধর্ম্মাবলম্বী বলিয়া বর্ণনা করিলেন তাহার কারণ বুঝা সুকঠিন। "অবনের্ভূষণং সেনবংশঃ" এই কয়টি কথাদ্বারাও বল্লালের ক্ষত্রিয়ত্ব নিরাকৃত হইতেছে। সূর্য্য ও চন্দ্র-বংশীয় ক্ষত্রিয়গণ সেনবংশোদ্ভব নহেন। তাঁহাদের বংশোপাধি সিংহ, রাণা, রাও প্রভৃতি। তবে কেহ কেহ বলিতে পারেন, ভীমসেন চন্দ্রবংশীয় ক্ষত্রিয়। কিন্তু "সেন" শব্দ এস্থলে বংশোপাধি নহে, উহা নামের একটী অংশ মাত্র।

বল্লাল—তাপোনাপগতস্তৃষা নচ কৃশা ধৌতা ন ধূলী তনোঃ
ন স্বচ্ছন্দ মকারি কন্দকবলং কা নাম কেলকীথা।
দূরোৎক্ষিপ্তকরেণ হস্ত করিণা স্পৃষ্টা ন বা পদ্মিনী
প্রারব্ধো মধুপৈরকারণ মহো ঝঙ্কারকোলাহলঃ॥ (২)

লক্ষ্মণ—পরীবাদ স্তথ্যো ভবতি বিতথোবাপি মহতাং
তথাপ্যুচ্চৈর্দ্ধাম্নাং হরতি মহিমানং জনরবঃ।
তুলোত্তীর্ণস্যাপি প্রকটনহতাশেষতমসঃ
রবেস্তাদৃক্ তেজো নহি ভবতি কন্যাং গতবতঃ॥ (১)

বল্লাল—সুধাংশোর্জাতেয়ং কথমপি কলঙ্কস্য কণিকা।
বিধাতুর্দ্দোষোয়ং নচ গুণনিধেস্তস্য কিমপি॥
স কিং নাত্রেঃ পুত্রোনকিমু হরচূড়ার্চ্চনমণিঃ।
ন বা হন্তি ধ্বান্তং জগদুপরি কিংবা ন বসতি॥ (২)

---

(২) তাপ অপগত হয় নাই, তৃষ্ণাও নিবৃত্তি লাভ করে নাই। শরীরের ধূলী এখন পর্য্যন্তও ধৌত হয় নাই এবং এ পর্য্যন্ত মনের বাঞ্ছানুরূপ কন্দগ্রাস করিতেও সমর্থ হই নাই। ক্রীড়ার বিষয় ত সুদূরপরাহত। হস্তী পদ্মিনীকে স্পর্শ করিবার নিমিত্ত দূরহইতে শুণ্ড উত্তোলন করিয়াছে মাত্র; এখন পর্য্যন্ত স্পর্শ করিতে পারে নাই। দুঃখের বিষয় ইতি মধ্যেই ভ্রমর সকল অকারণ ঝঙ্কার করিয়া কোলাহল করিতেছে।

(১) সত্য ও মিথ্যা উভয় প্রকার অপবাদেই সাধুলোকের মহিমা নষ্ট হইয়া থাকে। সূর্য্য আশ্বিন মাসে কন্যা রাশিস্থ হইলে লোকে বলে যে, তিনি কন্যাগত হইয়াছেন। এই মিথ্যা অপবাদনিবন্ধন তিনি সেই উক্তির অসত্যতা প্রতিপাদন করিবার উদ্দেশ্যে তুলা রাশিতে (তুলা পরীক্ষায়) গমন করেন এবং তথা হইতে বহির্গত হইয়াও (তুলা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়াও) অগ্রহায়ণাদি কয়েক মাস নিস্তেজ (ম্রিয়মাণ) অবস্থায় কালযাপন করেন।

(২) অমৃতের আকর চন্দ্রে যে অল্প পরিমাণ কলঙ্ক আছে তাহা ভগবানের ইচ্ছা প্রযুক্তই হইয়াছে। চন্দ্র নানা গুণের আকর বলিয়া সেই কলঙ্কদ্বারা তাঁহার কোন ক্ষতি হয় নাই। দেখ কলঙ্কসত্ত্বেও সকলে চন্দ্রকে অত্রি মুনির সন্তান বলিয়াই জানে এবং স্বয়ং শিব পর্য্যন্ত তাঁহাকে মস্তকে ধারণ করিয়া রহিয়াছেন, আর চন্দ্র সর্ব্বদাই মনুষ্য লোকের উপর বিরাজমান থাকিয়া গাঢ় অন্ধকার বিনাশ করিতে সমর্থ হইতেছেন।

করিত (২)।" অতএব বৈদ্যবংশীয় সেনরাজগণ যে ক্ষত্রিয়ত্বের ভাণ করিবেন তাহাতে আশ্চর্য্যের বিষয় কি আছে ?

পদ্মিনীঘটিত বিরোধে যে বৈদ্যসমাজে তুমুল আন্দোলন উপস্থিত হইয়াছিল তাহা বৈদ্যকুলপঞ্জিকায় লিখিত আছে। বাঙ্গালা দেশে বৈদ্য ভিন্ন অনেক জাতি বিদ্যমান রহিয়াছে; কিন্তু এই বিরোধের ফলে যে অন্য কোন জাতির মধ্যে সামাজিক বিপ্লব ঘটিয়াছিল তাহা অদ্যাপি কেহ বলে নাই। সেনরাজগণ বৈদ্য না হইলে, বল্লাললক্ষ্মণের বিরোধের ফলে কেবল বৈদ্যসমাজে বিপ্লব সংঘটিত হওয়ার সম্ভাবনা ছিল না। কেহ কেহ বল্লাল লক্ষ্মণের বিরোধের কথা স্বীকার করিতে প্রস্তুত নহেন। পূর্ব্বে যে নুলোপঞ্চাননের উক্তি উদ্ধৃত করা হইয়াছে তাহাতে সেই বিরোধের কথা স্পষ্ট উল্লিখিত হইয়াছে। নুলোপঞ্চানন বলিয়াছেন, "পদ্মিনীঘটিত বিরোধেই, লক্ষ্মণের অনুগত বৈদ্যগণ যজ্ঞোপবীত ত্যাগ করিয়াছিলেন।" বাঙ্গালা দেশে বল্লাললক্ষ্মণসম্বন্ধীয় বিরোধসম্বন্ধে যে সমস্ত শ্লোক প্রচারিত আছে, তদ্দ্বারাও বল্লালের পদ্মিনীঘটিত অপবাদ সমর্থিত হইতেছে। নিম্নে সেই সমস্ত শ্লোক উদ্ধৃত করা গেল—

লক্ষ্মণ সেন—শৈত্যং নাম গুণস্তবৈব সহজঃ স্বাভাবিকী স্বচ্ছতা
কিং ব্রূমঃ শুচিতাং ভবন্তি শুচয়ঃ স্পর্শেন যস্যাপরে।
কিঞ্চান্যৎ কথয়ামি তে স্তুতিপদং যজ্জীবিনাং জীবনং
ত্বঞ্চেন্নীচপথেন গচ্ছসি পয়ঃ কস্ত্বাং নিরোদ্ধুং ক্ষমঃ ॥ (১)

---

(2) Ancient India, vol. 11, page 247.

(১) হে জল, শৈত্য ও স্বচ্ছতা তোমার প্রকৃতিগত গুণ, তোমার পবিত্রতার কথা আর কি বর্ণনা করিব? কারণ তোমাকে স্পর্শ করিয়াই অপরে পবিত্রতা লাভ করে। তোমাকে আর কি বলিয়া প্রশংসা করিবে? তুমিই সকল জীবের জীবন ধারণের উপায়স্বরূপ। অতএব তুমি নীচগামী হইলে কে তোমাকে প্রতিরোধ করিতে সমর্থ হইবে?

ঐ সমস্ত গ্রন্থে নাই। যাঁহারা শাস্ত্রদর্শী তাঁহারা একবাক্যে বলিবেন যে, ঐ সমস্ত পুস্তকে পূর্ব্বোক্ত কথাগুলি থাকিতে পারে না। কাহারও এ বিষয়ে সন্দেহ হইলে তিনি ঐ সমস্ত পুস্তক পাঠ করিয়া সংশয় দূর করিতে পারেন। তবে এ কথা নিঃসঙ্কোচে বলা যাইতে পারে যে, হলধর তর্কচূড়ামণি চতুর চূড়ামণি ছিলেন। বোধ হয় আন্দুলের রাজা রাজনারায়ণ বাবুর, মা সরস্বতীর সহিত ঘনিষ্ঠতা ছিল না। চূড়ামণি মহাশয় এই সুবিধায় ছাই ভস্ম লিখিয়া রাজা বাহাদুরের নিকট হইতে প্রচুর অর্থ সংগ্রহ করিয়া লইয়াছেন। ফলে হলধরের "কায়স্থকৌস্তুভ" একখানি আজগুবী পুস্তক এবং উহা পাঠ করিলে স্পষ্টই বুঝা যায়, চূড়ামণি মহাশয় রাজনারায়ণ বাবুকে প্রবঞ্চনা করিবার উদ্দেশ্যে এবং শাস্ত্রজ্ঞ লোকে সহজে কৃত্রিমতা বুঝিতে পারে এই অভিপ্রায়ে ইচ্ছা পূর্ব্বক উহাতে নানা অসংলগ্ন কথার অবতারণা করিয়াছেন। স্বর্গীয় রাজেন্দ্রলাল বাবু এইরূপ কৃত্রিমতা বুঝিতে পারিয়াই গ্রন্থের এবং গ্রন্থকারের নাম লিখিতে বিরত হইয়াছেন।

স্বর্গীয় রাজেন্দ্রলাল মিত্র মহোদয় Indo Aryan নামক পুস্তকে লিখিয়াছেন, "কুলাচার্য্য ঠাকুরের কুলপঞ্জিকায় আদিশূরকে" ক্ষত্রিয়বংশ হংস বলিয়া বর্ণনা করা হইয়াছে।" কিন্তু এই কুলাচার্য্য ঠাকুর কে এবং তাঁহার সম্পূর্ণ রচনাটি বা কি, তাহা রাজেন্দ্রবাবু লিখেন নাই। বস্তুতঃ এটি কোন কুলপঞ্জিকার বচন নহে। কায়স্থকৌস্তভনামক একখানি কৃত্রিম গ্রন্থে নিম্ন লিখিত বচনটি লিখিত আছে :—

স্ফূর্ত্ত ক্ষত্রিয় বংশহংসঃ সর্ব্বমহাধীশ্বরো গৌড়ে।
শ্রীআদিত্যস্থরো নৃপতি, স্বয়ং তেজসা॥

হলধর তর্কচূড়ামণি মহাশয় অর্থের লোভে ব্রাহ্মণোচিত সততা বিসর্জ্জন দিয়া, আন্দুলের রাজা কায়স্থবংশীয় রাজনারায়ণ বাবুকে "কায়স্থ কৌস্তভ" রচনা করিয়া দিয়াছিলেন। এই পুস্তক যে আগা গোড়া কৃত্রিম তাহা সেই পুস্তকে লিখিত নিম্নোদ্ধৃত বচনগুলি পাঠ করিলেই স্পষ্ট প্রতীয়মান হইবে :—

"পঞ্চজন ব্রহ্ম কায়স্থ বেদবিদ্যার্থী মহাশয়েরা রাজা আদিত্য স্থরের যজ্ঞ করিয়া দক্ষিণাস্বরূপ গ্রাম ও ভূমি বেদপাঠার্থে পাইয়াছিলেন। ইঁহার সপ্রমাণ ইহাদের সমাজ ;—ঘোষ মহাশয়েরা সমাজ আকনাবাসী।
ইত্যমরঃ, অপিচ ত্রিক াণ্ডশেষশ্চঃ।"

"কৃত্তিবাস ওঝা কায়স্থ। ওষ কায়স্থকে অপভ্রংশ ভাষায় ওঝা শব্দে লোক মান্য করিয়া কহিত। ইনি কায়স্থবংশজ হইয়া উপাধি পণ্ডিত ছিলেন। যথা এই পণ্ডিতের কৃত ভাষা রামায়ণ আদ্যকাণ্ডের ৩৮ পত্রাঙ্ক ও স্থন্দর কাণ্ডের ৮৪ পত্রাঙ্ক প্রমাণ।

"সর্ব্ব বর্ম্মাচার্য্য কায়স্থ। সর্ব্ববর্ম্মা বর্ম্মণ। ইতি কলাপঃ।"

বলা বাহুল্য যে "ইত্যমর ত্রিকাণ্ডশেষশ্চ" "কলাপ" এবং রামায়ণের স্থন্দর ও আদ্যকাণ্ডের উক্তি বলিয়া যাহা উদ্ধৃত হইয়াছে, তাহা কখনও

রাজবল্লভ অগ্নিষ্টোম ও বাজপেয়প্রভৃতি অনেক মহাযজ্ঞ সম্পন্ন করিয়া ছিলেন।

উমাচরণ বাবুর মতে রাজবল্লভ যজ্ঞানুষ্ঠানের সংকল্প করিয়া, রাজনগরে ভারতবর্ষের বিভিন্নপ্রদেশীয় ব্রাহ্মণ পণ্ডিত একত্র করিলে যজ্ঞোপবীত অনুষ্ঠানের প্রস্তাব কার্য্যে পরিণত হইয়াছিল। নবাব মহবৎজঙ্গ অর্থাৎ আলিবর্দ্দী ১৭৫৬ খৃষ্টাব্দের জুন মাস পর্য্যন্ত বাঙ্গালার সিংহাসনে সমাসীন ছিলেন। অতএব সিদ্ধান্ত হইতেছে যে, রাজবল্লভ অগ্নিষ্টোম প্রভৃতি যাগযজ্ঞ ১৭৫৪ খৃষ্টাব্দের পূর্ব্বেই সম্পন্ন করিয়া ছিলেন।

শ্রীযুক্ত বালগঙ্গাধর তিলক মহাশয় Arctic Home in the Vedas নামক পুস্তকে প্রমাণ করিয়াছেন, ভারতীয় আর্য্যজাতি পূর্ব্বে উত্তর মেরুর সন্নিহিত স্থানে বাস করিতেন এবং সেই প্রদেশ বরফ পাতে মনুষ্যবাসের অযোগ্য হইলে তাঁহারা ক্রমে পঞ্চনদ প্রদেশে আসিয়া উপনিবেশ সংস্থাপন করেন। উত্তর মেরুর সন্নিহিত স্থানে বাস করার সময় আর্য্যগণ প্রাকৃতিক শক্তিনিচয়কে দেবতাজ্ঞানে উপাসনা করিতেন। এই সময় দ্যুঃ বরুণ, ইন্দ্র, অগ্নি, সরস্বতীপ্রভৃতি কতিপয় দেবতাই তাঁহাদের আরাধ্য ছিলেন। সরলপ্রাণ শিশু স্বীয় জনক জননীর নিকট যে ভাবে অভীষ্ট বস্তু প্রার্থনা করে, পূজনীয় আর্য্যগণও তদ্রূপ পবিত্র বেদমন্ত্রোচ্চারণে ঐ সমস্ত দেবতাগণের নিকট স্বীয় স্বীয় মনোবাঞ্ছা জ্ঞাপন করিতেন। আর্য্য ঋষিগণ সকলেই অতি নিঃস্বার্থচিত্ত ছিলেন; সুতরাং তাঁহাদের কল্পনাপ্রসূত দেবতাগণ, জনক জননী ও আত্মীয়বর্গের ন্যায় একমাত্র লোকহিতকর কার্য্যে ব্যাপৃত থাকা বলিয়াই চিত্রিত হইয়াছেন। তৎকালে সুসভ্য আর্য্যসমাজে সভ্যতাসুলভ কৃত্রিমতা প্রবেশ লাভ করিতে সমর্থ হয় নাই। আর্য্যসন্তানগণ এই সময় হলচালনা ও গবাদি পশুপালন করিয়া জীবিকা নির্ব্বাহ করিতে-

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

যজ্ঞানুষ্ঠান

রাজবল্লভ যে সমস্ত যজ্ঞানুষ্ঠান করিয়া গিয়াছেন, তন্মধ্যে অগ্নিষ্টোম, অত্যগ্নিষ্টোম, বাজপেয়, কিরীটকোণ এবং স্বর্গারোহণ নামক যজ্ঞই সমধিক উল্লেখযোগ্য। কথিত আছে, কিরীটকোণ যজ্ঞ মুর্শিদাবাদের অন্তর্গত কিরীটেশ্বরীর আলয়ে এবং অপর সমস্ত যজ্ঞ রাজনগরে সম্পন্ন হইয়াছিল। কোন্ সময় এই সমস্ত যজ্ঞের অনুষ্ঠান হইয়াছিল, তাহা নিশ্চিতরূপে বলা সুকঠিন। তবে বর্দ্ধমানের অন্তর্গত শ্রীখণ্ড গ্রামে রাজবল্লভ যে ভূতনাথ দেবের এক মন্দির প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন, সেই মন্দির সংলগ্ন প্রস্তরফলকহইতে যজ্ঞানুষ্ঠানের সময়সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ আভাস পাওয়া যায়। প্রস্তরফলকে লিখিত আছে :—

প্রাসাদং সমকারয়ৎ নবমমুং শ্রীভূতনাথস্য বৈ।
যোঽগ্নিষ্টোমমহাধ্বরাদি মযজত্যো বাজপেয়ী ক্ষিতৌ॥
দাতা শ্রীযুতরাজবল্লভনৃপোঽম্বষ্ঠারবিন্দার্য্যমা।
শাকে তর্কমহীধ্ররাগরজনীনাথেচ মাঘে সিতে॥ (১)

এতদ্দারা প্রতীয়মান হইতেছে, ভূতনাথদেবের মন্দির ১৬৭৬ শকাব্দে, অর্থাৎ ১৭৫৪ খৃষ্টাব্দে নির্ম্মিত হইয়াছিল এবং তাহার পূর্ব্বেই

---

(১) যিনি অগ্নিষ্টোমপ্রভৃতি মহাযজ্ঞ সম্পাদন করিয়াছেন, যিনি জগতে বাজপেয়ী বলিয়া খ্যাতি লাভ করিয়াছেন, অম্বষ্ঠকুলপদ্মের বিকাশক সেই নৃপতি রাজবল্লভ ১৬৭৬ শাকের মাঘ মাসে শুক্লপক্ষে সোমবার ভূতনাথ দেবের এই রমণীয় প্রাসাদ নির্ম্মাণ করিয়া দিয়াছেন।

আর্য্য জাতির শৈশব অবস্থায় সমস্ত যজ্ঞানুষ্ঠানই সহজসাধ্য ছিল। এই সময় পাঠসমাপনের পূর্ব্বে কোন আর্য্যসন্তানই পরিণয়সূত্রে আবদ্ধ হইতেন না। পাঠসমাপনান্তে গুরুকুলহইতে প্রত্যাগমন করিয়া সকলে দারপরিগ্রহ করিতেন। বিবাহের অব্যবহিত পরে, শুক্লপক্ষীয় প্রতিপদে কিংবা পৌর্ণমাসীতে প্রত্যেকের গৃহে অগ্ন্যাধান প্রক্রিয়াদ্বারা যজ্ঞীয় অগ্নির প্রতিষ্ঠা হইত। তৎকালে কোন দেবালয় কিংবা দেবতামূর্ত্তি প্রতিষ্ঠিত ছিল না। প্রত্যেক গৃহী স্ব স্ব গৃহ-বেদিকার পার্শ্বে উপবেশন করিয়া পবিত্র বেদমন্ত্রোচ্চারণে অভীষ্ট দেবতার আরাধনা করিতেন।

পঞ্চনদ প্রদেশে উপনিবেশ সংস্থাপিত হইলে, আর্য্যসমাজ ক্রমে ধনে জনে উন্নতি লাভ করিল এবং সঙ্গে সঙ্গে যজ্ঞানুষ্ঠানও বহুব্যয়-সাধ্য এবং আড়ম্বরপূর্ণ হইয়া উঠিল। এই সময় হইতেই যাগযজ্ঞ সম্বন্ধীয় বিভিন্ন কার্য্যনির্ব্বাহের উদ্দেশ্যে ঋত্বিক্ সকল হোতা, অধ্বর্য্যু, উদ্গাতা ও ব্রাহ্মণ, এই চারিশ্রেণীতে বিভক্ত হইলেন। যজ্ঞবেদিকা ও যজ্ঞীয় পাত্র প্রস্তুত করণ, আবশ্যক পরিমাণে কাষ্ঠ ও বারি সংগ্রহ করা, উৎকৃষ্ট পশু বধ করা প্রভৃতি কার্য্যভার অধ্বর্য্যুগণের উপর ন্যস্ত হইল, উদ্গাতৃগণ যজ্ঞসম্পাদন কালে একতানে সুমধুর সামগান করিতে লাগিলেন এবং হোতৃগণ গুরুগম্ভীরস্বরে ঋঙ্মন্ত্র উচ্চারণ করিয়া যজ্ঞানুষ্ঠানে রত হইলেন। ব্রাহ্মণগণের নিমিত্ত যজ্ঞের কোন বিশেষ অঙ্গ নির্দ্দিষ্ট হইল না; তাঁহার প্রতি সমগ্র যজ্ঞানুষ্ঠানের অধ্যক্ষতা অর্পিত হইল এবং পূর্ব্বোক্ত তিন শ্রেণীর ঋত্বিকের কোন বিষয়ে সন্দেহ হইলে ব্রাহ্মণেরা তাহা ভঞ্জন করিতে লাগিলেন। প্রত্যেক শ্রেণীতে চারিজন ঋত্বিক্ নিযুক্ত হইতেন।

অগ্নিষ্টোম, অত্যগ্নিষ্টোম ও বাজপেয়প্রভৃতি সমস্ত যজ্ঞের অনুষ্ঠান

ছিলেন। বর্ত্তমান সময়ের ন্যায় তৎকালে বিভিন্ন জাতিরও আবির্ভাব হয় নাই। আর্য্যগণের ভারতবর্ষে আগমনের প্রথম ভাগে ভারতীয় সমাজে আর্য্য ও অনার্য্য, এই দুইটি মাত্র জাতি ছিল। (১) শ্রম বিভাগের অভাবে একই ব্যক্তিকে হলচালনা, যুদ্ধ ও স্তোত্র রচনা প্রভৃতি সমস্ত আবশ্যক কার্য্য নির্ব্বাহিত করিতে হইত। বশিষ্ঠ, বিশ্বামিত্র প্রভৃতি বৈদিক যুগের ঋষিবর্গ জটাবল্কলধারী সন্ন্যাসিগণের ন্যায় সংসার পরিত্যাগ না করিয়া, রীতিমত গৃহধর্ম্ম আচরণ করিতেন। সোমরস এই সময়ের অতি উপাদেয় পানীয়মধ্যে পরিগণিত ছিল। বৈদিক যুগের ঋষিগণ এই রসের এত পক্ষপাতী ছিলেন যে এক মাত্র সোমলতার উদ্দেশ্যেই বহুসংখ্যক স্তোত্র বিরচিত হইয়াছিল। অতি বিচিত্র উপায়ে সোমলতা হইতে রস নির্গত করা হইত সাতটি আর্য্যললনা কোমলকণ্ঠে এক যোগে সোমলতার স্তবসূচক সঙ্গীত লহরি উত্থিত করিয়া অঙ্গুলীর সহায়তায় লতা নিষ্পেষণে প্রবৃত্ত হইতেন। লতা নিষ্পেষিত হইয়া গেলে তদুপরি তাঁহারা অল্প অল্প জল সেচন করিতেন। অতঃপর প্রত্যেকে এক এক খণ্ড ঊর্ণা-নির্ম্মিত বস্ত্রে কিয়ৎপরিমাণ নিষ্পেষিত লতা বিজড়িত করিয়া লইয়া সংকোচন করিতে থাকিতেন। এই সময় প্রত্যেকের নিকট এক একটি পাত্র সংরক্ষিত হইত। ক্রমে সংকোচনের ফলে লতা হইতে রস নির্গত হইয়া সেই সমস্ত পাত্রে গিয়া পড়িত। সমস্ত রস নির্গত না হওয়া পর্য্যন্ত সুমধুর সঙ্গীতের বিরাম হইত না। আর্য্যমহিলাগণ এইরূপে যে রস সংগ্রহ করিতেন, তাহা দুগ্ধে মিশ্রিত করিয়া বৈদিক ঋষিগণ নিরতিশয় পরিতৃপ্তির সহিত পান করিতেন।

---

(১) শ্রীযুক্ত বালগঙ্গাধর তিলক গণপত উৎসব উপলক্ষে যে বক্তৃতা করেন তাহাতে বলিয়াছেন, পুরুষ সূক্তে যে বিভিন্ন বর্ণের কথা লিখিত আছে তদ্দারা এক বর্ণের অপর বর্ণ অপেক্ষা শ্রেষ্ঠতা প্রতিপাদন হয় না।

বিধবাবিবাহবিষয়ক আন্দোলন, কি বৈদ্যসম্প্রদায়ভুক্ত বিভিন্ন মেল মধ্যে পরস্পর আদানপ্রদানের উদ্যোগ, এই সমস্ত বিষয়েই রাজবল্লভকে অগ্রণী হইতে দেখা যায়। সুতরাং পৌরাণিক ধর্ম্মপ্লাবিত বাঙ্গালাদেশে সেনরাজগণের অধঃপতনের সঙ্গে যে সমস্ত বৈদিক অনুষ্ঠান অপ্রচলিত হইয়া পড়িয়াছিল, তাহার পুনরনুষ্ঠান বিষয়ে রাজবল্লভই যে পথপ্রদর্শক হইয়াছিলেন, সে বিষয়ে অণুমাত্রও সন্দেহ করা সঙ্গত নহে।

শ্রীযুক্ত বাবু যতীন্দ্রমোহন রায়, ১৩১০ শালের জ্যৈষ্ঠ সংখ্যা "নবপ্রভা" নামক মাসিক পত্রিকায় "বিদুষী আনন্দময়ী" নামে এক প্রবন্ধ প্রচার করিয়াছেন। সেই প্রবন্ধে লিখিত আছে, "রাজবল্লভের জ্ঞাতি জপ্সানিবাসী রামগতি সেন ও তাঁহার কন্যা আনন্দময়ী দেবীর বিদ্যাবত্তার যথেষ্ট খ্যাতি ছিল। রাজবল্লভের অগ্নিষ্টোম যজ্ঞের প্রাক্কালে রামগতি সেনের নিকট ঐ যজ্ঞের প্রমাণ ও যজ্ঞকুণ্ডের প্রতিকৃতি জানিবার ইচ্ছা প্রকাশ করিলে, তিনি কন্যা আনন্দময়ীর প্রতি ঐ কার্য্যের ভার অর্পণ করেন এবং সেই বিদুষী ললনা তদনুসারে স্বহস্তে অগ্নিষ্টোম যজ্ঞের প্রমাণ ও প্রতিকৃতি লিখিয়া রাজবল্লভের নিকট পাঠাইয়া দেন।"

যতীন্দ্র বাবু যাহা লিখিয়াছেন, তৎসম্বন্ধে জপ্সা গ্রামেও যে প্রবাদ প্রচলিত আছে সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। কিন্তু কয়েকটি অবস্থার প্রতি লক্ষ্য করিলে এই প্রবাদ যে সত্য নহে তাহা স্পষ্টই প্রতীয়মান হইবে। আনন্দময়ী পূর্ব্বকথিত সুপ্রসিদ্ধ লালা রাম প্রসাদের পৌত্রী ছিলেন। ১৭৫৪ খৃষ্টাব্দের পূর্ব্বে যে রাজবল্লভ অগ্নিষ্টোম যজ্ঞ সম্পন্ন করিয়াছেন তাহা প্রমাণদ্বারা প্রদর্শিত হইয়াছে। শ্রীযুক্ত বাবু দীনেশচন্দ্র সেন "বঙ্গভাষা ও সাহিত্য" নামক পুস্তকে লিখিয়াছেন, ১৭৬১ খৃষ্টাব্দে আনন্দময়ী দেবীর বয়ঃক্রম নয় বৎসর ছিল। সুতরাং ১৭৫৪ খৃষ্টাব্দে এই মহিলা মাত্র ছয় বৎসর বয়সে পদার্পণ করিয়াছিলেন। এরূপ

প্রকরণ প্রায় একই প্রকারের; তবে মন্ত্রসম্বন্ধে কিঞ্চিৎ বিভিন্নতা বিদ্যমান আছে। সমস্ত যজ্ঞকার্য্যই বসন্তকালে সম্পাদ্য এবং পঞ্চাহ সাধ্য। যাঁহারা বেদজ্ঞ এবং অবহিতাগ্নি কেবল তাঁহারাই এই সমস্ত যজ্ঞ সম্পাদন করিতে অধিকারী।

সুপ্রসিদ্ধ সেনরাজবংশের অধঃপতনের পর এবং রাজবল্লভের অভ্যুদয়ের পূর্ব্বে, বাঙ্গালাদেশে আর কেহই এই সমস্ত যজ্ঞানুষ্ঠানে হস্তক্ষেপ করিয়াছেন কি না সে বিষয়ে গুরুতর সন্দেহ আছে। ক্ষিতীশ বংশাবলী প্রণেতা ৺কার্ত্তিকেয় চন্দ্র রায় লিখিয়াছেন, নবদ্বীপাধিপতি কৃষ্ণচন্দ্র রায় অগ্নিষ্টোম যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিয়াছিলেন। কিন্তু রাজবল্লভ এই কার্য্যে ব্রতী হওয়ার পূর্ব্বে যে কৃষ্ণচন্দ্র রায় সেই যজ্ঞ সম্পাদন করিয়াছেন, তৎসম্বন্ধে কোন প্রমাণ বিদ্যমান নাই। রাজবল্লভের সমসাময়িক যে সমস্ত লেখক তৎসম্বন্ধে লেখনী ধারণ করিয়াছেন, তাঁহারা অনেকেই রাজবল্লভকে "অগ্নিষ্টোমী" "বাজপেয়ী" প্রভৃতি বিশেষণে বিশেষিত করিয়া গিয়াছেন। এতদ্দ্বারা প্রতীয়মান হইতেছে, যে সময় রাজবল্লভ এই কার্য্যে হস্তক্ষেপ করেন, তৎকালে উহা নিরতিশয় অভিনব ব্যাপার বলিয়াই পরিগণিত ছিল এবং যাঁহারা সেই সমস্ত যাগযজ্ঞানুষ্ঠানে ব্রতী হইতেন, তাঁহাদিগকে লোকে সাতিশয় সম্মানের চক্ষে নিরীক্ষণ করিত। কার্ত্তিকেয় বাবুর মতে ১৭১০ খৃষ্টাব্দে কৃষ্ণচন্দ্র রায় জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। সুতরাং রাজবল্লভ ও কৃষ্ণচন্দ্র যে সমসাময়িক ছিলেন একথা বলা বাহুল্য মাত্র। কিন্তু সমকালবর্ত্তী কোন লেখকই নবদ্বীপাধিপের প্রতি এই সমস্ত বিশিষ্ট সংজ্ঞা প্রয়োগ করেন নাই। এতদ্দ্বারা সিদ্ধান্ত হয় যে, কৃষ্ণচন্দ্রের যজ্ঞানুষ্ঠান সময়ে অগ্নিষ্টোম প্রভৃতি যজ্ঞকার্য্যের অভিনবত্ব কিয়ৎ পরিমাণে বিদূরিত হইয়াছিল। ফলে কি নিরুপবীত অম্বষ্ঠগণমধ্যে যজ্ঞোপবীতপ্রথাপ্রবর্ত্তনের চেষ্টা, কি

প্রোক্ত বৈদিক পুরোহিতদিগের গৃহে যজ্ঞপ্রকরণসম্বন্ধে যে সমস্ত তালপত্রলিখিত পুথি বিদ্যমান আছে, তৎপাঠে অবগত হওয়া যায়, রাজবল্লভের পুত্র রায় গোপালকৃষ্ণও অনেক যজ্ঞানুষ্ঠান করিয়াছিলেন। রাজবল্লভ এবং লালা রামপ্রসাদের বয়সের তুলনা করিলে গোপালকৃষ্ণ ও রামগতি সমসাময়িক বলিয়া অনুমান করা যাইতে পারে। রাজবল্লভ কর্ত্তৃক অগ্নিষ্টোম প্রভৃতি যজ্ঞ অনুষ্ঠিত হইলে, বিক্রমপুর অঞ্চলস্থ বিদ্যোৎসাহী কোন কোন লোক যে বৈদিক প্রক্রিয়াসমূহ সংগ্রহ করিতে যত্নবান্ হইয়াছিলেন সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। রামগতির বিদ্যাবত্তার খ্যাতি এখনও শুনিতে পাওয়া যায়। সম্ভবতঃ তিনিও রাজবল্লভের যজ্ঞানুষ্ঠানের পর যজ্ঞপ্রকরণসম্বন্ধীয় তত্ত্বসংগ্রহ করিয়াছিলেন। রাজনগরহইতে যজ্ঞানুষ্ঠান প্রকরণ জানিতে চাহিয়া কোন লোক রামগতির নিকট প্রেরিত হওয়া সত্য হইলে, তাহা বোধ হয় রায় গোপালকৃষ্ণের আমলেই হইয়াছিল। প্রবাদে যে রাজবল্লভের নাম উক্ত হইয়াছে, তাহা রায় গোপাল কৃষ্ণ নামের পরিবর্ত্তে হওয়াই সম্ভবপর।

উমাচরণ বাবু লিখিয়াছেন, "এই সমস্ত যজ্ঞানুষ্ঠানকল্পে রাজবল্লভ মুক্তহস্তে অর্থব্যয় করিতে কুণ্ঠিত হন নাই। দেশীয় প্রত্যেক ব্রাহ্মণ পণ্ডিতকে এই উপলক্ষে ৫০০৲ টাকা বিদায় দেওয়া হইয়াছিল এবং যে সমস্ত ব্রাহ্মণ পণ্ডিত সুদূরবর্ত্তী দেশসমূহহইতে রাজনগরে সমবেত হইয়াছিলেন, তাঁহাদের কেহ উষ্ট্র, কেহ হস্তী, কেহ ঘোটক এবং কেহ স্বর্ণরৌপ্যের অলঙ্কার লাভ করিয়াছিলেন। এই যজ্ঞে অনেক রবাহূত এবং ভিক্ষুকেরও আগমন হইয়াছিল। রাজবল্লভ এই শেষোক্ত ব্যক্তিগণকে নিরাশ না করিয়া প্রত্যেককে ২০৲ টাকা দান করিয়াছিলেন। অনুষ্ঠানের গুরুত্ব অনুসারে পুরোহিত দক্ষিণাস্বরূপই তিন লক্ষ টাকা লইয়াছিলেন। সুপ্রসিদ্ধ লালা রামপ্রসাদের প্রতি সমগ্র যজ্ঞ

একটি অপোগণ্ড শিশুর পক্ষে যজ্ঞের প্রমাণ ও যজ্ঞকুণ্ডের প্রতিকৃতি লিখিয়া দেওয়া কদাচ সম্ভবপর নহে।

১৭০৭ খৃষ্টাব্দে রাজবল্লভের জন্ম ধরিয়া লইলে, অগ্নিষ্টোম সময়ে তাঁহার বয়ঃক্রম ৪৭ বৎসরের অধিক হইতে পারে না। পরিশিষ্টে টমসন সাহেবের যে রিপোর্ট উদ্ধৃত করা হইল তাহাতে দেখা যায়, লালা রামপ্রসাদ ১৭৮৫ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত রাজবল্লভের উত্তরাধিকারিবর্গের কার্য্য করিয়াছেন। ১৭৬৩ খৃষ্টাব্দে ৫৬ বৎসর বয়সে রাজবল্লভ প্রাণত্যাগ করেন। অতএব যে রামপ্রসাদ ১৭৮৫ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত কার্য্যক্ষম ছিলেন, তিনি যে রাজবল্লভ অপেক্ষা বয়ঃকনিষ্ঠ হইবেন তাহা নিঃসঙ্কোচে বলা যাইতে পারে। ১৭৫৪ খৃষ্টাব্দের পূর্ব্বে অর্থাৎ রাজবল্লভের যজ্ঞানুষ্ঠানের প্রাক্কালে, রামপ্রসাদের পুত্র রামগতি ও পৌত্রী আনন্দময়ীর বয়ঃক্রম যে অল্পই ছিল সে বিষয়ে সন্দেহ করিবার কারণ নাই।

পৌরাণিক ধর্ম্মপ্লাবিত বাঙ্গালা দেশে রাজবল্লভের সময় কেহ যে বৈদিক প্রক্রিয়ার বিষয় অবগত ছিলেন তাহা কদাচ সম্ভবপর নহে। বাঙ্গালা দেশে বেদ বেদাঙ্গ শিক্ষা হইতে পারে এরূপ বিদ্যালয় অদ্যাপি স্থাপিত হয় নাই। জম্পা ও রাজনগরের বৈদিক পুরোহিতগণ এখন ফরিদপুরের অন্তর্গত মগুয়াগ্রামে বাস করেন। সেই বৈদিক পুরোহিতবংশপ্রভব শ্রীযুক্ত চন্দ্রকুমার স্মৃতিভূষণ মহাশয় বলেন, "তাঁহার বৃদ্ধপ্রপিতামহ গোবিন্দদেব চক্রবর্ত্তী রাজবল্লভের সমকালবর্ত্তী লোক ছিলেন এবং তিনি রাজবল্লভকর্ত্তৃক প্রেরিত হইয়া ৺বারাণসী ধাম হইতে অগ্নিষ্টোমপ্রভৃতি যজ্ঞের প্রকরণসংগ্রহ করিয়াছিলেন। তৎকালে বেদবেদাঙ্গপ্রভৃতি শাস্ত্রে রামগতির অভিজ্ঞতা থাকিলে, রাজবল্লভের বৈদিক পুরোহিত কখনই যজ্ঞানুষ্ঠানপ্রকরণসংগ্রহ করিবার উদ্দেশ্যে সুদূরবর্ত্তী কাশীধামে যাওয়ার ক্লেশ স্বীকার করিতেন না।

তনয়ার এই শোচনীয় পরিণাম রাজবল্লভের বক্ষে শেলের ন্যায় বিদ্ধ হইল। অপ্রতিহত ক্ষমতা এবং বিপুল রাজসম্পদ্ সত্ত্বেও তিনি স্বীয় জীবন দুর্ব্বিষহ বলিয়া মনে করিতে লাগিলেন। শোকের প্রথম উচ্ছ্বাস অপগত হইলে রাজবল্লভ চিন্তা করিয়া স্থির করিলেন, অভয়ার ন্যায় একটি বালিকার পক্ষে ব্রহ্মচর্য্যব্রতগ্রহণ কদাচ মঙ্গলময় জগদীশ্বরের অভিপ্রেত হইতে পারে না এবং যে প্রথার শাসনে হিন্দু সমাজস্থ বহুসংখ্যক বালবিধবাকে এইরূপ ব্রহ্মচারিণীর ন্যায় জীবন যাপন করিতে হয় তাহা নিশ্চিতই আর্য্যশাস্ত্রানুমোদিত নহে। তৎকালে কৃষ্ণদাস বেদান্তবাগীশ, নীলকণ্ঠ সার্ব্বভৌম এবং কৃষ্ণদেব বিদ্যাবাগীশ তাঁহার দ্বারপণ্ডিত কার্য্যে নিযুক্ত ছিলেন। রাজবল্লভ সেই তিন জনকে হিন্দুশাস্ত্র সমুদ্র মন্থন করিয়া বিধবাবিবাহের বৈধতাসম্বন্ধে অনুসন্ধান করিতে বলিলেন। তদনুসারে তাঁহারা শাস্ত্রানুশীলন এবং পরাশর আলোচনাদ্বারা সিদ্ধান্ত করিলেন যে, অক্ষতযোনি বিধবাগণের পুনর্ব্বার বিবাহবিষয়ে হিন্দুশাস্ত্রে কোন কালে নিষেধবিধি বিদ্যমান নাই। কিন্তু বহুকাল যাবৎ বিধবাবিবাহ হিন্দুসমাজে অপ্রচলিত ছিল। সুতরাং রাজবল্লভ মাত্র তিন জন ব্রাহ্মণ পণ্ডিতের মতের উপর নির্ভর করিয়া কার্য্যক্ষেত্রে অগ্রসর হওয়া সঙ্গত মনে করিলেন না। তিনি স্পষ্টই বুঝিতে পারিলেন, হিন্দুসমাজে বিধবাবিবাহ প্রচলিত করিতে হইলে ব্রাহ্মণ পণ্ডিতসমাজের সম্মতি গ্রহণ করা প্রয়োজন। অতএব বিধবা বিবাহ বিষয়ে মতামত সংগ্রহ করিবার উদ্দেশ্যে তিনি কালবিলম্ব না করিয়া, ভারতবর্ষের বিভিন্ন প্রদেশস্থ ব্রাহ্মণপণ্ডিতগণের নিকট লোক প্রেরণ করিলেন। প্রেরিত লোক কাশী, কাঞ্চী, মিথিলা প্রভৃতি নানা স্থান হইতে অনুকূল মত সংগ্রহ করিয়া অবশেষে নবদ্বীপ আসিয়া উপস্থিত হইল।

এই সময় নবদ্বীপে বহুসংখ্যক ব্রাহ্মণ পণ্ডিত বাস করিতেন।

কার্য্যের অধ্যক্ষতা অর্পিত হওয়ায় কোন কার্য্যে বিশৃঙ্খলা ঘটিতে পারে নাই।”

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

অক্ষতযোনি হিন্দু বিধবাগণের পুনর্ব্বিবাহবিষয়ক আন্দোলন

তৃতীয় অধ্যায়ের পঞ্চম পরিচ্ছেদে রাজবল্লভের যে কনিষ্ঠা তনয়ার কথা উল্লেখ করা গিয়াছে তাঁহার নাম অভয়া দেবী। তৎকালে প্রচলিত “গৌরীদান” প্রথানুসারে অভয়া অষ্টম বর্ষে পদার্পণ করিলেই খুলনা জেলার অন্তর্গত সেনহাটী গ্রামের ধর্ম্মাঙ্গদবংশীয় রূপেশ্বরসেন নামক একটি বালকের সহিত তাঁহার উদ্বাহ কার্য্য সম্পন্ন হইল। বিবাহের অল্পকাল পরেই অভয়াকে অকূল পাথারে ভাসাইয়া রূপেশ্বর পরলোকে গমন করিল। এই ঘটনায় সমগ্র রাজনগরে হুলস্থুল পড়িয়া গেল। রাজবল্লভের অন্যান্য সন্তানের ন্যায় এই বালিকারও অতুলনীয় রূপ ছিল। পূর্ব্বে এই রূপরাশি দেখিয়া রাজবল্লভ ও শশিমুখী আপনাদিগকে কতই গৌরবান্বিত বোধ করিতেন ; কিন্তু এখন তাহা উভয়ের নিকটেই বিষের ন্যায় প্রতীয়মান হইতে লাগিল। সম্পন্ন পিতার অনুগ্রহে নানাবিধ আভরণে ভূষিত হইয়া অভয়ার বালিকাসুলভ রমণীয়তা সকলকেই মুগ্ধ করিত। কিন্তু বৈধব্যের সঙ্গে সঙ্গে তাহা সমস্তই অভয়ার দেহলতাহইতে অপসারিত করা হইল এবং তিনি শুক্লাম্বরপরিহিতা হইয়া ব্রহ্মচারিণীর ন্যায় একাহারে জীবন যাপন করিতে লাগিলেন।

অতএব আমি অনুরোধ করিতেছি আগামী কল্য রাজবল্লভের দূত সভায় সমাগত হইলে আমি বিধবাবিবাহবিষয়ে অনুকূল মত প্রদান করিবার নিমিত্ত আপনাদিগকে বারংবার বলিব, কিন্তু আপনারা তাহাতে কদাচ সম্মত হইবেন না।” এই সময় বাঙ্গালা দেশে নৈতিক অবনতির চরম সীমা উপস্থিত হইয়াছিল, সুতরাং সমাজের অগ্রণী ব্রাহ্মণপণ্ডিতগণ অম্লানবদনে কৃষ্ণচন্দ্রের অশিষ্ট প্রস্তাবে সম্মত হইতে অনুমাত্রও দ্বিধা বোধ করিলেন না।

পরদিন রাজবল্লভের প্রেরিত দূতগণ নবদ্বীপের রাজসভায় সমাসীন হইলে বিধবাবিবাহের বৈধতাবিষয়ক প্রশ্ন উপস্থাপিত হইল এবং সুচতুর কৃষ্ণচন্দ্র রাজবল্লভের ভয়ে বিপক্ষতাচরণ করিতে কুণ্ঠিত হইয়া প্রকাশ্যে পণ্ডিতমণ্ডলীকে অনুকূল মত প্রদান করিবার নিমিত্ত সনির্ব্বন্ধ অনুরোধ করিলেন। কিন্তু পণ্ডিতমণ্ডলী পূর্ব্ব সংকেত অনুসারে বলিলেন, “মহারাজের অনুরোধ রক্ষা করা আমাদের কর্ত্তব্য হইলেও আমরা সত্যের (?) মর্য্যাদা লঙ্ঘন করিয়া কদাচ নিরয়গামী হইতে পারিব না। হিন্দুশাস্ত্রানুসারে বিধবাবিবাহ কোনরূপেই সিদ্ধ হইতে পারে না। সুতরাং আমরা কোন ক্রমেই এ বিষয়ে অনুকূল মত প্রদান করিতে পারিব না।” কৃষ্ণচন্দ্র এই উত্তরে মনে মনে অতিশয় প্রীত হইলেও প্রকাশ্যে রাজবল্লভের সহিত সমবেদনা প্রদর্শন করিলেন। রাজবল্লভের প্রেরিত লোক কৃষ্ণচন্দ্রের চতুরতা বুঝিতে না পারিয়া অগত্যা ম্লানমুখে রাজনগরে প্রত্যাগমন করিল। তৎকালে নবদ্বীপবাসী পণ্ডিতমণ্ডলীর মতের বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হইতে বাঙ্গালার কোন লোকই সাহস করিত না; সুতরাং রাজবল্লভের অভিপ্রায় আর কার্য্যে পরিণত না হইয়া নবদ্বীপপাদবিহারিণী ভাগীরথীসলিলেই বিসর্জ্জিত হইল।(১)

(১) কার্ত্তিকেয়বাবু প্রণীত ক্ষিতীশ বংশাবলী—১৫৫ ১৫৬ পৃঃ

বাঙ্গালাদেশের মধ্যে একমাত্র এই স্থানেই বিবিধ শাস্ত্রের আলোচনা হইত এবং বাঙ্গালার বিভিন্ন প্রদেশস্থ বিদ্যার্থিগণ নবদ্বীপে আসিয়াই পাঠসমাপনপূর্ব্বক উপাধি লাভ করিতেন। ফলে তৎকালে শিক্ষা সম্বন্ধে নবদ্বীপের এরূপ একাধিপত্য হইয়াছিল যে, কোন ছাত্র নবদ্বীপের পাঠ সমাপন না করিলে প্রচুর শাস্ত্রজ্ঞান সত্ত্বেও দেশমধ্যে পণ্ডিতপদবাচ্য হইতে পারিতেন না। শাস্ত্রসম্বন্ধীয় কোন সামান্য প্রশ্ন উপস্থিত হইলেই বাঙ্গালার সমস্ত লোক নবদ্বীপনিবাসী পণ্ডিতমণ্ডলীর মতের অপেক্ষা করিত এবং তাঁহাদের অভিমত অশিষ্ট হইলেও তাহা বেদবাক্যের ন্যায় অভ্রান্ত বলিয়া সাদরে শিরোধার্য্য করিত। এই সমস্ত পণ্ডিতগণ কৃষ্ণনগরের জমিদার সুপ্রসিদ্ধ রাজা কৃষ্ণচন্দ্র রায়ের আশ্রিত ছিলেন। রাজবল্লভের সহিত কৃষ্ণচন্দ্রের যথেষ্ট সৌহার্দ্দ্য ছিল। রাজবল্লভ মনে করিয়াছিলেন কৃষ্ণচন্দ্রের সহায়তায় তিনি নবদ্বীপ নিবাসী পণ্ডিতমণ্ডলী হইতে অনায়াসে বিধবাবিবাহবিষয়ক অনুকূল মত সংগ্রহ করিতে পারিবেন। কিন্তু সুহৃদ্‌বর কৃষ্ণচন্দ্রই রাজবল্লভের অভীষ্টসিদ্ধিবিষয়ে দুর্ল্লঙ্ঘ্য অন্তরায় হইয়া দাঁড়াইলেন।

রাজবল্লভের লোক নবদ্বীপে উপস্থিত হওয়া মাত্রই সুচতুর কৃষ্ণচন্দ্র তাঁহাদিগকে সাদরে গ্রহণ করিয়া সাহায্য দানে প্রতিশ্রুত হইলেন। অতঃপর তিনি পণ্ডিতগণকে গোপনে আহ্বান করিয়া বিধবাবিবাহের বৈধতাসম্বন্ধে প্রশ্ন করিলে তাঁহারা সকলেই উত্তর করিলেন, অক্ষতযোনি হিন্দুবিধবাগণের পুনরায় বিবাহ হইতে হিন্দুশাস্ত্রানুসারে কোনরূপ বাধা হইতে পারে না। কৃষ্ণচন্দ্র তখন আক্ষেপ করিয়া বলিলেন, "পূর্ব্বে একথা জানিতে পারিলে আমি স্বয়ংই এইরূপ সমাজ-সংস্কারে ব্রতী হইতাম; কিন্তু বৈদ্যবংশীয় রাজবল্লভের চেষ্টায় বিধবাবিবাহ সমাজে প্রচলিত হইয়া গেলে আমার আর অপমানের সীমা থাকিবে না।

কাহারও মতে ঐ ঘটনা নেপাল রাজদরবারে সংঘটিত হইয়াছিল। এই সমস্ত জনশ্রুতির কোনটি সত্য এবং কোনটি মিথ্যা তাহা নির্ণয় করা সুকঠিন সন্দেহ নাই; তবে একথা নিশ্চিতরূপে বলা যাইতে পারে যে নবদ্বীপাধিপতি বিরুদ্ধাচরণ না করিলে রাজবল্লভের চেষ্টার ফলে বাঙ্গালা দেশে অক্ষতযোনি হিন্দুবিধবার পুনর্ব্বিবাহ প্রচলিত হইয়া যাইত কিন্তু কৃষ্ণচন্দ্রের বিপক্ষতানিবন্ধনই রাজবল্লভ স্বীয় অভিলাষ পূর্ণ করিতে পারেন নাই।

বিধবাবিবাহ যে হিন্দুশাস্ত্রসম্মত একথা এখন অনেকেই স্বীকার করেন। প্রাচীন আর্য্যসমাজে এই প্রথা ভূরি পরিমাণে প্রচলিত ছিল। অক্ষতযোনি বিধবার ত কথাই নাই, তৎকালে পুত্রবতী বিধবারাও পুনরায় বিবাহিত হইতে পারিতেন। এবং তাদৃশ বিধবার পুত্রগণও পিতৃরিক্থের অধিকারী হইতেন। ভগবান্ মনু বলিয়াছেন—

দ্বৌ তু যৌ বিবদেয়াতাং দ্বাভ্যাং জাতৌ স্ত্রিয়াধনে।
তয়োর্যৎ যস্য পিত্র্যং স্যাৎ তৎ স গৃহ্লীত নেতরৎ॥ ১৯১—৯অঃ

পুত্রবতী বিধবা নারী দ্বিতীয়বার বিবাহ করিলে তাহাতেও এক পুত্র হয় ও সে স্বামীও উপরত হয়েন। এখন ধন বিভাগ কি প্রকারে হইবে? সন্তানেরা আপন আপন পিতার ধন প্রাপ্ত হইবে। যাজ্ঞবল্ক্য বলিয়াছেন—অক্ষতা বা ক্ষতা বাপি পুনর্ভূঃ সংস্কৃতা পুনঃ।

বিধবা নারী ক্ষতযোনি বা অক্ষতযোনি যাহাই হউন, তিনি পুনরায় বিবাহিত হইয়া পুনর্ভূ নামের বিষয়ীভূত হইবেন। নারদও পঞ্চাপদে বিধবা-বিবাহ বিধেয় বলিয়া মত দিয়াছেন। মহর্ষি শাতাতপও বলিতেছেন যে—

উদ্বাহিতা চ যা কন্যা ন সংপ্রাপ্তা চ মৈথুনম্।
ভর্ত্তারং পুনরভ্যেতি যথা কন্যা তথৈব সা॥ ৪৪

বিধবাবিবাহ প্রচলন করিতে অসমর্থ হইলেও রাজবল্লভ অভয়ার মনোরঞ্জনের নিমিত্ত উপায়ান্তর উদ্ভাবন করিলেন। অবিলম্বে তাঁহার চেষ্টার ফলে জনৈক বৈদ্যসন্তান তাঁহার শিশু পুত্রকে অভয়ার করে দত্তকপুত্ররূপে অর্পণ করিতে সম্মত হইল এবং অভয়া সেই শিশুটিকে দত্তক পুত্ররূপে গ্রহণ করিয়া জননীর ন্যায় লালনপালন করিতে লাগিলেন। যে ধর্ম্মাঙ্গদ বংশে অভয়ার বিবাহ হইয়াছিল তাহা বঙ্গীয় বৈদ্যসমাজে সুপ্রসিদ্ধ কুলীন বলিয়া পরিগণিত। কিন্তু সামাজিক নিয়মানুসারে তৎকালে দত্তক পুত্রগণ "চন্দনের" অনুষ্ঠান না করিলে কৌলীন্য রক্ষা করিতে সমর্থ হইত না। অগত্যা রাজবল্লভ বিশেষ আড়ম্বরের সহিত 'চন্দনের" অনুষ্ঠান করিয়া বিধবা তনয়ার দত্তক পুত্রের কৌলীন্য রক্ষা করিলেন। এই দত্তকপুত্র গোপীকৃষ্ণসেন নামে খ্যাত ছিলেন। গোপীকৃষ্ণের বংশধরগণ অদ্যাপি বিদ্যমান আছেন এবং বঙ্গীয় বৈদ্যসমাজে তাঁহারা কৌলীন্য মর্য্যাদা উপভোগ করিতেছেন।(১)

কেহ কেহ বলেন, "রাজবল্লভের প্রেরিত লোক বিধবা-বিবাহ বিষয়ক প্রস্তাব লইয়া নবদ্বীপে উপস্থিত হইলে কৃষ্ণচন্দ্র তাঁহাদিগকে অন্যান্য ভোজ্যের সহিত একটি গোবৎসও প্রদান করেন। আগন্তুকগণ এইরূপ অভিনব উপহারের কারণ জিজ্ঞাসা করিলে তিনি উত্তর করিলেন, যে বিধবা-বিবাহ বহুকাল যাবৎ অপ্রচলিত আছে তাহা পুনরায় প্রচলিত হইতে পারিলে শাস্ত্রানুসারে গোমাংসভক্ষণেও আপত্তি হইতে পারে না। রাজবল্লভের লোক এই উত্তরশ্রবণে সাতিশয় লজ্জিত হইল এবং আর বিলম্ব না করিয়া সত্বরপদে রাজনগরে প্রত্যাগমন করিল।"

(১) গোপীকৃষ্ণের পুত্র রাধামোহন সেন। রাধামোহনের পুত্র কালীচন্দ্র, কালীচন্দ্রের পুত্র চন্দ্রকুমার সেন এখনও জীবিত আছেন।

হইতে পারে। যাহা হউক কৃষ্ণচন্দ্র বিবেকের বশবর্ত্তী হইয়া রাজবল্লভের বিধবা-বিষয়ক আন্দোলনে বিরুদ্ধাচরণ করিলে অনেকেই তাঁহাকে ধন্যবাদ প্রদান করিতেন সন্দেহ নাই; কিন্তু যদি তিনি ঈর্ষার বশবর্ত্তী হইয়া রাজবল্লভের বিপক্ষতাচরণে প্রবৃত্ত হইয়া থাকেন, তবে সেই কার্য্যদ্বারা নিশ্চিতই নবদ্বীপাধিপের গৌরবরক্ষা হয় নাই।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

সমাজপতিত্বে

বাঙ্গালা দেশের বৈদ্যসম্প্রদায় যে পাঁচ মেলে বিভক্ত, তন্মধ্যে বঙ্গীয় মেলের প্রথম সমাজপতি ধন্বন্তরিবংশোদ্ভব রবিসেন মহামণ্ডল। বর্ত্তমান খুলনা জিলার অন্তর্গত সেনহাটি নামক গ্রামে রবিসেন বাস করিতেন এবং তিনি চন্দনী মহালের "মণ্ডলেশ্বর" ছিলেন। তাঁহার লোকান্তর গমনের পর তদীয় ক্ষুল্লতাত উচলিসেনের পুত্র বিজয় সেন অধিকারী এই সম্মানসূচক পদ লাভ করেন। বিজয় সেনের পর তৎপুত্র ও পৌত্র ক্রমান্বয়ে বঙ্গীয় বৈদ্যসমাজের অধিনায়কত্ব করিয়া গিয়াছেন। বিজয় সেনের পৌত্রের নাম রামচন্দ্র সেন। রামচন্দ্র পরলোক গমন করিলে অনেক দিন পর্য্যন্ত কেহ সমাজপতির আসনে বরিত হয়েন নাই।

বঙ্গীয় মেলে যে যে বংশের বৈদ্যসন্তানগণ কুলীন বলিয়া পরিগৃহীত তন্মধ্যে বিষ্ণুদাশের বংশোদ্ভবগণ অন্যতম। বর্ত্তমান খুলনা জিলার

সমুদ্‌গৃহ্য তু তাং কন্যাং সা চেৎ অক্ষতযোনিকা।
কুলশীলবতে দদ্যাৎ ইতি শাতাতপোঽব্রবীৎ॥ ৪৫

যে কন্যার বিবাহের পর স্বামিসহবাস হয় নাই, সেই বিধবা কুমারীই, তাহার পুনরায় বিবাহ হওয়া উচিত। শাতাতপের মত এই যে, তাহাকে কুলশীলবান্ পাত্রে দান করা অতি কর্ত্তব্য। ভগবান্ মনুও নবমাধ্যায়ের ১৭৫ ও ১৭৬ শ্লোকে এ কথা বলিয়া গিয়াছেন। ফলতঃ মন্বাদির যে সময়ে জগতে ধর্ম্ম চারিপোয়া ছিল, তখন বিধবার কেবল ব্রহ্মচর্য্যে না কুলাইলে এই ঘোর কলিকালে, আটপোয়া অধর্ম্মের যুগে, বিধবার যে পুনরায় বিবাহ দেওয়া উচিত সে বিষয়ে কোনও সংশয়ই নাই। কিন্তু বিধবা-বিবাহ প্রথা আর্য্যগণ যৌন পবিত্রতা রক্ষা করিবার উদ্দেশ্যেই সমাজ হইতে ক্রমে উঠাইয়া দিয়াছিলেন, কালে বিধবা-বিবাহ রহিত হইয়া গিয়াছিল। প্রাচীন আর্য্যসমাজে প্রাপ্ত বয়স্ক না হইলে কোন পুরুষ কি রমণী উদ্বাহ শৃঙ্খলে আবদ্ধ হইত না; সুতরাং বিধবা বিবাহের অপ্রচলনদ্বারা সমাজের কোন ব্যক্তিকেই তৎকালে বালবৈধব্যের বিষময় ফল উপভোগ করিতে হয় নাই। বাঙ্গালা দেশে "গৌরীদান" প্রথা প্রবর্ত্তনের সঙ্গে সঙ্গে অনেক অনর্থ উপস্থিত হইয়াছে। বাঙ্গালী রমণী অল্প বয়সে সন্তানের জননী হইয়া বাঙ্গালী জাতিকে দুর্ব্বল করিয়া ফেলিয়াছেন। বর্ত্তমান সময়ের অনেক চিন্তাশীল হিন্দুবিধবা বিবাহের পক্ষপাতী নহেন। বোধ হয় এক পুরুষের এক রমণীই জগদীশ্বরের অভিপ্রেত। স্ত্রীজাতির পক্ষে পত্যন্তর গ্রহণ যেমন দোষাবহ, পুরুষের পক্ষে দারান্তরপরিগ্রহ করা তদপেক্ষা কম নিন্দনীয় নহে। যাঁহারা সমাজসংস্কারে প্রয়াসী, তাঁহাদের পক্ষে হিন্দুবিধবার পুনর্ব্বিবাহ বিষয়কচেষ্টাপরিত্যাগপূর্ব্বক বাল্যবিবাহ ও পুরুষের দারান্তর পরিগ্রহের বিরুদ্ধে আন্দোলন উপস্থাপিত করিলে সমাজের প্রভূত কল্যাণ সাধিত

তৎকালে হরিনাথ নিরতিশয় ক্ষমতাশালী লোক হইয়া দাঁড়াইয়াছিলেন। সমগ্রকুলীনসম্প্রদায়মধ্যে এমন কোন লোক বিরল ছিল, যিনি সাহস করিয়া হরিনাথের বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হইতে পারিতেন। সৌভাগ্যক্রমে তৎকালে যশোহরের অন্তর্গত বেন্দাগ্রামে রামকান্তদাশ ঘটকবিশারদ নামে এক ব্যক্তি বিদ্যমান ছিলেন। কান্নদাশবংশে রামকান্তের জন্ম হইয়াছিল এবং বাক্‌পটুতা, কবিত্ব ও সৎসাহসের নিমিত্ত সমগ্র বঙ্গীয় বৈদ্যসমাজেই তিনি সুপরিচিত ছিলেন। কুলীনসম্প্রদায় হরিনাথকে বিফল-মনোরথ করিবার উদ্দেশ্যে এখন রামকান্তের শরণাপন্ন হইলেন। রামকান্ত বিশেষরূপে অবগত ছিলেন, রাজা হরিনাথের বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হইলে তাঁহার পক্ষে প্রিয় জন্মভূমিতে অবস্থান করা সুকঠিন হইয়া উঠিবে। তথাপি তিনি শরণাগত কুলীনগণের সম্মানরক্ষার্থে কৃতসংকল্প হইয়া তাঁহাদের সহায়তায় আত্মরক্ষার অনুষ্ঠান করিলেন এবং নির্দ্দিষ্ট দিবসে মূলঘর গ্রামে "চন্দনের" সভায় আসিয়া উপস্থিত হইলেন।

এই সময় রামকান্ত বঙ্গীয় বৈদ্যসমাজের কুলাচার্য্যের পদে বরিত ছিলেন। যথাসময়ে হরিনাথ ও নিমন্ত্রিত বৈদ্যসন্তানগণ সভায় সমাসীন হইলে রামকান্ত নিম্নলিখিতরূপে সভা বর্ণনা করিলেন :—

সভা বিরিঞ্চের্মধুসূদনস্য
সেয়ং তৃতীয়া শশিশেখরস্য।
শক্রস্য তূর্য্যা তব পঞ্চমীয়ং
ষষ্ঠী ন গোষ্ঠীনরনাথ আস্তে॥

অতঃপর হরিনাথ জিজ্ঞাসা করিলেন, "সমস্ত বৈদ্যসন্তানগণ আগমন করিয়াছেন কিনা?" রামকান্ত প্রত্যুত্তরে বলিলেন :—

সমাগতা ন দেবা নরদেব সংসদি।

অন্তর্গত মূলঘর গ্রামে এই বংশে রাজা হরিনাথের জন্ম হয়। রাজা হরিনাথ কুলীনসম্প্রদায়মধ্যে শীর্ষস্থান অধিকার করিবার উদ্দেশ্যে একদা "চন্দনের"(১) অনুষ্ঠান করেন। হরিনাথের প্রপিতামহ দেব বংশোদ্ভব নিম্নশ্রেণীস্থ বৈদ্যের দৌহিত্র ছিলেন এবং তিনি স্বস্থান ত্যাগ করিয়া ভিন্নগ্রামে বাস করিতেছিলেন। এই উভয় কারণেই তাঁহার মর্য্যাদার অনেক লাঘব হইয়াছিল হরিনাথের পিতামহ জানকীবল্লভ রায় কায়স্থবংশীয় রাজা প্রতাপআদিত্যের অনুগ্রহে খড়রিয়া পরগণার জমিদারী লাভ করেন এবং রামভদ্র, বলভদ্র ও রামকৃষ্ণ নামে তাঁহার যে তিন পুত্র জন্মে তাঁহারা বিদ্যাবত্তার নিমিত্ত যথাক্রমে কবিকর্ণপূর কবিচন্দ্র এবং কবিকঙ্কণ উপাধিতে ভূষিত হন। এই সময় হইতে বিষ্ণুদাশবংশ পুনরায় উজ্জ্বলতা প্রাপ্ত হইলেও বৈদ্যবংশীয় কোন কুলীনই তাঁহাদিগকে সমাজের শীর্ষস্থান প্রদান করিতে সম্মত ছিলেন না।

---

(১) "চন্দন" একটি কুলযজ্ঞবিশেষ। বিবাহ ও দত্তকগ্রহণপ্রভৃতি মাঙ্গলিক উৎসবে ইহার অনুষ্ঠান হইয়া থাকে। অনুষ্ঠাতাকে এই উপলক্ষে সমগ্র বৈদ্যসমাজের নিমন্ত্রণ করিতে হয়। নির্দ্দিষ্ট দিবসে নিমন্ত্রিতগণ কর্ম্মকর্ত্তার আলয়ে সমবেত হইলে তাঁহারা সকলে এক সভামণ্ডপে সমাসীন হন। সভার সর্ব্বোচ্চ স্থানে সমাজপতি এবং তাঁহার উভয় পার্শ্বে অরবিন্দ, বিকর্ত্তন এবং প্রভাকর বংশীয় বৈদ্যগণ উপবেশন করেন। তৎপর অন্যান্য শ্রেণীর কুলীন ও অষ্টঘর বংশীয় বৈদ্য ও অপরাপর বৈদ্য সন্তান স্ব স্ব পদমর্য্যাদানুসারে ক্রমে উপবিষ্ট হইলে, কর্ম্মকর্ত্তা আসিয়া সেই সভায় আসন পরিগ্রহ করেন। এই সময় জনৈক কুলাচার্য্য চন্দনদ্বারা প্রথমতঃ কর্ম্মকর্ত্তার তৎপর সমাজপতির ও তাঁহার উভয় পার্শ্বস্থ কুলীনগণের এবং তৎপর সমবেত অন্যান্য সকলের ললাটে যথাক্রমে তিলক প্রদান করিয়া কার্য্য শেষ করেন। এই অনুষ্ঠান উপলক্ষে যে সমস্ত ব্যক্তি আগমন করেন তাঁহারা বংশমর্য্যাদায় কর্ম্মকর্ত্তা অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ হইলে নির্দ্দিষ্টহারে "বিদায়" পাইয়া থাকেন। এইরূপ অনুষ্ঠান বহুব্যয়সাধ্য এবং ইহা অতিশয় সমারোহের সহিত সম্পন্ন হইয়া থাকে।

প্রচলন করিতে প্রয়াস পাইয়া রাজবল্লভ দেখিতে পাইলেন যে, তাঁহার বিরুদ্ধবাদিগণ মনোহর রায়কে নেতৃস্বরূপ সম্মুখে রাখিয়া তাঁহারই নামে বিপক্ষতাচরণ করিতেছে। সুতরাং বিরুদ্ধবাদিগণকে কৌশলে বশীভূত করিবার উদ্দেশ্যে রাজবল্লভ বিক্রমপুরের সমাজ-পতিত্ব হস্তগত করিবার নিমিত্ত ব্যগ্র হইয়া উঠিলেন। তৎকালে নানা কারণে মনোহর রায়ের আর্থিক অবস্থা শোচনীয় হইয়া দাঁড়াইয়াছিল। রাজবল্লভ এই সুযোগে মনোহর রায়ের নিকট সমাজপতিত্ব ক্রয় করিবার প্রস্তাব করিয়া পাঠাইলেন। মনোহর অর্থের লোভ সংবরণ করিতে অসমর্থ হইয়া প্রচুর মূল্যের বিনিময়ে রাজবল্লভের নিকট সমাজপতিত্ব বিক্রয় করিলেন। এই অবধি রাজবল্লভ বিক্রমপুরস্থ বৈদ্যসমাজেয় নেতা বলিয়া পরিগৃহীত হইলেও সমগ্র বঙ্গীয় বৈদ্য সমাজ তাঁহাকে সমাজপতির আসন প্রদান করিল না। অবশেষে তৃতীয় পুত্র গঙ্গাদাসের বিবাহোপলক্ষে তিনি অতি সমারোহের সহিত "চন্দনের" অনুষ্ঠান করিলেন এবং তদবধি তিনি বঙ্গীয় বৈদ্যসমাজের নেতা বলিয়া পরিগৃহীত হইলেন। রামচন্দ্র সেনের পর মহারাজ রাজবল্লভই বঙ্গীয় সেনের সমাজপতির আসন লাভ করিয়াছেন। অদ্যাপি তাঁহার উত্তর পুরুষগণ এই সম্মানসূচক পদগৌরব উপভোগ করিয়া আসিতেছেন।

রামকান্ত যাহা উত্তর করিলেন, তাহা দ্ব্যর্থবোধক। এক অর্থ এই যে, হে নরদেব! আপনার সভায় দেবতারা আগমন করেন নাই, দ্বিতীয় অর্থ এই যে, হে নরদেব! আপনার সভায় আপনার প্রপিতামহের মাতামহ বংশীয় দেবোপাধিধারী বৈদ্যগণ উপস্থিত হন নাই।

হরিনাথের কুলযজ্ঞ বিনষ্ট হয় ইহা সমগ্র প্রধান প্রধান কুলীন সম্প্রদায়েরই আন্তরিক অভিপ্রায় ছিল, সুতরাং রামকান্তের উক্তি শ্রবণ করিয়া সভাস্থ সকলে বিদ্রূপচ্ছলে করতালি দিয়া উঠিল এবং সভাস্থল কোলাহলে পরিপূর্ণ হইয়া গেল। ইতিপূর্ব্বে রামকান্তের জীবনরক্ষার্থ একখানি বহুক্ষেপণীযুক্ত নৌকা সজ্জিত রহিয়াছিল, কোলাহলের সুযোগে রামকান্ত সভা হইতে প্রস্থান করিয়া ঐ নৌকার সাহায্যে বিক্রমপুরে প্রস্থান করিলেন। বঙ্গীয় বৈদ্যসমাজ যে সপ্তবিংশ স্থলে বিস্তৃত তন্মধ্যে বিক্রমপুর অন্যতম। তৎকালে বিক্রমপুরের অন্তর্গত "নপাড়া" গ্রামে রঘুরাম রায় নামে এক সুপ্রসিদ্ধ ব্যক্তি বাস করিতেন। তিনি ভরদ্বাজ বংশে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন এবং সমগ্র বিক্রমপুর পরগণার জমিদার ছিলেন। ক্ষমতা ও ঐশ্বর্য্যে বঙ্গীয় বৈদ্যসমাজে একমাত্র রঘুরামই হরিনাথের প্রতিদ্বন্দ্বী হওয়ার উপযুক্ত ছিলেন। রামকান্ত এখন আত্মরক্ষার্থ এই রঘুরাম রায়ের আশ্রয় গ্রহণ করিলেন। এই সময় রামকান্তের প্রযত্নে বিক্রমপুর বৈদ্যসমাজে শ্রেণীবিভাগ হইল এবং রঘুরাম সেই সমাজের নেতা বলিয়া পরিগৃহীত হইলেন। তিনি উচ্চশ্রেণীস্থ বৈদ্য ছিলেন না, সুতরাং সমগ্র বঙ্গীয় বৈদ্য তাঁহাকে সমাজপতির আসন দিতে স্বীকার করিল না।

রঘুরামের পর তাঁহার পৌত্র মনোহর রায় পর্য্যন্ত সমস্ত ব্যক্তিই বিক্রমপুরস্থ বৈদ্যসমাজের নেতা ছিলেন। এই শেষোক্ত ব্যক্তির সময়েই মহারাজ রাজবল্লভের আবির্ভাব হইয়াছিল। যজ্ঞোপবীত পুনঃ

বিশ্বস্ত সেনানী মুস্তাফা খাঁ। সিবীয়ার প্রান্তরে তাঁহারই পার্শ্বে অবস্থান করিয়া অকাতরে যুদ্ধ করিয়াছিল, সে এখন বিদ্রোহী হইয়া দাঁড়াইল। এই বিদ্রোহ দমন করিতে নবাব পক্ষের বহুসংখ্যক সেনা রণক্ষেত্রে প্রাণত্যাগ করিল এবং স্বয়ং নবাবকেও বিলক্ষণ বেগ পাইতে হইল। অতঃপর যে আলিবর্দ্দী শান্তিলাভ করিলেন এমন নহে; অল্পকাল মধ্যেই আর এক বিপদের সংবাদ পাইয়া তিনি বিমূঢ় হইয়া পড়িলেন।

পূর্ব্বে বলা হইয়াছে কনিষ্ঠা তনয়া আমনাবিবীর জ্যেষ্ঠ পুত্র সিরাজ উদ্দৌল্লাকে আলিবর্দ্দী পোষ্যপুত্ররূপে গ্রহণ করিয়া লালনপালন করিতেছিলেন। সায়র মোতাক্ষরিণে লিখিত আছে, প্রেমিক যেমন প্রিয়তমার অদর্শনে উদ্ভ্রান্তচিত্ত হয়, আলিবর্দ্দীও তদ্রূপ সিরাজকে দুই দণ্ড দেখিতে না পাইলে অস্থির হইয়া পড়িতেন। আমনার স্বামী জয়নার্দ্দিন আহাম্মদ বিহার প্রদেশের শাসন-কর্ত্তৃত্বে নিযুক্ত ছিলেন। কিন্তু তিনি এই পদে সন্তুষ্ট থাকিবার লোক ছিলেন না। কিরূপে নিবাইস ও সৈয়দ আহাম্মদের সমস্ত বিভব এবং আলিবর্দ্দীর সিংহাসন হস্তগত করিবেন, জয়নার্দ্দিন বিহারে অবস্থান করিয়া কেবল তাহার উপায়ই চিন্তা করিতেছিলেন, অবশেষে এক সুযোগও আসিয়া উপস্থিত হইল। বিদ্রোহী সেনানী মুস্তাফা খাঁর অনুচর সমসের খাঁ ও সর্দ্দার খাঁ বিদ্রোহ প্রশমনের অব্যবহিত পরে আলিবর্দ্দীর অনুমতি ক্রমে দ্বারবঙ্গে অবস্থান করিতেছিলেন। জয়নার্দ্দিন মনে করিলেন এই দুই আফগান সেনানীকে স্বপক্ষে আনয়ন করিতে পারিলে তাহাদের সহায়তায় বহুসংখ্যক আফগান সেনা সংগ্রহ করিতে পারিবেন এবং পরে আফগান সেনা লইয়া অভিযান করিলে সহজেই অভীষ্ট সিদ্ধ হইয়া যাইবে। জয়নার্দ্দিন অত্যন্ত কূটরাজনীতিক ছিলেন। আলিবর্দ্দীর সন্দেহ উদ্রেক না হয়, এই অভিপ্রায়ে তিনি আলিবর্দ্দীর নিকট লিখিয়া

ষষ্ঠ অধ্যায়

প্রথম পরিচ্ছেদ

যেমন কর্ম্ম তেমন ফল

প্রকৃতিপুঞ্জ আলিবর্দ্দীর কৃতঘ্নতা বিস্মৃত হইল সত্য ; কিন্তু বিধাতা তাঁহাকে ক্ষমা করিলেন না। সুখ ও শান্তির আশায়ই আলিবর্দ্দী প্রভু-পুত্র সরফরাজের উচ্ছেদ সাধন করিয়া সিংহাসন অধিকার করিয়াছিলেন। দুর্ভাগ্যক্রমে এখন সেই সিংহাসনই তাঁহার কাল হইয়া দাঁড়াইল। ফলে বাঙ্গালার নবাবীপদ লাভ করিয়া তিনি একদিনের নিমিত্তও শান্তি উপভোগ করিতে পারিলেন না।

সিংহাসনলাভের অব্যবহিত পরেই আলিবর্দ্দীকে উড়িষ্যার শাসন-কর্ত্তা মুরশিদকুলীর বিরুদ্ধে অভিযান করিতে হইল। উড়িষ্যা বিজিত হইলে মহারাষ্ট্রীয় সেনা দলে দলে বিভিন্ন পথে বাঙ্গালায় প্রবেশ করিয়া প্রকৃতিপুঞ্জকে ব্যতিব্যস্ত করিয়া তুলিল। এক দল বিতাড়িত হইলে বিভিন্ন পথে আর একদল এবং সেই দল বিতাড়িত হইলে অন্য পথ দিয়া তৃতীয় দল উপস্থিত হইয়া আলিবর্দ্দীকে আর বিশ্রাম করিবার অবসর প্রদান করিল না। এইরূপে একমাত্র "বর্গীর হাঙ্গামা" নিবারণ কল্লেই তাঁহার শাসনকালের অধিকাংশ সময় পর্য্যবসিত হইয়া গেল। ইহাতেই যে আলিবর্দ্দী নিষ্কৃতি লাভ করিলেন এমন নহে। যে সুহৃদ্‌বর ও

অনুচরসহ নদী পার হইয়া অপর তটে তাহাদের সহিত সাক্ষাৎ করিলেন। ধূর্ত্ত আফগানসেনা জয়নার্দ্দনের বিনাশ সাধনে কৃতসংকল্প হইলেও এখন তাঁহার অভ্যর্থনা করিতে ক্রটি করিল না। ইহাতে জয়নার্দ্দন এতদূর প্রীত হইলেন যে, আফগানেরা সহজে নদী পার হইয়া যাহাতে পাটনায় উপস্থিত হইতে পারে, সে বিষয়ে তিনি অবিলম্বে সুবন্দোবস্ত করিয়া দিলেন। এই উপায়ে বহুসংখ্যক আফগান সেনা পাটনায় উপস্থিত হইয়া জাফর খাঁর উদ্যানে শিবির সন্নিবেশ করিল। অতঃপর তাহাদিগকে দরবারে অভ্যর্থনা করার নিমিত্ত একটী দিন নির্দ্দিষ্ট হইল। নির্দ্দিষ্ট দিবসে জয়নার্দ্দন আফগান সেনার অভ্যর্থনার নিমিত্ত দরবার গৃহে আগমন করিলেন। ইতিমধ্যে তাহারা তথায় প্রবেশ করিয়া জয়নার্দ্দনকে নির্দ্দয়রূপে হত্যা করিল। পাটনা নগরী এখন আফগান-দিগের হস্তগত হইল এবং আমনাবিবীও তাঁহার সন্তানসন্ততি শত্রুহস্তে বন্দী হইয়া কারারুদ্ধ অবস্থায় কালযাপন করিতে লাগিলেন।

আলিবর্দ্দী তৎকালে মুরশিদাবাদে অবস্থান করিতেছিলেন। অবিলম্বে পাটনার দুর্ঘটনা তাঁহার কর্ণগোচর হইল এবং তিনি তনয়ার পরিণাম ভাবিয়া আকুল হইয়া পড়িলেন। রাজকোষে তখন অর্থের অত্যন্ত অভাব ছিল, সুতরাং কিরূপে অর্থ সংগ্রহ করিয়া উপযুক্ত সংখ্যক সেনাসহ পাটনার দিকে অভিযান করিবেন তাহা তিনি ভাবিয়া স্থির করিতে পারিলেন না। এই সময় নিবাইস মহম্মদ, ঘেসাটিবিবী, জগৎশেঠ এবং নগরের অন্যান্য প্রধান প্রধান ধনবান্ ব্যক্তি নবাবকে প্রচুর অর্থ সাহায্য করিল (১)। এইরূপে যে অর্থ সংগ্রহ হইল তদ্দারা

---

(1) Sair. vol. II. page 46.

উমাচরণবাবু লিখিয়াছেন, "একদা আলিবর্দ্দী অর্থকষ্টে পড়িয়া রায়রায়ানের নিকট সাতলক্ষ টাকা চাহিয়া পাঠাইলে, রায়রায়ান রাজকোষের অসচ্ছলতা জানাইয়া

পাঠাইলেন "সমসের খাঁ ও সর্দ্দার খাঁ বিস্তর আফগান সেনা সংগ্রহ করিয়াছে। যে সমস্ত সেনা তাহাদের সহিত বাঙ্গালা হইতে এস্থলে আসিয়াছিল, তাহাদিগকে ঐ সেনানীদ্বয় এপর্য্যন্ত বিদায় প্রদান করেন নাই। আফগানসেনাগণ সহজে বিতাড়িত হইবার পাত্র নহে। একবার দুর্গ নির্ম্মাণ করিতে পারিলে তাহারা দুর্দ্ধর্ষ হইয়া উঠিবে এবং রাজ্যের শান্তি বিনষ্ট করিতে অনুমাত্রও কুণ্ঠিত হইবে না। আমার মনে হয়, উহাদিগকে রাজকীয়সেনাদলভুক্ত করিতে পারিলে উহারা কোনরূপ উৎপাত করিবে না। বিহারের রাজকোষে এত অর্থ নাই যে বিহারের আয় হইতে এই সেনাদলের ব্যয় সঙ্কুলন হইতে পারে। মুরশীদাবাদের রাজকোষ হইতে অর্থসাহায্য পাইলে আমি সমস্ত আফগানগণকেই রাজকীয় সেনাদলভুক্ত করিতে পারি এবং তাহাতে উভয় কূলই রক্ষা হওয়ার সম্ভাবনা।" আলিবর্দ্দী অত্যন্ত বিচক্ষণ লোক ছিলেন সন্দেহ নাই; কিন্তু তিনি জয়নার্দ্দিনকে অত্যন্ত স্নেহ করিতেন। সুতরাং অন্ধ স্নেহের বশবর্ত্তী হইয়া তিনি আর কোনরূপ সন্দেহ না করিয়াই জামাতার প্রস্তাবে সম্মতি প্রদান করিলেন।

অতঃপর জয়নার্দ্দিন আফগান সেনানায়কদ্বয়ের সহিত সন্ধির প্রস্তাব চালাইতে লাগিলেন। সন্ধির কথাবার্ত্তা সুস্থির হইলে ১৭৪৭ খৃষ্টাব্দের প্রারম্ভে আফগানেরা পাটনার অপর তীরে সেনাদলসহ শিবির সন্নিবেশ করিল। ইতিপূর্ব্বে আলিবর্দ্দী সন্ধির ছলনায় আব্দুল করিম ও রোসন খাঁ নামক দুইজন আফগানসেনানীকে রাজসভায় আনিয়া নিঃসহায় অবস্থায় হত্যা করিয়াছিলেন। বর্ত্তমান ক্ষেত্রে আফগানেরা ভয়ের ভাণ করিয়া নদী উত্তীর্ণ হইল না দেখিয়া, জয়নার্দ্দিন মনে করিলেন তাহারা প্রকৃত প্রস্তাবেই ভীত হইয়া নদী পার হইতেছে না। অগত্যা তিনি আফগানদিগের মনে বিশ্বাস উৎপাদন করিবার উদ্দেশ্যে কতিপয়

করিল। সমবেত বাহিনী মেদিনীপুর পর্য্যন্ত আসিলেই বিধাতার বিড়ম্বনায় বর্ষা সমাগমে তাঁহাদের গতিরোধ হইল। আলিবর্দ্দী এখন মেদিনীপুরে শিবির সন্নিবেশ করিয়া সসৈন্যে তথায় অবস্থান করিতে লাগিলেন এবং স্থির করিলেন যে, বর্ষাবসানে মহারাষ্ট্রীয়দিগের বিরুদ্ধে অভিযান করিয়া তাহাদিগকে উপযুক্ত প্রতিফল প্রদান করিবেন। এই সময় এমন একটি অভিনব ঘটনা উপস্থিত হইল যে তাহাতে আলিবর্দ্দী অতিমাত্র বিস্মিত ও বিচলিত হইয়া পড়িলেন।

যে সময় আলিবর্দ্দী মুরশিদাবাদ হইতে উড়িষ্যা অভিমুখে প্রস্থান করিয়াছিলেন, তৎকালে সিরাজ আলিবর্দ্দীর অনুগমন না করিয়া মুরশিদাবাদ নগরে প্রিয়তমা লুৎফন্নেসার সহিত প্রেমাভিনয়ে নিরত ছিলেন। আলিবর্দ্দীর অনুপস্থিতি-সুযোগে মেহেদি নেগার নামক জনৈক সম্ভ্রান্ত মুসলমানের পরামর্শে, সিরাজউদ্দৌল্লা বিহারের শাসন-কর্ত্তৃত্ব স্বহস্তে গ্রহণ করিবার নিমিত্ত ব্যগ্র হইয়া পড়িলেন। স্নেহ-প্রবণ মাতামহ যে এতদিন তাঁহাকে অত্যন্ত যত্নের সহিত লালন পালন করিয়াছেন এবং তাঁহার ন্যায় অন্যায় সমস্ত আকাঙ্ক্ষাই বিনা বাক্যব্যয়ে পরিতৃপ্ত করিতে কুণ্ঠিত হন নাই, একথা এখন ক্ষমতার মোহিনী শক্তিতে বশীভূত সিরাজের মনে একবারও উদিত হইল না। তিনি অনায়াসে আলিবর্দ্দীর স্নেহশৃঙ্খল ছিন্ন করিয়া লুৎফন্নেছা ও কতিপয় অনুচর সহ রজনীযোগে পাটনা অভিমুখে প্রস্থান করিলেন। নিবাইস সিরাজকে প্রতিনিবৃত্ত করিতে চেষ্টা পাইয়া কৃতকার্য্য হইতে পারিলেন না এবং অবশেষে আলিবর্দ্দীকে এই সমস্ত বৃত্তান্ত জ্ঞাপন করিবার নিমিত্ত মেদিনীপুরের শিবিরে একজন দূত পাঠাইয়া দিলেন (১)।

---

(১) অক্ষয়বাবু লিখিয়াছেন "সিরাজ এই সময় পঞ্চদশ বৎসরের তরুণ যুবক"—সিরাজউদ্দৌল্লা ৪৯ পৃঃ।

নবাব সেনাগণের প্রাপ্য বেতন পরিশোধ করিলেন এবং প্রচুর সেনাবল লইয়া পাটনা অভিমুখে অগ্রসর হইতে লাগিলেন. বিপক্ষেরা নবাব সেনার বেগ সহ্য করিতে অক্ষম হইয়া পরাভূত হইল। অতঃপর সন্তান সন্ততি সহ তনয়ার উদ্ধার সাধন করিয়া আলিবর্দ্দী সিরাজ উদ্দৌল্লাকে বিহারের শাসনকর্ত্তৃত্বে নিযুক্ত করিলেন। তৎকালে সিরাজ অল্পবয়স্ক ছিলেন, সুতরাং বিশ্বস্ত সচিব জানকীরামকে তাঁহার প্রতিনিধিস্বরূপ রাখিয়া নবাব পুনরায় মুরশিদাবাদ অভিমুখে অগ্রসর হইলেন (২)।

অতঃপর ১৭৫০ খৃষ্টাব্দে মহারাষ্ট্রীয়েরা পুনরায় সদলবলে বাঙ্গালায় প্রবেশ করিল। আলিবর্দ্দী এখন স্পষ্টই বুঝিতে পারিলেন যে মহারাষ্ট্রীয় দিগকে সমূলে বিনষ্ট না করিলে শান্তির আশা করা বিড়ম্বনা মাত্র, সুতরাং তিনি মুরশিদাবাদ রক্ষার ভার নিবাইসের প্রতি অর্পণ করিয়া প্রচুর সেনা সহ উড়িষ্যার দিকে ধাবমান হইলেন। এই সময় মিরজাফর ও রায়দুর্ল্লভ স্ব স্ব সেনাদল লইয়া প্রভুর অনুগমন

আদেশানুরূপ অর্থ প্রদান করিতে বিরত হন। অগত্যা নবাব নিবাইসকে ডাকিয়া কিরূপে অর্থ সংগ্রহ হইতে পারে তাহার পরামর্শ জিজ্ঞাসা করেন। উভয়ের পরামর্শে স্থির হয় যে রাজবল্লভের উপর অর্থ সংগ্রহের ভার ন্যস্ত হইবে। রাজবল্লভ নবাবের আদেশ পাইয়া জগৎশেঠের গোমস্তা হইতেই সমগ্র সাত লক্ষ টাকা কৌশল ক্রমে সংগ্রহ করিলেন। আলিবর্দ্দী এই ঘটনায় প্রীত হইয়া রাজবল্লভকে "মহারাজ" উপাধি দিয়া সম্মানিত করিলেন।

(২) অক্ষয়বাবু লিখিয়াছেন, "আলিবর্দ্দী আফগানদিগের বিরুদ্ধে অভিযান করিলে বিশ্বাসঘাতক আতাউল্লা খাঁ যে আফগানদিগের সহিত গোপনে ষড়যন্ত্র করিতেছিল, তৎসংবলিত একখানা পত্র ধরা পড়ে। সিরাজ এই বিশ্বাসঘাতকতার পরিচয় পাইয়া একেবারে ক্রোধে উন্মত্ত হইয়া উঠিলেন।"—সিরাজউদ্দৌল্লা ৪১ পৃঃ

মোতাক্ষরীণের ২য় খণ্ডের ৪৮ ও ৪৯ পৃষ্ঠায় আতাউল্লার ষড়যন্ত্রের কথা লিখিত আছে বটে, কিন্তু সিরাজ উদ্দৌল্লার নাম গন্ধ পর্য্যন্ত নাই। বোধ হয় অক্ষয়বাবু কল্পনা নেত্রে সিরাজকে ক্রোধে উন্মত্ত হইতে দেখিয়াছেন।

পাটনায় গিয়া স্বহস্তে বিহার প্রদেশের শাসনদণ্ড গ্রহণ করিব। আপনার আর অগ্রসর হইবার প্রয়োজন নাই। আমাকে প্রতিনিবৃত্ত করিতে প্রয়াস পাইবেন না। যদি একথা না শুনেন, তবে নিশ্চিত জানিবেন, আমার মস্তক আপনার হস্তীর পদতলে লুণ্ঠিত না হইলে আমি স্বহস্তে আপনার শিরচ্ছেদন করিতে কুণ্ঠা বোধ করিব না। (১)"

আলিবর্দ্দী কি সত্যই সিরাজের প্রতি অবিচার করিয়া তাঁহাকে পৈত্রিক স্বত্ব হইতে বঞ্চিত রাখিয়াছিলেন? ফলে সিরাজের উক্তি কৃতঘ্নতার চরম দৃষ্টান্ত ভিন্ন আর কিছুই নহে। আলিবর্দ্দীর নিকট সিরাজ যেরূপ আদর যত্ন পাইয়াছেন, পৃথিবীতে আর কেহ কাহারও নিকট সেরূপ আদর যত্ন পাইয়াছে কিনা সন্দেহ। সিরাজ যখন যাহা চাহিয়াছেন, আলিবর্দ্দী মুক্তহস্তে অর্থব্যয় করিয়া তখনই তাহা দিয়াছেন। বিহারের শাসনকর্ত্তৃত্বে সিরাজের পিতাকে আলিবর্দ্দীই নিযুক্ত করিয়াছিলেন। অতএব এই পদে সিরাজের কিরূপে

---

(১) Sair, vol. II. pages 93 to 96.

অক্ষয়বাবু লিখিয়াছেন "সিরাজ পাটনা নগরে আসিয়া জানকীরাম কর্ত্তৃক প্রত্যাখ্যাত হইলে তাঁহার ক্রোধাগ্নি দ্বিগুণবেগে জ্বলিয়া উঠিল এবং তজ্জন্যই তিনি ঐরূপ রুক্ষভাষায় পত্রোত্তর প্রদান করিলেন। ফলে এবিষয়ে সিরাজের কোন অপরাধ নাই। জানকীরামের ন্যায় একজন ভৃত্যকর্ত্তৃক অপমানিত হইলে আলিবর্দ্দীও ধৈর্য্য রক্ষা করিতে পারিতেন কিনা সন্দেহ"—সিরাজউদ্দৌল্লা, ৪৭। ৪৮ পৃঃ

দুঃখের বিষয় অক্ষয়বাবু এস্থলে ইতিহাসের আশ্রয় গ্রহণ না করিয়া সিরাজের দোষক্ষালনের নিমিত্ত কল্পনার আশ্রয় লইয়াছেন। সায়র মোতাক্ষরীণ পাঠে অবগত হওয়া যায় যে, সিরাজ ভাগলপুর পর্য্যন্ত আসিয়াই মাতামহের পত্র পাইয়াছিলেন এবং সেই স্থলে থাকিয়াই পত্রোত্তর দিয়াছিলেন। বলাবাহুল্য, অতঃপর সিরাজ ভগবান্‌পুর ত্যাগ করিয়া পাটনায় অগ্রসর হন এবং তথায় জানকীরাম কর্ত্তৃক পরে প্রত্যাখ্যাত হন। (Sair, vol. II. pages 95 to 100)

আলিবৰ্দ্দী শিবিরে বসিয়া হোসেনকুলীখাঁপ্রমুখ অনুচরবর্গের সহিত খোসগল্প করিতেছিলেন, এমন সময় দূত আসিয়া সমস্ত বৃত্তান্ত আলিবৰ্দ্দীর নিকট নিবেদন করিল। দূতের কথা শুনিয়া বৃদ্ধের আর বাক্যস্ফূর্ত্তি হইল না; বিষাদে তাঁহার বদমমণ্ডল মলিন হইয়া গেল এবং অব্যক্ত মানসিক যাতনায় তিনি কেবল কম্পমান হইতে লাগিলেন। কিন্তু এখনও প্রিয়তম দৌহিত্রের অমঙ্গল আশঙ্কায়ই তাঁহার স্নেহপ্রবণ হৃদয় আলোড়িত হইতেছিল। তৎকালে বর্ষাসুলভ জলদজালে গগনমণ্ডল আচ্ছন্ন ছিল এবং সময় সময় মূষলধারায় বৃষ্টি নিপতিত হইয়া পথঘাট দুর্গম করিয়া তুলিয়াছিল। আলিবৰ্দ্দী এই সমস্ত বাধা বিঘ্ন তুচ্ছ করিলেন এবং স্নেহপূর্ণ লিপি সহ জনৈক দূতকে সিরাজের নিকট পাঠাইয়া দিয়া স্বয়ং শিবিকারোহণে দূতের পশ্চাদ্বর্ত্তী হইলেন। সিরাজ ভাগলপুর পর্য্যন্ত আসিলে দূত নিকটে আসিয়া তাঁহার নিকট নবাবের পত্র প্রদান করিল। অনুচিত আদরে সিরাজের মস্তিষ্ক বিকৃত হইয়া গিয়াছিল, সুতরাং তিনি দূত মুখে বৃদ্ধ মাতামহকে বলিয়া পাঠাইলেন:—

"আপনি ন্যায়ের মর্য্যাদা লঙ্ঘন করিয়া আমাকে পৈত্রিক স্বত্ব হইতে বঞ্চিত রাখিয়াছেন এবং মুখে স্নেহের ভাণ করিয়া আমার উন্নতির পথ কণ্টকাকীর্ণ করিতেছেন। আপনারই অনুগ্রহে নিবাইস মহম্মদ ও সৈয়দ আহাম্মদ বিপুল সম্পদের অধিকারী হইয়াছেন; কিন্তু আমার ভাগ্যে কেবল স্তোভ বাক্য ভিন্ন আর কিছুই লাভ হয় নাই। আমি আর কখনও আপনার কথা প্রতিপালন করিব না। এখন আমি

পূর্ব্বে প্রদর্শিত হইয়াছে যে সিরাজ ১৭২৯ কিংবা ১৭৩২ খৃষ্টাব্দের পূর্ব্বে জন্মগ্রহণ করিয়াছেন। সুতরাং এখন তাঁহার বয়ক্রম একবিংশ কিংবা ত্রয়োবিংশের কম হইতে পারে না।

উদ্যোগ করিতেছিলেন। কিন্তু কি উদ্দেশ্যে সিরাজের শুভাগমন হইয়াছে তাহা পূর্ব্বাহ্নে অবগত হওয়া সঙ্গত মনে করিয়া জানকীরাম প্রত্যুদ্গমনের পূর্ব্বেই সিরাজের নিকট একজন দূত প্রেরণ করিলেন। স্বীয় উদ্দেশ্য গোপন রাখিতে পারিলে সিরাজ বিনা রক্তপাতেই পাটনায় প্রবেশ করিতে পারিতেন। কিন্তু তাঁহার তরল মস্তিষ্কে সেরূপ কোন কৌশলের ভাব মোটেই উদিত হইল না। তিনি দূতের নিকট অকপটচিত্তে সমস্ত অভিপ্রায় প্রকাশ করিয়া ফেলিলেন। সিরাজের উদ্দেশ্য বুঝিতে পারিয়া জানকীরাম আর সিরাজকে প্রত্যুদ্গমন করিলেন না এবং অনেক ইতস্ততঃ করিয়া নগরের দ্বার রোধ পূর্ব্বক তথায় সেনাসমাবেশ করিলেন। এদিকে সিরাজ জাফর খাঁর উদ্যান হইতে নগর দ্বারে উপস্থিত হইয়া বলিলেন অবিলম্বে দ্বার উন্মোচন কর, আমি নগরে প্রবেশ পূর্ব্বক জানকী রামের কর্ণমর্দ্দন করিয়া তাহাকে উপযুক্ত শিক্ষা দিব।" এখন যে কেহই অগ্রসর হইয়া তাঁহার আদেশ প্রতিপালন করিবে না এ কথা সিরাজের স্থূল বুদ্ধিতে মোটেই উদিত হইল না। এই সময় মেহাদি নেগার তথায় আসিয়া সিরাজকে বলিলেন, কয়েকদিন অপেক্ষা করিলে আমাদের উপযুক্ত পরিমাণ সেনাসংগ্রহ হইবে এবং তখন সংগৃহীত সেনা লইয়া আমরা সহজেই দ্বারভগ্নপূর্ব্বক নগরে প্রবেশ করিতে পারিব।" সিরাজ এই কথায় সন্তুষ্ট না হইয়া ক্রোধভরে উত্তর করিলেন, "তোমারই কথায় আস্থা স্থাপন করিয়া আমি সাম্রাজ্য ও রাজভোগপরিত্যাগপূর্ব্বক এতদূর অগ্রসর হইয়াছি। অতএব সংগ্রামে লিপ্ত হইতে অনুমাত্রও বিলম্ব করা তোমার পক্ষে উচিত নহে।"(১) মেহেদি নেগার রুষ্ট হইয়া প্রত্যুত্তর

(১) এস্থলে সিরাজ স্বীয় উক্তিদ্বারাই প্রমাণ করিতেছেন যে, ইতিপূর্ব্বে তিনি আলিবর্দ্দীর প্রতি যে সমস্ত দোষারোপ করিয়াছিলেন তাহা সমস্তই ভিত্তিশূন্য।

পৈত্রিক স্বত্ব উদ্ভূত হইতে পারে তাহা সিরাজ ভিন্ন আর কেহ বুঝিবে না। কিন্তু বিধাতার ন্যায় বিধান অলঙ্ঘনীয়! আলিবর্দ্দীর পিতা একদিন হা অন্ন! হা অন্ন! করিয়া ইতস্ততঃ বেড়াইতেছিল এবং মহানুভব সুজা খাঁ তাহাকে সপরিবারে আশ্রয় দিয়া সৌভাগ্যের সোপানে আরোহণ করাইয়া দিয়াছিলেন। সেই অন্নদাতার পুত্র সরফরাজের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করিয়া এবং অন্যায় যুদ্ধে তাহাকে নিহত করিয়া আলিবর্দ্দী কৃতঘ্নতার চরম দৃষ্টান্ত প্রদর্শন করিয়াছিলেন। ভগবান্ এখন আলিবর্দ্দীর অনুগৃহীত লোক দ্বারা তৎপ্রতি কৃতঘ্নতা প্রদর্শন করাইয়া তাঁহাকে সমুচিত শিক্ষা প্রদান করিলেন। আফগান সেনানায়ক বীরবর মুস্তাফাকে তিনি কতই না অনুগ্রহ করিতেন? কিন্তু মুস্তাফা খাঁ বীরোচিত ধর্ম্মে বিসর্জ্জন দিয়া অনুগ্রহের প্রতিদান কল্পে বিদ্রোহী হইয়া দাঁড়াইয়াছিল, সিরাজের পিতা জয়নদ্দিন আহাম্মদকে আলিবর্দ্দী বিহারের শাসন কর্ত্তৃত্বরূপ রাজকীয় সর্ব্বশ্রেষ্ঠ পদে নিযুক্ত করিয়াছিলেন, কিন্তু ইহাতে জয়নদ্দিনের উচ্চাকাঙ্ক্ষা পরিতৃপ্ত হয় নাই। তিনি আলিবর্দ্দীকে সিংহাসনচ্যুত করিবার অভিপ্রায়ে আফগানদিগের সহিত সন্ধি করিতে যাইয়া পাপের প্রায়শ্চিত্ত স্বরূপ তাহাদেরই হস্তে নিহত হইয়াছিলেন। ফলে ন্যায়পরায়ণ বিধাতার রাজ্যে কেহই অন্যায় কাজ করিয়া সহজে অব্যাহতি লাভ করিতে পারে না এবং এজন্যই আলিবর্দ্দী নিতান্ত অনুগৃহীত লোক হইতে পদে পদে কৃতঘ্নতাই উপভোগ করিতেছিলেন।

সিরাজ ভাগলপুর হইতে ক্রমে পাটনা অভিমুখে অগ্রসর হইতে লাগিলেন এবং অবশেষে জাফর খাঁর উদ্যানে আসিয়া সমুপস্থিত হইলেন। জানকীরাম এপর্য্যন্ত সিরাজের অভিপ্রায় বুঝিতে পারেন নাই; সুতরাং তিনি তাঁহাকে অভ্যর্থনা করিবার অভিপ্রায়ে প্রত্যুদ্গমন করিবার

সুতরাং বৃদ্ধের আর আনন্দের পরিসীমা রহিল না। তিনি এখন নিশ্চিন্ত হইয়া স্নেহপূর্ণ পত্র সহ সৈয়দ আছাতুল্লাকে সিরাজের নিকট পাঠাইয়া দিলেন। সৈয়দ নন্দন অনেক প্রকার প্রবোধ দিলে সিরাজ অগত্যা আলিবর্দ্দীর সহিত দেখা করিতে সম্মত হইলেন। সিরাজ আসিতেছেন শুনিয়া বৃদ্ধ আনন্দে উন্মত্ত হইয়া উঠিলেন এবং বালকের ন্যায় নৃত্য

কবিবর নবীনচন্দ্র সেন কাব্য লিখিতে গিয়া সিরাজের চরিত্র বিকৃত করিয়াছেন বলিয়া অক্ষয় বাবু আক্ষেপ করিয়াছেন। কিন্তু ইতিহাস লিখিতে গিয়া নবীন বাবুকে পর্য্যন্ত তিনি কল্পনায় পরাজিত করিয়াছেন। সিরাজ যে পাটনা অভিযানের সময় অসিহস্তে মাতামহপার্শ্বে দাঁড়াইয়াছিলেন, অথবা কোন সম্মুখযুদ্ধে ক্ষিপ্রহস্তে অসি চালাইয়াছিলেন তাহা সায়রমোতাক্ষরীণ প্রমুখ কোন ইতিহাসে লিখিত নাই। অক্ষয় বাবু সায়র মোতাক্ষরীণের ১ম খণ্ডের ৪১৬ পৃষ্ঠায় এই উক্তির সমর্থনে প্রমাণ আছে বলিয়াছেন। আমাদের দুর্ভাগ্যবশতঃ সায়র মোতাক্ষরীণের সেই পৃষ্ঠায় কিংবা যে স্থলে পাটনা অভিযানের বৃত্তান্ত বর্ণিত হইয়াছে, তথায় সিরাজউদ্দৌল্লার নাম গন্ধ পর্য্যন্ত পাওয়া গেল না। সায়র মোতাক্ষরীণের নানাস্থানে বরং সিরাজকে কাপুরুষ বলিয়াই বর্ণন করা হইয়াছে। বড়বাটীর দুর্গ বিজয়ের বর্ণনায় কোন মুসলমান লেখক যে সিরাজের বীরত্বের প্রশংসা করিয়াছেন, তাহা বোধ হয় অক্ষয় বাবু ভিন্ন আর কেহ অবগত নহেন। তবে সিরাজ যে অনেক অভিযানে মাতামহের সঙ্গে সঙ্গে ছিলেন একথা সত্য। তৎকালে প্রত্যেক সেনানায়কই পরিবারবর্গ সঙ্গে লইয়া শত্রুর বিরুদ্ধে অভিযান করিতেন। আকবর, আরঙ্গজেবপ্রমুখ মোগল বাদসাহগণ যখনই কোন যুদ্ধসজ্জা করিয়া রাজধানী হইতে বহির্গত হইতেন, তখনই স্বতন্ত্র পটমণ্ডপে বেগমগণ তাঁহাদের অনুগমন করিতেন। আলিবর্দ্দীর সহধর্ম্মিণী প্রায় সকল যুদ্ধেই স্বামীর অনুগমন করিয়াছেন। যুদ্ধযাত্রায় অনুগমন করিলেই যদি সিরাজ বীরপুরুষ বলিয়া পরিগণিত হইতে পারেন, তবে মোগল বাদসাহের বেগমগণ এবং আলিবর্দ্দীর সহধর্ম্মিণীকেও সেই গৌরবসূচক উপাধিতে ভূষিত করিতে বোধ হয় অক্ষয় বাবুর আপত্তি হইবে না।

করিলেন, "তুমি দুর্ব্বুদ্ধিবশে দূতের নিকট প্রকৃত উদ্দেশ্য ব্যক্ত না করিলে জানকীরাম কথনই নগরদ্বার রুদ্ধ করিত না এবং তুমিও অনায়াসে নগরে প্রবেশ করিয়া স্বহস্তে শাসনদণ্ড গ্রহণ করিতে পারিতে।" তৎকালে মাত্র ৬০ জন সেনা মেহাদি নেগারের অধীন ছিল। তিনি এই অল্পসংখ্যক সেনা লইয়াই অগত্যা সংগ্রামে লিপ্ত হইলেন। জানকীরামের বিপুল সেনাবল ছিল। সুতরাং মেহাদিনেগার কিয়ৎক্ষণ যুদ্ধ করিয়াই সসৈন্যে তাহাদের হস্তে নিহত হইলেন। সিরাজ এখন উপায়ান্তর না দেখিয়া কাপুরুষের ন্যায় পলায়নপূর্ব্বক মস্তাফা কুলী-খাঁর আবাসস্থলে আশ্রয় গ্রহণ করিলেন। (১)।

তৎকালে আলিবর্দ্দী বার নামক স্থানে উপস্থিত হইয়াছিলেন এস্থলে তিনি শুনিতে পাইলেন যে সিরাজ অক্ষত শরীরে জীবিত আছেন ;

(১) Sair, vol. II. page 104.

অক্ষয় বাবু লিখিয়াছেন, 'সিরাজ পিতার নিধন বৃত্তান্ত শুনিয়া অসিহস্তে মাতামহ-পার্শ্বে দাঁড়াইলেন। সিরাজ বালক হইলেও বীর বালক, নবাব তাঁহাকে লইয়াই যুদ্ধযাত্রা করিলেন। ইংরেজ ইতিহাসে সিরাজউদ্দৌলা কেবল ইন্দ্রিয়পরায়ণ ও অকর্ম্মণ্য জঘন্য রুচির চঞ্চল যুবক বলিয়াই পরিচিত। কিন্তু সিরাজউদ্দৌলা স্বয়ং অসিহস্তে যতবার সম্মুখযুদ্ধে অগ্রসর হইয়াছেন, বিপদের সংবাদ পাইয়া যতবার ক্ষিপ্রহস্তে অসিচালনা করিয়াছেন, আলিবর্দ্দী ভিন্ন আর কোন নবাবই সেরূপ দৃষ্টান্ত দেখাইতে পারে নাই। তিনি আশৈশব মাতামহের কণ্ঠহার হইয়া প্রায় প্রত্যেক যুদ্ধেই শিবিরে পরিভ্রমণ করিতেন। বর্দ্ধমানের নিকট মহারাষ্ট্র সেনা যে সময় আলিবর্দ্দীর গতি রোধ করে, তখন সিরাজ নিতান্ত বালক। তৎকালে আজ্ঞাবহ হইয়া এবং কখনও বা রাজাজ্ঞায় স্বয়ং সেনা চালনার ভার গ্রহণ করিয়া এই বীর বালক যে সকল সমর কৌশলের পরিচয় প্রদান করেন, বড়বাটীর দুর্গজয় কাহিনী বর্ণনা করিবার সময় মুসলমান ইতিহাস লেখক তাহার সমুচিত প্রশংসা করিয়া গিয়াছেন।"—সিরাজউদ্দৌলা ৩৯, ৪০ পৃঃ

অধিকাংশ সময় কেবল রণক্ষেত্রে যাপন করিয়া আলিবর্দ্দী অতিশয় ক্লান্ত হইয়া পড়িয়াছিলেন। এক্ষণে জীবনের প্রদোষ সময় নিকটবর্ত্তী জানিয়া তিনি শান্তিলাভের আশায় ব্যাকুল হইয়া উঠিলেন। কিন্তু দুর্দ্দান্ত মহারাষ্ট্রীয়েরা সহজে তাঁহাকে শান্তিসুখ উপভোগের অবসর প্রদান করিতে প্রস্তুত ছিল না। অগত্যা তিনি উড়িষ্যার দাবি পরিত্যাগ করিয়া মহারাষ্ট্রীয়দিগের সহিত সন্ধিস্থাপন করিলেন। পাটনা সংক্রান্ত ঘটনায় আলিবর্দ্দী বুঝিতে পারিলেন, সিরাজের উচ্ছৃঙ্খলতা নিবারণ করিতে হইলে তাঁহাকে কিয়ৎপরিমাণ শাসনক্ষমতা প্রদান করা আবশ্যক। সুতরাং ১৭৫২ খৃষ্টাব্দে তিনি সিরাজের হস্তে শাসনসংক্রান্ত কতিপয় কার্য্যভার অর্পণ করিয়া স্বীয় দায়িত্বের মাত্রা লঘু করিলেন। (১)

প্রয়োগে বিহারের শাসনদণ্ড গ্রহণ করিতে উদ্যত হইয়াছেন। এস্থলে জানকী রাম যদি সিরাজের গতি রোধ না করিতেন, তবে কি তাঁহার কর্ত্তব্য সম্পাদন করা হইত? প্রভুভক্ত এবং বিশ্বস্ত কর্ম্মচারীর যাহা কর্ত্তব্য জানকীরাম তাহাই করিয়াছেন। আলিবর্দ্দী যে জানকীরামকে সিরাজের নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করিবার নিমিত্ত পাঠাইয়াছিলেন তাহা জানকীরামকে দোষী সাব্যস্ত করিয়া নহে; সিরাজের মনে জানকীরামসম্বন্ধে কোনরূপ বিরুদ্ধভাব না থাকে, এই অভিপ্রায়েই তিনি জানকী রামকে ক্ষমা চাহিতে বলিয়াছিলেন।

(১) Long's Records, page 33.

অক্ষয় বাবু এই ঘটনাকে "যৌবরাজ্যে অভিষেক" বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। ইংরেজ ইতিহাসে ইহা "উত্তরাধিকারিমনোনয়ন" বলিয়া বর্ণিত হইয়াছে। স্বয়ং আলিবর্দ্দী দিল্লীশ্বরের মনোনীত কর্ম্মচারী ছিলেন, এ অবস্থায় তাঁহার পক্ষে দিল্লীশ্বরের অনুমতি ব্যতীত উত্তরাধিকারিমনোনয়ন কিরূপে সিদ্ধ হইতে পারে?

করিতে লাগিলেন। অবশেষে সিরাজ আসিয়া তাঁহার পদতলে পতিত হইলেই আলিবর্দ্দী দুই বাহু প্রসারণ করিয়া সিরাজকে বক্ষে টানিয়া লইলেন। এখন উভয়ে স্বচ্ছন্দমনে বিহারের রাজভবনে প্রবেশ করিলেন। জানকীরাম কোন অপরাধ না করিলেও পূর্ব্বোক্ত ঘটনায় সিরাজ তৎপ্রতি অত্যন্ত রুষ্ট হইয়াছিলেন, আলিবর্দ্দী সিরাজের মনোরঞ্জনার্থ জানকীরামকে সিরাজের নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করিতে বলিলেন। জানকীরাম প্রভুর আদেশ শিরোধার্য্য করিয়া ক্ষমা চাহিলে সিরাজ তৎপ্রতি পুনরায় প্রসন্ন হইলেন (১)

---

(১) Sair Motakharin, vol. II. pages 100 to 107.

অক্ষয়বাবু এই উপলক্ষেও সিরাজের কলঙ্কক্ষালনের প্রয়াস পাইয়া লিখিয়াছেন, "সিরাজ যে আলিবর্দ্দীর সহিত কলহ করেন নাই, মোতাক্ষরীণই তাহার প্রমাণ। আলিবর্দ্দীয় আগমন সংবাদপ্রাপ্তি মাত্রই সিরাজ তাঁহার নিকট গিয়া রীতিমতে পদচুম্বন করিয়াছিলেন। রাজা জানকীরামের দোষেই যে এত অনর্থ ঘটিয়াছে, তাহা স্বীকার করিয়া স্বয়ং নবাব আলিবর্দ্দীও জানকীরামকে ক্ষমা করার জন্য সিরাজকে অনুরোধ করিয়াছিলেন"।—সিরাজউদ্দৌল্লা ৫০ পৃঃ

মোতাক্ষরীণে যাহা লিখিত আছে তাহা পূর্ব্বে উদ্ধৃত করা হইয়াছে। তদ্দৃষ্টে প্রতীয়মান হইবে, সিরাজ সহজে আসিয়া বৃদ্ধের পদচুম্বন করেন নাই। যুদ্ধে পরাভূত হইয়া তিনি আলিবর্দ্দীরই অনুগত লোকের আশ্রয়ে বাস করিতেছিলেন। আলিবর্দ্দী দূত পাঠাইয়া অনেক অনুনয় বিনয় করিলে পর সিরাজ অনুগ্রহপূর্ব্বক তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে সম্মত হইয়াছিলেন। এতদ্দ্বারা সিরাজের কলঙ্ক কিরূপে ক্ষালিত হইতে পারে তাহা বুঝা সুকঠিন। বরং এই ঘটনায় ইহাই প্রমাণ হয় যে, কৃতঘ্ন সিরাজকে অনুগ্রহ করিয়া আলিবর্দ্দীই ক্ষমাশীলতার পরিচয় দিয়াছেন।

পাটনা সংক্রান্ত ঘটনায় জানকীরামের কি অপরাধ হইতে পারে, তাহা অক্ষয়বাবু ভিন্ন আর কেহ বুঝিবেনা। সিরাজ আলিবর্দ্দীর অনুমতিলাভ না করিয়াই বল

করিলেন (১)। এখন হইতে নিবাইসের দৃষ্টি বাঙ্গালার সিংহাসনের দিকে আকৃষ্ট হইল, সিরাজের জন্মদাতা কৃতঘ্ন জয়নদ্দিন যে ভাবে আলিবর্দ্দীর সিংহাসন লাভের কল্পনা করিতেছিলেন তাহা পূর্ব্বেই উল্লেখ করা গিয়াছে। কিন্তু নিবাইস সে প্রকৃতির লোক ছিলেন না। তিনি মনে মনে স্থির করিলেন, যে পর্য্যন্ত আলিবর্দ্দী জীবিত রহিবেন তত দিন বাঙ্গালার শাসনদণ্ড তাঁহার হস্তেই ন্যস্ত থাকিবে; কিন্তু আলিবর্দ্দীর পরলোকগমনের পর তিনি রাজ্যভার গ্রহণ করিয়া স্বীয় অভিলাষ পূর্ণ করিবেন। ইতিমধ্যে আলিবর্দ্দী ও তাঁহার সহধর্ম্মিণী যে ভাবে সিরাজের প্রতি স্নেহমমতাপ্রদর্শন করিতেছিলেন, তাহাতে নিবাইসের মনে সন্দেহের ছায়া নিপতিত হইল। তিনি এখন স্পষ্টই বুঝিতে পারিলেন, প্রচুর পরিমাণে শক্তি সঞ্চয় না করিতে পারিলে তাঁহার পক্ষে বাঙ্গালার সিংহাসন লাভ করা দুঃসাধ্য হইয়া উঠিবে এবং আলিবর্দ্দীর সহায়তায় সিরাজ অনায়াসে তাঁহাকে বঞ্চিত করিয়া সমগ্র রাজসম্পদ্ অধিকার করিয়া বসিবেন।

এই সময় ঢাকার নায়েব নাজিম হোসেনকুলী খাঁ নিবাইসের পার্শ্বচররূপে মুরশিদাবাদে অবস্থান করিতেছিলেন। নিবাইস এখন হোসেনকুলীর নিকট স্বীয় মনোগতভাব ব্যক্ত করিলেন। হোসেনকুলী নিবাইসের সংকল্পসিদ্ধিবিষয়ে সহায়তা করিতে সম্মত হইলে, উভয়ে পবিত্র কোরাণ স্পর্শ করিয়া পরস্পরের জীবন ও সম্মানরক্ষার জন্য প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হইলেন (১)। কিয়ৎকাল পরে নিকাশপ্রদান উপলক্ষে রাজবল্লভ ঢাকা হইতে মুরশিদাবাদে আগমন করিলেন। অবিলম্বে রাজবল্লভের প্রতিভার কথা নবাবদরবারে পরিব্যাপ্ত হইয়া পড়িল।

(১) Sair, vol. I. page 337.

(১) Sair, vol. II. page 124.

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

মতিঝিলের প্রমোদোদ্যানে

১৭৪৩ খৃষ্টাব্দে নিকাশ প্রদান করিতে আসিয়া রাজবল্লভ যে মুরশিদাবাদেই রহিয়া গিয়াছিলেন তাহা পূর্ব্বে উল্লেখ করা হইয়াছে। কিন্তু কি জন্য যে নিবাইস তাঁহাকে সহকারী দেওয়ানের পদ প্রদানে মুরশিদাবাদে রাখিয়া দিয়াছিলেন তাহার কারণ তৎকালে উল্লিখিত করা হয় নাই।

আলিবর্দ্দীর শাসনকালে নিবাইস মহম্মদ সর্ব্ব প্রধান রাজপদে প্রতিষ্ঠিত ছিলেন। যখনই কোন শত্রুর বিরুদ্ধে অভিযান উপলক্ষে আলিবর্দ্দী মুরশিদাবাদ পরিত্যাগ করিতেন, তখনই তিনি নিবাইসকে প্রতিনিধি পদে নিযুক্ত করিয়া তৎপ্রতি নগর রক্ষার ভার দিয়া যাইতেন। আলিবর্দ্দীর জ্যেষ্ঠা তনয়া ঘেসেটী বিবী নিবাইসের সহধর্ম্মিণী ছিলেন। সুতরাং নিবাইস মনে করিতেছিলেন, শ্বশুরের যে কিছু পার্থিব সম্পদ্ আছে তাহা জ্যেষ্ঠানুক্রমে একমাত্র তাঁহার স্ত্রীরই প্রাপ্য। যে সময় আলিবর্দ্দী সিরাজকে পোষ্যপুত্ররূপে গ্রহণ করিয়াছিলেন তৎকালে তিনি সামান্য রাজকর্ম্মচারী মাত্র ছিলেন। অবশেষে গিরিয়ার প্রান্তরে সরফরাজের সহিত বলপরীক্ষায় বাঙ্গালার রাজলক্ষ্মী আলিবর্দ্দীর অঙ্কশায়িনী হইলেন এবং সেই যুদ্ধে নিবাইস সমরক্ষেত্রে আলিবর্দ্দীর পার্শ্বে দণ্ডায়মান থাকিয়া তাঁহার বিশেষ সহায়তাও

বর্দ্ধীর পরলোক গমনের পর সিংহাসন লইয়া বিরোধ উপস্থিত হইলে প্রথম মুরশিদাবাদ নগরেই শক্তির পরীক্ষা হওয়ার সম্ভাবনা, সেই পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইতে না পারিলে একমাত্র পূর্ব্ববাঙ্গালার সেনার সহায়তায় নিবাইস কখনও বাঙ্গালার সিংহাসন লাভ করিতে পারিবেন না। আলিবর্দ্দী তৎকালে প্রকৃতি পুঞ্জের অতি প্রিয়পাত্র ছিলেন এবং রাজ্যের প্রায় সমস্ত প্রধান ব্যক্তিই তাঁহার একান্ত অনুরক্ত হইয়া উঠিয়াছিল। সুতরাং রাজবল্লভ ও হোসেনকুলী নিবাইসের সহিত পরামর্শ করিয়া স্থির করিলেন, যাহাতে নাগরিকগণ এই নিবাইসের সহিত প্রীতির আকর্ষণে নিবদ্ধ হয় এবং রাজধানীর সন্নিকটে তাঁহারও সেনাবল সঞ্চিত থাকে তাহার উপায় উদ্ভাবন করা একান্ত আবশ্যক।

নিবাইস স্বভাবতই দয়াদাক্ষিণ্য প্রভৃতি বহুসংখ্যক সদ্‌গুণের আধার ছিলেন। অধীন কর্ম্মচারিগণকে তিনি অকপট বন্ধু বলিয়া মনে করিতেন। দীন দরিদ্রের কাতর প্রার্থনায় নিবাইসের স্নেহপ্রবণ হৃদয় সহজেই দ্রবীভূত হইয়া যাইত। গিরিয়ার যুদ্ধাবসানে সরফরাজ জননী জিন্নতন্নেছা নিবাইসের রক্ষণে অর্পিতা হইলে, তিনি সেই মহিলাকে অতিশয় সম্মানের সহিত নিজগৃহে রাখিয়াছিলেন। নিবাইস তাঁহাকে জননী বলিয়া সম্বোধন করিতেন। নিবাইসের সংসারের সমস্ত কর্ত্তৃত্ব এই মহিলার প্রতিই ন্যস্ত ছিল এবং এমন কি স্বয়ং ঘেসেটি বিবিকে পর্য্যন্ত তাঁহার আদেশ অপেক্ষা করিয়া চলিতে হইত। জিন্নতন্নেছা সমীপস্থ হইলেই নিবাইস সসম্ভ্রমে করযোড়ে দণ্ডায়মান হইতেন এবং অনুমতি লাভ না করা পর্য্যন্ত কখনও আসন পরিগ্রহ করিতেন না। (১)

(১) Sair, vol. I. page 356 and vol. II. page 128.

নিবাইস মনে করিলেন, প্রতিভার অবতার যুবক রাজবল্লভকে স্বপক্ষে আনয়ন করিতে পারিলে সংকল্পসিদ্ধিবিষয়ে তাঁহার নিকট হইতে অনেক সাহায্য পাইবেন। কিন্তু হঠাৎ রাজবল্লভের বিশ্বস্ততায় আস্থা স্থাপন না করিয়া পরীক্ষা করিবার উদ্দেশ্যে তিনি রাজবল্লভকে আপাততঃ মুরশিদাবাদে অবস্থান করিতে বলিলেন। এইরূপে কিয়ৎকাল অতীত হইলে নিবাইস বুঝিতে পারিলেন, রাজবল্লভের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করিলে কোনরূপ অনিষ্ট হইবার আশঙ্কা নাই। তখন তিনি রাজবল্লভকে সহকারী দেওয়ানের পদ দেওয়াইয়া মুরশিদাবাদেই রাখিয়া দিলেন। এখন হইতে রাজবল্লভ, হোসেনকুলী ও নিবাইস একযোগ হইয়া যাহাতে নিবাইসের সংকল্প কার্য্যে পরিণত হইতে পারে, তদ্বিষয়ের আয়োজন উদ্যোগ করিতে লাগিলেন।

পূর্ব্বে বলা হইয়াছে হাসনউদ্দিন হোসেনকুলীর এবং রামদাস রাজবল্লভের প্রতিনিধিস্বরূপ ঢাকায় অবস্থান করিতেছিলেন। ঢাকা বিভাগে যে সমস্ত সেনা ছিল, তাহারা সমস্তই স্থানীয় নাজিম ও দেওয়ানের অধীন হইয়া কার্য্য করিত। হোসেনকুলী ও রাজবল্লভ এখন স্ব স্ব প্রতিনিধির সহায়তায় সেই সমস্ত সেনাগণকে হস্তগত করিলেন এবং নূতন নূতন সেনা সংগ্রহ করিয়া প্রভূত শক্তি সঞ্চয় করিতেও ত্রুটি করিলেন না। এই সমস্ত চেষ্টার ফলে সমগ্র পূর্ব্ববাঙ্গলায় নিবাইসের প্রভুত্ব অক্ষুণ্ণ হইয়া দাঁড়াইল (১)।

এই সময় আর একটি সমস্যা উপস্থিত হইল। বাঙ্গলার রাজধানী মুরশিদাবাদ নগরের সমস্ত সেনাই আলিবর্দ্দীর করায়ত্ত ছিল। আলি-

(১) অর্ম্ম সাহেব বলেন, "নিবাইস কতিপয় বৎসর পর্য্যন্ত ঢাকার শাসন-কর্ত্তৃত্বে নিযুক্ত থাকিয়া প্রচুর অর্থ সঞ্চয় করিয়াছিলেন এবং তদনুবলে তিনি বহুসংখ্যক সেনাও সংগ্রহ করিয়া রাখিয়াছিলেন। * * আলিবর্দ্দী এখন আশঙ্কা করিলেন যে সন্দেহের কারণ উপস্থিত হইলেই নিবাইস ঢাকায় গিয়া স্বাধীন হইয়া বসিবেন।

Orme's Indoostan, vol. II. page 48.

সুতরাং উপযুক্ত সংখ্যক সুসজ্জিত সেনা রাখিবার উদ্দেশ্যে তাঁহারা সমীপবর্ত্তী কোনও এক সুবিধাজনক স্থানের অন্বেষণে ব্যস্ত হইলেন নিবাইসের কবিজন সুলভ কোমল হৃদয় মুরশিদাবাদের অনৈসর্গিক শোভায় অনুমাত্রও তৃপ্তিলাভ করিতে সমর্থ হইতনা। প্রকৃতি দেবীর স্বভাবসিদ্ধ সৌন্দর্য্য-সুধা পান করিবার নিমিত্ত তাঁহার উদ্দাম মনোমধুপ নিয়তই আকুল হইয়া উঠিত। এই সময় একদিন মতিঝিল নামক সরোবর নিবাইসের নয়নপথে পতিত হইলে তিনি তৎপ্রতি নিরতিশয় আকৃষ্ট হইয়া পড়িলেন। মতিঝিল মুরশিদাবাদ হইতে দুইমাইল দক্ষিণে অবস্থিত আছে। একদা ভাগীরথীর খরস্রোত সেই স্থান দিয়া প্রবহমাণ হইলেও কালক্রমে সেই স্রোতঃপ্রবাহ রুদ্ধ হইয়া অশ্বপাদুকাকৃতি হ্রদের আকার ধারণ করিয়াছিল। এই সরোবরে মুক্তা উৎপন্ন হইত বলিয়া উহা মতিঝিল নামে অভিহিত হইয়া থাকে। মতিঝিলের তীরস্থিত ঘনপত্রশ্যামল বিটপিশ্রেণী অবলোকন করিলে দর্শকের নয়ন যুগল চরিতার্থ হইয়া যাইত। তদভ্যন্তরস্থ বারিরাশির উপর দিয়া নানাবর্ণের সুন্দর সুন্দর জলচর পক্ষিগণ অকুতোভয়ে সন্তরণ করিত, বিচিত্র জলজ প্রসূনরাশি স্তবকে স্তবকে প্রস্ফুটিত হইয়া সরোবরের স্বচ্ছ সলিলে নিয়ত প্রতিবিম্বিত হইত, পিকবধূগণ তটস্থিত বৃক্ষের নিভৃত নিকুঞ্জমধ্যে লুক্কায়িত থাকিয়া সুমধুর কুহুতানে গান করিত। ফলতঃ প্রকৃতি দেবী মুরশিদাবাদের অনৈসর্গিকতায় রুষ্ট হইয়াই যেন শান্তিলাভের উদ্দেশ্যে জনমানবশূন্য মতিঝিলে আসিয়া আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছিলেন এবং বিবিধ প্রকার উদ্দাম লীলাভিনয় করিয়া মনের সাধ পূর্ণ করিতেছিলেন।

নিবাইস মনের অনুরূপ স্থান লাভ করিয়া মতিঝিলের পশ্চিম তটে একটি সুরম্য প্রাসাদ নির্ম্মাণ করিবার সংকল্প করিলেন। অন্যের

মুরশিদাবাদ-বাসিগণের প্রীতি আকর্ষণ করিবার উদ্দেশ্য নিবাইস এখন তাঁহার প্রাসাদদ্বার নগরবাসী দুঃস্থ আবালবৃদ্ধ বনিতার নিমিত্ত উন্মুক্ত করিয়া দিলেন। কাহারও বিপদের সংবাদ অবগত হইলে তিনি অযাচিত ভাবেই বিপন্নের সমীপস্থ হইয়া যথাসাধ্য সাহায্য দান করিতে লাগিলেন। অভাবগ্রস্ত লোকের সাহায্যকল্পে মাসিক ব্যয়ের পরিমাণ সপ্তত্রিংশৎ সহস্র টাকা নির্দ্ধারিত হইল। যে সমস্ত লোককে মাসিক সাহায্য দিতে হইবে, নিবাইস তাহাদিগের নাম ধাম লিখিয়া লইলেন এবং প্রতি মাসের প্রথম দিবসেই স্বহস্তে দাতব্য মুদ্রা বিভাগ করিয়া বিশ্বস্ত ভৃত্যদ্বারা প্রত্যেকের গৃহে পাঠাইয়া দিতে লাগিলেন। নিবাইসের উদারতা যে কেবলমাত্র পরিচিত ও আত্মীয়বর্গের মধ্যেই নিবদ্ধ রহিল এমন নহে। দুরবস্থাপন্ন ব্যক্তি অপরিচিত ও অনাত্মীয় হইলেও, নিবাইস তৎপ্রতি করুণাবারি সেচন করিতে কুণ্ঠিত হইলেন না (১)। এই সময় রাজবল্লভ পুত্র রামদাসের সহায়তায় ঢাকা বিভাগের দেওয়ানী পদোচিত কর্ত্তব্য সম্পাদন করিতেছিলেন। তিনি বিশ্বস্ততাসহকারে ঢাকাবিভাগের উদ্বৃত্ত রাজস্ব নিবাইসের করে অর্পণ করিয়া তাঁহার বাদন্যতার সহায়তা করিতে লাগিলেন (২)। ফলে নাগরিক গণের হৃদয় আকর্ষণ করিবার উদ্দেশ্য যে কৌশলজাল বিস্তৃত হইয়াছিল তাহা অচিরে সুফল প্রসব করিল এবং মুরশিদাবাদ বাসী আবাল বৃদ্ধ বনিতা এখন নিবাইসকে দেবতার ন্যায় ভক্তি শ্রদ্ধা করিতে লাগিল। মুরশিদাবাদ নগরের বক্ষে সৈন্যসমাবেশ করিলে যে সকলেরই মনে সন্দেহের উদ্রেক হইবে একথা নিবাইস ও তাঁহার পরামর্শদাতা রাজবল্লভ ও হোসেন কুলী বিলক্ষণ রূপে অবগত ছিলেন।

(১) Sair, vol. II. page 128.

(২) অক্ষয় বাবুর সিরাজউদ্দৌল্লা ৯১পৃঃ

এই ঘটনায় তীক্ষ্ণবুদ্ধিসম্পন্ন আলিবর্দ্দী পর্য্যন্ত কোনরূপ সন্দেহের কারণ দেখিতে না পাইয়া সময় সময় তথায় শুভাগমন করিতে লাগিলেন (১)। কেহ ঘুণাক্ষরেও প্রকৃত উদ্দেশ্য বুঝিতে না পারে, এই অভিপ্রায়ে নিবাইস মতিঝিলের প্রাসাদকে প্রথম প্রথম প্রমোদোদ্যানে পরিণত করিলেন। পুরুষত্ববর্জ্জিত হইলেও তিনি সুন্দরী ললনাগণে পরিবেষ্টিত থাকিতে ইচ্ছা করিতেন এবং তাঁহার মনোরঞ্জনের নিমিত্ত বহুসংখ্যক বেতনভোগী কাঞ্চনী নিযুক্ত ছিল। প্রাসাদ নির্ম্মিত হইয়া গেলে নিবাইস রাজকীয় কর্ত্তব্য শেষ করিয়া অবসর সময় কাঞ্চনী লইয়া তথায় গমনাগমন করিতে লাগিলেন।

এখন হইতে মতিঝিল অপ্সরারাজ্যে পরিণত হইল। নিবাইস এ স্থলে পদার্পণ করিলেই প্রাসাদের কক্ষসমূহ আলোক-মালায় উদ্ভাসিত হইত, কোন কক্ষ হইতে রমণীগণের কোমল কণ্ঠনিঃসৃত সঙ্গীতধ্বনি উত্থিত হইয়া নৈশ গগন প্লাবিত করিত, কোন কক্ষে রূপযৌবন-সম্পন্না নর্ত্তকীবৃন্দ অপূর্ব্ব বেশভূষা পরিধান করিয়া, তবলসারঙ্গপ্রভৃতি বাদ্যযন্ত্রের তালে তালে নৃত্য করিত, কোন কক্ষে প্রমত্ত অনুচরগণ অট্টহাস্য করিয়া নানা প্রকার বিশ্রম্ভালাপে নিযুক্ত হইত। প্রাসাদের বহির্ভাগে প্রকৃতিদেবী নিঃসঙ্কোচে বিবিধ প্রকার লীলাভিনয় করিতেন। তৎকালে অভ্যন্তরস্থ কাঞ্চনীগণের বিলোল কটাক্ষ, আবেশভাব এবং অঙ্গচালনার ফলে পরিদোলায়মান নূপুরকঙ্কণপ্রভৃতির সুমধুর নিক্কণ প্রকৃতি দেবীর উদ্দামলীলাভিনয়ের সমাবেশে এক অপূর্ব্ব শোভা বিন্যস্ত হইত। কিন্তু এই সমস্ত আমোদ প্রমোদ সত্ত্বেও, রাজবল্লভ এবং

---

(১) রাজস্বসচিব চাঁদরায় পরলোক গমন করিলে আলিবর্দ্দী তৎপদে বীরুদত্তকে নিযুক্ত করার সময় এই মতিঝিল প্রাসাদেই দরবার করিয়াছিলেন—Sair, vol. II. page 85.

অলক্ষিতভাবে সেই স্থানে বসিয়া সংকল্পসিদ্ধিবিষয়ে মন্ত্রণা চলিবে ভাবিয়া রাজবল্লভ ও হোসেন কুলী প্রভুর সংকল্পে সম্মত হইলেন। প্রথমেই প্রাসাদনির্ম্মাণ আরম্ভ করিলে আলিবর্দ্দী সন্দেহ করিয়া নানা প্রকার বাধা বিঘ্ন জন্মাইতে পারেন এই আশঙ্কা করিয়া রাজবল্লভ ও হোসেনকুলী নিবাইসকে প্রথমে প্রাসাদ নির্ম্মাণ করিতে নিষেধ করিয়া নবাবদরবার হইতে একটি অতিথিশালা, একটি মসজিদ ও একটি মাদ্রাসা নির্ম্মাণ করিবার অনুমতি গ্রহণ করিবার নিমিত্ত বলিলেন। তদনুসারে ১৭৪৩ খৃষ্টাব্দে নবাবের অনুমতিক্রমে নিবাইস সরোবরের পশ্চিম তটে একটি মসজিদ, একটি অতিথিশালা ও একটি মাদ্রাসা নির্ম্মাণ করাইলেন। ক্রমে সেস্থলে প্রাসাদের ভিত্তিও প্রোথিত করা হইল। অদূরে হিন্দুরাজত্বের গৌরবসূচক গৌড় নগরে স্তূপীকৃত ভগ্নাবশেষ পড়িয়া রহিয়াছিল, নিবাইস তথাহইতে উপকরণ সংগ্রহ করিয়া প্রাসাদনির্ম্মাণকার্য্যে ব্রতী হইলেন। বহুসংখ্যক সুনিপুণ শিল্পী অনেক চেষ্টা ও পরিশ্রম করিয়া পূর্ব্বকথিত ভিত্তির উপর এক রমণীয় প্রাসাদ উত্তোলন করিল। প্রাসাদের, উত্তর পূর্ব্ব ও দক্ষিণ ভাগ অশ্বপাদুকাকৃতি হ্রদের সলিলরাশিদ্বারা স্বতই সুরক্ষিত ছিল; সুতরাং একমাত্র পশ্চিম দিক্ রক্ষা করিবার নিমিত্ত সেস্থলে এক সুদৃঢ় তোরণ দ্বার নির্ম্মিত হইল।

এই প্রাসাদনির্ম্মাণে যে রাজনৈতিক গূঢ় অভিপ্রায় নিহিত আছে তাহা নিবাইস ও তাঁহার দলভুক্ত বিশ্বস্ত লোক ভিন্ন অন্যকেহ জানিতে পারিল না। তৎকালে বর্গীর হাঙ্গামা উপলক্ষে রাজ্যের অধিকাংশ লোককেই আত্মরক্ষার উপায় উদ্ভাবন করিতে হইত; সুতরাং নিবাইস যে সুদৃঢ় তোরণ দ্বার উত্তোলন করিয়া মতিঝিলের প্রাসাদ সুরক্ষিত করিলেন ইহাতে কাহারও সন্দেহের উদ্রেক হইল না। এমন কি

রাজপ্রাসাদ ও বাঙ্গালার সিংহাসন অধিকার করিতে অণুমাত্রও বিলম্ব করিবেন না।

তৎকালে সিরাজ যে ভাবে জীবন যাপন করিতেছিলেন, তাহা মোতাক্ষরীণে নিম্নলিখিতরূপে বর্ণিত হইয়াছে ঃ—

"আলিবর্দ্দীর তনয়াগণ এবং প্রিয়তম দৌহিত্র সিরাজউদ্দৌল্লা ঘোরতর পাপানুষ্ঠানে নিরত ছিলেন। নিতান্ত সামান্য লোকেও যে সমস্ত দুষ্কার্য্য করিতে ঘৃণা বোধ করে, তাঁহারা সেই সমস্ত কার্য্য করিতে অণুমাত্রও কুণ্ঠা বোধ করিতেন না। নবাবের নন্দদুলাল সিরাজউদ্দৌল্লা এই সময় রাজপথে ধাবমান হইয়া নানারূপ অশ্লীল প্রসঙ্গের অবতারণা করিতেন এবং এরূপ রহস্যপূর্ণ কার্য্যে ব্রতী হইতেন যে, লোকে তাহা দেখিয়া বিস্মিত হইয়া যাইত। আলিবর্দ্দীর সন্তানসন্ততিগণকে লইয়া সিরাজ প্রত্যেক প্রশস্ত ও অপ্রশস্ত পথেই ঘুরিয়া বেড়াইতেন এবং বিবিধ প্রকার ঘৃণাজনক অনুষ্ঠানে লিপ্ত হইয়া লোকের বিরক্তি উৎপাদন করিতেন। এই সময় তাঁহাদের হস্তে পদস্থ ও বয়স্ক ব্যক্তির এবং রমণীজাতির সম্ভ্রম পর্য্যন্ত রক্ষা পাওয়া দায় হইয়া উঠিত। আলিবর্দ্দী অতিকষ্টে ও পরিশ্রমে যে উচ্চ সম্পদ্ ও রাজ্যের প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন, সিরাজপ্রভৃতির পূর্ব্বোক্ত আচরণে তাহা ধ্বংসমুখে অগ্রসর হইতে লাগিল। আলিবর্দ্দী এই সমস্ত দেখিয়াও কোনরূপ শাসন করা আবশ্যক মনে করিলেন না। সুতরাং সিরাজ ক্রমেই গুরুতর পাপানুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হইলেন এবং সকল প্রকার পাপানুষ্ঠান সিরাজের নিত্য কর্ম্মের মধ্যে পরিগণিত হইয়া উঠিল। তিনি কোনরূপ অনুশোচনা না করিয়া নির্ভয়ে পাপস্রোতে গা ঢালিয়া দিলেন। কোন পুরুষ কি রমণী দেখিয়া চিত্ত আকৃষ্ট হইলেই সিরাজ তাহাদিগকে দিয়া বলপূর্ব্বক ইন্দ্রিয়লালসা পরিতৃপ্ত করিবার প্রয়াস পাইতে লাগিলেন।

হোসেনকুলী-প্রমুখ বিশ্বস্ত অমাত্যগণ প্রাসাদের নিভৃত কক্ষে বসিয়া অতি সংগোপনে নানাবিধ রাজনৈতিক সমস্যার মীমাংসা করিতেন।

১৭৫২ খৃষ্টাব্দে আলিবর্দ্দী সিরাজকে উত্তরাধিকারী বলিয়া ঘোষণা করিলে নিবাইসের পক্ষে মুরসিদাবাদে অবস্থান করা নিরাপদ বলিয়া বিবেচিত হইল না। তদনুসারে তিনি সেই সময় মুরসিদাবাদ ত্যাগ করিয়া স্বজনগণ সহ মতিঝিলের প্রাসাদে উঠিয়া আসিলেন এবং তথায় বসিয়া প্রকাশ্যে শক্তিসঞ্চয় করিতে লাগিলেন (১)।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

সিরাজকর্ত্তৃক নিবাইসের বলক্ষয়ের চেষ্টা

সুযোগ্য ও বিশ্বস্ত দেওয়ান রাজবল্লভের সুবন্দোবস্তে নিবাইস প্রচুর অর্থ সঞ্চয় করিয়াছিলেন। তিনি এখন সেই অর্থে বহুসংখ্যক সেনা সংগ্রহ করিতে সমর্থ হইলেন। বীরবর হোসেনকুলী এই সময় নিবাইসের সর্ব্বপ্রধান কর্ম্মচারী ছিলেন (২)। সংগৃহীত সমস্ত সেনাই সুদক্ষ হোসেনকুলীর তত্ত্বাবধানে উপযুক্ত রণকৌশল শিক্ষা করিয়া নিরতিশয় দুর্দ্ধর্ষ হইয়া উঠিল। এখন সকলেই মনে করিল আলিবর্দ্দীর জীবন-প্রদীপ নির্ব্বাপিত হইলেই নিবাইস তাঁহার সেনাদল লইয়া মুরসিদাবাদের

---

(1) Sair, vol. II. page 156.

(2) Orme's Indoostan, vol. II. page 48.

অধিকার করিবেন, ইহা তাঁহার অভিপ্রেত ছিল না। বাল্যকাল হইতেই তিনি সিরাজকে অতিযত্নে লালন পালন করিয়াছেন এবং সিরাজ তাঁহারই আদরে বৰ্দ্ধিত হইয়া এখন বয়ঃপ্রাপ্ত হইয়াছে। আলিবৰ্দ্দীর সহধৰ্ম্মিণীও সিরাজের প্রতি নিরতিশয় অনুরক্ত ছিলেন। স্বামীর লোকান্তরগমনের সঙ্গে সঙ্গে দৌহিত্র বাঙ্গালার সিংহাসনে অধিরূঢ় হয়, এই আকাঙ্খাই তিনি হৃদয়ের নিভৃত কক্ষে অতিসন্তর্পণে পোষণ করিতেছিলেন। আলিবৰ্দ্দী তাঁহার সহধৰ্ম্মিণীর প্রতি এতদূর শ্রদ্ধাবান্ ছিলেন যে, তাঁহার অনুরোধ রক্ষা করিতে গিয়া স্বীয় সংকল্প পরিবর্ত্তন করিতেও কুণ্ঠিত হইতেন না। জয়নদ্দিন আহাম্মদের হত্যার পর আফগান-গণ পরাভূত হইলে আলিবৰ্দ্দী দ্বিতীয় জামাতা সৈয়দ আহাম্মদকে বিহার প্রদেশের শাসন-কর্তৃত্বে নিযুক্ত করেন। কিন্তু এই সময় সহধৰ্ম্মিণীর অনু-রোধে সৈয়দ আহাম্মদের নিয়োগ রহিতপূৰ্ব্বক সিরাজকে সেই পদ প্রদান করিতে হয়। (১) আলিবৰ্দ্দী এখন সহধৰ্ম্মিণীর মনের দিকে চাহিয়া সিরাজের নিমিত্ত সিংহাসনের পথ উন্মুক্ত রাখিতে ব্যগ্র হইয়া উঠিলেন। সিরাজ যে সৰ্ব্বাংশে রাজপদোচিত কৰ্ত্তব্যসম্পাদনে অসমর্থ ছিলেন, সুতীক্ষ্ণবুদ্ধি আলিবৰ্দ্দী তাহা সম্পূর্ণরূপেই অবগত ছিলেন। সায়র মোতাক্ষরীণে লিখিত আছে ;—

"নিজাম উল্‌মুলুক লোকান্তর গমন করিলে তদীয় পুত্র নাছিরজঙ্গ পিতার সিংহাসনে অধিরোহণ করেন। কিন্তু তিনি ফরাসীদিগের বিরুদ্ধে অভিযান করিতে গিয়া পথিমধ্যেই স্বপক্ষীয় আফগান সেনা কর্তৃক নিহত হন। নাছিরজঙ্গের ভাগিনেয় মোজাফরজঙ্গ ফরাসী-দিগের সহিত ষড়্‌যন্ত্র করিয়া আফগানদিগকে সেই হত্যাকাৰ্য্যে

(1) Sair, vol. II. page 65—66.

কোনস্থলে বিফল মনোরথ হইলে তিনি সেই পুরুষ কি রমণীকে নানা রূপ লাঞ্ছনা দিতেও কুণ্ঠা বোধ করিতেন না। এই সময় এক দল নষ্ট চরিত্র লোক আসিয়া সিরাজের সহিত মিলিত হইল এবং তিনি তাহাদিগকে সঙ্গে লইয়া যথেচ্ছরূপে ইন্দ্রিয় লালসা চরিতার্থ করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। ক্রমে এমন অবস্থা আসিয়া দাঁড়াইল যে পাপানুষ্ঠান করিবার সুবিধা না পাইলেই তিনি বিষণ্ণ হইতে লাগিলেন। এখন আর তাঁহার পাপপুণ্যে প্রভেদ বোধ রহিল না। ইন্দ্রিয়বৃত্তি চরিতার্থ করিবার উদ্দেশ্যে ঘনিষ্ঠ সম্পর্কান্বিত এবং উচ্চপদস্থ পুরুষ ও রমণীর আলয়ে বল পূর্ব্বক প্রবেশ করিতে তিনি অণুমাত্রও দ্বিধা বোধ করিলেন না। মিশরবাসিগণ ফেরো (Pharao) নৃপতিগণকে যেরূপ ঘৃণার চক্ষে নিরীক্ষণ করিত, লোকে এখন সিরাজকে দেখিলেও তদ্রূপ শিহরিয়া উঠিতে লাগিল। কেহ দৈবাৎ সিরাজের নয়নপথে পতিত হইলেই "ভগবান্ আমাকে রক্ষা কর" বলিয়া ভয়ে প্রস্থান করিতে কালবিলম্ব করিল না। (১)

নিবাইস এক্ষণে রাজ্যের সমস্ত প্রধান প্রধান ব্যক্তিগণেরই চিত্তাকর্ষণ করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। একমাত্র নষ্ট-চরিত্র লোক ভিন্ন অন্য কেহই সিরাজের পক্ষাবলম্বী ছিল না। সুতরাং সিরাজ নিবাইসকে একজন প্রবল প্রতিদ্বন্দ্বী বলিয়া মনে করিতেছিলেন। (২)

আলিবর্দ্দী নিবাইসকে অতিশয় স্নেহ করিতেন সন্দেহ নাই। কিন্তু নিবাইস যে সিরাজের উচ্ছেদসাধন করিয়া বাঙ্গালার সিংহাসন

---

(১) Sair, vol. II. page 121—122.

(২) সায়র মোতাক্ষরীণে লিখিত আছে, হাজি আহাম্মদের দৌহিত্র হাসন রেজাখাঁ নিবাইসের প্রতি অনুরক্ত ছিলেন বলিয়া সিরাজের চক্ষুঃশূল হইয়াছিলেন— Sair, vol. II. page 183.

পারে, তবে তোমরা নিরাপদে অবস্থান করিবার ভরসা করিতে পার।” (১)

এই সমস্ত জানিয়া শুনিয়াও বৃদ্ধ নবাব কেন যে সহধর্ম্মিণীর কথায় সিরাজকে সিংহাসনে সুপ্রতিষ্ঠিত করিবার সংকল্প করিলেন, তাহার কারণও সায়র মোতাক্ষরীণে নিম্নলিখিতরূপে বর্ণিত আছে ঃ—

“বিধাতা এমনই বিধান করিয়াছিলেন যে, আলিবর্দ্দীর পরিবার-বর্গের উচ্চসম্পদ্ সমূলে বিনষ্ট হইবে, তাঁহার পরিবারস্থ অনুপযুক্ত লোকদিগের লাঞ্ছনার পরিসীমা থাকিবে না এবং ধনধান্যপূর্ণ বাঙ্গলা, বিহার ও ভারতবর্ষের অন্যান্য প্রদেশের অধিবাসিগণ শাসনকর্ত্তৃগণের দুর্ভাগ্যের ফলে অশেষ অত্যাচার সহ্য করিবে। দুঃখের বিষয় আলিবর্দ্দী জীবিত থাকিতেই বিধাতার প্রকোপ বর্ষিত হইতে আরম্ভ হইয়াছে। তাঁহার পরিবারস্থ যে সমস্ত লোক গুণগরিমায় রাজ্য ও ক্ষমতা অব্যাহত রাখিতে সমর্থ ছিলেন, তাঁহারা একে একে কালগ্রাসে পতিত হইয়াছেন। ইঁহাদের কোনও একজন জীবিত থাকিলেও তিনি শিষ্টের পালন ও দুষ্টের দমন করিয়া রাজ্যের শান্তিরক্ষা করিতে পারিতেন। নিবাইস মহম্মদ, সৈয়দ আহাম্মদ এবং জয়নদ্দিন আলিবর্দ্দীর ন্যায় বিচক্ষণ ছিলেন না সত্য ; কিন্তু ভগবান্ তাঁহাদিগকে যে সমস্ত গুণগরিমার অধিকারী করিয়াছিলেন, তাহাতে তাঁহাদের প্রত্যেকেই সুশৃঙ্খলার সহিত রাজ্য শাসন করিতে সমর্থ হইতেন সন্দেহ নাই। সিরাজ ও তদীয় ভ্রাতৃযুগল অপেক্ষা তাহাদের পিতা ও পিতৃব্যগণ যে সর্ব্বাংশে শ্রেষ্ঠ ছিলেন, তাহা নিঃসঙ্কোচে বলা যাইতে পারে। কিন্তু বিধাতার নির্ব্বন্ধ খণ্ডন করা কাহারও সাধ্যায়ত্ত নহে।” (২)

(1) Sair, vol. II. page 156.
(2) Sair, vol. II. page 146.

নিযুক্ত করিয়াছিলেন। অতঃপর মোজাফরজঙ্গ সিংহাসনে আরোহণ করিয়া কয়েকদিন মধ্যেই নিহত হইলে, সৈয়দমহম্মদ খাঁ পূর্ব্বোক্ত ফরাসি দিগেরই সহায়তায় সিংহাসন লাভ করেন। এই উপলক্ষে ফরাসী গবর্ণর বুসি সাহেবের প্রতিপত্তি অনেক পরিমাণে বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়। আলিবর্দ্দী প্রায়ই নাছিরজঙ্গের অবস্থার সহিত সিরাজের অবস্থার তুলনা করিয়া প্রকাশ্য সভায় বলিতেন, "সিরাজউদ্দৌল্লা বাঙ্গলার সিংহাসনে আরোহণ করিলেই পাশ্চাত্যেরা সমগ্র ভারতবর্ষ গ্রাস করিয়া বসিবে।" নবাব যে বিনা কারণে এইরূপ মন্তব্য প্রকাশ করিতেন এমন নহে। তিনি বিলক্ষণরূপে অবগত ছিলেন, ভগবান্ সিরাজকে মোটেই হিতাহিত বিচারশক্তি প্রদান করেন নাই। রাজ্যের সৈনিক বিভাগের কর্ম্মচারিগণ যে সিরাজের প্রতি বিরূপ ছিল এবং সিরাজ যে বিনা কারণে ইংরেজ দিগের সহিত কলহ অন্বেষণ করিতেন তাহাও আলিবর্দ্দীর অবিদিত ছিল না। তিনি স্পষ্টই বুঝিয়াছিলেন, সিরাজ সিংহাসনে আরোহণ করিলেই রাজ্যে অত্যাচারের পরাকাষ্ঠা হইবে।" (১) সায়র মোতাক্ষরীণের অন্যত্র লিখিত আছে ;—

"আলিবর্দ্দীর জীবনপ্রদীপ নির্ব্বাণোন্মুখ হইলে, নগরের কতিপয় প্রধান ব্যক্তি তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে উপস্থিত হন। সিরাজ সিংহাসনে আরোহণ করিলে তাঁহাদিগকে সিরাজের হস্তে লাঞ্ছনা ভোগ করিতে না হয়, এই অভিপ্রায়ে তাঁহারা সিরাজের করে তাঁহাদের হাত উঠাইয়া দিবার নিমিত্ত মুমূর্ষু নবাবের নিকট প্রার্থনা করেন। বৃদ্ধ এই কথা শুনিয়া ঈষৎ হাসিয়া বলিলেন, 'আমার মৃত্যুর পর তিন-দিন পর্য্যন্তও যদি সিরাজ তাঁহার মাতামহীর সহিত সদ্ভাব রক্ষা করিতে

(1) Sair, vol. II. pages 162—163.

স্বীয় পুত্রের নামে বাকরগঞ্জ জিলার অন্তর্গত বোজরগ উমেদপুর পরগণার জমিদারী বন্দোবস্ত করিয়া ঢাকায় অবস্থান করিতেছিল। জমিদারীর অনেক রাজস্ব বাকি পড়িয়াছিল বলিয়া তৎকাল প্রচলিত নিয়মানুসারে মহম্মদ সাদক নিবাইসের আদেশে মুরসিদাবাদে কারারুদ্ধ হইয়াছিল। উচ্ছৃঙ্খলতা এবং লাম্পট্যদোষে সেই যুবক সিরাজউদ্দৌল্লা অপেক্ষা কোন অংশেই ন্যূন ছিল না। সিরাজ কারাগারে উপস্থিত হইয়া সাদককে বলিলেন, "হাসনউদ্দিনকে হত্যা করিতে সম্মত হইলে আমি তোমাকে মুক্তি প্রদান করিতে পারি এবং ভবিষ্যতে কেহ তোমাকে বিপন্ন করিতে না পারে তদ্বিষয়েও প্রতিশ্রুতি দিতে সম্মত আছি। মহম্মদ সাদক এই প্রস্তাবে সম্মত হইলে, সিরাজ তাহার পলায়নের সুবিধা করিয়া দিলেন এবং মহম্মদ সাদক সেই সুযোগে কারাগার হইতে পলায়ন করিয়া একদিন প্রাতে ঢাকায় আসিয়া পিতার নিকট উপস্থিত হইল (১)। আগা বাকর পুত্রের নিকট সমস্ত শুনিয়া তাহাকে

---

(১) Scrafton সাহেবের মতে এই ঘটনা ১৭৫৫ খৃষ্টাব্দের ডিসেম্বর মাসের প্রথম ভাগে সংঘটিত হইয়াছিল—History of Backergunge by Beveridge, page 45.

কিন্তু ইংরেজ দপ্তরে রক্ষিত ১৭৫৪ খৃষ্টাব্দের ১৪ই মার্চ্চ তারিখের লিখিত পত্র (Despatch) পাঠে অবগত হওয়া যায়, এই সময়ের পূর্ব্বেই রাজবল্লভ ঢাকার শাসনকর্ত্তা ছিলেন। হাসন উদ্দিন ও হোসেনকুলীর মৃত্যুর পর যে তিনি এই পদ লাভ করেন সে বিষয়ে মতভেদ নাই। আগা বাকরের উত্তরপুরুষগণ বোজরগ উম্মেদপুর পরগণা উদ্ধার করিবার মানসে কলিকাতা কৌন্সিলে যে আবেদন করিয়াছিলেন। তাহা এখনও ইংরেজ দপ্তরে রক্ষিত আছে। সেই আবেদন পত্রানুসারে ১১৬০ বঙ্গাব্দ অর্থাৎ ১৭৫৩ খৃষ্টাব্দে আগা বাকরের মৃত্যু হইয়াছে। হাসন উদ্দিনের হত্যার পর যে আগা বাকরের মৃত্যু হয় ইহা একটি স্বীকৃত সত্য। সুতরাং ১৭৫৩ খৃষ্টাব্দেই যে হাসন উদ্দিন নিহত হইয়াছিলেন এ বিষয়ে সন্দেহ নাই—Long's Unpublished Records, page 52 and History of Backergunge by Beveridge, page 438.

ফলে এই সময় সরফরাজের প্রেতাত্মা রাজরাজেশ্বরের সিংহাসনের পার্শ্বে দাঁড়াইয়া কৃতঘ্নতার নিমিত্ত বিচার প্রার্থনা করিতেছিল (১)। আলিবর্দ্দী প্রজারঞ্জনে নিযুক্ত ছিলেন বলিয়াই ভগবান্ এ পর্য্যন্ত কোন প্রতিবিধান করেন নাই। কিন্তু এখন আর অপেক্ষা করা সঙ্গত নহে মনে করিয়াই তিনি ন্যায় দণ্ড উত্তোলন করিলেন। সুতরাং আলিবর্দ্দীও ভবিষ্যতের দিকে না চাহিয়া একমাত্র অন্ধস্নেহ ও সহধর্ম্মিণীর অনুরোধে সিরাজের পক্ষাবলম্বী হইয়া দাঁড়াইলেন।

নবাব দিব্যচক্ষে দেখিতে পাইলেন, যতদিন হোসেন কুলী ও হাসন উদ্দিন জীবিত থাকিবেন, ততদিন নিবাইসের পক্ষই প্রবল থাকিয়া যাইবে। পক্ষান্তরে হাসনউদ্দিনকে ইহজগৎ হইতে অপসারিত করিতে পারিলে পূর্ব্ববাঙ্গালায় যে নিবাইসের একাধিপত্য প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে, তাহা তিরোহিত হইবে এবং হোসেনকুলীকে হত্যা করিতে পারিলে মুরসিদাবাদ নগরে নিবাইস যে বিপুলসেনাসংগ্রহ করিয়াছেন, তাহা উপযুক্ত নেতার অভাবে ছিন্ন ভিন্ন হইয়া পড়িবে। আলিবর্দ্দী অতি সুচতুর রাজনৈতিক ছিলেন, তিনি মনে করিলেন স্বয়ং এ বিষয়ে হস্তক্ষেপ করিলে তাঁহার আর কলঙ্কের পরিসীমা থাকিবে না। সুতরাং তিনি প্রকাশ্যে নির্লিপ্ত থাকিয়া সিরাজের সহায়তায় হাসনউদ্দিন ও হোসেন কুলীর উচ্ছেদ সাধন করিতে কৃতসংকল্প হইলেন। ভগবানের ইচ্ছায় এই সময় এক সুবিধাও আসিয়া উপস্থিত হইল (২)।

তৎকালে আগাবাকর নামে জনৈক মুসলমান, মহম্মদ সাদক নামক

---

(১) Sair, vol. II. page 121.

(২) আলিবর্দ্দী যে পরোক্ষভাবে এই ষড়যন্ত্রে লিপ্ত ছিলেন, তাহা অর্ম্মসাহেবের ইতিহাস ও মোতাক্ষরীণ পাঠে অবগত হওয়া যায়—Orm's Indoostan, vol. II. page 48 and Sair, vol. II. page 123.

সুযোগে দ্বারপাল ও রক্ষকগণকে সহজে আয়ত্ত করিয়া দ্বার ভগ্নপূর্ব্বক হাসন উদ্দিনের শয়নকক্ষে প্রবেশ করিল। কোলাহলে হাসন-উদ্দিনের নিদ্রাভঙ্গ হইলে তিনি আততায়িগণকে দেখিতে পাইয়াই তাহাদের সম্মুখীন হইবার উদ্যোগ করিলেন। ইতিমধ্যে আগা বাকর ও তৎপুত্র অগ্রসর হইয়া তরবারিদ্বারা হাসন উদ্দিনকে খণ্ডবিখণ্ড করিয়া ফেলিল।

এই লোমহর্ষণ ঘটনা নগরমধ্যে রাষ্ট্র হইতে অনেক বিলম্ব ঘটিল না। কিন্তু সকলেই মনে করিল, রাজকীয় আদেশ ব্যতীত কখনও এরূপ একটি গুরুতর হত্যাকাণ্ড সংঘটিত হইতে পারে না। তৎকালে কেহই ইহার প্রতিবিধান করিতে অগ্রসর হইল না।

পরদিন প্রত্যূষে নিবাইসের প্রেরিত লোক সাদকের অনুসরণ করিতে করিতে ঢাকায় আসিয়া উপস্থিত হইলে সমস্ত রহস্য উদ্ঘাটিত হইল। এখন নাগরিকগণ সেনাসংগ্রহ করিয়া আগা বাকরের গৃহ অবরোধ করিল। পাপিষ্ঠ বাকর-পুত্রও অনুচরসহ তৎকালে গৃহাভ্যন্তরেই অবস্থান করিতেছিল। রাজকীয় সেনাগণ গৃহের চতুর্দ্দিক বেষ্টন করিয়া ফেলিলেন পিতা ও পুত্র বাহির হইয়া শত্রুপক্ষের সম্মুখীন হইল। মহম্মদ সাদক কতিপয় অনুচর সহ বিপক্ষের ব্যূহ ভেদ করিয়া পলায়ন করিল, কিন্তু আগা বাকর অবশিষ্ট অনুচর সহ সেই যুদ্ধে নিহত হইল। (১)

---

(1) Sair, vol. II. page 123, and History of Backergunge by Beveridge, page 43 to 46.

উমাচরণ বাবু লিখিয়াছেন, "কৃষ্ণদাস হাসন উদ্দিনের হত্যার কথা মুরসিদাবাদে লিখিয়া পাঠাইলে, নবাব একদল সেনাসহ রাজবল্লভকে ঢাকায় প্রেরণ করিলেন। যুদ্ধে আগাবাকর ও তৎপুত্র পরাভূত হইল এবং রাজবল্লভ আগাবাকরের সমস্ত

সাহায্য করিতে অগ্রসর হইল এবং পিতা ও পুত্রে সমস্ত দিন ব্যাপিয়া হাসন উদ্দিনের হত্যাসম্বন্ধে আয়োজন উদ্যোগ করিতে লাগিল।

ক্রমে দিবা অবসান ও নিশাকাল সমাগত হইল এবং নাগরিকগণ দৈনিক ক্লান্তি অপনোদন করিবার নিমিত্ত নিদ্রাদেবীর সুকোমল ক্রোড়ে আশ্রয় গ্রহণ করিল। লোককোলাহলপূর্ণ ঢাকা নগরী এখন নিস্তব্ধতা ধারণ করিয়াছে। ঘোর তিমিরাবরণে সমস্ত জগৎ আচ্ছন্ন হইয়া গিয়াছে। রাজপথে জনপ্রাণীর নামগন্ধ পর্য্যন্ত অনুভূত হইতেছে না, কেবল ক্ষণে ক্ষণে দুই একটি কুক্কুর অর্দ্ধনিমিলিত লোচনে অস্ফুট শব্দ করিয়া রজনীর নিস্তব্ধতা ভঙ্গ করিতেছে। দস্যু ও তস্কর প্রভৃতি নিকৃষ্ট শ্রেণীর লোক অসদভিপ্রায়সাধনোদ্দেশ্যে ধীরে ও নিঃশব্দে পাদচারণা করিতেছে, নিশাচর পেচকগণ তাহাদের স্বভাবসিদ্ধ বিকট শব্দ করিয়া মানবের হৃদয়ে আতঙ্ক সঞ্চার করিয়া দিতেছে। আগা বাকর ও তৎপুত্র এই সময় দ্বাদশ সংখ্যক সশস্ত্র অনুচর সহ গৃহ হইতে বহির্গত হইয়া ক্রমে হাসন উদ্দিনের দ্বারদেশে উপস্থিত হইল। তৎকালে হাসন উদ্দিন শয়নকক্ষে সুকোমল শয্যায় নিদ্রাভিভূত ছিলেন এবং তাঁহার দ্বারপাল ও শরীর-রক্ষকগণ নিদ্রাবশে প্রায় অচেতন হইয়া পড়িয়াছিল। আগা বাকর ও তাহার অনুচরগণ এই

---

(১) সুলেখক শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রনাথ সেন বলেন, "ঢাকানিবাসী সৈয়দ আহাম্মদ রেজা সাহেবের মতে, নিহত হওয়ার সময় হাসন উদ্দিন একমনে কোরাণ পাঠ করিতেছিলেন; ঢাকার ভূতপূর্ব্ব নবাব সুপ্রসিদ্ধ নছরৎজঙ্গ বাহাদুরের পুস্তকালয়ে একখানি কোরাণ বিদ্যমান রহিয়াছে। সেই কোরাণের একপৃষ্ঠায় এখনও রক্তের চিহ্ন দেখিতে পাওয়া যায়। আহাম্মদ রেজা সাহেব বলিয়াছেন, হাসন উদ্দিন সেই পৃষ্ঠা পাঠ করিবার সময়ই আঘাত প্রাপ্ত হইয়াছিলেন এবং আঘাতের ফলে তাঁহার শরীর হইতে যে রক্ত বিন্দু নির্গত হইয়াছিল, তাহার চিহ্নই এইরূপে অঙ্কিত হইয়া রহিয়াছে।"

"সিরাজের প্ররোচনায় পরিবারস্থ যাবতীয় লোকই হোসেনকুলীর উপর খড়্গহস্ত হইয়া উঠিল। আলিবর্দ্দীর সহধর্ম্মিণী, হোসেনকুলী ও তাঁহার ভ্রাতা হায়দরালি খাঁর নিধন সাধনোদ্দেশ্যে স্বামীর নিকট আসিয়া তাঁহার অনুমতি প্রার্থনা করিলেন। বিধাতার বিড়ম্বনায়ই যেন নবাব প্রত্যুত্তরে বলিলেন, "নিবাইসের অনুমতি ব্যতীত এরূপ কার্য্যে হস্তক্ষেপ করা যাইতে পারে না।" সহধর্ম্মিণী নিবাইসের সম্মতি লাভ করিবেন বলিয়া প্রতিশ্রুতি দিলে আলিবর্দ্দী ইঙ্গিতক্রমে এই হত্যাকাণ্ডের অনুমতি প্রদান করিলেন। অতঃপর নবাবপত্নী ঘেসেটী বিবির নিকট গিয়া তাঁহাকে হোসেনকুলী ও তাঁহার ভ্রাতার হত্যা বিষয়ে নিবাইসের সম্মতি লাভ করিবার নিমিত্ত অনুরোধ করিলেন। ঘেসেটী বিবী সিরাজকে দুচক্ষে দেখিতে পারিতেন না সত্য, কিন্তু তৎকালে কোন এক গোপনীয় কারণে ঘেসেটি বিবীর সহিত নিবাইসের মনোমালিন্য ঘটিয়াছিল (১) এবং তাহাতে তিনি হোসেনকুলীর উপর এত রুষ্ট হইয়াছিলেন যে, নবাবতনয়া জননীর প্রস্তাবে সম্মত হইয়া স্বামীর নিকট গমন করিলেন। নিবাইস স্বভাবতই দুর্ব্বলচিত্ত লোক ছিলেন এবং এই সময় স্বর্গ ও মর্ত্ত্য উভয় লোকের উপরই তিনি বীতশ্রদ্ধ হইয়া পড়িয়াছিলেন (২)। সুতরাং তিনি ঐহিক ও পারলৌকিক মঙ্গল বিসর্জ্জন দিয়া ঘেসেটি বিবীর অনুরোধে সেই

---

(১) সায়র মোতাক্ষরীণের অনুবাদক হাজি মস্তফা বলেন, 'হোসেন ঘেসেটী বিবীর প্রেমোপহার তুচ্ছ করিয়া সিরাজজননী আমনার প্রেমে মজিয়াছিলেন বলিয়া ঘেসেটী বিবী তৎপ্রতি খড়্গহস্ত হইয়াছিলেন। নিবাইস ক্লীব হইলেও হোসেনকুলীর সহায়তায় রমণীজনসুলভ বাসনার পরিতৃপ্তি করিতেন। এই উপলক্ষেও অনেক সময় স্বামী ও স্ত্রীতে ঝগড়া হইত—Sair, vol. II. page 124.

(২) এই সময় পৌষ্যপুত্র আক্রামউদ্দৌল্লার শোকে তিনি উন্মত্তপ্রায় হইয়াছিলেন।

হাসন উদ্দিনের হত্যার বৃত্তান্ত নিবাইসের কর্ণগোচর হইলে তিনি রোষে ও ক্ষোভে উত্তেজিত হইয়া অস্ত্রধারণ করিলেন। আলিবর্দ্দী মনে করিলেন, নিবাইসকে প্রবোধ দিতে না পারিলে বিপ্লব ঘটিবার সম্ভাবনা, সুতরাং তিনি আর কালবিলম্ব না করিয়া নিবাইসের নিকট গমন করিলেন এবং তাঁহাকে প্রবোধ দিয়া বলিলেন, "হাসন উদ্দিনের হত্যার সহিত সিরাজ উদ্দৌলার অণুমাত্রও সংস্রব নাই। আলিবর্দ্দী এরূপ কৌশলে এই কথাগুলি বলিলেন যে, নিবাইস তাহাই বিশ্বাস করিয়া অবশেষে অস্ত্রত্যাগ করিলেন (১)। এই সময় আগা বাকরের অধিকারভুক্ত বোজরগ উমেদপুর পরগণা বাজেয়াপ্ত হইয়া রাজবল্লভের তত্ত্বাবধানে অর্পিত হইল (২)।

পূর্ব্বোক্ত উপায়ে এক কণ্টক উদ্ধার হইল বটে, কিন্তু হোসেনকুলী জীবিত থাকাপর্য্যন্ত আলিবর্দ্দী সিরাজকে নিরাপদ মনে করিতে পারিলেন না। হাসন উদ্দিনের হত্যার সংবাদ পাইয়া নিবাইস যেরূপ উত্তেজিত হইয়াছিলেন, তাহাতে আলিবর্দ্দী কৌশল না করিলে হুলস্থূল বাধিয়া যাইত। সুতরাং সিরাজ এখন ভয়ে হোসেনকুলীর হত্যার কল্পনা কিয়ৎকালের জন্য স্থগিত রাখিলেন। অতঃপর যে ভাবে সেই সুযোগ উপস্থিত হইল, তাহা সায়র মোতাক্ষরীণে নিম্নলিখিত-রূপে বর্ণিত হইয়াছে ঃ—

ধনরত্ন বাজেয়াপ্ত করিয়া নবাব দরবারে পাঠাইয়া দিলেন। নবাব ধনরত্নের অর্দ্ধাংশ ও বোজরগ উমেদপুরের জমিদারী রাজবল্লভকে প্রদান করিয়া পুরস্কৃত করিলেন।"

(1) Orm's Indoostan, vol. II. page 48.

(2) History of Backergung by Beveridge, pages 94 and 431, and Hunter's Statistical Account of Backergunge, page 222.

উৎসর্গীকৃত হইয়া জীবন-নাটক শেষ করিল। হোসেনের ভ্রাতা হায়দার আলি খাঁ অন্ধ ছিলেন। সিরাজের সহচরগণ তাঁহাকেও টানিয়া বাহির করিল। হায়দরআলি সাহসী পুরুষ ছিলেন এবং বহুবার রণক্ষেত্রে গিয়া অস্ত্রচালনা করিতে কুণ্ঠিত হন নাই। তিনি নিকটস্থ হইয়াই সিরাজকে ভর্ৎসনা করিতে লাগিলেন এবং তাঁহার জননী ও পরিবারস্থ মহিলাগণের দুশ্চরিত্রতার বিষয় উল্লেখ করিয়া বিদ্রূপ করিতে কুণ্ঠিত হইলেন না। হায়দরআলি ইহাও বলিলেন, "রে অপদার্থ নরাধম! তুই এইভাবেই বীরপুরুষগণের জীবন সংহার করিয়া থাকিস?" সিরাজ তাঁহাকে আর অধিক বলিবার অবসর প্রদান করিলেন না। ইতিমধ্যে অনুচরগণ সিরাজের আদেশে হায়দারআলিকেও কাটিয়া খণ্ড বিখণ্ড করিয়া ফেলিল।

"পূর্ব্বকালে সিয়াভসের নিধন ব্যাপারে যেরূপ নানাবিধ উপদ্রব সংঘটিত হইয়াছিল, এই নিরপঁরাধ লোকদিগের হত্যাকাণ্ডও সেইরূপ বিবিধ অমঙ্গলের নিদানস্বরূপ হইয়া দাঁড়াইল। এই হত্যাকাণ্ডের ফলেই এমন সমস্ত ঘটনা আসিয়া উপস্থিত হইল যে, তদ্দ্বারা আলিবর্দ্দীর কষ্টোপার্জ্জিত রাজ্য ও ক্ষমতা রসাতলে ডুবিয়া গেল। এই লোমহর্ষণ ঘটনায় এমন এক দাবানলের সৃষ্টি হইল যে, তাহা কিয়ৎকাল প্রধূমিত থাকিয়া অবশেষে প্রজ্জ্বলিত হইয়া উঠিল এবং আলিবর্দ্দীর অসংখ্য পরিবার সেই অগ্নিতে ক্রমে দগ্ধ হইয়া ভস্মীভূত হইতে লাগিল। অগ্নি যে এ স্থলেই নির্ব্বাপিত হইল এমন নহে, ক্রমে তাহা সোনার বাঙ্গলা দগ্ধ করিয়া ভস্মীভূত করিতেও কালবিলম্ব করিল না।" (১)

নিবাইসের পক্ষ দুর্ব্বল করিবার উদ্দেশ্যেই যে সিরাজ হোসেন-কুলীকে নিহত করিয়াছিলেন, সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। (২) নিবাইস

(1) Sair, vol. II. pages 124, 125 & 126.

(2) Orme's Indoostan, vol. II. page 45.

লোমহর্ষণ প্রস্তাবে সম্মতি প্রদান করিলেন। আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, হোসেন যে তাঁহার অকৃত্রিম বন্ধু ছিলেন এবং তিনি যে পবিত্র কোরাণ স্পর্শ করিয়া স্বীয় জীবনের ন্যায় হোসেনের জীবন রক্ষা করিবেন বলিয়া প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলেন, সে কথা এখন একবারও তাঁহার মনে উদিত হইল না। হত্যাসংক্রান্ত সমস্ত উদ্যোগ আয়োজন শেষ হইলে আলিবর্দ্দী মৃগয়ার ব্যপদেশে রাজমহলের দিকে অগ্রসর হইলেন। তিনি মনে করিলেন, এ সময় মুরসিদাবাদে অবস্থান না করিলে লোকে বুঝিবে যে. তিনি এই ষড়যন্ত্রের বিষয় অণুমাত্রও অবগত নহেন। আলিবর্দ্দী নগর পরিত্যাগ করিলেই হিজরি ১১৬৮ অব্দের (১৭৫৪ খৃঃ) প্রারম্ভে সিরাজ নিবাইসের আবাসে গিয়া তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিলেন এবং হোসেনের হত্যাবিষয়ে তাঁহার অনুমতি লইয়া অপরাহ্ণে গৃহাভিমুখে প্রত্যাবর্ত্তন করিবার সময়, পথিমধ্যে হোসেনকুলীর গৃহদ্বারে আসিয়া উভয় ভ্রাতাকে সম্মুখে আনিবার জন্য অনুচরবর্গকে আদেশ প্রদান করিলেন। হোসেন তৎকালে গৃহমধ্যে বাস করিতেছিলেন, গৃহদ্বারে জনতা দেখিয়া তিনি পলায়নপূর্ব্বক সমীপবর্ত্তী হাজি মেহদির আলয়ে আশ্রয় গ্রহণ করিলেন এবং এই বিপদের সংবাদ হাজি মেহদির যোগে নিবাইস মহম্মদের নিকট প্রেরণ করিলেন। হাজি মেহদি নিবাইসের নিকট কোনরূপ সন্তোষজনক উত্তর না পাইয়া বিষণ্ণমনে প্রত্যাবর্ত্তন করিতেছিলেন, ইতিমধ্যে সিরাজের সহচরগণ গৃহ মধ্যে প্রবেশ করিয়া হোসেনকুলীকে ধরিয়া ফেলিল এবং তাঁহাকে টানিয়া আনিয়া সিরাজের নিকট উপস্থিত করিল। সেই পাষাণ-হৃদয়, বিবেকহীন, রাক্ষস হোসেনকুলীকে দেখিবামাত্রই খণ্ড খণ্ড করিয়া কাটিয়া ফেলিবার আদেশ দিল। অবিলম্বে সিরাজের অনুজ্ঞা অক্ষরে অক্ষরে প্রতিপালিত হইল। এইরূপে হতভাগ্য হোসেন

ব্যাপারই যদি হত্যার কারণ হইয়া থাকে, তবে এই শেষোক্ত দুই ব্যক্তি কি জন্য নিহত হইলেন? অক্ষয় বাবু হাসন উদ্দিনের হত্যার কারণ সম্বন্ধে নির্ব্বাক্ থাকিয়া হায়দরআলির হত্যাসম্বন্ধে বলিয়াছেন। কিন্তু সায়র মোতাক্ষরীণে স্পষ্টই লিখিত আছে, "সিরাজের মাতামহী হোসেন-কুলী এবং তাঁহার ভ্রাতা হায়দরআলির নিধনবিষয়ে আলিবর্দ্দীর অনুমতি গ্রহণ করিলেন।" অতএব হায়দরআলির নিধনব্যাপার যে ষড়যন্ত্রমূলক, কিন্তু সাময়িক উত্তেজনার ফল নহে, তাহা সম্পূর্ণরূপে প্রমাণিত হইতেছে।

হোসেনকুলী যে অবৈধ প্রণয়ের নিমিত্ত নিহত হইয়াছিলেন এ কথাও ঠিক নহে। সায়রমোতাক্ষরীণপাঠে অবগত হওয়া যায়, ঘেসেটী বিবীর সহিত হোসেনকুলী বহুকাল পর্য্যন্ত অবৈধ প্রণয়ে লিপ্ত ছিলেন এবং এই প্রণয়বৃত্তান্ত যে মুরসিদাবাদবাসী সমস্ত লোকেই জানিতেন, তাহা সায়র মোতাক্ষরীণের অনুবাদক হাজি মুস্তাফা সাহেব স্পষ্টই বলিয়া গিয়াছেন। সায়র মোতাক্ষরীণে আছে, "আলিবর্দ্দীর সমস্ত তনয়া ও সিরাজউদ্দৌল্লা ঘোরতর পাপানুষ্ঠানে লিপ্ত থাকিতেন এবং তাঁহারা একত্রে দলবদ্ধ হইয়া নগরের প্রশস্ত ও অপ্রশস্ত রাস্তায় ঘুরিয়া ঘুরিয়া নানারূপ পাপানুষ্ঠানে লিপ্ত হইতেন।" (১) এতদ্দ্বারা ইহাই

---

(১) মোহনলালের যে ভগ্নী সিরাজের করে অর্পিতা হইয়াছিল, সেই রমণী খর্ব্বকায়া এবং কৃশাঙ্গী ছিল এবং ভারতবাসীর মতে ঐ ললনা আদর্শ সুন্দরী বলিয়া পরিগণিত ছিল। এই রমণী ওজনে ২২ সের মাত্র হইত। সিরাজের ভগ্নীপতির সহিত প্রণয়ালাপে শিশু অবস্থায় একদা সিরাজ এই উপপত্নীকে দেখিতে পান এবং তখন ক্রোধভরে তাহাকে বলেন "রমণি! আমি দেখিতেছি তোমার ও গণিকার মধ্যে কোনই প্রভেদ নাই।" হতভাগিনী তখন নিরুপায় হইয়া উত্তর করে, "আমি যে গণিকা তাহা সকলেই জানে এবং আমি এই ভাবেই জীবন যাপন করিতেছি,

তৎকালে পুত্রশোকে এরূপ জ্ঞানশূন্য হইয়া পড়িয়াছিলেন যে, তাঁহার হিতাহিত বিচার করিবার শক্তি ছিল না। দুঃখের বিষয়, ঘেসেটি বিবী একমাত্র স্ত্রীজন-সুলভ ঈর্ষাবশে হোসেনের নিধন বিষয়ে সহায়তা করিয়া নিজপদে কুঠারাঘাত করিলেন। অক্ষয় বাবু সিরাজ উদ্দৌল্লায় লিখিয়াছেন ঃ—

"তাঁহার (হোসেনকুলীর) নামের সঙ্গে নাওয়াজেসের বেগম ঘেসেটীর নাম সংযুক্ত করিয়া দাসদাসীগণ অনেক কথা কানাকানি করিত, সে কথা ক্রমেই পল্লবিত হইয়া উঠিতেছিল, সকলেই তাহা জানিত। কিন্তু উদ্ধতস্বভাব সিরাজউদ্দৌলাকে কেহই সাহস করিয়া সে কথা বলিতে পারিত না। অবশেষে পারিবারিক কলঙ্ক যখন ক্রমেই বহু বিস্তৃত হইয়া পড়িল, তখন আলিবর্দ্দীর বেগম গোপনে কণ্টক মোচন করিবার জন্য সে পাপ কথা সিরাজের কর্ণগোচর করিলেন। সিরাজউদ্দৌলা আর আত্মসংবরণ করিতে পারিলেন না। * * * হোসেনকুলীকে সিরাজ স্বহস্তে নিধন করেন নাই। মাতামহীর উত্তেজনায় মাতামহ ও নেয়াজেসের সম্মতিক্রমে সিরাজের উপর এই পারিবারিক কলঙ্ক মোচনের ভার অর্পিত হওয়ায় তাঁহার সম্মুখে ও তাঁহার আদেশে এই হত্যাকাণ্ড সাধিত হয়। সাময়িক উত্তেজনায় হোসেনকুলীর অন্ধ ভ্রাতাও নির্দ্দয়রূপে নিহত হন।" (১)

অক্ষয় বাবু সিরাজের কলঙ্কক্ষালন করিবার জন্য যাহাই বলুন না কেন, তাঁহার সমস্ত কথা যে ভিত্তিশূন্য, এ কথা নিঃসঙ্কোচে বলা যাইতে পারে। সিরাজ যে কেবল হোসেনকুলীকেই হত্যা করিয়াছিল এমন নহে। হোসেনের ভ্রাতা হায়দরআলি এবং ভ্রাতুষ্পুত্র হাসন উদ্দিনের ঘেসেটীবেগমঘটিত কলঙ্কে অণুমাত্রও সংশ্রব ছিল না। প্রণয়

(১) সিরাজউদ্দৌলা ৯৬, ৯৭ পৃঃ।

যে, সিরাজ হোসেনকুলীকে কোনরূপে অপরাধী জানিয়া হত্যা করেন নাই।

এ কথা স্বীকার্য্য যে আলিবর্দ্দী ও তাঁহার সহধর্ম্মিণী লাম্পট্যদোষে দুষ্ট ছিলেন না। কিন্তু সংসারে এমন অনেক লোক আছেন, যাঁহারা স্বয়ং নিষ্কলঙ্ক হইয়াও অপত্যগণের উচ্ছৃঙ্খলতাবিষয়ে সম্পূর্ণরূপে উদাসীন থাকেন। সায়রমোতাক্ষরীণপাঠে অবগত হওয়া যায়, সন্তানসন্ততিগণের উচ্ছৃঙ্খলতা সত্ত্বেও আলিবর্দ্দী তাহাদিগকে কোনরূপ শাসন করিতেন না, বরং পরোক্ষভাবে প্রশ্রয় দিতেন (২)। ঘেসেটিবিবীর স্বামী ক্লীব ছিলেন; আমনার স্বামী আফগান কর্ত্তৃক নিহত হইলে প্রচলিত রীতি অনুসারে তিনি আর দ্বিতীয় স্বামী গ্রহণ করিতে পারেন নাই। নবাব ও তাঁহার সহধর্ম্মিণী তনয়াদ্বয়ের অতৃপ্ত যৌবনলালসার বিষয় চিন্তা করিয়াই তাঁহাদের চরিত্রহীনতায় হস্তক্ষেপ করেন নাই। নবাবনন্দিনীগণের উচ্ছৃঙ্খলতার মাত্রা এতদূর বৃদ্ধি পাইয়াছিল যে, কোন সুপুরুষ নয়নগোচর হইলেই তাঁহারা সামান্য গণিকার ন্যায় তাহার সহিত প্রণয়ালাপে লিপ্ত হইতেন। নবাব ও তৎপত্নী কঠোরতা অবলম্বন করিলে কখনও তনয়াগণের উচ্ছৃঙ্খলতার মাত্রা এতদূর বৃদ্ধি পাইত না। অতএব কন্যাগণের পবিত্রতা রক্ষার উদ্দেশ্যে যে তাঁহারা হোসেনকুলীর হত্যাব্যাপারে লিপ্ত হন নাই, এ কথা সহজেই অনুমান করা যাইতে পারে। চরিত্র-হীনতার নিমিত্ত হোসেনকুলী নিহত হইলে সায়র মোতাক্ষরীণপ্রণেতা কখনও আক্ষেপ সহকারে বলিতেন না, "এই নিরপরাধ লোকদিগের হত্যাকাণ্ডে বিবিধ প্রকার অমঙ্গলের নিদান স্বরূপ হইয়া দাঁড়াইল।" অক্ষয়বাবুর সিরাজউদ্দৌলার ১১৯ পৃষ্ঠায়

(2) Sair, vol. II. page 122.

প্রমাণ হইতেছে যে, সিরাজ উদ্দৌলা ঘেসেটীবিবীসংক্রান্ত কলঙ্ককথা পূর্ব্ব হইতেই অবগত ছিলেন এবং তিনি স্বয়ংও তাহার সাহায্য করিতেন। এ অবস্থায় হোসেনসংক্রান্ত ঘেসেটী বিবীর কলঙ্কের কথা শুনিয়া সিরাজের আত্মহারা হওয়া অত্যন্ত অস্বাভাবিক সন্দেহ নাই। সিরাজ যে মাতামহীর নিকট এ কলঙ্কের কাহিনী প্রথম শুনিয়াছিলেন এবং মাতামহীর প্ররোচনায় তিনি হোসেনকুলীর নিধনসাধনে কৃত-সংকল্প হইয়াছিলেন এ কথাই বা অক্ষয়বাবু কোথায় পাইলেন? সায়র মোতাক্ষরীণেই লিখিত আছে যে. সিরাজের প্ররোচনায়ই মাতামহী প্রভৃতি পরিবারবর্গ হোসেনের উপর খড়্গহস্ত হইয়া উঠিয়াছিলেন; অক্ষয়বাবুর উক্তি সম্পূর্ণ কপোলকল্পিত। ঘেসেটি বিবী যে হোসেন কুলীর হত্যাব্যাপারে আলিবর্দ্দীর সহধর্ম্মিণীর সহায়তা করিয়াছিলেন, তাহা অক্ষয়বাবু না বলিলেও মোতাক্ষরীণে লিখিত আছে। ঘেসেটিবিবীর প্রণয়বৃত্তান্তই হোসেনকুলীর হত্যার কারণ হইলে আলিবর্দ্দীর সহধর্ম্মিণী কখনও এ বিষয়ে ঘেসেটিবিবীর সহায়তা গ্রহণ করিতেন না। সিরাজের হস্তে অনেক লোক নিহত হইয়াছেন। এমন কি মোহনলালের যে ভগ্নী তাঁহার উপপত্নী ছিল, পর-পুরুষের সহিত প্রণয়ে লিপ্ত হইতে দেখিয়া তাহাকে তিনি জীবন্ত সমাহিত করিতেও কুণ্ঠিত হন নাই। (১) কিন্তু মৃত্যুকালে তিনি কেবল হোসেনকুলীর হত্যার কথা উল্লেখ করিয়া আবেগভরে বলিয়াছিলেন "হোসেনকুলীর হত্যাপরাধের প্রায়শ্চিত্তস্বরূপ আমাকে মারিতেই হইবে।" (১) এতদ্দ্বারা ইহাই প্রতীয়মান হইতেছে

গণিকাবৃত্তিই আমার ব্যবসায়। গণিকাবৃত্তি তোমার জননীর পক্ষে নিন্দার বিষয়।" অতঃপর সিরাজ তাহাকে জীবন্ত প্রোথিত করিয়া ক্রোধোপশম করেন—Sair, vol. II. page 187.

(1) Sair, vol. II. page 242.

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

ঘেস'টিবিবীর পৃষ্ঠ-পোষকতায়

আমনা বেগমের দ্বিতীয় পুত্র আক্রামউদ্দৌল্লাকে শৈশবে পোষ্যপুত্র-রূপে গ্রহণ করিয়া নিবাইস অতি যত্নের সহিত লালনপালন করিতেছিলেন। ১৭৫৩ খৃষ্টাব্দে বসন্তরোগে আক্রামউদ্দৌল্লা পরলোক গমন করিলে নিবাইস শোকে এত মর্ম্মপীড়িত হইলেন যে, তাঁহার আর হিতাহিত বিবেচনাশক্তি রহিল না। সায়র মোতাক্ষরীণে লিখিত আছে ঃ—

"শোকে নিবাইস অতিশয় ম্রিয়মাণ হইলেন। এখন পার্থিব কোন বিষয়েই তাঁহার আর স্পৃহা রহিল না। আহার, বিহার এবং পরিচ্ছদের উপর তিনি সম্পূর্ণরূপে বীতস্পৃহ হইয়া পড়িলেন। অতি সহজে তাঁহার ধৈর্য্যচ্যুতি ঘটিতে লাগিল। একমাত্র মৃত পুত্রের চিন্তা তাঁহার সমস্ত হৃদয় অধিকার করিল। ঘেসেটিবিবী অনেক যত্ন চেষ্টা করিলেন, কিন্তু কিছুতেই নিবাইসের মন পরিবর্ত্তিত হইল না। তাঁহার মনোরঞ্জনের নিমিত্ত নিত্য নূতন উৎসবের আয়োজন হইতে লাগিল, কিন্তু নিবাইস তাহাতে অণুমাত্রও আসক্তিপ্রদর্শন করিলেন না। মহরমের সময় উপস্থিত হইলে সমগ্র নগর আনন্দোৎসবে মত্ত হইয়া উঠিল এবং আলিবর্দ্দী স্বয়ং আসিয়া নিবাইসকে নূতন পরিচ্ছদ ধারণ করিবার জন্য অনুরোধ করিলেন, কিন্তু নিবাইস তাহাতে কর্ণপাত পর্য্যন্ত করিলেন না। (১)

---

(1) Sair, vol. II. pages 114 and 120.

সিরাজের প্রতি আলিবর্দ্দীর অন্তিম উপদেশ বলিয়া নিম্নলিখিত কথা কয়টি উদ্ধৃত হইয়াছে, "হোসেনকুলী খাঁর বিদ্যাবুদ্ধি ও খ্যাতি প্রতিপত্তি ছিল। সকত জঙ্গের প্রতি তাঁহার ঐকান্তিক অনুরাগ জন্মিয়াছিল। আজ হোসেন কুলী জীবিত থাকিলে তোমার পথ কণ্টকশূন্য হইত না; সে হোসেন কুলী আর নাই।" এতদ্দ্বারা ইহাই সিদ্ধান্ত হয় যে, আলিবর্দ্দী হোসেন কুলীকে সিরাজউদ্দৌল্লার অন্তরায়স্বরূপ মনে করিয়াই তাহার নিধনবিষয়ে কৃতসংকল্প হইয়াছিলেন। ফলে হোসেন কুলী নিহত না হইলে নিবাইসের বলক্ষয় হয় না এবং নিবাইসের বলক্ষয় না হইলে সিরাজ নিষ্কণ্টকে সিংহাসন লাভ করিতে পারেন না, ইহা ভাবিয়াই নবাব ও তৎপত্নী হোসেনকে হত্যা করিবার কল্পনা করিয়াছিলেন। হাসন উদ্দিনের হত্যাসংবাদ শুনিয়া নিবাইস অনর্থ ঘটাইবার উদ্যোগ করিয়াছিলেন এবং বহু কষ্টে আলিবর্দ্দীকে নিবাইসের ক্রোধোপশম করিতে হইয়াছিল। এই নিমিত্তই এবার নিবাইস মহম্মদের সম্মতি গ্রহণ করা আবশ্যক হইয়াছিল।

প্রধান প্রধান নাগরিকসহ মৃতের সংকারোদ্দেশ্যে সে স্থলে আগমন করিলেন। মৃতদেহ রীতিমতে প্রক্ষালিত হইয়া নূতনবস্ত্রমণ্ডিত হইল এবং আলিবর্দ্দীপ্রমুখ শ্মশানবন্ধুগণ তাহা কবরস্থানে লইয়া যাইবার জন্য উত্তোলন করিলেন। এই সময় সমবেত জনতা হইতে এক অশ্রুতপূর্ব্ব ও হৃদয়বিদারক বিলাপধ্বনি উত্থিত হইয়া গগণমণ্ডল বিদীর্ণ করিল। শ্মশানবন্ধুগণ অতিকষ্টে জনতার মধ্য দিয়া শব বহন করিতে করিতে অবশেষে আক্রামউদ্দৌল্লার সমাধিস্থানে আসিয়া উপস্থিত হইল এবং তাহারই পার্শ্বে উহা সমাহিত করিয়া ম্লানমুখে প্রত্যাবর্ত্তন করিল। সায়র মোতাক্ষরীণ-প্রণেতা বলেন, "জীবিত থাকা পর্য্যন্ত এরূপভাবে জীবনযাপন করিবে যে মৃত্যুর পর তোমার সদনুষ্ঠানসমূহ যেন লোকের হৃদয়ে জাগরূক থাকে।" এই কথাগুলি একমাত্র নিবাইস মহম্মদের ন্যায় লোকদিগের প্রতিই প্রযুক্ত হইতে পারে।(১)

এখন বিধবা ঘেসেটিবিবী পৌত্র মবারকউদ্দৌলার নিমিত্ত বাঙ্গালার সিংহাসনের পথ উন্মুক্ত করিতে ব্যগ্র হইয়া উঠিলেন। হোসেনকুলীর মৃত্যুর পর হইতে রাজবল্লভই নিবাইসের সর্ব্বপ্রধান কর্ম্মচারিপদে নিযুক্ত হইয়াছিলেন। ঘেসেটিবিবী স্বামীর পদাঙ্ক অনুসরণ করিয়া তাঁহাকে সেই পদেই প্রতিষ্ঠিত রাখিলেন। নিবাইস জীবিত থাকা পর্য্যন্ত তাঁহার নিকট রাজবল্লভের যথেষ্ট প্রতিপত্তি ছিল। এখন ঘেসেটিবিবীও এই প্রবীণ কর্ম্মচারীর পরামর্শমতেই সমস্ত কার্য্য নির্ব্বাহ করিতে মনস্থ করিলেন (২)। অবিলম্বে মতিঝিলের প্রমোদোদ্যান সুরক্ষিত সেনানিবাসে পরিণত হইল এবং ঘেসেটিবিবী সশস্ত্রপ্রহরিপরিবেষ্টিত

---

(1) Sair, vol. II. pages 126, 127 & 133.

(2) Orme's Indoostan, vol. II. page 49.

সৌভাগ্যক্রমে ইতিমধ্যে আক্রামউদ্দৌল্লার বিধবা পত্নী একটি পুত্র প্রসব করিলেন। আলিবর্দ্দী নিবাইসের মনোরঞ্জনোদ্দেশ্যে সেই নবজাত বালককে মবারকউদ্দৌল্লা উপাধি দিয়া রাজপ্রাসাদের তত্ত্বাবধায়ক ও ঢাকা প্রদেশের নাজিমীপদে নিযুক্ত করিলেন। শিশুটির সরল মুখখানি দেখিয়া নিবাইস কথঞ্চিৎ সান্ত্বনা লাভ করিলেন বটে, কিন্তু তিনি আক্রামউদ্দৌল্লার শোক বিস্মৃত হইতে পারিলেন না। শোকের আতিশয্যে তাঁহার স্বাস্থ্য সম্পূর্ণরূপে ভগ্ন হইয়া গেল। তিনি ক্রমে শোথরোগে আক্রান্ত হইয়া পড়িলেন। ঘেসেটিবিবী ও আত্মীয় বন্ধু-বান্ধবগণ চিকিৎসক আনাইলেও তিনি কোন চিকিৎসকের অধীন হইতে বা ঔষধ সেবন করিতে সম্মত হইলেন না। অগত্যা আলিবর্দ্দী তাঁহাকে মতিঝিল হইতে চিকিৎসার অভিপ্রায়ে মুরশিদাবাদে আনয়ন করিলেন। এখন রীতিমত চিকিৎসা চলিল বটে, কিন্তু ঔষধে কোন ফলোদয় হইল না।

ক্রমে নিবাইস মরণোন্মুখ হইলেন। তখন ঘেসেটিবিবী আশঙ্কা করিতে লাগিলেন যে, এস্থলে নিবাইসের দেহত্যাগ হইলে সিরাজউদ্দৌল্লা তাঁহাকে কারারুদ্ধ করিতে অনুমাত্রও কুণ্ঠা বোধ করিবে না। অতএব সিরাজের কবল হইতে আত্মরক্ষা করিবার উদ্দেশ্যে তিনি একদিন স্বামীসহ বস্ত্রাবৃত শিবিকায় আরোহণ করিয়া মতিঝিলে প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন। যে সময় নিবাইস এইভাবে নীত হইতেছিলেন তৎকালে তাঁহার জ্ঞান ছিল কিনা সন্দেহ। অবশেষে ১৭৫৬ খৃষ্টাব্দের জানুয়ারী মাসে রজনীযোগে নিবাইসের পবিত্র আত্মা অমরধামে চলিয়া গেল।

মৃত্যুর অব্যবহিত পরেই এই সংবাদ মুরশিদাবাদ নগরে রাষ্ট্র হইয়া পড়িল। রজনী প্রভাত হইতে না হইতে দলে দলে লোক আসিয়া মতিঝিলের প্রাসাদ পূর্ণ করিয়া ফেলিল। স্বয়ং আলিবর্দ্দী স্বজন ও

অক্ষয়বাবু লিখিয়াছেন:—"রাজবল্লভ অপ্রাপ্তবয়স্ক মবারক-

ঘেসেটি বিবিকে বাল-বিধবারূপে পাঠকবর্গের সমীপে উপস্থিত করিবার অভিপ্রায়েই যে কৈলাস বাবু নিবাইসকে অকালে শমনভবনে প্রেরণ করিয়াছেন সে বিষয়ে সন্দেহ নাই।

ঘেসেটি বিবীর সহিত রাজবল্লভের অবৈধ প্রণয় থাকার কথা উল্লেখ করিয়া কৈলাস বাবু "জনৈক বিখ্যাত ঐতিহাসিকের" দোহাই দিয়াছেন। কিন্তু সেই ঐতিহাসিক যে অর্ম্মসাহেব ভিন্ন আর কেহ নহে তাহা আবার কৈলাস বাবু "নব্যভারতে" স্বীকার করিয়াছেন। অর্ম্মসাহেবের ইতিহাসে লিখিত আছে:—

A gentoo named Rajballab succeeded Hossain Kuly Khan in the post of Devan or prime minister to Newaish ; after whose death his influence continued with the widow with whom she wus supposed to be more intimate than became either her rank or his religion.—Orm's Indoostan, vol. II. page 49.

উদ্ধৃতস্থলে অর্ম্মসাহেব বলেন, লোকে অনুমান করে রাজবল্লভের সহিত ঘেসেটি বিবীর যেরূপ ঘনিষ্ঠতা হইয়াছিল তাহা ঘেসেট বিবীর পদ ও রাজবল্লভের ধর্ম্মানুমোদিত নহে। কিন্তু কৈলাস বাবু অর্ম্মসাহেবের লিখিত বৃত্তান্তের অনুবাদ করিতে গিয়া "লোকে অনুমান করে" এই কথাটি উঠাইয়া দিয়াছেন।

ফলতঃ রাজবল্লভের সহিত ঘেসেটি বিবীর প্রণয়-বৃত্তান্ত প্রকৃত নহে। সায়র মোতাক্ষরীণ-প্রণেতা গোলাম হোসেন এবং সেই গ্রন্থের ইংরেজী অনুবাদক হাজি মস্তফা সাহেব ঘেসেটবিবী ও তাঁহার প্রণয়াস্পদ ব্যক্তিগণের নামোল্লেখ করিয়া গিয়াছেন। রাজবল্লভ যে ঘেসেটি বিবীর সহিত অবৈধ প্রণয়ে লিপ্ত ছিলেন, একথা উহাঁদের কেহই বলেন নাই। এই অপবাদ প্রকৃত হইলে তাহা সায়ের মোতাক্ষরীণে কিংবা হাজি মস্তফাকৃত অনুবাদের টীকায় নিশ্চিতই লিখিত থাকিত। মুরশিদাবাদ-কাহিনীপ্রণেতা নিখিল বাবু বলেন, "রাজবল্লভের সহিত ঘেসেটি বিবির অবৈধ প্রণয়সম্বন্ধে অর্ম্মসাহেবের ইতিহাসে যে ইঙ্গিত আছে, তাহা সম্পূর্ণ ভিত্তিশূন্য। (মুরসিদাবাদ-কহিনী ১৬১ পৃঃ)। নিখিল বাবু মুরসিদাবাদ অঞ্চলে বাস করেন, এই প্রণয়বৃত্তান্ত সত্য হইলে তিনি অবশ্যই এ সম্বন্ধে জনরব শুনিতে পাইতেন।

হইয়া তন্মধ্যে বাস করিতে লাগিলেন। যে সকল যোদ্ধা নিবাইসের আমলে তাঁহার সেনাদলভুক্ত হইয়াছিল, তাহাদিগকে বশীভূত রাখিবার উদ্দেশ্যে প্রচুর অর্থ প্রদান করা হইল। সেনাদল এইরূপ অনুগ্রহ লাভ করিয়া এতদূর প্রীত হইল যে, তাহারা ঘেসেটিবিবীর স্বার্থ রক্ষা করিবার উদ্দেশ্যে সিরাজের বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করিতে অণুমাত্রও কুণ্ঠিত হইবে না বলিয়া প্রতিজ্ঞা করিল। নজর আলি নামে জনৈক মুসলমান এই সেনাদলের নায়ক হইলেন। নজরআলির সহিত হোসেনকুলীর আকারগত অনেক সাদৃশ্য ছিল। হোসেনকুলীর মৃত্যুর পর হইতে নজর আলিই ঘেসেটিবিবীর অনুগ্রহভাজন হইয়া পড়িয়াছিলেন। মৃত্যুর পূর্ব্বে নিবাইস যেমন বাঙ্গালার সিংহাসনসম্বন্ধে সিরাজের প্রবল প্রতিদ্বন্দী ছিলেন, এখন রাজবল্লভের পরামর্শে পরিচালিত হইয়া ঘেসেটি-বিবীও ঠিক সেইরূপ প্রতিদ্বন্দী হইয়া দাঁড়াইলেন। (১)

---

(1) Sair, vol. II. page 184 & Riazoo Salatin, page 363.

শ্রীযুক্ত কৈলাসচন্দ্র সিংহ ১২৮৯ সালের বান্ধব পত্রিকার ৭৭ পৃষ্ঠায় লিখিয়াছেন, "নিবাইস অকালে পরলোক গমন করিলে আলিবর্দ্দী দুহিতাকে স্বামীর সিংহাসনে স্থিরতর রাখিলেন। এই সময় রাজবল্লভ প্রধান রাজপুরুষ। ক্রমে তাঁহার সহিত বিধবা শাসনকর্ত্রীর একটি ঘৃণিত সম্পর্ক সৃষ্ট হইল। জনৈক বিখ্যাত ঐতিহাসিক লিখিয়াছেন, "নিবাইস-পত্নীর সহিত রাজবল্লভের যে সম্পর্ক হইয়াছিল, তাহা জাতি ধর্ম্ম, ব্যবহার ও বিধি বিরুদ্ধ বটে।"

ফলে নিবাইস কথনও অকালে পরলোক গমন করেন নাই। ১৭৫৬ খৃষ্টাব্দের জানুয়ারী মাসে তিনি এবং এই ঘটনার দুই কি তিনমাস পরে তাঁহার কনিষ্ঠ ভ্রাতা সৈয়দ আহাম্মদ কালগ্রাসে পতিত হন। মৃত্যুকালে সৈয়দ আহাম্মদের বয়স অন্যূন ৬০ বৎসর ছিল (Sair, vol II. page 161 —মোতাক্ষরীণ-প্রণেতা গোলাম হোসেন-সৈয়দ আহাম্মদকে উপলক্ষ করিয়া বলিতেছেন, "তিনি ৬০ বৎসর বয়স্ক প্রবীণ ব্যক্তি এবং আমি ২৭ বৎসর বয়স্ক যুবক মাত্র।")

সপ্তম অধ্যায়

প্রথম পরিচ্ছেদ

ইংরেজ বণিক্

ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানি বাণিজ্য করিবার উদ্দেশ্যে ভারতবর্ষে উপস্থিত হইয়া সর্ব্ব প্রথম সুরাটবন্দরে কুঠী সংস্থাপন করিল। বাউটন নামে জনৈক ইংরেজ সেই কুঠীর চিকিৎসক পদে নিযুক্ত ছিলেন। ১৬৩৬ খৃষ্টাব্দে সম্রাট্ সাহজাহানের কন্যা দুশ্চিকিৎস্য রোগে আক্রান্ত হইলে, বাউটন সাহেব অনেক চেষ্টা করিয়া তাঁহাকে রোগমুক্ত করিলেন। সম্রাট্ এই ঘটনায় নিরতিশয় প্রীতি লাভ করিয়া বাউটন সাহেবকে পুরস্কৃত করিতে উদ্যত হইলে. তিনি স্বার্থসাধন অপেক্ষা স্বজাতীয় কল্যাণ অধিকতর বাঞ্ছনীয় মনে করিয়া, ইংরেজ কোম্পানিকে বিনা শুল্কে বাণিজ্য করিবার অধিকার দিবার নিমিত্ত সম্রাটের নিকট অনুমতি প্রার্থনা করিলেন। সম্রাট্ এই মহানুভব চিকিৎসকের প্রার্থনা পূর্ণ করিয়া তাঁহাকে একখানি সনন্দ প্রদান করিলে, বাউটন সাহেব সেই সনন্দসহ বাঙ্গালায় উপস্থিত হইলেন। তৎকালে সুলতান সুজা বাঙ্গালার শাসনকর্ত্তৃত্বে নিযুক্ত ছিলেন। বাউটনের আগমনের পূর্ব্ব হইতে সুজার সহধর্ম্মিণী বিবিধ দুরারোগ্য ব্যাধিতে আক্রান্ত হইয়া অত্যন্ত কষ্ট

উদ্দৌলাকে সিংহাসনে বসাইয়া ঘেসেটি বিবীর নামে স্বয়ং বাঙ্গালা, বিহার ও উড়িষ্যায় নবাবী করিবার কল্পনা করিলেন।" (১)

এই কথা যে সায়র মোতাক্ষরীণে লিখিত বৃত্তান্ত দ্বারা সমর্থিত হইতেছে তাহাও আবার অক্ষয়বাবুই উল্লেখ করিয়াছেন। দুঃখের বিষয় সায়র মোতাক্ষরীণের কোন্ পৃষ্ঠায় সেই কথা সমর্থিত হইয়াছে তাহা লিখিতে অক্ষয়বাবু বিস্মৃত হইয়াছেন। রাজবল্লভ যে স্বয়ং নবাবী করিবার কল্পনা করিতেছিলেন, এ কথা সায়র মোতাক্ষরীণের কোন স্থলেই লিখিত নাই। সায়র মোতাক্ষরীণ পাঠে ইহাই বরং প্রতীয়মান হইবে যে, ঘেসেটিবিবীই সিরাজের প্রতিদ্বন্দ্বী হইয়া দাঁড়াইয়াছিলেন এবং রাজবল্লভ সেই মহিলার পৃষ্ঠপোষক ও পরামর্শদাতৃস্বরূপ কার্য্য করিয়াছেন।

পূর্ব্ব-বাঙ্গালার জনসাধারণ রাজবল্লভকে পূতচরিত্র বলিয়াই অবগত আছে এবং সমসাময়িক লেখকগণ তাঁহাকে "দাতা" "শুদ্ধাচারী" বলিয়াই বর্ণনা করিয়াছেন। সায়রমোতাক্ষরীণপাঠে অবগত হওয়া যায়, হোসেন কুলীর মৃত্যুর পর আকারগত সাদৃশ্যের নিমিত্ত নজরআলী নামক একজন মুসলমান সেনানী ঘোসেটি বিবীর সুনজরে পড়িয়াছিলেন। অর্ম্মসাহেব যে ভ্রমে পতিত হইয়া নজর আলির দোষ রাজবল্লভের স্কন্ধে নিক্ষেপ করিয়াছেন, সেবিষয়ে সন্দেহ নাই। অর্ম্মসাহেবও এ সম্বন্ধে অনুমান করা ভিন্ন স্পষ্ট করিয়া কিছু বলেন নাই। উপযুক্ত ভিত্তিশূন্য অনুমান কখনও প্রমাণ নহে। রাজবল্লভ তৎকালে পরিণত বয়সে পদার্পণ করিয়াছিলেন। বিলাস-পরায়ণা নবাবনন্দিনী যে রাজবল্লভের ন্যায় একজন নিষ্ঠাবান্ প্রৌঢ় হিন্দুকর্ম্মচারীর প্রেমে আসক্ত হইবেন তাহা কদাচ সম্ভবপর নহে। "রিয়াজু সেলাতিন" প্রভৃতি অন্য কোনও মুসলমান-প্রণীত ইতিহাসেও এ কথার উল্লেখ নাই।

(১) সিরাজউদ্দৌল্লা ১১২ পৃঃ।

সপ্তম অধ্যায়

প্রথম পরিচ্ছেদ

ইংরেজ বণিক্

ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানি বাণিজ্য করিবার উদ্দেশ্যে ভারতবর্ষে উপস্থিত হইয়া সর্ব্ব প্রথম সুরাটবন্দরে কুঠী সংস্থাপন করিল। বাউটন নামে জনৈক ইংরেজ সেই কুঠীর চিকিৎসক পদে নিযুক্ত ছিলেন। ১৬৩৬ খৃষ্টাব্দে সম্রাট্ সাহজাহানের কন্যা দুশ্চিকিৎস্য রোগে আক্রান্ত হইলে, বাউটন সাহেব অনেক চেষ্টা করিয়া তাঁহাকে রোগমুক্ত করিলেন। সম্রাট্ এই ঘটনায় নিরতিশয় প্রীতি লাভ করিয়া বাউটন সাহেবকে পুরস্কৃত করিতে উদ্যত হইলে. তিনি স্বার্থসাধন অপেক্ষা স্বজাতীয় কল্যাণ অধিকতর বাঞ্ছনীয় মনে করিয়া, ইংরেজ কোম্পানিকে বিনা শুল্কে বাণিজ্য করিবার অধিকার দিবার নিমিত্ত সম্রাটের নিকট অনুমতি প্রার্থনা করিলেন। সম্রাট্ এই মহানুভব চিকিৎসকের প্রার্থনা পূর্ণ করিয়া তাঁহাকে একখানি সনন্দ প্রদান করিলে, বাউটন সাহেব সেই সনন্দসহ বাঙ্গালায় উপস্থিত হইলেন। তৎকালে সুলতান সুজা বাঙ্গালার শাসনকর্ত্তৃত্বে নিযুক্ত ছিলেন। বাউটনের আগমনের পূর্ব্ব হইতে সুজার সহধর্ম্মিণী বিবিধ দুরারোগ্য ব্যাধিতে আক্রান্ত হইয়া অত্যন্ত কষ্ট

পাইতেছিলেন, দেশীয় কোন চিকিৎসকই তাঁহার রোগের অপনোদন করিতে সমর্থ হন নাই। বাউটন সাহেব বাঙ্গালায় আসিলে সুলতান সুজা তাঁহাকে সহধর্ম্মিণীর চিকিৎসার নিমিত্ত আহ্বান করিলেন। সেই ভিষক্‌কুলতিলকের চিকিৎসার কৌশলে নবাবপত্নী অচিরেই রোগমুক্ত হইলেন। নবাব প্রিয়তমা পত্নীর আরোগ্যলাভে নিরতিশয় সন্তুষ্ট হইয়া বাউটন সাহেবকে রাজবৈদ্যরূপে নিযুক্ত করিলেন। এখন হইতে নবাব দরবারে বাউটনসাহেবের প্রতিপত্তির আর পরিসীমা রহিল না। অতঃপর সুরাটের কুঠীর অধ্যক্ষ ১৬৪০ খৃষ্টাব্দে দুইখানি বাণিজ্য পোত ইংলণ্ড হইতে আনাইয়া বাঙ্গালায় প্রেরণ করিলে, বাউটন সাহেবের অনুগ্রহে উভয় পোতের অধ্যক্ষই নবাব দরবারে সাদরে অভ্যর্থিত হইলেন।

ইউরোপ হইতে যে সমস্ত পণ্য এ দেশে প্রেরিত হইতেছিল, তদ্দ্বারা প্রথম প্রথম পাশ্চাত্য বণিক্‌সম্প্রদায় তাদৃশ লাভবান্ হইতেন না। তৎকালে রেশম ও কার্পাসনির্ম্মিত বস্ত্রপ্রভৃতি যে সমস্ত পণ্য দ্রব্য এ দেশ হইতে রপ্তানি হইয়া ইউরোপে বিক্রীত হইত, তদ্দ্বারাই পূর্ব্বোক্ত বণিক্‌সম্প্রদায় সবিশেষ লাভবান্ হইতেন। যে সমস্ত ভারতবাসী বস্ত্রবয়নকার্য্যে লিপ্ত থাকিত তাহাদের অবস্থা অতি শোচনীয় ছিল। অর্থের অসংস্থাননিবন্ধন তাহারা উপযুক্ত বাসস্থান পর্য্যন্ত নির্ম্মাণ করিতে সমর্থ হইত না। এক একদিনের পরিশ্রমের ফলে যে পরিমাণ অর্থ সংগৃহীত হইত, তদ্দ্বারাই তাহারা সেই সেই দিনের আহার্য্য ক্রয় করিত এবং অর্থ সঞ্চয় করা কাহাকে বলে তাহা সেই হতভাগ্যগণ স্বপ্নেও জানিতে পারিত না। একমাত্র বস্ত্রবয়নের তাঁত এবং শারীরিক শক্তির উপর নির্ভর করিয়াই তাহারা জীবনসংগ্রামে লিপ্ত হইত। যাহারা বস্ত্রবিক্রয়ের ব্যবসায় করিত, তাহাদিগকে এই সমস্ত তন্তুবায়ের

সহায়তায় বস্ত্র প্রস্তুত করাইয়া লইতে হইত। কিন্তু তন্তুবায়গণ এমনই দুরবস্থাপন্ন ছিল যে. বস্ত্রবয়নোপযোগী উপকরণ এবং দৈনিক আহার্য্য সংগ্রহ করিতে যে অর্থের প্রয়োজন হয় তাহা পর্য্যন্ত তাহাদের হস্তে সঞ্চিত থাকিত না। সুতরাং বস্ত্রব্যবসায়িগণ এক এক তন্তুবায়ের সহিত নির্দ্দিষ্ট সংখ্যক বস্ত্র নির্দ্ধারিত সময়ের মধ্যে প্রস্তুত করার বন্দোবস্ত করিয়া, বস্ত্রবয়নোপযোগী উপকরণ ও দৈনিক আহার্য্য সংগ্রহের নিমিত্ত তাহাকে নির্দ্ধারিত মূল্যের কিয়দংশ অগ্রিম প্রদান করিত। প্রচলিত ভাষায় এই অগ্রিম প্রদত্ত অর্থই "দাদন" নামে অভিহিত ছিল। তন্তুবায়গণ "দাদন" গ্রহণ করিলেই নির্দ্দিষ্ট পরিমাণ বস্ত্র নির্দ্ধারিত সময়মধ্যে বস্ত্রব্যবসায়ীকে সরবরাহ করিতে বাধ্য হইত। এই উপায়ে বস্ত্রসংগ্রহ করিতে হইলে যে সুদীর্ঘ সময়ের প্রয়োজন, সে কথা বলা বাহুল্য মাত্র। ইউরোপ হইতে কোন বাণিজ্যপোত পূর্ব্বাহ্লে বস্ত্রসংগ্রহের সুবন্দোবস্ত না করিয়া এদেশে আসিলে. একমাত্র বস্ত্রসংগ্রহকার্য্যেই অনেক কাল অতীত হইয়া যাইত এবং তাহাতে প্রচুর ব্যয়বাহুল্যও ঘটিত। এ দেশে কুঠী সংস্থাপন করিতে পারিলে তথায় উপযুক্ত পরিমাণ বস্ত্র সংগৃহীত হইতে পারিবে এবং উপযুক্ত পরিমাণ বস্ত্র সংগৃহীত হইলে সংবাদ অনুসারে ইউরোপ হইতে বাণিজ্য-পোত আসিয়া অল্পসময়মধ্যে বহন করিয়া নিতে সমর্থ হইবে, ইহা ভাবিয়াই এখন পাশ্চাত্য বণিক্‌সম্প্রদায় ভারতবর্ষে কুঠীসংস্থাপন করিবার সংকল্প করিলেন. তদনুসারে বাঙ্গালা দেশের মধ্যে হুগলীর বন্দরেই ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির সর্ব্বপ্রথম এক কুঠী সংস্থাপিত হইল। নবাবের অনুমতি লাভ ব্যতিরেকে ইংরেজরা প্রথম প্রথম হুগলীর কুঠীতে আত্মরক্ষার অভিপ্রায়ে সেনাসন্নিবেশ করিতে পারিলেন না। সুরাটের বন্দরে যে কুঠী অবস্থিত ছিল, তথায় তাঁহারা ইতিপূর্ব্বেই কর্ত্তৃপক্ষ হইতে অনুমতি লাভ করিয়া সেনা রাখিয়াছিলেন। সুতরাং আত্মরক্ষার অভিপ্রায়ে

বাঙ্গালা দেশীয় সমস্ত কুঠীই মান্দ্রাজ প্রদেশীয় কুঠীসমূহের অধীন হইয়া চলিতে লাগিল।

অতঃপর ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানি বহু অর্থব্যয় করিয়া ১৬৬০ খৃষ্টাব্দে ঢাকা ও বাঙ্গালার অন্যান্য স্থানে কুঠী সংস্থাপন করিলেন। এখন বাঙ্গালার নবাব সুবিধা পাইয়া ইংরেজ বণিক্‌সম্প্রদায়ের নিকট হইতে শুল্কের দাবিতে প্রচুর অর্থ আদায় করিতে কুণ্ঠিত হইলেন না। ১৫৮৫ খৃষ্টাব্দে কলিকাতানগরস্থাপয়িতা সুপ্রসিদ্ধ যব্‌ চার্ণক সাহেব হুগলীর কুঠীর অধ্যক্ষ হইয়া বাঙ্গালায় আসিলে নবাবের উৎপীড়ন অসহনীয় মনে করিয়া তিনি তদ্বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করিলেন। ইংরেজ জাতির সৌভাগ্য-সূর্য্য উদিত হইতে তখনও অনেক বিলম্ব ছিল। সুতরাং নবাব সায়েস্তা খাঁ সহজেই হুগলীর কুঠী অধিকার করিয়া ইংরেজদিগকে বাঙ্গালা হইতে তাড়াইয়া দিলেন। ১৬৮৯ খৃষ্টাব্দে ইংরেজ দিগের সহিত বাঙ্গালার নবাবের যে সন্ধি হইল, তদনুসারে যব চার্ণক সাহেব কতিপয় সেনা লইয়া বাঙ্গালায় পুনরাগমনপূর্ব্বক সুতানুটী গ্রামে এক কুঠী সংস্থাপন করিলেন। এই সময় সম্রাট্‌ আরঙ্গজেব দিল্লীর সিংহাসনে আসীন ছিলেন। তিনি ১৬৯০ খৃষ্টাব্দে ইংরেজ কোম্পানিকে এই নিয়মে এক সনন্দ প্রদান করিলেন যে, বার্ষিক তিন সহস্র মুদ্রা প্রদান করিলেই তাঁহারা বিনা শুল্কে বাঙ্গালা দেশে বাণিজ্য করিতে পারিবেন।

সুতানুটীর কুঠী নির্ম্মিত হওয়ার পর হইতে ইংরেজরা তথায় দুর্গ নির্ম্মাণ করিবার নিমিত্ত ব্যগ্র হইয়া উঠিলেন। কিন্তু ক্রমে পাঁচ বৎসর চেষ্টা করিয়াও তাঁহারা নবাবের অনুমতি লাভ করিতে পারিলেন না। সৌভাগ্যক্রমে ইতিমধ্যে বর্দ্ধমানাধিপ বিদ্রোহী হইয়া হুগলী ও মুরসিদাবাদ লুণ্ঠন করিলে, নবাব পাশ্চাত্য বণিক্‌গণকে আত্মরক্ষার উপায় অবলম্বন করিবার অনুমতি প্রদান করিলেন। তদনুসারে ১৬৯৬ খৃষ্টাব্দে, অর্থাৎ

ইব্রাহিম খাঁর নবাবী আমলে. ইংরেজেরা কলিকাতায়, ওলন্দাজেরা চুঁচুড়ায় এবং ফরাসিরা চন্দননগরে দুর্গ নির্ম্মাণ করিয়া শক্তিসঞ্চয় করিতে প্রবৃত্ত হইলেন।

১৬৯৭ খৃষ্টাব্দে সম্রাট্পুত্র আজিম ওসান বাঙ্গালার নবাব হইয়া আসিলে ইংরেজরা প্রচুর উপঢৌকন সহ তাঁহার দরবারে উপস্থিত হইলেন। উপঢৌকনের প্রাচুর্য্যে সন্তুষ্ট হইয়া নবাব ইংরেজদিগকে সুতানুটী, কলিকাতা ও গোবিন্দপুর প্রভৃতি হুগলী নদীর পূর্ব্বতটস্থ কয়েকটি গ্রামের তিনমাইল পরিমিত ভূমি ক্রয় করিবার অধিকার প্রদান করিলেন।

এই সময় কলিকাতা বনজঙ্গলে পরিপূর্ণ ছিল এবং তথায় কেবল হিংস্র জন্তুগণই বাস করিত। কিন্তু ইংরেজ দিগের হস্তে আসিয়া তাহা অপূর্ব্ব শ্রীধারণ করিল। এখন শ্রমজীবিগণ দলে দলে নবাবের অধিকার পরিত্যাগ করিয়া কলিকাতায় আসিয়া গৃহ প্রতিষ্ঠা করিল এবং অল্পকাল মধ্যেই উহা জনমানবে পরিপূর্ণ হইয়া গেল। কলিকাতার এইরূপ দ্রুত উন্নতি লক্ষ্য করিয়া হুগলীর ফৌজদার নিরতিশয় শঙ্কিত হইলেন এবং কিরূপে সে স্থলের লোক প্রবাহ রুদ্ধ করিবেন তাহার উপায় নির্দ্ধারণ কল্পে ব্যস্ত হইয়া পড়িলেন। অবশেষে তিনি কলিকাতা প্রবাসী ইংরেজ অধ্যক্ষকে লিখিয়া পাঠাইলেন, নবাবের যে সমস্ত প্রজা কলিকাতায় বাস করিতেছে, তাহাদের বিচারকার্য্যনির্ব্বাহের উদ্দেশ্যে শীঘ্রই একজন কাজি কলিকাতায় প্রেরিত হইবে। ইংরেজেরা ইহাতে প্রমাদ গণিয়া পুনরায় প্রচুর উপঢৌকন সহ আজিম ওসানের আশ্রয় গ্রহণ করিলেন, তিনি ইংরেজদিগের পক্ষাবলম্বী হইয়া দাঁড়াইলেন। নবাবের এইরূপ পৃষ্ঠপোষকতায় পূর্ব্বোক্ত ফৌজদারের অভিপ্রায় আর কার্য্যে পরিণত হইতে পারিল না।

তৎকালে কলিকাতা, ঢাকা, কাশিমবাজার, হুগলী ও বালেশ্বর প্রভৃতি

স্থানে ইংরেজদিগের বাণিজ্যকুঠী সংস্থাপিত হইয়াছিল। এই সমস্ত কুঠীর মধ্যে কলিকাতার কুঠীতেই অধিক সংখ্যক সেনা বাস করিত। ১৭০৭ খৃষ্টাব্দে কলিকাতার দুর্গে যে সমস্ত সেনা ছিল, তাহাদের সংখ্যা তিনশতের ন্যূন হইবে না। ইংরেজ কোম্পানি এখন কলিকাতার কুঠীকে প্রেসিডেন্সির আসনে উন্নীত করিলেন এবং বাঙ্গালার অন্যান্য কুঠী সমূহকে কলিকাতাস্থ কুঠীর অধীন করিয়া দিলেন। এ পর্য্যন্ত মাদ্রাজ প্রদেশীয় সর্ব্বপ্রধান কুঠীর তত্ত্বাবধানে যে বাঙ্গালার সমস্ত কুঠীর কার্য্য নির্ব্বাহিত হইতেছিল, তাহা এখন হইতে রহিত হইয়া গেল।

আজিম ওসান হইতে ভূমি ক্রয় করিবার অধিকার লাভ করা সত্ত্বেও ইংরেজরা সুচতুর মুরসিদকুলীর প্রতিবন্ধকতায় ঐ অধিকার কার্য্যে পরিণত করিতে সমর্থ হন নাই। মুরসিদকুলী গোপনে সমস্ত জমিদারদিগকে ডাকাইয়া ইংরেজ দিগের নিকট ভূমি বিক্রয় করিতে নিষেধ করিয়াছিলেন; সুতরাং কোন জমিদারই সাহস করিয়া আর ইংরেজ দিগের নিকট ভূমি বিক্রয় করিতে অগ্রসর হইল না। ইংরেজ জাতির স্বভাবই এই যে তাঁহারা সহজে সংকল্প পরিত্যাগ করেন না। সুতরাং তাঁহারা মুরসিদ কুলীখাঁর বিরুদ্ধাচরণে ভগ্নোৎসাহ না হইয়া সম্রাট্দরবারে যোগাড় করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। অবশেষে ১৭১৭ খৃষ্টাব্দে সম্রাট্ ইংরেজ দিগকে এই বলিয়া এক সনন্দ প্রদান করিলেন যে তাঁহারা কলিকাতার নিকট-বর্ত্তী ৩৭ খানি গ্রাম ক্রয় করিতে পারিবেন এবং বাঙ্গালার নবাব এবিষয়ে কোনরূপ প্রতিবন্ধকাচরণ করিলে তাঁহাকে সম্রাটের বিরাগভাজন হইতে হইবে।

১৭৪২ খৃষ্টাব্দে মহারাষ্ট্রীয়েরা সদলবলে বাঙ্গালায় প্রবেশ করিলে, নবাব আলিবর্দ্দী ইংরেজ দিগকে কলিকাতার কুঠী সুরক্ষিত করার আদেশ প্রদান করিলেন। এই আদেশের বলে ইংরেজেরা সুতানুটির

উত্তর প্রান্ত হইতে গোবিন্দপুরের দক্ষিণ প্রান্ত পর্য্যন্ত এক সুদীর্ঘ খাল খনন করিলেন। সেই খালই এখন "মহারাষ্ট্রীয় খাত" নামে অভিহিত হইতেছে। এই সময় ওয়াট সাহেব কাসিমবাজারের এবং ড্রেক সাহেব কলিকাতার কুঠীর অধ্যক্ষপদে অধিষ্ঠিত ছিলেন (১)।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

আত্ম রক্ষার উদ্যোগে

সিরাজ পূর্ব্বে ভাবিয়াছিলেন, হোসেনকুলী ও তদীয় ভ্রাতুষ্পুত্র হাসনউদ্দিনকে হত্যা করিতে পারিলেই তিনি নিষ্কণ্টকে বাঙ্গালার সিংহাসন অধিকার করিতে পারিবেন। কিন্তু এখন তিনি স্পষ্টই বুঝিতে পারিলেন, যে পর্য্যন্ত রাজবল্লভ জীবিত থাকিবেন সে পর্য্যন্ত তাঁহার পক্ষে নিরাপদে সিংহাসন লাভের আশা করা বিড়ম্বনা মাত্র। ফলে, এই সময় ঘেসেটি বিবীর পক্ষ রাজবল্লভের পরামর্শে পরিচালিত হইয়া অত্যন্ত দুৰ্দ্ধর্ষ হইয়া উঠিয়াছিল এবং মুরসিদাবাদবাসী যাবতীয় লোকেই মনে করিতেছিল যে, আলিবৰ্দ্দীর জীবন-প্রদীপ নির্ব্বাপিত হইলেই ঘেসেটি বিবীর সেনাদল রাজপ্রাসাদ আক্রমণ করিয়া বাঙ্গালার সিংহাসন অধিকার করিয়া বসিবে। সিরাজ ও তৎপক্ষীয় লোকেরা সহজে বাঙ্গালার

(1) Orme's Indoostan, vol. II. page 8 to 25.

সিংহাসন লাভের আশা পরিত্যাগ করিতে প্রস্তুত ছিলেন না ; সুতরাং তাঁহারা এখন রাজবল্লভের সর্ব্বনাশ সাধনে কৃত সংকল্প হইয়া দাঁড়াইলেন।

রাজবল্লভও অতিশয় সুচতুর রাজনৈতিক ছিলেন। সিরাজ যে অতঃপর তাঁহারই অনিষ্টাচরণে প্রবৃত্ত হইবেন, তাহা রাজবল্লভ পূর্ব্বেই অনুমান করিয়া সমস্ত ধনসম্পদ রক্ষার নিমিত্ত উপায় অবলম্বন করিতে ত্রুটি করিলেন না।

এই সময় ইংরেজ-বণিকেরা বাঙ্গালাদেশে শক্তিশালী জাতি বলিয়া পরিচিত হইতেছিলেন। ইতিপূর্ব্বে, রাজবল্লভের সহিত ইংরেজদিগের যে কয়েকবার সংঘর্ষ উপস্থিত হইয়াছিল, তাহাতেই ইংরেজেরা রাজবল্লভের কৃতিত্ব ও দৃঢ়তার পরিচয় পাইয়াছিলেন। ১৭৪৯ খৃষ্টাব্দে হুগলী বন্দরস্থ মুসলমান ও আরমাণী বণিকদিগের পণ্যদ্রব্য বহন করিয়া এক খানি বাণিজ্যপোত বঙ্গোপসাগরের মধ্য দিয়া যাইতেছিল ; কোন ইংরেজ-রণতরী সেই পোত আক্রমণ করিয়া সমস্ত পণ্যদ্রব্য লুণ্ঠন করিল। নবাব আলিবর্দ্দী এই অত্যাচারকাহিনী শুনিতে পাইয়া সমস্ত লুণ্ঠিত দ্রব্য মুসলমান ও আরমাণী বণিকদিগকে প্রত্যর্পণ করিবার নিমিত্ত কলিকাতাস্থ কুঠীর ইংরেজ অধ্যক্ষের প্রতি আদেশ পাঠাইলেন। ইংরেজেরা এই আদেশ প্রতিপালন করিতে বিলম্ব করিলে, নবাব তৎক্ষণাৎ ইংরেজ আড়ঙ্গের গোমস্তাকে কারারুদ্ধ করিলেন। এবং যাহাতে ইংরেজের কোন বাণিজ্য-নৌকা বাঙ্গালার মধ্য দিয়া গমনাগমন না করিতে পারে, তাহার উপায় অবলম্বন করিবার নিমিত্ত ভিন্ন ভিন্ন প্রদেশের শাসন কর্ত্তৃগণকে আদেশ দিতেও বিস্মৃত হইলেন না। রাজবল্লভ তৎকালে ঢাকার দেওয়ান ছিলেন। তিনি নবাবের আদেশ পাইয়াই ঢাকা বিভাগস্থ সমস্ত ব্যবসায়ী হইতে এই নিয়মে মুচলিকা গ্রহণ করিলেন যে, তাহারা ইংরেজ কুঠীর সংশ্লিষ্ট কোন লোকের নিকটই কোনরূপ

পণ্যদ্রব্য বিক্রয় করিতে পারিবে না। ব্যবসায়ীগণ গোপনে ইংরেজদিগের সহিত কোনরূপ সংস্রব রাখিতে না পারে এই উদ্দেশ্যে তিনি অতঃপর ঢাকা হইতে বাকরগঞ্জ পর্য্যন্ত প্রত্যেক চৌকীতে প্রহরী নিযুক্ত করিলেন (১)। এই সমস্ত চেষ্টার ফলে ইংরেজদিগের বাণিজ্য একেবারে বন্ধ হইবার উপক্রম হইল। অগত্যা তাহারা লুণ্ঠিত পণ্যদ্রব্যের ক্ষতিপূরণ করিয়া বাণিজ্য রক্ষা করিলেন।

১৭৫৪ খৃষ্টাব্দের প্রথমভাগে হোসেনকুলী নিহত হইলে, রাজবল্লভ তৎপদে নিযুক্ত হইয়া পাশ্চাত্য বণিক দিগের নিকট প্রচলিত "নজরাণা" তলব করিলেন। কিন্তু পাশ্চাত্যেরা স্বভাবসিদ্ধ ঔদ্ধত্য বশতঃ সহজে রাজবল্লভের আদেশ প্রতিপালন করিতে সম্মত হইল না। তৎকালে কোন ব্যক্তি উচ্চ রাজপদে নিযুক্ত হইলেই, প্রজাসাধারণ সম্মান প্রদর্শনার্থ তাঁহাকে "নজরাণা" স্বরূপ কিঞ্চিৎ অর্থ প্রদান করিত। পাশ্চাত্য বণিকগণ সেই নিয়ম লঙ্ঘন করিয়া ধৃষ্টতা প্রদর্শন করিলে, রাজবল্লভ তাহাদিগকে উপযুক্ত শাসন করিবার নিমিত্ত কৃতসংকল্প হইলেন এবং সমস্ত পাশ্চাত্য বণিক দিগকে বলিয়া পাঠাইলেন যে, "নজরাণা" প্রদান না করিলে তাহাদিগের বাণিজ্য একেবারে বন্ধ করিয়া দেওয়া হইবে। অগত্যা ফরাসি-প্রমুখ প্রত্যেক জাতীয় বণিক সম্প্রদায়ই ৪৩০০৲ টাকা নজরাণা স্বরূপ প্রদান করিয়া রাজবল্লভের অনুকম্পা লাভ করিল। (২)

পূর্ব্বে বলা হইয়াছে, আক্রামউদ্দৌল্লার মৃত্যুর পর মবারকউদ্দৌলা

(1) Long's Unpublished Records of Government, page 17.

(2) Long's Unpublished Records of Government, page 52 —Rajballab becoming Nawab of Dacca peremptorily demanded the *usual* visit from the three nations. The French compounded it for Rs. 4300 and the English did the same rather than have the trade stopped—Despatch, dated the 1st. March, 1754.

১৭৫৪ খৃষ্টাব্দের শেষভাগে ঢাকার নবাবীপদ লাভ করেন। এই সময় রাজবল্লভই নিবাইসের সংসারের সর্ব্বপ্রধান কর্ম্মচারী ছিলেন। তিনি এই উপলক্ষে মবারকউদ্দৌল্লার "নজরাণা" স্বরূপ ইংরেজ বণিক দিগের নিকট দশ সহস্র মুদ্রা দাবি করিয়া পাঠাইলেন। এবারেও ইংরেজেরা বিনা আপত্তিতে আদেশ প্রতিপালন করা সঙ্গত মনে না করিয়া, কুঠীর দেওয়ান ও আমমোক্তারের যোগে রাজবল্লভকে সংবাদ দিলেন যে, 'ফরাসিস এবং ওলন্দাজ বণিকগণ আদিষ্ট পরিমাণ টাকা না দিলে আমরাও তাহা দিতে প্রস্তুত নহি।' রাজবল্লভ ইংরেজ দিগের ধৃষ্টতার প্রতিফল দেওয়ার উদ্দেশ্যে দেওয়ানকে কারারুদ্ধ করিলেন এবং আমমোক্তারকে মুক্তিপ্রদান করিয়া তাহার যোগে ইংরেজ দিগকে বলিয়া পাঠাইলেন যে, "নজরাণা" প্রদান করিতে অসম্মত হইলে ইংরেজ-দিগকে প্রচলিত নিয়মানুসারে উপঢৌকন দিতে হইবে। কেবল এইরূপ ভয়প্রদর্শন করিয়াই তিনি যে নিরস্ত রহিলেন এমন নহে, রাজবল্লভ সঙ্গে সঙ্গে ইংরেজ দিগকে উপযুক্ত শিক্ষা দিবারও বন্দোবস্ত করিলেন। এই সময় কতিপয় নৌকা ইংরেজদিগের পণ্য বহন করিয়া বাকরগঞ্জ হইতে রওণা হইয়াছিল। রাজবল্লভ আদেশ প্রদান করিয়া সে সমস্ত নৌকাই আবদ্ধ করাইলেন। অগত্যা ইংরেজেরা তিন সহস্র টাকা নজরাণা স্বরূপ প্রদান করিয়া রাজবল্লভের অনুগ্রহ লাভ করিতে সমর্থ হইলেন (১)।

(1) Long's Unpublished Records, page 55.—Consultations, dated the 12th February, 1755, and also History of Backergunj by Beveridge, page 43.

অক্ষয় বাবু লিখিয়াছেন, "রাজবল্লভ যখন ঢাকার নবাব বলিয়া পরিচিত ছিলেন, সে সময় তিনি বিনা কারণে ইংরেজ দিগের দুর্গতির একশেষ করিয়া ছাড়িয়াছিলেন। রাজবল্লভ একবার নজর তলপ করিয়া পাঠাইলেন, ইংরেজ তাহাতে ভ্রূক্ষেপ করিলেন

ইংরেজ জাতি চিরকালই দৃঢ়তার নিকট মস্তক অবনত করে। রাজবল্লভ পূর্ব্বোক্তরূপে ইংরেজদিগকে স্বীয় আদেশ প্রতিপালন করিতে

না, অমনি রাজবল্লভ ইংরেজ দিগের গোমস্তা বর্গকে কারারুদ্ধ করিলেন ও ইংরেজের বাণিজ্য বন্ধ করিয়া দিলেন। * * * রাজবল্লভের শাসনে লোকে সাহস করিয়া আর ইংরেজের চাকুরী করিতেও স্বীকৃত হইল না। রাজবল্লভ পার্ব্বণী আদায়ের বা নজর আদায়ের উপলক্ষ করিয়া প্রায় মধ্যে মধ্যে এরূপ ব্যবহার ই করিতেন। * * * রাজ-বল্লভের ও কৃষ্ণবল্লভের উৎপীড়নে ইউরোপীয় বণিকগণ এরূপ বিপর্য্যস্ত হইতেন যে, সময় সময় তজ্জন্য নবাব দরবারে সমুদয় শ্রেণীর ইউরোপীয় বণিকগণ সমবেত ভাবে অভিযোগ করিয়া পরিত্রাণ পাইতেন।"—সিরাজউদ্দৌল্লা ১০৬ ও ১০৭ পৃঃ

রাজবল্লভ যে ইংরেজদিগের দুর্গতির একশেষ করিয়া দিয়াছিলেন, অথবা বিনা কারণে তাহাদের বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হইয়াছিলেন, এ কথার কোন প্রমাণ নাই। লঙ সাহেবের প্রকাশিত ইংরেজ দপ্তরের কাগজপত্রে যাহা লিখিত আছে তাহা পুর্ব্বে উদ্ধৃত করা হইয়াছে। তদ্দৃষ্টে প্রতীয়মান হইবে যে, ইংরেজেরা তৎকাল প্রচলিত "নজরাণা" দিতে অস্বীকার করায় ও আলিবর্দ্দীর আদেশ অমান্য করায়, রাজবল্লভ তাহাদিগের বাণিজ্য বন্ধ করিয়া দিয়া নজরাণার টাকা আদায় করিয়াছিলেন ও তাহাদিগকে আলিবর্দ্দীর আদেশ প্রতিপালন করিতে বাধ্য করিয়াছিলেন। তিনি যে বিনা কারণে ইংরেজ দিগের অশেষ দুর্গতি করিয়াছেন এ কথা মাত্রও তাহাতে লিখিত নাই। রাবল্লভের শাসনে যে কেহ সাহসী হইয়া ইংরেজদিগের চাকুরী করিতে অগ্রসর হয় নাই এ কথাই বা অক্ষয় বাবু কোথায় পাইলেন? অক্ষয় বাবু লিখিয়াছেন যে, লঙ সাহেবের প্রকাশিত ইংরেজ দপ্তরের কাগজপত্রে ঐ কথা লিখিত আছে। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশতঃ সমস্ত পুস্তক পাঠেও এই উক্তির সমর্থনের কোন প্রমাণ পাওয়া গেল না। রাজবল্লভ যে পার্ব্বণী ও নজর আদায় উপলক্ষ করিয়া প্রায়ই ইংরেজদিগের প্রতি অত্যাচার করিতেন, এ কথাও অক্ষয়বাবুর কপোল-কল্পিত ভিন্ন আর কিছুই নহে। এ সম্বন্ধে তিনি কোন প্রমাণই উদ্ধৃত করেন নাই। লঙ সাহেবের প্রকাশিত কাগজ পত্রে মাত্র দুইবার "নজরাণা" আদায়ের কথা লিখিত আছে এবং তাহা পূর্ব্বে উদ্ধৃত করা হইয়াছে। যে দুইবার এইরূপে নজরাণা আদায়

বাধ্য করিলে, তাঁহারাও ক্রমে রাজবল্লভের কার্য্যকুশলতা সম্বন্ধে শ্রদ্ধাবান হইয়া পড়িলেন। যে সময় ঘেসেটিবিবী সিরাজের প্রতিদ্বন্দীরূপে দণ্ডায়মান, তৎকালে ইংরেজদিগের কাশিমবাজারের কুঠী ওয়াটসাহেবের অধ্যক্ষতায় অর্পিত ছিল। রাজবল্লভের পৃষ্ঠপোষকতায় ঘেসেটিবিবী যে

হইয়াছিল, তাহার প্রত্যেকবারেই প্রচলিত নিয়মানুসারে ইংরেজদিগের নজরাণা প্রদান করা কর্ত্তব্য ছিল। নবাব আলিবর্দ্দী এবং সিরাজউদ্দৌলাও পাশ্চাত্য জাতিসমূহ হইতে সময় সময় নজরাণা আদায় করিয়াছেন, এ সম্বন্ধে কাহারও সন্দেহ হইলে তিনি লঙ সাহেবের প্রকাশিত ইংরেজ দপ্তরের কাগজপত্র দেখিতে পারেন। ফলে সেই সমস্ত কাগজপত্রে যে usual visit কথাটি লিখিত আছে, তাহার অর্থ "প্রায়ই আদায় করিতেন" হইতে পারে না। উহার প্রকৃত অর্থ "যে নজরাণা তৎকাল প্রচলিত প্রথা অনুসারে দেয় ছিল তাহা।"

রাজবল্লভ ও কৃষ্ণবল্লভের উৎপীড়নে ইউরোপীয় বণিক সম্প্রদায় যে সময় সময় নবাব দরবারে আবেদন করিয়া পরিত্রাণ পাইতেন এ কথাও সম্পূর্ণ ভিত্তিশূন্য। লঙ সাহেবের প্রকাশিত ইংরেজ দপ্তরের কাগজপত্রে লিখিত আছে যে, কৃষ্ণদাসের নবাবী আমলে, ১৭৫৫ খৃষ্টাব্দে নায়েব আবুতালী একবারমাত্র ওলন্দাজ বণিকদিগের নিকট নজরাণা তলব করিয়াছিলেন ও ওলন্দাজ বণিকসম্প্রদায় তাহা প্রদান করিতে অসম্মত হইলে, কুঠির কর্ম্মচারী ঢাকার দুর্গে কারারুদ্ধ হইয়াছিল এবং ওলন্দাজ বণিকেরা আদিষ্ট অর্থ প্রদান করিয়া পূর্ব্বোক্ত কর্ম্মচারীর উদ্ধার সাধন করিয়াছিলেন। লঙ সাহেব লিখিয়াছেন যে, এ সম্বন্ধে পাশ্চাত্য বণিক সমাজে আন্দোলন উপস্থিত হইয়া নবাব দরবারে আবেদন প্রেরিত হইবে বলিয়া স্থিরীকৃত হইয়াছিল। চতুর্থ অধ্যায়ের দ্বিতীয় পরিচ্ছেদে এই সম্বন্ধীয় বিস্তৃত বিবরণ লিপিবদ্ধ করা হইয়াছে। তদ্দৃষ্টে প্রতীয়মান হইবে যে, এই ঘটনায় রাজবল্লভ ও কৃষ্ণদাস যে সংশ্লিষ্ট ছিলেন তাহারও কোন উল্লেখ নাই।

পাশ্চাত্য বণিকগণ "নজরাণা" প্রদান করিতে অসম্মত হইয়া রাজাজ্ঞা লঙ্ঘন করিয়াছিলেন। এ অবস্থায় যে রাজবল্লভ তাঁহাদের প্রতি কঠোরতা অবলম্বন করিয়াছিলেন, তাহাতে রাজবল্লভের দৃঢ়তাই বরং প্রকাশ পায়।

সমরসজ্জা করিয়াছিলেন, তাহা দেখিয়া ওয়াট সাহেব মনে করিলেন, আসন্ন বিপ্লবে ঘেসাটিবিবীই জয়লাভ করিয়া বাঙ্গালার সিংহাসন অধিকার করিবেন। রাজবল্লভও ইতিপূর্ব্বেই বুঝিয়াছিলেন, বাঙ্গালা দেশে একমাত্র ইংরেজ ভিন্ন আর কোন জাতিই সিরাজের বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হইতে সাহস করিবে না। সুতরাং তিনি অনেক বিবেচনা করিয়া ওয়াট সাহেবের সহিত গোপনে কথাবার্ত্তা চালাইতে লাগিলেন। ঘেসাটিবিবী সিংহাসন লাভ করিলে ইংরেজদিগকে সর্ব্বদা রাজবল্লভের অনুগ্রহপ্রার্থী হইতে হইবে ভাবিয়া, ওয়াট সাহেবও রাজবল্লভের অভিপ্রায় অনুসারে কার্য্য করিতে সম্মত হইলেন। অতঃপর ওয়াট সাহেব কলিকাতার অধ্যক্ষকে লিখিয়া পাঠাইলেন যে, রাজবল্লভের লোক কলিকাতায় উপস্থিত হইলে তাহাকে যেন নগরমধ্যে আশ্রয় প্রদান করা হয়।

তৎকালে আমিনচাঁদ নামে পশ্চিমভারতবাসী জনৈক বণিক কলিকাতায় অবস্থান করিয়া ব্যবসায় চালাইতেছিল। নবাব দরবার ও ইংরেজমহল এই উভয় স্থলেই আমিনচাঁদের যথেষ্ট প্রতিপত্তি ছিল। রাজবল্লভ আমিনচাঁদের সহিত গোপনে কথাবার্ত্তা চালাইয়া স্থির করিলেন যে, কৃষ্ণদাস কলিকাতায় আসিলে আমিনচাঁদ তাঁহাকে স্বীয় আবাসস্থলে আশ্রয় প্রদান করিবেন।

কৃষ্ণদাস তৎকালে ঢাকায় বাস করিতেছিলেন। রাজবল্লভ বিশ্বস্ত লোকদ্বারা কৃষ্ণদাসকে বলিয়া পাঠাইলেন, অবিলম্বে তীর্থ যাত্রার ছলে তিনি যেন পরিবার ও ধনরত্নসহ কলিকাতায় গমন করেন। পিতার আদেশ পাইয়া কৃষ্ণদাস তৎক্ষণাৎ প্রকাশ্যে শ্রীক্ষেত্র যাত্রার উদ্যোগ করিলেন। অবিলম্বে বহুসংখ্যক নৌকা সংগ্রহ করিয়া তন্মধ্যে পরিবার ও ধনরত্ন সংস্থাপন পূর্ব্বক ঢাকা হইতে রওনা হইলেন। নৌকাবহর ক্রমে

ত্রিমোহনার নিকট উপস্থিত হইলে. কৃষ্ণদাস নাবিকদিগকে বঙ্গোপ-সাগরেরদিকে গমন করিতে নিষেধ করিয়া বড়গঙ্গা বাহিয়া চলিতে বলিলেন। তদনুসারে নাবিকগণ বড়গঙ্গায় প্রবেশ করিয়া জেলঙ্গী ও হুগলীনদী অতিক্রম করিল ও ক্রমে কলিকাতায় আসিয়া উপস্থিত হইল। ওয়াট সাহেবের চিঠি ইতিপূর্ব্বেই কলিকাতায় পৌছিয়াছিল। অধ্যক্ষ ড্রেক সাহেব তৎকালে বায়ু পরিবর্ত্তন করিবার উদ্দেশ্যে .বালেশ্বরে অবস্থান করিতেছিলেন। অগত্যা কৌন্সিলের অপর সদস্যগণ ওয়াট সাহেবের অনুরোধে কৃষ্ণদাসকে তীরে অবতরণ করিবার আদেশ প্রদান করিলেন। তদনুসারে কৃষ্ণদাস পরিবার ও ধনরত্নসহ আমিনচাঁদের আলয়ে উপস্থিত হইয়া তথায় আশ্রয় লাভ করিলেন। (১)

রাজবল্লভ যাহা আশঙ্কা করিয়াছিলেন, কার্য্যেও তাহাই সংঘটিত হইল। সিরাজ এক্ষণে রাজবল্লভকে করতলগত রাখিবার উদ্দেশ্যে তাঁহার সমস্ত ধনরত্ন লুণ্ঠন করিবার নিমিত্ত ঢাকায় সৈন্য প্রেরণ করিলেন। কিন্তু সিরাজের প্রেরিত সৈন্য ঢাকায় উপস্থিত হইবার পূর্ব্বেই কৃষ্ণদাস ঢাকা হইতে পলায়ন করিয়াছিলেন; সুতরাং তাহারা ভগ্নমনোরথ হইয়া প্রত্যাবর্ত্তন করিল। (২)

উমাচরণ বাবু লিখিয়াছেন, "সিরাজ এই উপলক্ষে যে সেনাদল ঢাকায় প্রেরণ করিয়াছিলেন, তাহারা কৃষ্ণদাসকে ধৃত করিতে না পারিয়া রাজবল্লভের অনেক ধনরত্ন আত্মসাৎ করিয়া মুরশিদাবাদে ফিরিয়া আসিল।"

অতঃপর যে ঘটনা হইল, তাহা অর্ম্ম সাহেব নিম্নলিখিতরূপে বর্ণনা করিয়াছেন :—

---

(১) Orme's Indoostan, vol. II, page 51.

(২) Sair, vol II, page 188.

"কৃষ্ণদাস যে কলিকাতায় আশ্রয় গ্রহণ করিলেন, এ কথা অল্পকাল মধ্যেই মুরশিদাবাদে প্রচার হইয়া পড়িল। সিরাজ এই সংবাদ শুনিয়া ক্রোধে উন্মত্ত হইয়া উঠিলেন এবং আলিবর্দ্দীর নিকট আসিয়া বলিলেন, 'আমি বিশ্বস্ত সূত্রে অবগত হইয়াছি যে, ইংরাজেরা নিবাইসের বিধবা পত্নীর পক্ষাবলম্বন করিয়াছে।' তৎকালে আলিবর্দ্দী মৃত্যু শয্যায় শায়িত ছিলেন এবং কাশিমবাজারের কুঠীর চিকিৎসক ডাক্তার ফোর্থ সাহেব তাঁহাকে চিকিৎসা করিতেছিলেন। সিরাজ যে সময় আলিবর্দ্দীর নিকট ঐ কথাগুলি বলিলেন, তৎকালে ফোর্থ সাহেবও তথায় উপস্থিত ছিলেন। আলিবর্দ্দী সিরাজকে কোন উত্তর প্রদান না করিয়া ফোর্থ সাহেবকে সিরাজের উক্তি সত্য কিনা জিজ্ঞাসা করিলেন। ডাক্তার সাহেব তাহাতে এই উত্তর দিলেন যে, "শত্রুপক্ষীয়েরা ইংরেজদিগের ক্ষতি করার মানসে ঐরূপ জনরব রটনা করিয়া দিয়াছে, এবং অনুসন্ধানের ফলে যে উহা ভিত্তিশূন্য বলিয়া প্রকাশ পাইবে, সে বিষয়ে অনুমাত্রও সন্দেহ নাই। একমাত্র এদেশে বাণিজ্য করাই ইংরেজদিগের মনের অভিপ্রায়, তদ্ভিন্ন তাঁহারা অন্য কোন উচ্চাকাঙ্ক্ষা পোষণ করেন না।" তখন আলিবর্দ্দী কাশিমবাজারের কুঠিতে কি পরিমাণ সৈন্য আছে, ওলন্দাজ ও ফরাসিরা তথায় কোন সেনা পাঠাইয়াছে কিনা, ইংরাজদিগের রণপোতসকল এখন কোথায় অবস্থান করিতেছে এবং কোন রণপোত শীঘ্র বাঙ্গলায় আসিবে কিনা, ইত্যাদি কথা ফোর্থ সাহেবকে জিজ্ঞাসা করিলেন। পূর্ব্বোক্ত কথোপকথন শেষ হইলে আলিবর্দ্দী সিরাজকে বলিলেন, 'তোমার উক্তি সত্য বলিয়া বিশ্বাস করিতে আমি প্রস্তুত নহি।' সিরাজ অতঃপর উত্তর করিলেন, 'আমার কথা যে অক্ষরে অক্ষরে সত্য তাহা আমি প্রমাণ প্রয়োগ দ্বারা প্রদর্শন করিতে প্রস্তুত আছি।' (১)

(১) Orme's Indoostan, vol. II, page 51 & 52.

রিয়াজু সেলাতিনে লিখিত আছে, "রাজবল্লভ তাঁহার পরিবারবর্গ ও সন্তান সন্ততিদিগকে কলিকাতায় ইংরেজের আশ্রয়ে প্রেরণ করিলে, সিরাজ তাঁহাদিগকে ধৃত করিবার অভিপ্রায়ে গুপ্তচর বিভাগের অধ্যক্ষ রাজারামকে তথায় প্রেরণ করিতে উদ্যত হইলেন। আলিবর্দ্দী তখন সিরাজকে প্রতিনিবৃত্ত করিয়া বলিলেন, "আরোগ্য লাভ করিয়া আমি স্বয়ংই রাজবল্লভের পরিবারবর্গকে এখানে আনয়ন করিব।" (১)

শ্রীযুক্ত বাবু কৈলাসচন্দ্র সিংহ ১২৮৯ সনের বান্ধব পত্রিকার ৮০ পৃষ্ঠায় লিখিয়াছেন :--

"বিশ্বাসঘাতক নরাধম রাজা রাজবল্লভ ঢাকায় রাজকীয় ধনাগার হইতে দুইকোটী টাকা অন্যায়রূপে আত্মসাৎ করিয়াছিলেন। সিরাজ যখন ঢাকার নেয়াবতীর নিকাশ ও রাজস্ব তলব করেন, তখন কৃষ্ণদাস সেই সকল লইয়া কলিকাতায় পলায়ন করেন। এখন পাঠকগণ বিচার করিয়া বলুন, সিরাজ দুর্ব্বৃত্ত কি রাজবল্লভ ও তাঁহার পুত্র কৃষ্ণদাস দুর্ব্বৃত্ত।"

কিন্তু অক্ষয় বাবু ততদূর অগ্রসর না হইয়া লিখিয়াছেন :—

"আলিবর্দ্দীর জীবনের আশা ফুরাইয়া আসিতেছে; সুনিপুণ রাজবৈদ্যগণ বৃদ্ধ নবাবের দিকে সাশ্রুলোচনে দৃষ্টিপাত করিয়া ভগ্নহৃদয়ে ফিরিয়া আসিতেছেন। সিরাজউদ্দৌলা নিশিদিন মাতামহের শয্যাপার্শ্বে কণ্ঠলগ্ন হইয়া বসিয়া রহিয়াছেন। (২) রাজবল্লভ বুঝিলেন, ইহাই উপযুক্ত সুসময়। তিনি কৃষ্ণবল্লভকে সংবাদ পাঠাইলেন যে, "আর কি

---

(১) Riazoo Salatin, page 365 & 366.

(২) ইহা বোধ হয় অক্ষয় বাবুর কল্পনা মাত্র। কোন ইতিহাসে ইহার প্রমাণ নাই। ফলে সিরাজ মাতামহের কণ্ঠলগ্ন হইয়া থাকিবার পাত্র ছিলেন না।

দেখিতেছ, ঢাকার ধনসম্পদ ও পরিবার লইয়া নৌকাপথে কলিকাতা অঞ্চলে পলায়ন কর।"(২)

রাজবল্লভ যে ঢাকায় রাজকীয় ধনাগার হইতে কোন টাকা আত্মসাৎ করিয়াছিলেন, তাহা কৈলাস বাবুর কপোল-কল্পিত কথা ভিন্ন আর কিছু নহে। কৈলাস বাবু রাজবল্লভের চরিত্র বর্ণনা করিতে গিয়া প্রায় সর্ব্বত্রই সত্যের মর্য্যাদা লঙ্ঘন করিয়াছেন। টাবিকি মুজাফরী, চাহার গুলজার সুজাই, রিয়াজু সেলাতিন, মোতারক্ষীণ প্রভৃতি মুসলমান লেখকের প্রণীত ইতিহাসে কিংবা অর্ম্মকৃত "ইন্দুস্তান" ও অন্যান্য ইংরেজ লেখকের ইতিহাসে এমন কথা লিখিত নাই যে, রাজবল্লভ ঢাকার রাজকীয় ধনাগারের কোন টাকা আত্মসাৎ করিয়াছিলেন।

ফলতঃ এই সময় রাজবল্লভ ও কৃষ্ণদাস সিরাজের প্রতিদ্বন্দী ঘেসেটি বিবীর কর্ম্মচারী ছিলেন। ঘেসেটি বিবী ও সিরাজের স্বার্থ পরস্পর বিরুদ্ধ ছিল। কৈলাস বাবু নিজেই স্বীকার করিয়াছেন, এ সময় ঘেসেটি বিবী ঢাকার নাজিমীপদে প্রতিষ্ঠিত ছিলেন (১২৮৯ সনের বান্ধব পত্রিকার ৭৭ পৃঃ)। অতএব সিরাজ কেন যে রাজবল্লভের নিকট নিকাশ তলব করিবেন এবং রাজবল্লভই কেন বা ঘেসেটিবিবীর প্রতিদ্বন্দী সিরাজের নিকট নিকাশ দিতে বাধ্য হইবেন, তাহার কারণ কৈলাস বাবু ভিন্ন আর কেহ বুঝিবে না।

যে নিমিত্ত সিরাজ কৃষ্ণদাসের অনুসরণ করিয়াছিলেন, তাহা তিনি নিজেই আলিবর্দ্দীর নিকট ডাক্তার কোর্থ সাহেবের সমক্ষে বলিয়াছিলেন, পূর্ব্বে সে সমস্ত কথাই উদ্ধৃত করা হইয়াছে। তদ্দৃষ্টে প্রতীয়মান হইবে যে, ঘেসেটি বিবীর পক্ষচ্ছেদ করাই কৃষ্ণদাসের অনুসরণে সিরাজউদ্দৌল্লার একমাত্র উদ্দেশ্য ছিল। অন্যথা কৃষ্ণদাস কলিকাতায়

(২) সিরাজউদ্দৌলা ১১২ পৃঃ

আশ্রয় লাভ করিলে, সিরাজ কখনও বলিতেন না যে ইংরেজেরা ঘেসেটি বিবীর পক্ষাবলম্বন করিয়াছে। রাজবল্লভ ও কৃষ্ণদাসের প্রতি 'বিশ্বাসঘাতক' 'দুর্বৃত্ত' ও 'নরাধম' প্রভৃতি বিশেষণ বিনা কারণে প্রয়োগ করিয়া কৈলাস বাবু যেরূপ শিষ্টাচার (?) প্রদর্শন করিয়াছেন, তজ্জন্য তাঁহার সুরুচি (?) ও সুশিক্ষাকে (?) ধন্যবাদ দেওয়া কর্ত্তব্য।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

সিরাজের রাজ্যাভিষেকে

অশীতিবর্ষে পদার্পণ করিয়া আলিবর্দ্দী উদরীরোগে আক্রান্ত হইয়া পড়িলেন। বাঙ্গালার অধিকাংশ সুনিপুণ চিকিৎসক নবাবের রোগ অপনোদনের চেষ্টা করিলেন বটে, কিন্তু কেহই সেই পরিণত বয়সের ব্যাধি দূর করিতে সমর্থ হইলেন না। অবশেষে ১৭৫৬ খৃষ্টাব্দের ৯ই এপ্রিল তারিখে তিনি সংসারের সমস্ত শৃঙ্খল ছিন্ন করিয়া অনন্তধামে চলিয়া গেলেন।

যে সুজা খাঁর আশ্রয় লাভ করিয়া আলিবর্দ্দী দরিদ্রতার কবল হইতে মুক্তিলাভ করিয়াছিলেন, তাঁহারই পুত্র সরফরাজের নিধন সাধন করিয়া পাশব বলে তিনি বাঙ্গালার সিংহাসন অধিকার করিয়াছিলেন সত্য, কিন্তু এ কথা নিঃসঙ্কোচে বলা যাইতে পারে যে. তাঁহার ন্যায় উপযুক্ত শাসনকর্ত্তা তৎকালে সমগ্র ভারতবর্ষের মধ্যেও বিদ্যমান ছিল কিনা সন্দেহ। সায়র মোতাক্ষরীণে লিখিত আছে ঃ—

"আলিবৰ্দ্দীর একটি মাত্র ধৰ্ম্মপত্নী ছিল এবং সেই ধৰ্ম্মপত্নী ভিন্ন দ্বিতীয় রমণীর অঙ্গস্পর্শে তাঁহার আত্মা কখনও কলুষিত হয় নাই। সন্তান সন্ততিগণের প্রতি তিনি নিরতিশয় স্নেহপরায়ণ ছিলেন। জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা হাজি আহাম্মদ এবং তদীয় ধৰ্ম্মপত্নীর প্রতি তিনি সৰ্ব্বদাই সম্মান প্রদর্শন করিতেন। নিবাইস পরলোক গমন করিলে তিনি অত্যন্ত শোকাকুল হইয়া পড়িলেন এবং এই শোক কিয়ৎপরিমাণে বিস্মৃত হইবার উদ্দেশ্যে দ্বিতীয় ভ্রাতুষ্পুত্র সৈয়দ আহাম্মদকে পূর্ণিয়া হইতে মুরসিদাবাদে আসিবার জন্য লিখিয়া পাঠাইলেন। দুর্ভাগ্যক্রমে তাঁহার আশা পুরণ না হইতেই সৈয়দ আহাম্মদ কালগ্রাসে পতিত হইলেন। এই ঘটনায় আলিবৰ্দ্দীর স্নেহপ্রবণ হৃদয় শতধা বিদীর্ণ হইয়া গেল এবং তিনি কয়েক দিন মধ্যেই ভ্রাতুষ্পুত্রদ্বয়ের অনুগমন করিয়া চিরশান্তি লাভ করিলেন।

"রাজকীয় কৰ্ত্তব্য সম্পাদনে আলিবৰ্দ্দী নিয়তই অসাধারণ কৃতিত্ব প্রদর্শন করিতেন। তিনি প্রত্যহ প্রত্যুষে গাত্রোত্থান করিয়া স্নানাহার করিতেন এবং তৎপর নিয়মিত উপাসনা করিয়া অনুচরবর্গ সহ কাফিপানে প্রবৃত্ত হইতেন। কাফিপান শেষ হইলেই দরবারের সময় আসিয়া উপস্থিত হইত এবং তিনি দরবার গৃহে আসীন হইয়া রাজকীয় প্রত্যেক বিভাগের কৰ্ম্মচারী ও অপর লোকের আবেদন নিবেদন স্বকর্ণে শুনিয়া কৰ্ত্তব্য স্থির করিতেন। দুই ঘণ্টার কম সময়ে দরবার শেষ হইত না। অতঃপর নিবাইস মহম্মদ, সৈয়দ আহাম্মদ, সিরাজউদ্দৌলা প্রভৃতি আত্মীয়বর্গের সহিত আলিবৰ্দ্দী বিশ্রামাগারে প্রবেশ করিতেন। নবাব এ স্থলে উপবিষ্ট হইলেই, কেহ খোস গল্প করিত, কেহ কবিতার আবৃত্তি করিত এবং কেহবা ঐতিহাসিক প্রসঙ্গের অবতারণা করিয়া তাঁহার চিত্ত বিনোদনে রত হইত। মধ্যাহ্ন

কালে তিনি স্বজন ও আগন্তুকগণ সহ আহারে উপবেশন করিতেন। ১ ঘটিকা হইতে ৪ ঘটিকা পর্য্যন্ত সমস্ত সময় একমাত্র সাধন ভজনেই অতিবাহিত হইত। চারি ঘটিকার পর নবাব কিয়ৎপরিমাণে বরফ-মিশ্রিত জলপান করিয়া শাস্ত্রজ্ঞ লোক দিগের সহিত শাস্ত্র সম্বন্ধীয় আলোচনা করিতেন। কিয়ৎকাল এইরূপে অতিবাহিত হইলে জগৎশেঠ-প্রমুখ রাজকর্ম্মচারিগণ তথায় উপস্থিত হইয়া মোগল রাজধানী ও অন্যান্য স্থানের সংবাদ বলিত। শাসনসংক্রান্ত যে সমস্ত আদেশ দেওয়া প্রয়োজন তাহা এই অবসরেই জ্ঞাপন করা হইত। অপরাহ্ণ ৬ ঘটিকার সময় সমগ্র প্রাসাদ আলোকিত হইয়া উঠিত এবং তখন বিদূষকগণ নানারূপ কৌতুক করিয়া হাস্যরসের অবতারণা করিত। বিদূষকগণের সংসর্গে কিয়ৎকাল যাপন করিয়া নবাব নেমাজ পাঠে প্রবৃত্ত হইতেন ও নেমাজ শেষ করিয়া বেগমের কক্ষে গমন করিতেন। রাত্রি ৯ ঘটিকা পর্য্যন্ত সেই কক্ষে কাটাইয়া তিনি পুনরায় রাজকার্য্যে প্রবৃত্ত হইতেন এবং এইরূপে রজনীর দ্বিতীয়যাম অতীত হইয়া যাইত। ১২ ঘটিকার পূর্ব্বে তিনি কখনও শয়ন কক্ষে প্রবেশ করিতেন না। শয়নের অব্যবহিত পূর্ব্বে নবাব কোন দিন যৎসামান্য ফলমূল আহার করিতেন এবং কোন দিন কিছুই আহার করিতেন না। একমাত্র সুনির্ম্মল বারি ব্যতীত তিনি জীবনে অন্য কোন পানীয় স্পর্শ করেন নাই।" (১)

আলিবর্দ্দীর জীবন শঙ্কটাপন্ন হইলেই জ্যেষ্ঠা তনয়া ঘেসেটি বিবী মতিঝিলে বিপুল সেনা সমাবেশ করিয়া রাখিয়া সিরাজের প্রতিবন্ধকতাচরণে নিযুক্ত ছিলেন। (২) সুতরাং এখন সকলেই মনে করিল, বাঙ্গালার সিংহাসন উপলক্ষে অচিরে সিরাজ ও ঘেসেটিবিবীর

(1) Sair, vol. II. page 150 to 162.
(2) Sair, vol. II. page 156.

মধ্যে তুমুল সংগ্রাম উপস্থিত হইবে। আলিবর্দ্দীর মহিষী এই ঘটনায় মনে মনে অত্যন্ত চিন্তিত হইয়া পড়িলেন এবং প্রিয়তম দৌহিত্র যে রূপে নিষ্কণ্টকে রাজ্যভোগ করিতে পারে, তাহার উপায় উদ্ভাবনার্থ জগৎশেঠকে ডাকাইয়া পাঠাইলেন। জগৎশেঠ আসিলেন, পরামর্শক্রমে স্থির হইল, মহিষী স্বয়ংই মতিঝিলে গিয়া ঘেসেটি বিবীকে সিরাজের পক্ষাবলম্বন করিতে অনুরোধ করিবেন। তদনুসারে তিনি জগৎশেঠের সমাভিব্যাহারে মতিঝিলে আসিয়া তনয়াকে বলিলেন, 'সিরাজ কখনও মাতৃস্বসার বিরুদ্ধাচরণে প্রবৃত্ত হইবেন না; সুতরাং সিরাজের বশ্যতা স্বীকার করা ঘেসেটিবিবীর একান্তই কর্ত্তব্য। নিবাইস-পত্নী প্রথমতঃ এ প্রস্তাবে সম্মতি প্রদান করিলেন না; অবশেষে জননীর অনুরোধ উপেক্ষা করিতে না পারিয়া সিরাজের বশ্যতা স্বীকার পূর্ব্বক তিনি স্বীয় সর্ব্বনাশের পথ উন্মুক্ত করিলেন। (১)

প্রতাপ বাবুর নিকট রাজবল্লভের জীবনী সম্বন্ধে যে হস্তলিখিত পুস্তক পাওয়া গিয়াছে তাহাতে লিখিত আছে, "ঘেসেটি বিবী যে সিরাজের বশ্যতা স্বীকার করেন এ বিষয়ে রাজবল্লভের অনুমাত্রও ইচ্ছা ছিল না।"

সন্ধির অব্যবহিত পরেই সিরাজ নির্ব্বিবাদে সিংহাসনে আরোহণ করিলেন। (২) যে ভাবে এই অভিষেক উৎসব সম্পন্ন হইল তাহা রিয়াজু সেলাতিনে নিম্নলিখিতরূপে বর্ণিত হইয়াছে ঃ—

---

(1) Orme's Indoostan, vol. II. page 55, and also Riazoo Salatin, p. 363.

(২) কোন কোন পাশ্চাত্য লেখকের মতে সিরাজ এই সময় মাত্র সপ্তদশবর্ষে পদার্পণ করিয়াছিলেন। ফলে, এই উক্তি সত্য নহে। পূর্ব্বে প্রদর্শিত হইয়াছে, সিরাজ ১৭২৯ কি ১৭৩২ খৃষ্টাব্দের পূর্ব্বে জন্মগ্রহণ করেন। সুতরাং এই সময় তাঁহার বয়ঃক্রম ২৪ অথবা ২৭ বৎসরের কম হইতে পারে না।

"ঘেসেটি বিবী সিরাজের বিরুদ্ধাচরণ করিতে বিরত হইলেই নজর আলি সিরাজের ভয়ে পলায়মান হইল। ইতিমধ্যে সিরাজের সেনাগণ মতিঝিলে আসিয়া ঘেসেটি বিবীকে সমস্ত ধনরত্ন সহ ধৃত করিল। এখন এই মহিলার আর লাঞ্ছনার পরিসীমা রহিল না। নবাব সেনা নিবাইস-পত্নীর প্রাসাদ সমূহ ভূমিসাৎ করিল এবং ভূগর্ব্ভে তাঁহার যে কিছু ধনরত্ন নিহিত ছিল তাহা উত্তোলন পূর্ব্বক মনসুরগঞ্জ লইয়া যাইল।" (১)

সায়র মোতাক্ষরীণ-প্রণেতা বলেন, "সিরাজ রাজ্যে অভিষিক্ত হইয়াই সর্ব্বপ্রথম একদল সেনাকে এই আদেশ দিয়া মতিঝিলে প্রেরণ করিলেন যে, ঘেসেটি বিবীকে তথা হইতে ধৃত করিয়া আনিয়া কারারুদ্ধ করিতে হইবে। ইতিপূর্ব্বে নির্ব্বোধের ন্যায় ঘেসেটিবিবী যে সেনাগণকে প্রচুর ধনরত্ন উপঢৌকন দিয়াছিলেন, তাহাতে এখন কোন ফলোদয় হইল না। যে সকল সেনা আলিবর্দ্দীর মৃত্যুর অব্যবহিত পূর্ব্বে সিরাজের বিরুদ্ধাচরণ করিবে প্রতিজ্ঞা করিয়া ঘেসেটিবিবী হইতে অনেক ধনরত্ন উপঢৌকন লইয়াছিল, তাহাদের অধিকাংশ নিজ নিজ আবাসে চলিয়া গেল এবং যে অল্পসংখ্যক অবশিষ্ট রহিল, তাহারা নবাবসেনার আগমনে কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হইয়া পড়িল। মতিঝিলে যে কিছু ধনরত্ন পাওয়া গেল, নবাব সেনা তাহা সমস্তই রাজকোষে প্রেরণ করিল। সিরাজকে পুত্রবৎ স্নেহ করাই ঘেসেটি বিবীর কর্ত্তব্য ছিল, কিন্তু ঘেসেটিবিবী তাঁহাকে নিয়ত বিদ্বেষ ভাবেই নিরীক্ষণ করিতেন। হোসেন কুলীর অন্যায় হত্যাকাণ্ডে সম্মতি প্রদান করিয়া এবং বিবিধ অধর্ম্ম-কার্য্যে লিপ্ত থাকিয়া নিবাইস-পত্নী স্বীয় চরিত্রে ও বংশে কলঙ্ক-

---

(1) Riazoo Salatin, page 363

কালিমা লেপন করিয়াছিলেন। এতদিন পরে সেই পাপের প্রায়শ্চিত্ত হইল। তিনি এখন সর্ব্বপ্রকার রাজকীয় পদগৌরব হইতে বঞ্চিত ও হৃতসর্ব্বস্ব হইয়া কারাগারে বাস করিতে লাগিলেন।" (১)

অর্ম্মসাহেব লিখিয়াছেন, "ঘেসেটিবিবী বশ্যতা স্বীকার করিলেই সিরাজ তাঁহাকে কারারুদ্ধ করিলেন এবং মতিঝিল আক্রমণ করিয়া মাতৃষ্বসার সমস্ত ধনরত্ন হস্তগত করিতে বিস্মৃত হইলেন না।" (২)

অক্ষয় বাবু লিখিয়াছেন, "ঘেসাটি বেগম বিধবা ছিলেন। সিরাজউদ্দৌলা ভিন্ন তাঁহার আর কেহ পরমাত্মীয় নাই। সুতরাং বৈধব্যদশায় একাকিনী মতিঝিলের রাজপ্রাসাদে স্বাধীনভাবে বিচরণ না করিয়া রাজান্তঃপুরে সিরাজউদ্দৌলার মাতা ও আলিবর্দ্দীর মহিষীর সহিত একত্র বাস করিবার জন্য সিরাজউদ্দৌলা বিনীতভাবে আত্ম-নিবেদন করিলেন। রাজবল্লভের স্বার্থসিদ্ধির সহজ পথ চিররুদ্ধ হইতেছে বলিয়া তিনি তুরীভেরী বাজাইয়া মতিঝিলের সিংহদ্বারে সেনা সমাবেশ করিতে আরম্ভ করিলেন। সিরাজউদ্দৌলা ইহাতেও উত্যক্ত না হইয়া তাঁহাকে রাজসদনে আহ্বান করিলেন এবং তাঁহার সকল প্রকার কুচরিত্রের কথা অবগত থাকিয়াও তাঁহার পদগৌরব অক্ষুণ্ণ রাখিয়া, বিনা রক্তপাতে মতিঝিল অধিকার করিয়া পিতৃব্য রমণীকে রাজান্তঃপুরে স্থান দান করিলেন। যেরূপ সুকৌশলে, বিনা রক্তপাতে এই প্রধূমিত বিবাদবহ্নি নির্ব্বাণ লাভ করিল, তাহার জন্য ইতিহাস একবারও সিরাজউদ্দৌলাকে ধন্যবাদ করে নাই ; বরং প্রকৃত কাহিনী গোপন করিয়া লিখিয়া রাখিয়াছে যে, সিরাজউদ্দৌলার কথা আর কি

---

(1) Sair, vol. II, page 136.

(2) Orme's Indoostan, vol. II, page 55.

বলিব? তিনি সিংহাসনে পদার্পণ করিবামাত্র আপন পিতৃব্য-রমণীর সর্ব্বস্ব লুণ্ঠন করিয়াছিলেন।" (১)

অক্ষয় বাবুর "সিরাজউদ্দৌলা" ইতিহাস বলিয়া পরিচিত না হইলে উদ্ধৃত কথাগুলি সম্বন্ধে কোন বক্তব্য ছিল না। কিন্তু ইতিহাস-লেখক ঔপন্যাসিকের ন্যায় কল্পনার রাজ্যে বিচরণ করিলে, সত্যের মর্য্যাদা রক্ষিত হয় না। মতিঝিল প্রাসাদ যে বিনা রক্তপাতে সিরাজ কিরূপে অধিকার করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন তাহা অর্ম্মসাহেব, রিয়াজুস্‌সেলাতিন ও মোতাক্ষরীণ-প্রণেতার উক্তি পূর্ব্বে উদ্ধৃত করিয়া প্রদর্শন করা হইয়াছে। তদ্দৃষ্টে প্রতীয়মান হইবে যে, আলিবর্দ্দীর মহিষী ও জগৎশেঠের প্ররোচনায় ঘেসেটিবিবী সিরাজের বশ্যতা স্বীকার করিলে, মতিঝিলের সেনাগণ ছত্রভঙ্গ হইয়া চলিয়া গিয়াছিল এবং সিরাজ তৎপরে সন্ধির সর্ত্তভঙ্গপূর্ব্বক মতিঝিলের প্রাসাদ অধিকার করিয়াছিলেন। এ স্থলে সিরাজের বিশ্বাসঘাতকতা প্রকাশ পাইয়াছে বলিয়াই ঐতিহাসিকেরা সিরাজকে ধন্যবাদ দেন নাই। যে সময় সিরাজ মতিঝিলের প্রাসাদে সৈন্য প্রেরণ করেন, তৎকালে উহা সম্পূর্ণ অরক্ষিত অবস্থায় অবস্থিত ছিল, সুতরাংই তাহা বিনা রক্তপাতে সিরাজসেনা অধিকার করিতে সমর্থ হইয়াছিল। এ স্থলে সিরাজের যে কি বাহাদুরী আছে, তাহা একমাত্র অক্ষয় বাবু ভিন্ন আর কেহ বুঝিতে পারিবে না।

সিরাজের দোষক্ষালন উদ্দেশ্যে অক্ষয় বাবু উদ্ধৃত স্থলে যে সমস্ত কথা লিখিয়াছেন তাহার অধিকাংশই প্রকৃত কথা নহে। সিরাজ কি ঘেসেটিবিবীকে আদর অভ্যর্থনা করিয়া মুরশিদাবাদে আনিয়াছিলেন এবং রাজান্তঃপুরে পুরমহিলাদিগের আবাসস্থলে স্থান দান করিয়াছিলেন? ইতিহাস যে এ সম্বন্ধে অক্ষয় বাবুকে সমর্থন করে না তাহা তিনি নিজেই

(১) সিরাজউদ্দৌলা ১৩৯, ১৪০ পৃষ্ঠা।

স্বীকার করিয়াছেন; তবে এই সমস্ত কথা তিনি কল্পনা ভিন্ন আর কোথা হইতে সংগ্রহ করিলেন? রিয়াজু সেলাতিন, মোতাক্ষরীণ ও ইন্দুস্তানে এ সম্বন্ধে যাহা লিখিত আছে তাহা পূর্ব্বে উদ্ধৃত করা হইয়াছে। তৎপাঠে দেখা যায়, সিরাজ ঘেসেটিবিবীকে বন্দী করিয়া আনিয়া মুরশিদাবাদের কারাগারে রাখিয়া দিয়াছিলেন এবং মতিঝিলের প্রাসাদ ভূমিসাৎ করিয়া ঐ স্থলের সমস্ত ধনরত্ন লুণ্ঠন করিয়া আনিয়াছিলেন। এই সমস্ত উক্তি বিদ্যমান থাকিতেও যে অক্ষয় বাবু তাহা গোপন করিয়া, মতিঝিল-সংক্রান্ত ঘটনা বিকৃতভাবে বর্ণনা করিয়াছেন, তাহাতে বড়ই আক্ষেপ করিতে ইচ্ছা হয়।

অক্ষয় বাবুর লিখিত বৃত্তান্তে রাজবল্লভ-সম্বন্ধে যে কয়টি কথা আছে, তাহাও প্রকৃত অবস্থার বিপরীত। মতিঝিল অধিকার করার সময় রাজবল্লভ যে তুরীভেরী বাজাইয়া সেনাসমাবেশ করিয়াছিলেন এবং সিরাজ তাঁহাকে সাদরে আহ্বান করিয়া তাঁহার পূর্ব্ব পদগৌরব অক্ষুণ্ণ রাখিয়াছিলেন কোন ইতিহাসই এ কথার সমর্থন করিবে না। বরং আমরা দেখিতে পাই যে, তৎকালে রাজবল্লভ সিরাজকর্ত্তৃক পদচ্যুত হইয়া কারাগারে নিক্ষিপ্ত হইয়াছিলেন এবং ঢাকার শাসনকর্ত্তৃত্ব জানকী রামের পুত্র রায়দুর্ল্লভের হস্তে অর্পিত হইয়াছিল।

অর্ম্ম সাহেব লিখিয়াছেন, "সিরাজের শাসনকালে রাজবল্লভ ঢাকার শাসনকর্ত্তৃত্ব হইতে অপসারিত হইলেন এবং রায়দুর্ল্লভ তৎপদে নিযুক্ত হইয়া ঢাকা-বিভাগের শাসনকার্য্য চালাইতে লাগিলেন।" (১) সায়র মোতাক্ষরীণ-প্রণেতা যাহা লিখিয়াছেন, তদ্দ্বারাও এই উক্তি সমর্থিত হইতেছে। (২)

---

(1) Orme's Indoostan, vol. II, page 357.

(2) Sair, vol. II, page 253.

রিয়াজু সেলাতিনে লিখিত আছে ঃ—

"বাঙ্গালার দেওয়ান মাহাবত জঙ্গ পরলোক গমন করিলে সিরাজউদ্দৌলা নিকাশের ছলে পেস্কার রাজবল্লককে ধৃত করিলেন। রাজবল্লভ কিয়ংপরিমাণ অর্থ প্রদানে অব্যাহতি লাভের চেষ্টা করিলেও সিরাজ তাঁহাকে কারারুদ্ধ করিয়াই রাখিলেন।" (১)

উমাচরণ বাবু লিখিয়াছেন ঃ—

" রায়রায়াণ ও জগৎশেঠের সহিত রাজবল্লভের তাদৃশ সদ্ভাব ছিল না। কলিকাতার অধ্যক্ষ ড্রেকসাহেবের সহিত বাজবল্লভের ঘনিষ্ঠতা দেখিয়া রায়রায়াণ ও জগৎশেঠ সিরাজের নিকট গিয়া বলিলেন, "রাজবল্লভ আপনার মঙ্গলাকাঙ্ক্ষী নহেন।" সিরাজ ইহাতে রাজবল্লভের প্রতি অত্যন্ত অসন্তুষ্ট হইলেন এবং একদিন কোন ছলে তাঁহাকে দরবারে আনিয়া শিরশ্ছেদনের নিমিত্ত ঘাতকের হস্তে সমর্পণ করিয়া দিলেন। ঘাতক তৎক্ষণাৎ শিরশ্ছেদনে উদ্যত হইলে রাজবল্লভ আত্মদোষক্ষালনোদ্দেশ্যে অত্যন্ত ধীরতার সহিত কয়েকটী কথা বলিলেন। রাজবল্লভের বাক্য-কৌশলে সিরাজের ক্রোধাগ্নি কিয়ৎ পরিমাণে উপশমিত হইল এবং তিনি রাজবল্লভের প্রাণদণ্ডাজ্ঞা রহিত করিয়া তাঁহাকে কারাগারে প্রেরণ করিলেন। অবশেষে কৃষ্ণদাস ইংরাজদিগের আশ্রয়ে পলায়ন করিলে, সিরাজ রাজবল্লভকে কারাগার হইতে আনিয়া পুনরায় তাঁহার প্রাণদণ্ড করিতে উদ্যত হইলেন। এবারও রাজবল্লভ বাগ্‌জাল বিস্তার করিয়া সিরাজের অনুগ্রহ লাভ করিলেন। এখন হইতে তাঁহাকে আর কারাগারে প্রেরণ করা হইল না বটে, কিন্তু তিনি নগরমধ্যে নজরবন্দী অবস্থায় কালযাপন করিতে লাগিলেন।"

---

(1) Reazoo Salatin Page 265.

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

সিরাজকর্ত্তৃক কৃষ্ণদাসের অনুসরণে

মতিঝিলে বীরত্বপ্রদর্শন করিয়াই সিরাজ পূর্ণিয়া আক্রমণ করিবার সংকল্প করিলেন। সৈয়দ আহাম্মদের মৃত্যুর পর তৎপুত্র সওকতজঙ্গ পূর্ণিয়ার শাসনকর্ত্তৃত্বে প্রতিষ্ঠিত ছিলেন। পিতৃব্য ও মাতৃস্বসৃ-পুত্রকে পূর্ণিয়ার ন্যায় ক্ষুদ্র স্থলের আধিপত্যে স্থিরতর রাখিতে উদারহৃদয় সিরাজ কোন ক্রমেই সম্মত হইতে পারিলেন না। অবিলম্বে সেনাসংগ্রহ করিয়া তিনি সওকতজঙ্গকে আক্রমণ করিবার অভিপ্রায়ে রাজমহলে আসিয়া উপস্থিত হইলেন।

ইতিপূর্ব্বে ইংলণ্ড হইতে কলিকাতা প্রেসিডেন্সির অধ্যক্ষের নিকট সংবাদ আসিয়াছিল যে, ফরাসিসদিগের সহিত ইংরেজদিগের যুদ্ধ অনিবার্য্য হইয়া উঠিয়াছে এবং কলিকাতাপ্রবাসী ইংরেজেরা যেন আত্মরক্ষার্থ প্রস্তুত হইতে কালবিলম্ব না করেন। তদনুসারে কলিকাতার ইংরেজ সম্প্রদায় বহুসংখ্যক লোক নিযুক্ত করিয়া দুর্গের প্রাকার সংস্কার করাইতেছিলেন। সিরাজউদ্দৌলার যে সমস্ত গুপ্তচর এই সময় কলিকাতায় অবস্থান করিতেছিল, তাহারা পূর্ব্বোক্ত ঘটনা উপলক্ষ করিয়া সিরাজকে লিখিয়া পাঠাইয়াছিল যে, ইংরেজেরা অতি ব্যস্ততার সহিত কলিকাতার দুর্গ সুদৃঢ় করিতেছে। সিরাজ এই সংবাদ পাইয়া ক্রোধে উন্মত্ত হইয়া উঠিয়াছিলেন এবং অধ্যক্ষ ড্রেক সাহেবকে আদেশ দিয়াছিলেন যে, ইংরেজেরা কোন নূতন দুর্গ নির্ম্মাণ করিতে পারিবে না ও দুর্গের যে অংশ নির্ম্মিত হইয়াছে তাহা ভগ্ন করিতে হইবে।

ড্রেক সাহেব তদুত্তরে লিখিয়া পাঠাইলেন, "ইংরেজেরা কোন দুর্গ নির্ম্মাণ করিতেছেন না; ফরাসিদিগের সহিত যুদ্ধ অনিবার্য্য বলিয়া তাঁহারা গঙ্গাতীরস্থ কামান সংস্থাপনের স্থানসমূহ আত্মরক্ষার্থ সংস্কার করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছেন।" সিরাজ রাজমহলে উপস্থিত হইলেই ড্রেক সাহেবের পত্র তাঁহার হস্তগত হইল। সিংহাসনে আরোহণের এক কি দুইদিন পরেই তিনি কৃষ্ণদাসকে ধনরত্নসহ তাঁহার হস্তে সমর্পণ করিবার নিমিত্ত কলিকাতার অধ্যক্ষের নিকট দূত প্রেরণ করিয়াছিলেন; কিন্তু কৌন্সিলের সদস্যগণ সেই দূতকে অপমানিত কবিয়া নগর হইতে বাহির করিয়া দিয়াছিল। এই নিমিত্ত সিরাজ পূর্ব্ব হইতেই ইংরেজদিগের প্রতি খড়্গহস্ত ছিলেন। ড্রেক সাহেবের উত্তর পাইয়া তিনি আর ধৈর্য্য রক্ষা করিতে পারিলেন না। পূর্ণিয়া অভিযানের সংকল্প সেই মুহূর্ত্তেই পরিত্যক্ত হইল; সিরাজ এখন সমস্ত সেনা লইয়া কলিকাতা আক্রমণ করিবার উদ্দেশ্যে রাজমহল পরিত্যাগ করিলেন। (১)

---

(১) Orme's Indoostan, Vol. II page, 54, 56.

(২) সায়র মোতাক্ষরীণে লিখিত আছে, "সিরাজ রাজমহলে উপস্থিত হইয়াই শুনিলেন যে, কৃষ্ণদাস সিরাজের প্রেরিত চরদিগের চক্ষে ধূলি নিক্ষেপ করিয়া কলিকাতায় আশ্রয়লাভ করিয়াছেন। ইহাতে তিনি পূর্ণিয়া আক্রমণের সংকল্প পরিত্যাগ করিয়া মুরশিদাবাদে প্রত্যাবৃত্ত হইলেন।"—Sair, vol. II. page 188.

এস্থলে সায়র মোতাক্ষরীণপ্রণেতা নিশ্চয়ই ভ্রমে পতিত হইয়াছেন। পূর্ব্বে যে ডাক্তার কোর্থ সাহেবের সহিত আলিবর্দ্দীর কথোপকথনের বিষয় উল্লেখ করা হইয়াছে তদ্দৃষ্টে প্রতীয়মান হইবে যে, আলিবর্দ্দী কালগ্রাসে পতিত হইবার পূর্ব্বেই সিরাজ কৃষ্ণদাসের কলিকাতা পলায়নের কথা শুনিয়াছিলেন। রিয়াজু সেলাতিনেও এই কথাই সমর্থিত হইয়াছে।

পূর্ব্বে বলা হইয়াছে, কৃষ্ণদাস কলিকাতায় আসিয়া আমিনচাঁদের আশ্রয়ে বাস করিতেছিলেন। মুরশিদাবাদ নগরে আমিনচাঁদের জনৈক আত্মীয় বাস করিত। নবাব কলিকাতা অভিমুখে রওনা হইলেই সেই আত্মীয় প্রবর আমিনচাঁদের নিকট সিরাজউদ্দৌল্লার রণসজ্জার কথা লিখিয়া পাঠাইল। দুর্ভাগ্যক্রমে সেই সংবাদ-সংবলিত পত্র ইংরেজদিগের হস্তে পড়িল। সিরাজ আমিনচাঁদের সহিত ষড়যন্ত্র করিয়াই কলিকাতা আক্রমণ করিতেছেন, সুতরাং তাহারা আর কালবিলম্ব না করিয়া আমিনচাঁদের বাসস্থান অবরোধ করার জন্য সৈন্য প্রেরণ করিল।

এই সময় আমিনচাঁদ কলিকাতায় রাজসম্পদে বাস করিতেছিলেন। তাঁহার বাসস্থানের সুবিস্তৃত ও রমণীয় অট্টালিকারাজি, সিংহদ্বারের বহুসংখ্যক সুসজ্জিত পদাতিক সেনা এবং উন্নত অবস্থার পরিচায়ক সুন্দর অশ্বযানপ্রভৃতি অবলোকন করিলে আমিনচাঁদকে লোকে নবাব শ্রেণীস্থ পরাক্রান্ত লোক বলিয়াই মনে করিত। ইংরেজসেনা গৃহ অবরোধ করিলেই আমিনচাঁদের শ্যালক হাজারীমল্ল প্রাণভয়ে অন্তঃপুর মধ্যে প্রবেশ করিল। দুর্ব্বৃত্ত ইংরেজ সেনাগণ এখন তাহাকে ধৃত করিবার উদ্দেশ্যে ধাবমান হইয়া অন্তঃপুরের সীমায় উপস্থিত হইলেই, আমিনচাঁদের পদাতিকগণ অগ্রসর হইয়া তাহাদিগকে বাধা প্রদান করিল। পদাতিকেরা সংখ্যায় তিন শতেরও ন্যূন ছিল। ইংরেজ সেনা সেই বাধা না মানিয়া সম্মুখে অগ্রসর হইতে উদ্যত হইলে, আমিনচাঁদের পদাতিকসেনার সহিত তাহাদের সংঘর্ষ উপস্থিত হইল। কিন্তু সুশিক্ষিত ইংরেজসেনার বিরুদ্ধে আমিনচাঁদের অশিক্ষিত পদাতিকগণ অনেকক্ষণ যুদ্ধ করিতে পারিল না। ইংরেজসেনা পদাতিকগণকে পরাভূত করিয়া অন্তঃপুরের দ্বারে আসিয়া উপস্থিত হইল। এই সময় আমিনচাঁদের

সেনানায়ক জমাদার জগন্নাথ সিংহ অন্তঃপুর রক্ষায় নিযুক্ত ছিলেন। তিনি মনে করিলেন, ইংরেজসেনাগণ অন্তঃপুরে প্রবেশ করিতে পারিলেই পুরমহিলাগণের সম্ভ্রম নষ্ট করিয়া ফেলিবে। পবিত্র ক্ষত্রিয়বীর্য্যে জগন্নাথের জন্ম হইয়াছিল, সুতরাং পুরমহিলাগণের জীবন অপেক্ষা তাঁহাদের সম্ভ্রমই তাঁহার নিকট অধিকতর মূল্যবান বলিয়া বিবেচিত হইল। তিনি স্পষ্টই দেখিতে পাইলেন, দুর্দ্ধর্ষ ইংরেজসেনাগণকে তিনি কোনক্রমেই প্রতিরোধ করিতে পারিবেন না। অতএব আর কালবিলম্ব না করিয়া নিষ্কোষিত তরবারি হস্তে জগন্নাথ অন্তঃপুরে প্রবেশ করিলেন এবং একে একে প্রায় সমস্ত মহিলার জীবন সংহার করিয়া, রমণীহত্যার প্রায়শ্চিত্ত স্বরূপ নিজ শরীরেও আঘাত করিতে করিতে মৃতপ্রায় হইলেন। ইত্যবসরে একদল ইংরেজসেনা কৃষ্ণদাসকে ধৃত করিয়া দুর্গাভিমুখে লইয়া গেল। (১)

কতিপয় দিবস অতীত হইলেই সিরাজউদ্দৌলা সসৈন্যে কলিকাতার

---

(1) Orme's Indoostan, vol. II. page 50 to 63.

অক্ষয়বাবু লিখিয়াছেন, 'সিরাজউদ্দৌলা রাজবল্লভের সহিত সন্ধিস্থাপন করিয়া তিনিও নবাব সৈন্যের সহিত কলিকাতায় শুভাগমন করিতেছেন, এই কথা শুনিয়া ইংরেজেরা আশঙ্কা করিলেন যে, কৃষ্ণদাসও পিতার ন্যায় নবাবের পক্ষাবলম্বন করিবেন, সুতরাং তাঁহারা কৃষ্ণদাসকে ইংরেজদুর্গে কারারুদ্ধ করিয়া ফেলিল। সিরাজউদ্দৌলা ১৬০ পৃঃ।

কৃষ্ণদাস যে ইংরাজদুর্গে কারারুদ্ধ হইয়াছিলেন, এ কথার কোন প্রমাণ নাই। অর্ম্মসাহেবের ইতিহাসে লিখিত আছে যে, কৃষ্ণদাসকে ইংরাজদুর্গে নেওয়া হইল। কি উদ্দেশ্যে কৃষ্ণদাস এইরূপে নীত হইলেন, তাহা অর্ম্মসাহেবের ইতিহাসে লিখিত নাই। পূর্ব্বে বলা হইয়াছে, রাজবল্লভের সহিত সিরাজের সন্ধিসম্বন্ধে অক্ষয়বাবু যাহা লিখিয়াছেন, তাহা সমস্তই তাঁহার কল্পনা-প্রসূত। রাজবল্লভ যে নবাবসেনার সহিত কলিকাতায় আসিয়াছিলেন এ কথারও কোন ঐতিহাসিক ভিত্তি নাই।

প্রান্তভাগে সমুপস্থিত হইলেন। কোন্ পথে নগরে প্রবেশ করিতে হইবে তাহা নবাবসৈন্যগণমধ্যে কেহই অবগত ছিল না, সুতরাং ইতস্ততঃ পথের অনুসন্ধান করিয়া কালক্ষয় করিতে লাগিলেন। নবাবসেনার আগমনবার্ত্তা শ্রবণে পূর্ব্বোক্ত জগন্নাথ সিংহের বৈরনির্য্যাতন-স্পৃহা বলবতী হইয়া উঠিল। তিনি নৈশ অন্ধকারের সহায়তায় অন্যের অলক্ষিতে, অতি কষ্টে নবাবশিবিরে উপস্থিত হইয়া সেনাগণকে কলিকাতায় প্রবেশের পথ দেখাইয়া দিলেন। তাঁহারা আর কাল বিলম্ব না করিয়া সেই পথে নগরে প্রবেশপূর্ব্বক ইংরেজদুর্গ আক্রমণ করিল। নবাব সেনার গতিরোধ করিতে পারে ইংরেজদিগের তৎকালে সেরূপ সৈন্যবল ছিল না; সুতরাং যে সমস্ত ইংরেজ কলিকাতার দুর্গে অবস্থান করিতেছিলেন, তাঁহাদের অধিকাংশ প্রাণভয়ে নদীতীর সংলগ্ন নৌকার সাহায্যে কলিকাতা হইতে প্রস্থান করিলেন। যে সমস্ত ইংরেজ পলায়ন করিবার সুবিধা পাইলেন না, তাঁহারা কিয়ৎকাল নবাবসৈন্যের সহিত যুদ্ধ করিয়া অবশেষে আত্মসমর্পণ করিলেন। এইরূপে কলিকাতা অধিকৃত হইলে, সিরাজউদ্দৌল্লা বন্দিবর্গকে জনৈক প্রহরীর হস্তে ন্যস্ত করিয়া শিবিরে প্রত্যাবৃত্ত হইলেন। ইংরেজ লেখকগণ বলেন, এই প্রহরী বন্দিবর্গকে এক অপ্রশস্ত কক্ষে আবদ্ধ করিয়া রাখিল এবং পিপাসা ও উত্তাপে সেই সমস্ত বন্দিগণের অধিকাংশ কালগ্রাসে নিপতিত হইল। ইতিহাসে এই ঘটনা "অন্ধকূপহত্যা" নামে প্রসিদ্ধ। (১)

---

(১) অনেক আধুনিক বাঙ্গালী লেখক "অন্ধকূপ হত্যার" অস্তিত্বে আস্থাবান নহেন। কিন্তু ইংরাজ লেখকগণ সকলেই এই ঘটনার কথা বিবৃত করিয়া গিয়াছেন। "নবাবী আমলের বাঙ্গালার ইতিহাস" প্রণেতা শ্রীযুক্ত বাবু কালীপ্রসন্ন বন্দ্যোপাধ্যায় অন্ধকূপ-হত্যাকাহিনী সত্য বলিয়াই বিশ্বাস করেন। সায়র মোতাক্ষরীণের ইংরেজী অনুবাদক

অর্ম্ম সাহেব লিখিয়াছেন, "দুর্গজয়ের পর অপরাহ্ণ ৫টার সময় সিরাজ, মীরজাফর ও অন্যান্য সেনানায়কগণকে সঙ্গে লইয়া দুর্গমধ্যে প্রবেশ করিলেন। আসিয়াই তিনি আমিনচাঁদ ও কৃষ্ণদাসকে সম্মুখে উপস্থাপিত করিবার নিমিত্ত আদেশ দিলেন। অবিলম্বে আমিনচাঁদ ও

হাজি মস্তাফা সাহেব বলেন, "১৩১ জন ইংরেজ যে অন্ধকূপে নিবদ্ধ হইয়া মানবলীলা সংবরণ করিয়াছিল, মোতাক্ষরীণে তৎসম্বন্ধে বর্ণবিসর্গও লিখিত হয় নাই। প্রকৃত ঘটনা এই যে, হিন্দুস্থানী প্রহরিগণ এই সমস্ত বন্দিবর্গকে পরবর্ত্তী প্রাতঃকালে নবাব সমীপে উপস্থাপিত করিবে মনে করিয়া, এক রজনীর নিমিত্ত সুরক্ষিত অবস্থায় রাখি-বার অভিপ্রায়ে তাহাদিগকে দুর্গের একটি কক্ষে আবদ্ধ করিয়া রাখিয়াছিল। কিন্তু এত অধিক লোকের স্থান সংকুলান হইবে কিনা তাহা সেই প্রহরিগণ একবারও ভাবিয়া দেখে নাই। ইংরেজদুর্গে কোন কারাগার না থাকিলেও প্রহরীরা সেই কক্ষকেই কারাগার মনে করিয়া লইয়া বন্দিগণকে তথায় রাখিয়া দিয়াছিল। ওয়াট সাহেবের কার্য্যাবলীর মধ্যে ইহা একটি প্রধান ঘটনা হইলেও বাঙ্গালার কোন লোকেই এ বিষয়ের বিন্দুবিসর্গও অবগত নহে। একমাত্র কলিকাতায়ই চারিলক্ষ লোকের বাস; অথচ তাহাদের কেহই এই ঘটনার কথা অবগত নহে। অন্ধকূপ হত্যার বিষয় অবগত আছে, বাঙ্গালায় এমন একটি লোক পাওয়াও সুকঠিন। ফলতঃ দেশীয় লোকেরা বড়ই অসতর্ক এবং তাহাদের অনুসন্ধিৎসা একেবারে নাই বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। কিন্তু ভারতবাসিগণকে এই হত্যাকাণ্ডের নিমিত্ত নির্দ্দয় বলা সুসঙ্গত হইলে ইংরেজদিগকেও অন্য এক ঘটনার নিমিত্ত নির্দ্দয় বলা যাইতে পারে। একদা ইংরেজেরা মান্দ্রাজে পাঠাইবার সংকল্প করিয়া ৪ শত হিন্দু সিপাহীকে কয়েকখানি নৌকায় উঠাইয়া দিয়াছিল। কিন্তু সিপাহীগণের পথে খাদ্য ও পানীয় সম্বন্ধে যাহা আবশ্যক হইবে, তৎসম্বন্ধে ইংরেজেরা কোনরূপ সুবন্দোবস্ত করে নাই। বন্যায় সমস্ত নৌকাই জলমগ্ন হইয়া গিয়াছিল এবং সিপাহীরা তিনদিন অনাহারে থাকিয়া মানবলীলা সংবরণ করিয়াছিল। Sair, vol. II. page 190.

এস্থলে হাজি মুস্তাফা সাহেব অন্ধকূপ-হত্যার অস্তিত্বেই বিশ্বাস করিতেছেন, কিন্তু লিপিকুশল অক্ষয়বাবু অন্ধকূপ-হত্যা কল্পনামূলক প্রতিপাদন করিবার অভিপ্রায়ে

কৃষ্ণদাস নবাবসমক্ষে নীত হইলে নবাব উভয়ের প্রতিই শিষ্টাচার প্রদর্শন করিতে কুণ্ঠিত হইলেন না। (১)

উমাচরণ বাবু বলেন, "কলিকাতা বিজীত হইলে সিরাজউদ্দৌলা কয়েকজন ইংরেজ বন্দীসহ কৃষ্ণদাসকে শৃঙ্খলে আবদ্ধ করিয়া মুরশিদাবাদে লইয়া চলিলেন। কৃষ্ণদাস ও ইংরেজ বন্দিগণ এই সময় জীবনের আশা সম্পূর্ণরূপে বিসর্জ্জন দিয়াই নবাবের অনুগামী হইলেন। অবশেষে তাঁহারা সকলে মুরশিদাবাদে উপস্থিত হইলে নবাবপত্নী তাঁহাদিগকে তদবস্থায় দেখিতে পাইলেন। রাজ্ঞীর রমণীসুলভ স্নেহপ্রবণ হৃদয় বন্দিগণের শোচনীয় অবস্থা দর্শনে বিগলিত হইল এবং তিনি স্বয়ং নবাবকে অনুরোধ করিয়া তাঁহাদিগকে মুক্ত করিয়া দিলেন। (২)

যে কৃষ্ণদাসকে হস্তগত করার অভিপ্রায়ে সিরাজ ইংরেজদিগের

লিখিতেছেন. "হাজি মুস্তাফা নামধারী সুবিখ্যাত ফরাসী পণ্ডিত মুতাক্ষরীণের যে সুবৃহৎ অনুবাদ রাখিয়া গিয়াছেন, তাহাতে তিনি টীকাস্থলে লিখিয়া রাখিয়াছেন যে সমসাময়িক বাঙ্গালীদিগের নিকট সবিশেষ অনুসন্ধান করিয়া জানিয়াছেন—অন্যান্য লোকের কথা দূরে থাকুক, নিজ কলিকাতার অধিবাসিরাই অন্ধকূপ-হত্যার সংবাদ জানিত না—সিরাজউদ্দৌল্লা ২৩০ পৃঃ।

(১) Orme's Indoostan, vol. II. page 73.

(২) সাহেবের ইতিহাসে কৃষ্ণদাসসম্বন্ধে এরূপ কোন কথা লিখিত নাই সত্য, কিন্তু হলওয়েল ও আর দুইজন ইংরাজ সম্বন্ধে যাহা বর্ণিত হইয়াছে, তাহার সহিত উমাচরণ বাবুর লিখিত বৃত্তান্তের অনেক সাদৃশ্য দেখিতে পাওয়া যায়। অর্ম্ম সাহেব বলেন—"সিরাজের আদেশে হলওয়েল এবং আর দুইজন ইংরেজ বন্দী শৃঙ্খলাবদ্ধ হইয়া মুরসিদাবাদে নীত হইলেন এবং পথিমধ্যে তাহাদের আর লাঞ্ছনার পরিসীমা রহিল না। অবশেষে ভূতপূর্ব্ব নবাব আলিবর্দ্দীর সহধর্ম্মিণী অনেক অনুরোধ উপরোধ করিলে সিরাজ তাহাদিগকে মুক্তি প্রদান করিলেন।"—Orme's Indoostan Vol. II, pages 79 to 81.

সহিত কলহে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন, সেই কৃষ্ণদাসকে হাতে পাইয়া সিরাজ যে কি নিমিত্ত তৎপ্রতি শিষ্টাচার প্রদর্শন করিলেন, তৎসম্বন্ধে অক্ষয়বাবু বলিতেছেন, "রাজবল্লভের সহিত সন্ধিস্থাপন করিবার সময় সিরাজ কৃষ্ণদাসের সকল অপরাধ মার্জ্জনা করিয়াছিলেন। তৎপর ইংরেজেরা বিনাদোষে কৃষ্ণদাসকে কারারুদ্ধ করায় সিরাজউদ্দৌলার সহানুভূতি কৃষ্ণদাসের কল্যাণ কামনায় আকৃষ্ট হইয়া পড়িয়াছিল।" (১)

পূর্ব্বে বলা হইয়াছে যে, রাজবল্লভের সহিত সিরাজের সন্ধিস্থাপনের এবং ইংরেজকর্ত্তৃক কৃষ্ণদাসের কারারোধের বৃত্তান্ত প্রকৃত নহে। উমাচরণ বাবুর মতে সিরাজ কৃষ্ণদাসকে শৃঙ্খলাবদ্ধ করিয়া মুরশিদাবাদে আনিলে নবাবপত্নী তাঁহাকে মুক্তি প্রদান করিয়াছিলেন। ইংরেজ ঐতিহাসিকের মতে সিরাজ কলিকাতার দুর্গেই কৃষ্ণদাসের প্রতি সৌজন্য প্রদর্শন করেন। এই শেষোক্ত কথা প্রকৃত হইলে অনুমান হয় যে, কলিকাতার দুর্গ জয় করিয়া সিরাজ হর্ষে উৎফুল্ল হইয়া উঠিয়াছিলেন এবং কৃষ্ণদাসই যে সেই সৌভাগ্যের নিদানস্বরূপ তাহা মনে করিয়া তিনি কৃষ্ণদাসের প্রতি সদয় হইয়াছিলেন। রাজবল্লভের ন্যায় কৃষ্ণদাসও অতিশয় সুপুরুষ ছিলেন। "সুন্দর মুখের জয় সর্ব্বত্র" ইহা একটি সর্ব্বজনবিদিত সত্য। অস্থিরমতি সিরাজ যে সাময়িক উত্তেজনাবশতঃ অপেক্ষাকৃত বয়ঃকনিষ্ঠ কৃষ্ণদাসের অনিন্দনীয় কান্তি ও যৌবনসুলভ লাবণ্যদর্শনে তৎপ্রতি অনুকম্পা প্রদর্শন করিয়াছিলেন, তাহা অনুমান করাও অসঙ্গত নহে।

অতঃপর নবাবসেনা কলিকাতা নগরী লুণ্ঠন করিতে ব্যস্ত হইল এবং আমিনচাঁদ ব্যতীত অন্য কোন নগরবাসিই উচ্ছৃঙ্খল নবাবসেনাগণের হস্ত হইতে পরিত্রাণ লাভ করিতে সমর্থ হইল না। আমিনচাঁদের

(১) সিরাজউদ্দৌলা, ১৮৫ পৃঃ

জমাদার পূর্ব্ব কথিত জগন্নাথ সিংহের অনুরোধে, নবাব স্বীয় সেনাগণকে আমিনচাঁদের গৃহে কোনরূপ উৎপাত করিতে নিষেধ করিয়া পাঠাইলেন। সুতরাং এই বিপ্লবে আমিনচাঁদের কোনরূপ ক্ষতি হইল না। কৃষ্ণদাস যে সমস্ত ধনরত্ন লইয়া কলিকাতায় আসিয়াছিলেন তাহা সমস্তই আমিনচাঁদের আলয়ে গচ্ছিত ছিল। সম্ভবতঃ সেই সমস্ত ধনরত্ন এই সুযোগে রক্ষা পাইল।

এখন সিরাজের আদেশে ক্রমে কলিকাতার নাম "আলিনগরে" পরিবর্ত্তিত হইল এবং বিজয়গর্ব্বে উৎফুল্ল হইয়া নবাব মাণিকচাঁদের হস্তে কলিকাতা রক্ষার ভার অর্পণপূর্ব্বক মুরশিদাবাদে প্রস্থান করিলেন।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

প্রজার বিরাগ

এই সময় বাঙ্গালা দেশে যে সমস্ত রাজপুরুষ বিদ্যমান ছিলেন, তন্মধ্যে রাজবল্লভ, মিরজাফর, মাহাতাপচাঁদ, জগৎশেঠ, রায়দুর্লভ, রামনারায়ণ, রেহিম খাঁ ও ওমরখাঁপ্রভৃতি কতিপয় ব্যক্তির নামই বিশেষরূপে উল্লেখযোগ্য।

রায়দুর্ল্লভ বা দুর্ল্লভরাম জানকীরামের পুত্র। "রাজাবলীতে" লিখিত আছে, যে সময় আলিবর্দ্দী সুজাখার অধীনতায় উড়িষ্যার

---

(1) Consultations, dated the 17th April, 1758—Long's Unpublished Records, page 141.

অন্তর্গত অসুরেশ্বর পরগণার তহবিলদারি কার্য্যে নিযুক্ত ছিলেন, সেই সময় জানকীরাম তাঁহার পেস্কারী করিতেন। আলিবর্দ্দী বিহারের শাসনকর্ত্তৃত্বলাভ করিলে জানকীরাম সেই প্রদেশের দেওয়ানি-পদে উন্নীত হন। গিরীয়ার যুদ্ধাবসানে বাঙ্গালার সিংহাসন আলিবর্দ্দীর করতলগত হইলে জানকীরাম সমরসচিবের পদ লাভ করেন। পাটনার শাসনকর্ত্তা জয়নদ্দিন আফগানের হস্তে নিহত হওয়ার পর আলিবর্দ্দীর নির্দ্দেশ অনুসারে জানকীরাম সিরাজের প্রতিনিধিস্বরূপ বিহারপ্রদেশের শাসনদণ্ড পরিচালনা করিতে প্রবৃত্ত হন। আলিবর্দ্দী বাঙ্গালার সিংহাসনে প্রতিষ্ঠিত হইয়াই ভূতপূর্ব্ব নবাব সুজাখাঁর জামাতা মুরশিদকুলীকে উড়িষ্যা প্রদেশের শাসন কর্ত্তৃত্ব হইতে বিতাড়িত করেন এবং সেনানী মুস্তাফার ভ্রাতুষ্পুত্র আব্দুল রসুলকে এই প্রদেশের শাসন কর্ত্তৃত্বে ও রায়দুর্ল্লভকে তাহার আমমোক্তার পদে নিযুক্ত করিয়া তথা হইতে প্রস্থান করেন। মুস্তাফা খাঁ বিদ্রোহী হইলে আব্দুল রসুল উড়িষ্যার শাসনভার পরিত্যাগপূর্ব্বক পিতৃব্যের পক্ষাবলম্বন করেন এবং সেই সময় রায়দুর্ল্লভ উড়িষ্যার শাসনভার প্রাপ্ত হন। ইতিমধ্যে মহারাষ্ট্রীয়েরা সদলবলে উড়িষ্যায় প্রবেশ করিয়া রায়দুর্ল্লভকে কারারুদ্ধ করে ও আলিবর্দ্দী তাহাদিগকে এক লক্ষ টাকা দিয়া এক বৎসর পর রায়দুর্ল্লভের কারামোচন করিতে সমর্থ হন। ১৭৫২ খৃষ্টাব্দে জানকীরাম পরলোক গমন করিলে রায়দুর্ল্লভ বাঙ্গালার সমরসচিবের পদ লাভ করেন।

রামনারায়ণ বাল্যকালে আলিবর্দ্দীর সংসারেই প্রতিপালিত হইয়াছিলেন। জয়নদ্দিন আহম্মদ বিহারের শাসন-কর্ত্তৃত্বলাভ করিলে রামনারায়ণ তাঁহার খাসনবিসের পদ লাভ করেন ও কার্য্যকুশলতা প্রদর্শন করিয়া ক্রমে ঐ প্রদেশের সহকারি দেওয়ানের পদে উন্নীত হয়েন।

জানকীরাম বিহারের প্রতিনিধি শাসনকর্ত্তা হইলে, রামনারায়ণ তাঁহার প্রধান সচিবের পদ লাভ করেন এবং জানকীরামের পরলোক গমনের পর সেই প্রদেশের শাসন-কর্ত্তৃত্বে বরিত হন।

মীরজাফর আলিবর্দ্দীর বৈমাত্রেয় ভগ্নীকে বিবাহ করিয়াছিলেন। যে সময় রায়দুর্ল্লভ উড়িষ্যার সুবাদারী পদে নিযুক্ত ছিলেন, তৎকালে মীরজাফর মেদিনীপুর ও হুগলীর ফৌজদারের কার্য্য করিতেন। মহারাষ্ট্রীয়েরা রায়দুর্ল্লভকে কারারুদ্ধ করিলে, আলিবর্দ্দীর মধ্যম জামাতা সৈয়দ আহাম্মদ উড়িষ্যার শাসন-কর্ত্তৃত্বে এবং মীরজাফর তাঁহার সহকারী-পদে নিযুক্ত হন। এই সময় একদা আলিবর্দ্দী মীরজাফরকে মহারাষ্ট্রীয় সেনার বিরুদ্ধে প্রেরণ করেন, কিন্তু বীরবর মিরজাফর শত্রুগণকে দেখিবামাত্রই ভয়ে অস্থির হইয়া পড়িয়া সসৈন্যে বর্দ্ধমানে পলায়নপূর্ব্বক জীবন রক্ষা করেন। মিরজাফরকে সাহায্য করিবার জন্য হাজি আহাম্মদের জামাতা আতাউল্লাও সসৈন্যে প্রেরিত হইয়াছিলেন। আতাউল্লা মহারাষ্ট্রীয়দিগকে উড়িষ্যা হইতে বিতাড়িত করিয়া দিয়া বর্দ্ধমানে মিরজাফরের সহিত মিলিত হন। এই সময়ে উভয়ে আলিবর্দ্দীকে বাঙ্গালার সিংহাসন হইতে অপসারিত করিবার উদ্দেশ্যে এক ষড়যন্ত্রে যোগদান করেন। আলিবর্দ্দী এই সংকল্প জানিতে পারিয়া মীরজাফরকে পদচ্যুত করিলে, মীরজাফর প্রথমতঃ আলিবর্দ্দীর বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করেন। কিন্তু সেনাগণ আলিবর্দ্দীর বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিতে সম্মত না হওয়ায় মীরজাফর অগত্যা মুরশিদাবাদে আসিয়া উদার-হৃদয় নিবাইস মহম্মদের শরণ গ্রহণ করেন। নিবাইস মীরজাফরের কাতর উক্তিতে বিগলিত হইয়া আলিবর্দ্দীর নিকট অনুরোধ করিলে, আলিবর্দ্দী মীরজাফরকে ক্ষমা করিয়া বকসির পদে স্থিরতর রাখেন।

জগৎশেঠ মাহাতাপচাঁদ আলিবর্দ্দীর রাজস্বসচিব ও খাজাঞ্চির-পদে

নিযুক্ত ছিলেন। তাঁহার আদিপুরুষ মাণিকচাঁদ প্রথমতঃ বাণিজ্যোপলক্ষে ঢাকায় অবস্থান করিতেন। মুরশিদকুলী বাঙ্গালার দেওয়ান হইয়া ঢাকায় পদার্পণ করিলে, তৎসহ মাণিকচাঁদের যথেষ্ট সৌহার্দ্দ সংঘটিত হইয়াছিল। মুরশিদকুলী মুরশিদাবাদে আসিলে মাণিকচাঁদও তাঁহার অনুগমন করেন। এ স্থলেই তিনি রাজস্ব বিভাগের পেস্কারী পদ লাভ করেন। মাণিকচাঁদের পরামর্শমতেই মুরশিদকুলি মুরশিদাবাদে টাকশাল সংস্থাপনপূর্ব্বক টাকা প্রস্তুত করিতে প্রবৃত্ত হন। মুরশিদ বাঙ্গালার নাজিমীপদে উন্নীত হইয়া সম্রাট্ ফেরকসিয়ারকে অনুরোধ করিলে, মাণিকচাঁদ সম্রাট্ দরবার হইতে শেঠ উপাধি লাভ করেন। শেঠপ্রবর নিঃসন্তান পরলোক গমন করিলে তাঁহার ভ্রাতুস্পুত্র ফতেচাঁদ পিতৃব্যের স্থলাভিষিক্ত হন। ইনিই সর্ব্বপ্রথম 'জগৎশেঠ' উপাধি লাভ করেন। আনন্দচাঁদ ও দয়ালচাঁদ নামে ফতেচাঁদের দুই পুত্র ছিল। আনন্দচাঁদ পিতার মৃত্যুর পূর্ব্বেই মাহাতাপচাঁদকে একমাত্র পুত্র বিদ্যমান রাখিয়া পরলোক গমন করেন। সুতরাং ফতেচাঁদ লোকান্তরিত হইলে মাহতাপচাঁদই জগৎশেঠ উপাধিতে ভূষিত হন। দয়ালচাঁদের পুত্র স্বরূপচাঁদ মহারাজ উপাধি লাভ করেন। (১)

সায়র মোতাক্ষরীণে লিখিত আছে, "মাণিকচাঁদকে সিরাজ কলিকাতার শাসন-কর্ত্তৃত্বে নিযুক্ত করিলেন। তিনি পূর্ব্বে বর্দ্ধমানরাজের দেওয়ান ছিলেন। মাণিকচাঁদের অনুমাত্রও যোগ্যতা ছিল না, অথচ তিনি অত্যন্ত অহঙ্কারী ও অপরিণামদর্শী ছিলেন। একদা মহারাষ্ট্রীয়েরা অতর্কিতভাবে বর্দ্ধমানে আলিবর্দ্দীকে আক্রমণ করিলে মাণিকচাঁদ ভয়ে তথা হইতে সসৈন্যে পলায়ন করিয়াছিলেন। এরূপ অপদার্থ লোককে কলিকাতার শাসন-কর্ত্তৃত্বের ন্যায় দায়িত্বপূর্ণ পদে নিযুক্ত হইতে দেখিয়া

(1) Long's Unpublished Records, pages 578 to 579.

মীরজাফর, রেহিম খাঁ, ওমর খাঁ প্রমুখ প্রবীণ সেনানী সমূহ অত্যন্ত অপমান বোধ করিলেন। সিরাজ যে কেবল অযোগ্য কর্ম্মচারী নিয়োগ করিয়াই ক্ষান্ত রহিলেন এমন নহে, তিনি ক্রমাগত রাজা রায়দুর্লভ প্রমুখ চরিত্রবান্ ও সম্মানাস্পদ সেনানীর প্রতি অভদ্রোচিত ব্যবহার করিতে কুণ্ঠা বোধ করিলেন না। জগৎশেঠ এবং মুরশিদাবাদ নগরের অন্যান্য প্রধান অধিবাসীরাও এখন সিরাজের হস্তে নানারূপ লাঞ্ছনাভোগ করিতে লাগিলেন। অগত্যা তাঁহারা সকলে একযোগে সিরাজের উচ্ছেদসাধনে কৃতসংকল্প হইয়া দাঁড়াইলেন। যে স্থলে কোনরূপ অসন্তোষের চিহ্ন প্রকাশ পাইতে লাগিল, সেই স্থলেই তাঁহারা গুপ্তচর প্রেরণ করিয়া উৎসাহ দিতে ত্রুটি করিলেন না। তৎকালে মীরজাফরই রাজ্যমধ্যে প্রধান ব্যক্তি ছিলেন এবং সিরাজ সর্ব্বাপেক্ষা তাঁহারই অধিক অনিষ্ট করিয়াছিলেন। সুতরাং মীরজাফর অগ্রণী হইয়া সিরাজের বিরুদ্ধে আন্দোলন করিতে লাগিলেন এবং জগৎশেঠও পরোক্ষভাবে তাঁহার সহায়তা করিতে বিস্মৃত হইলেন না।"

অর্ম্ম সাহেব :লিখিয়াছেন, "১৭৫৬ খ্রীষ্টাব্দের ৯ই এপ্রিল তারিখে আলিবর্দ্দী মানবলীলা সংবরণ করিলেন। তিনি কিরূপে রাজকার্য্য নির্ব্বাহ করিতেন তাহা তাঁহার কার্য্যবলীদ্বারাই প্রকটিত হইয়াছে। হিন্দুস্থানের অধিকাংশ মুসলমান নৃপতি অপেক্ষা আলিবর্দ্দীর পারিবারিক জীবন সম্পূর্ণ বিভিন্নভাবে যাপিত হইত।—উচ্চাকাঙ্ক্ষার ফলে তিনি যে সমস্ত অভিজ্ঞতা লাভ করিয়াছিলেন, তাহা পর্য্যালোচনা করিয়া এবং মীর হবিব ও মুস্তাফাখাঁর বিদ্রোহে সতর্ক হইয়া, তিনি স্বীয় বংশধর ব্যতীত অন্য কোন মুসলমানকেই দূরবর্ত্তী প্রদেশে দায়িত্বপূর্ণ পদে নিযুক্ত করিতেন না। তাঁহার অধিকাংশ সেনা মুসলমান হইলেও তিনি সর্ব্বদাই তাহাদিগকে চক্ষে চক্ষে রাখিতেন এবং যাহাতে তাহারা বিদ্রোহী না

হইতে পারে, এই অভিপ্রায়ে তাহাদিগকে সুদূরবর্ত্তী স্থানে অনেক দিন অবস্থান করিতে দিতেন না। সমস্ত সেনাই তাঁহার নিকট হইতে নিয়মিতরূপে উপযুক্ত পরিমাণ বেতন পাইত এবং কেহ কোন বীরোচিত কার্য্য করিলে, আলিবর্দ্দী তাহাকে নগদ টাকা ও জায়গীর প্রদানে পুরস্কৃত করিতেও বিস্মৃত হইতেন না। একমাত্র সেনাবিভাগ ব্যতীত অপর সমস্ত বিভাগে তিনি মুসলমানের পরিবর্ত্তে হিন্দু কর্ম্মচারীই নিযুক্ত করিতেন। সেনাবিভাগীয় কাজকর্ম্মে হিন্দুদিগের বিশেষ পারদর্শিতা ছিল না এবং তাঁহারা সেই বিভাগে কাজ করিতে তাদৃশ আগ্রহও প্রকাশ করিত না। আলিবর্দ্দীর হিন্দু কর্ম্মচারিগণ যাহাতে প্রভুর আয় বৃদ্ধি হইতে পারে সে বিষয়ে প্রাণপণে যত্নবান্ হইত। রায়হর্ল্ল‌ভ আলিবর্দ্দীর বিশ্বস্ত মন্ত্রী এবং ধনাধ্যক্ষ ছিলেন; মেদিনীপুরের রাজা রামরামসিংহ তাঁহার গুপ্তচরবিভাগে অধ্যক্ষতা করিতেন। হাজি আহাম্মদের পুত্র ও পৌত্রগণ আলিবর্দ্দীর নিয়োগানুসারে যে যে প্রদেশের শাসন-কর্ত্তৃত্বে প্রতিষ্ঠিত ছিলেন, সেই সমস্ত প্রদেশের শাসনসম্বন্ধীয় প্রায় সমস্ত কার্য্য এবং তাহাদের পারিবারিক যাবতীয় ব্যাপার হিন্দু কর্ম্মচারিগণের সহায়তায়ই নির্ব্বাহিত হইত। যেরূপে শেঠপরিবারের ধনবৃদ্ধি হইতে পারে, তাহাতে আলিবর্দ্দী সর্ব্বদা যত্নবান্ ছিলেন এবং শাসনসংক্রান্ত কার্য্যে তিনি তাহাদিগকে লইয়া নিয়তই নিভৃতে পরামর্শ করিতেন। তাঁহারই আমলে মাণিকচাঁদ হুগলীর এবং রামনারায়ণ বিহারের শাসন-কর্ত্তৃত্বে নিযুক্ত হইয়াছিলেন। ফলে আলিবর্দ্দীর শাসন-কালে হিন্দুদিগের এতদূর প্রাধান্য হইয়া উঠিয়াছিল যে, তাঁহাদের ইঙ্গিত ব্যতীত অথবা তাঁহাদের অজ্ঞাতে শাসন সংক্রান্ত কোন গুরুতর ব্যাপারই সংঘটিত হইতে পারিত না। হিন্দু কর্ম্মচারিগণ আলিবর্দ্দীর প্রতি নিরতিশয় অনুরক্ত ছিলেন। তাঁহারা কখনও বিশ্বাসঘাতকতা অবলম্বন

করিয়া প্রভুর সর্ব্বনাশ করিতেন না এবং আলিবর্দ্দীর যখন যে বিষয়ের অভাব হইত তাহা পূরণ করিতে হিন্দুকর্ম্মচারিগণ সাধ্যানুসারে চেষ্টা করিতেন। কথিত আছে যে, মহারাষ্ট্রীয় যুদ্ধোপলক্ষে একমাত্র শেঠ পরিবারই আলিবর্দ্দীকে ত্রিশলক্ষ টাকা সাহায্যকল্পে দান করিয়াছিলেন। এই সমস্ত কারণে আলিবর্দ্দী হিন্দুদিগের প্রীতিআকর্ষণ করিবার নিমিত্ত সিরাজকেও উপদেশ দিয়া গিয়াছিলেন। দুঃখের বিষয়, সিরাজ যে রাজোচিত গুণগ্রামে আলিবর্দ্দী অপেক্ষা অনেক নিকৃষ্ট ছিলেন, তাহা আলিবর্দ্দী বুঝিতে পারেন নাই। যে হিন্দুকর্ম্মচারিগণ আলিবর্দ্দীর শাসনকালে তাঁহার সিংহাসনের প্রধান স্তম্ভস্বরূপ ছিলেন সিরাজের অপরিণামদর্শিতায় তাঁহারাই তাঁহাকে ধ্বংসপথে প্রেরণ করিবার কারণ হইয়া দাঁড়াইলেন। (১)

রিয়াজু সেলাতিনে লিখিত আছে, "সিরাজউদ্দৌলা সিংহাসনে আরোহণ করিয়া এমনই কোপন স্বভাবের পরিচয় দিতে লাগিলেন ও লোকের প্রতি এতদূর দুর্ব্বাক্য প্রয়োগ করিতে প্রবৃত্ত হইলেন যে, লোকের মনে এখন ভীষণ আতঙ্কের সঞ্চার হইল। রাজ্যের সমস্ত সেনানী ও রাজপুরুষগণ মনে মনে অতীব উদ্বিগ্ন হইয়া পড়িলেন। কোন রাজপুরুষকে সিরাজের সম্মুখে উপস্থিত হইতে হইলেই তিনি মনে করিতেন যে সিরাজের হস্তে নিশ্চিতই তাঁহাকে সম্মান কিংবা প্রাণ বিসর্জ্জন দিতে হইবে। দৈবাৎ কেহ প্রাণে প্রাণে কিংবা সসম্মানে সিরাজের দরবার হইতে প্রত্যাবৃত্ত হইতে পারিলে তিনি তজ্জন্য ভগবানের নিকট কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিতে কদাচ বিস্মৃত হইতেন না। ভূতপূর্ব্ব নবাবের আমলের সমস্ত রাজপুরুষ ও সেনানীগণকেই সিরাজ সর্ব্বদা ঠাট্টা বিদ্রূপ করিতেন এবং তাঁহাদের প্রতি তাচ্ছীল্যভাব প্রদর্শন করিবার উদ্দেশ্যে প্রত্যেককে

(1) Orme's Indoostan, vol. II. page 53.

এক একটি অবজ্ঞাসূচক উপনাম ধরিয়া ডাকিতেন। সকল কর্ম্মচারিগণকেই সিরাজ যদৃচ্ছা কটূক্তি করিতেন এবং কেহই সাহস করিয়া তাঁহার সমক্ষে মুখব্যাদান করিতেন না। মোহনলাল নামক জনৈক কায়স্থকে সর্ব্ব প্রধান অমাত্যপদে নিযুক্ত করিয়া সিরাজ তাঁহাকে মহারাজ উপাধি প্রদান করিলেন এবং সমস্ত রাজপুরুষগণকেই তিনি এই নবীন সচিবের প্রতি সম্মান প্রদর্শন করিবার নিমিত্ত বিশেষরূপে সতর্ক করিয়া দিলেন। সিরাজ এখন মোহনলালের এতদূর বশীভূত হইয়া পড়িলেন যে, শাসনসংক্রান্ত সমস্ত কার্য্যই মোহনলালের পরামর্শে চলিতে লাগিল। অপরিমিত অনুগ্রহের ফলে মোহনলালের আত্মবিস্মৃতি ঘটিল এবং তিনি রাজস্ববিভাগের অধিকাংশ প্রবীণ কর্ম্মচারিগণকে পদচ্যুত করিয়া তাঁহাদের পদে আপন আত্মীয় স্বগণকে নিযুক্ত করিলেন।” (১)

এখন রাজ্যের অধিকাংশ লোকই সিরাজের বিপক্ষে দণ্ডায়মান হইল এবং কি উপায়ে এই অনুপযুক্ত শাসনকর্ত্তাকে অপসারিত করা যাইতে পারে তাহার উপায় চিন্তা করিতে লাগিল। সিরাজের অনুগ্রহে যে সমস্ত চঞ্চলমতি ও লম্পট যুবক হঠাৎ উন্নত পদবীতে আরোহণ করিয়াছিল, একমাত্র তাহারাই নবাবের প্রতি অনুরক্ত রহিল। (২)

তৎকালে সওকতজঙ্গ পূর্ণিয়ায় শাসনদণ্ড পরিচালনা করিতেছিলেন। তিনি কোন অংশেই সিরাজ অপেক্ষা উৎকৃষ্ট না হইলেও মুরশিদাবাদের লোকে তাঁহার গুণগ্রামের বিষয় অণুমাত্রও অবগত ছিল না। সুতরাং তাহারা এখন সিরাজের আচরণে উত্যক্ত হইয়া সওকতজঙ্গকেই সিংহাসনে বসাইবার সংকল্প করিল। অচিরে মীরজাফরের স্বাক্ষরযুক্ত

(1) Riazoo Salatin, page 363.

(2) Sair, vol. II page 187.

পত্রসহ জনৈক দূত পূর্ণিয়ার দরবারে আগমন করিল। পত্রে লিখিত ছিল—"আমরা সকলেই আপনার দিকে তাকাইয়া রহিয়াছি। সিরাজের দুর্ব্ব্যবহারে রাজ্যের সমস্ত প্রধান সেনানী ও রাজপুরুষ তৎপ্রতি খড়্গ-হস্ত হইয়া দাঁড়াইয়াছে। আপনি কয়েকটি নিয়মে আবদ্ধ হইতে সম্মত হইলে সকলেই আপনাকে সাহায্য করিতে প্রস্তুত আছে। অতএব আপনি আর কাল বিলম্ব না করিয়া রণসজ্জা করিতে প্রবৃত্ত হউন এবং সিরাজের উচ্ছেদ সাধন করিয়া আলিবর্দ্দীর সমস্ত বিভব অধিকার করুন।

এই সময় মীর সিয়াবর্দ্দিন উমেদউলমুল্ক নামক জনৈক সম্ভ্রান্ত মুসলমান দিল্লীশ্বরের প্রধান অমাত্যের পদে প্রতিষ্ঠিত ছিলেন। জায়েদ উদ্দৌলা ও জালালউদ্দিন নামে সেই সচিব প্রবরের দুইজন বন্ধু ছিল। সৈয়দ আহাম্মদ জীবিত থাকিতে তিনি ঐ বন্ধুদ্বয়ের নিকট সওকতজঙ্গকে বাঙ্গালা, বিহার ও উড়িষ্যার শাসন-কর্ত্তৃত্বের সনন্দ সংগ্রহ করিয়া দেওয়ার নিমিত্ত অনুরোধ করিয়াছিলেন। মীরজাফরের পত্র আসিবার অব্যবহিত পরেই সওকতজঙ্গ দিল্লী হইতে সেই সনন্দ প্রাপ্ত হইলেন। (১)

অতঃপর সওকতজঙ্গ গর্ব্বে উৎফুল্ল হইয়া সিরাজউদ্দৌলাকে লিখিয়া পাঠাইলেন—"আমি দিল্লী হইতে বাঙ্গালা, বিহার ও উড়িষ্যার শাসন-কর্ত্তৃত্বের সনন্দ প্রাপ্ত হইয়াছি। উভয়ে একই বংশে জন্মগ্রহণ করিয়াছি বলিয়াই আমি আপনার প্রাণদণ্ড করিতে ইচ্ছা করিতেছি না। গ্রাসাচ্ছাদনের নিমিত্ত আপনার অভিপ্রায় মত ঢাকা বিভাগের যে কোন স্থান আপনাকে প্রদান করিতে আমি প্রস্তুত আছি। এখন আমার আদেশ এই যে, আপনি আর কালবিলম্ব না করিয়া রাজপ্রাসাদ, কোষাগার এবং গৃহসজ্জাসমূহ আমার কর্ম্মচারীর হস্তে অর্পণ করিয়া ঢাকায় প্রস্থান করিবেন। সাবধান, পত্রের উত্তর দিতে অণুমাত্রও

---

(1) Sair, vol. II page 197.

বিলম্ব করিবে না। উত্তরের অপেক্ষায় জিনপোষে পদদ্বয় সংস্থাপন-পূর্ব্বক আমি অশ্বপৃষ্ঠে দণ্ডায়মান রহিলাম।" (১)

সিরাজ সওকতজঙ্গের স্পর্দ্ধা সহ্য করিলেন না। তিনি অবিলম্বে প্রচুর সেনা সংগ্রহ করিয়া পূর্ণিয়ার অভিমুখে অগ্রসর হইতে লাগিলেন। অবশেষে সিরাজ সেনার সহিত সওকতজঙ্গের সেনার সমরক্ষেত্রে সাক্ষাৎ হইল। যুদ্ধে সওকতজঙ্গ নিহত হইলেন এবং সিরাজ পূর্ণিয়া অধিকার করিয়া তাহার শাসন-কর্ত্তৃত্ব মোহনলালের পুত্রের হস্তে অর্পণ করিলেন।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ

বিপ্লবের উদ্যোগ

কলিকাতা সিরাজের হস্তগত হওয়ার অব্যবহিত পরেই মানিঙ্হাম নামক জনৈক ইংরেজ এই দুর্ঘটনার সংবাদ লইয়া মান্দ্রাজে উপস্থিত হইল। মান্দ্রাজ-প্রবাসী ইংরেজেরা এখন পরামর্শ করিয়া স্থির করিল যে, বাঙ্গালা দেশে ইংরেজের প্রতিষ্ঠা পুনঃ সংস্থাপন করিতে হইলে তথায় একদল সুশিক্ষিত সেনা প্রেরণ করা একান্তই কর্ত্তব্য। তদনুসারে কর্ণেল ক্লাইব ও এডমিরাল ওয়াটসন সাহেব কতিপয় রণপোত লইয়া বঙ্গোপসাগরের মধ্য দিয়া ১৭৫৬ খ্রীষ্টাব্দের ১০ই অক্টোবর কলিকাতা অভিমুখে যাত্রা করিলেন।

---

(1) Sair, vol. II page 206.

সায়র মোতাক্ষরীণে লিখিত আছে—"ইংরেজ সেনানীরা স্বভাবতই বহুদর্শী ও সতর্ক। তাঁহারা ভবিষ্যতের প্রতি লক্ষ্য না রাখিয়া কোন কার্য্যেই হস্তক্ষেপ করেন না। যুদ্ধ বিগ্রহ উপস্থিত হইলে পশ্চাৎপদ হয়, ইংরেজ সেনার মধ্যে এমন লোক অতি বিরল। বাঙ্গালায় উপস্থিত হইয়া ক্লাইব স্থির করিলেন যে, অস্ত্রধারণের পূর্ব্বে সন্ধির প্রস্তাব করাই কর্ত্তব্য। সুতরাং তিনি বিনীতভাবে ড্রেক সাহেবের কার্য্যের নিমিত্ত ক্ষমা প্রার্থনা করিয়া সিরাজের নিকট লিখিয়া পাঠাইলেন, "ইংরেজদিগকে পূর্ব্বের ন্যায় বাণিজ্যকুঠী সংস্থাপন করিবার অনুমতি দিলে তাঁহারা নবাবকে কয়েক লক্ষ টাকা ক্ষতিপূরণস্বরূপ প্রদান করিতে প্রস্তুত আছেন।" সিরাজ নিরতিশয় নির্ব্বোধ ও অনভিজ্ঞ লোক ছিলেন এবং তাঁহার পার্শ্বচরেরা তদপেক্ষা অধিকতর কাণ্ডজ্ঞানশূন্য ছিল। দুর্ভাগ্যবশতঃ সিরাজ সেই সমস্ত পার্শ্বচরগণকে লইয়াই ক্লাইবের পত্রসম্বন্ধে পরামর্শ করিতে বসিলেন এবং সকলে মিলিয়া স্থির করিলেন যে ক্লাইবের প্রস্তাবে সম্মত হওয়া কোন মতেই উচিত নহে। দরবারে যে সমস্ত অভিজ্ঞ মন্ত্রী ছিলেন, তাঁহারা এ সময় কোন কথা বলিতে সাহস করিলেন না। ফলে নবাব তৎকালে এরূপ অপদার্থ লোকসমূহে পরিবেষ্টিত ছিলেন যে, কেহ ক্লাইবের প্রস্তাবে সম্মত হওয়ার কথা বলিলে তাহার দরবারে অবস্থান করা দুঃসাধ্য হইয়া উঠিত। সমস্ত প্রবীণ অমাত্যগণ সিরাজের অত্যাচারে জর্জ্জরিত হইয়াছিলেন, সুতরাং তাঁহারা মনে মনে সিরাজের উচ্ছেদ কামনা করিয়া এই সমস্যার সময় অগ্রবর্ত্তী হইয়া কোন কথা বলিলেন না।

"ক্লাইব নবাব দরবারের সমস্ত অবস্থাই ক্রমে জানিতে পারিলেন। অতঃপর উত্তরের অপেক্ষায় কালবিলম্ব করা অন্যায় মনে করিয়া তিনি সমরসজ্জা করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। অল্প কয়েকদিন মধ্যেই ইংরেজ

রণতরীসমূহ সগর্ব্বে পতাকা উত্তোলনপূর্ব্বক জলপথে আসিয়া মাণিক-চাঁদের আবাসস্থানের সম্মুখে নঙ্গর করিল। এখন রণপোতস্থিত ইংরেজ কামানশ্রেণী অনবরত অনল বর্ষণ করিয়া মাণিকচাঁদকে ব্যতিব্যস্ত করিয়া তুলিল। ইংরেজ সেনাগণ তৎকালে নিশ্চেষ্ট না রহিয়া জাহাজ হইতে অবতরণপূর্ব্বক মাণিকচাঁদের আবাসস্থানের দিকে ধাবমান হইল। ইংরেজসেনার সম্মুখে যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইতে পারেন মাণিকচাঁদের এরূপ সেনাবল ছিল না; সুতরাং তিনি বেগে প্রস্থান করিয়া আত্মরক্ষা করিলেন। এই সুযোগে ইংরেজবাহিনী কলিকাতা পুনরুদ্ধার করিয়া তথায় বিজয়পতাকা উত্তোলন করিতে বিস্মৃত হইল না।

"নবাব এই সংবাদ শুনিতে পাইয়া ইংরেজদিগকে বিতাড়িত করিবার উদ্দেশ্যে সসৈন্যে কলিকাতায় আসিবার সংকল্প করিলেন। পূর্ণিয়া বিজয়ের পর হইতে এপর্য্যন্ত চারি মাস বাইশ দিন মাত্র অতীত হইয়া গিয়াছে এবং সিরাজ এই সময় মুরশিদাবাদের প্রাসাদে বসিয়া কেবল সুখের কল্পনাই করিতেছিলেন। বিধাতার বিড়ম্বনায় সিরাজের সেই সুখকল্পনা চিরকালের নিমিত্ত অন্তর্হিত হইতে চলিল। তিনি এ পর্য্যন্ত যে সমস্ত পাপানুষ্ঠান করিয়াছেন, এখন তাহার প্রায়শ্চিত্ত আরম্ভ হইল। হিজরি ১১৭০ সনের ১২ই তারিখে বহুসংখ্যক সেনা ও প্রচুর যুদ্ধোপকরণসহ নবাব কলিকাতা অভিমুখে যাত্রা করিলেন এবং ক্রমে কলিকাতার নিকটবর্ত্তী হইয়া একস্থানে শিবিরসন্নিবেশনপূর্ব্বক অবস্থান করিতে লাগিলেন। সুচতুর ইংরেজ নবাবের আগমনবার্ত্তা পাইয়াই সন্ধির প্রস্তাবসহ নবাবশিবিরে দূত প্রেরণ করিল। দূতেরা সন্ধির ছলে শিবির মধ্যে প্রবেশ করিয়া গোপনে শিবিরসংক্রান্ত সমস্ত তত্ত্বই সংগ্রহ করিয়া ফেলিল। সিরাজ এরূপ বুদ্ধিমান্ ছিলেন যে, ইংরেজ দূতগণের নিগূঢ় অভিপ্রায় তিনি অণুমাত্রও বুঝিতে পারিলেন না এবং

সন্ধির সর্ত্ত বিষয়ে তর্কবিতর্ক করিয়া কেবল কালক্ষয় করিতে লাগিলেন। সমস্ত তত্ত্ব সংগৃহীত হইলে ইংরেজসেনা একদা রজনী প্রভাত হইবার পূর্ব্বে পশ্চাৎভাগ দিয়া নবাবশিবির আক্রমণ করিল। শত্রুপক্ষীয় গোলার আঘাতে শিবিরের অনেক সেনা হত ও আহত হইল এবং এবং অবশিষ্ট সেনা ছত্রভঙ্গ হইয়া পলায়ন করিল। যে পটমণ্ডপে নবাব অবস্থান করিতেছিলেন, তাহা অবরোধ করিয়া স্বয়ং নবাবকে বন্দী করাই ইংরাজদিগের প্রধান লক্ষ্য ছিল। সৌভাগ্যক্রমে সেইদিন কুজ্ঝটিকায় আচ্ছন্ন ছিল, সুতরাং ইংরেজ সেনা আর নবাবের পটমণ্ডপ অনুসন্ধান করিয়া বাহির করিতে পারিল না। নবাব এই সুযোগে বেগে প্রস্থান করিয়া আত্মরক্ষা করিলেন। অনেকদূর পর্য্যন্ত গিয়া সিরাজ বুঝিতে পারিলেন যে, ইংরাজসেনাগণ এখন আর তাঁহার অনুসরণ করিবে না। তখন তিনি কিংকর্ত্তব্য স্থির করিবার জন্য সকল অনুচরকে নিকটে আহ্বান করিলেন। অনুচরগণ আসিয়া দেখিল যে নবাব ভয়ে নিতান্তই বিহ্বল হইয়া পড়িয়াছেন। সুতরাং তাহারা নবাবের অবস্থা দেখিয়া পরামর্শ দিল যে, ইংরাজদিগের প্রস্তাব মতে সন্ধির সর্ত্তে সম্মত হওয়াই এখন কর্ত্তব্য। ইতিপূর্ব্বে ইংরেজেরা যে সকল সর্ত্তে সন্ধি করিতে প্রস্তুত ছিল, তাহার অধিকাংশই নবাবের অনুকূল ছিল এবং পার্শ্বচরগণের কুপরামর্শে তিনি সেই সমস্ত সর্ত্তে সন্ধি করিতে সম্মত হন। বর্ত্তমানে যে সন্ধির প্রস্তাব, হইল তাহাতে নবাবকে কলিকাতা আক্রমণের সমস্ত ক্ষতিপূরণ কড়ায় গণ্ডায় বুঝাইয়া দিতে হইল এবং তিনি এইভাবেই সন্ধি করিয়া মুরশিদাবাদে প্রস্থান করিলেন।

"মুরশিদাবাদে আসিয়া সিরাজ কেবল পূর্ব্বোক্ত দুর্ঘটনার বিষয় চিন্তা করিতে লাগিলেন। বিগত জীবনের পাপানুষ্ঠানসমূহ এখন তাঁহার স্মৃতিপটে উদিত হইল এবং তিনি তজ্জন্য কিয়ৎপরিমাণে অনুতাপও বোধ

করিলেন। নবাব এখন ক্রমে বুঝিতে পারিলেন যে, ভগবান পাপীকে সমুচিত প্রতিফল দেওয়ার উদ্দেশ্যে নিয়তই ন্যায়দণ্ড উত্তোলন করিয়া রহিয়াছেন। প্রধান প্রধান সেনানীগণ এবং নিকটবর্ত্তী আত্মীয়বর্গ এই সময় হইতেই নবাব দরবারে অনুপস্থিত হইতে লাগিলেন। প্রভুভক্ত ও বিশ্বস্ত সেনানী দোস্ত মহম্মদ নবাবের অনুমতি লইয়া মুরশিদাবাদ হইতে সাসেরামে চলিয়া গেল। প্রধানতম সেনানী রায়দুর্ল্লভ ও মীরজাফর এখন আর দরবারে উপস্থিত হওয়া আবশ্যক মনে করিলেন না। রায়দুর্ল্লভ ও মীরজাফরের প্ররোচনায় অচিরে রাজ্যের সর্ব্বত্র অসন্তোষের বীজ বিকীর্ণ হইয়া পড়িল। নবাব এ কথা বুঝিতে পারিয়াও তাঁহাদিগের প্রতি কোনরূপ দণ্ডবিধান করিতে সাহসী হইলেন না। তিনি মনে করিলেন, রায়দুর্ল্লভ ও মিরজাফর সম্বন্ধে কোনরূপ প্রতিবিধান করিলেই ইংরেজেরা তাঁহাদের পক্ষাবলম্বন করিয়া তাঁহাকে বিপন্ন করিয়া তুলিবে। সদয় ব্যবহার করিলে নবাব যে রায়দুর্ল্লভ ও মির-জাফরকে বশীভূত করিতে পারিবেন, সে বিষয়েও সন্দেহ; কিন্তু তিনি এমনই নির্ব্বোধ, গর্ব্বিত এবং বিপথগামী ছিলেন যে, এই উপায় অবলম্বন করা তাঁহার নিকট অপমানজনক বলিয়া প্রতিপন্ন হইল। দৃঢ়তা অবলম্বনপূর্ব্বক উভয় সেনানীর প্রাণসংহার করিলেও তিনি নিষ্কণ্টক হইতে পারিতেন; কিন্তু তাঁহাদের ন্যায় পদস্থ ব্যক্তিগণকে আক্রমণ করিতে যে পরিমাণ সাহসের প্রয়োজন, তাহা নবাবের মনে সঞ্চারিত হওয়ার কোন সম্ভাবনা ছিল না। রাজানুগৃহীত পার্শ্বচরগণ সকলেই যে কেবল অযোগ্য ছিলেন এমন নহে, অণুমাত্র সৎসাহস থাকিলেও তাঁহারা নিশ্চিতই নবাবকে বলিতেন যে, উপস্থিত সমস্যার সময় একমাত্র তাঁহাদেরই পরামর্শে পরিচালিত হওয়া নবাবের পক্ষে কর্ত্তব্য নহে। এই সমস্ত অপদার্থ লোকের প্ররোচনায় বশীভূত হইয়া নবাব এখন

প্রবীণ অমাত্য ও সেনানীগণের সহিত কোনরূপ পরামর্শ করা আবশ্যক মনে করিলেন না। প্রবীণ অমাত্য ও সেনানীগণের উপর বিশ্বাস স্থাপন করিলে ও তাঁহাদের প্রতি সৌজন্য দেখাইলে নবাব নিশ্চিতই তাঁহাদের প্রীতি আকর্ষণ করিতে পারিতেন। কিন্তু বিধাতার বিড়ম্বনায় তিনি এই সহজ পথ অবলম্বন করিতে বিরত হইয়া ক্রমেই গুরুতর সমস্যায় নিপতিত হইতে লাগিলেন। পার্শ্বচরগণ প্রকৃতপক্ষে নবাবের হিত-কামনা করিলে তাহারা অবশ্যই নবাবকে বলিত যে, এই সমস্যার সময় রাজ্যের প্রধান প্রধান ব্যক্তিগণকে একত্র করিয়া পরামর্শক্রমে কর্ত্তব্য স্থির করা সঙ্গত। কিন্তু তাঁহারা নবাবের নিকট অযোগ্য বলিয়া প্রতিপন্ন হওয়ার ভয়ে এ সম্বন্ধে কোন কথা বলিল না। এক একবার যে নবাব প্রবীণ অমাত্যগণের সহিত সদ্ভাব স্থাপন করিবার কল্পনা না করিলেন এমন নহে। কিন্তু দুর্জ্জয় অভিমান ও রোষে জর্জরিত হইয়া তিনি সেই ভাব অনেকক্ষণ স্থির রাখিতে পারিলেন না। মীরজাফরের মনে ভীতি সঞ্চারিত করিবার উদ্দেশ্যে তিনি অভিমানের বশে মীরজাফরের আলয়ের সম্মুখভাগে কামান সংস্থাপন করাইলেন। মোহনলাল রাজ্যের সর্ব্বোচ্চ পদে প্রতিষ্ঠিত হইলে, রায়দুর্ল্লভ প্রমুখ সমস্ত প্রধান রাজপুরুষগণই মনে মনে অত্যন্ত অসন্তুষ্ট হইলেন এবং মোহনলালের অধীন হইয়া কার্য্য করিতে রায়দুর্ল্লভ স্পষ্টভাবেই অস্বীকার করিলেন। সমগ্র মুরশিদাবাদ নগরে ক্ষমতা ও ঐশ্বর্য্যে জগৎশেঠের তুলনা ছিল না বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। সিরাজ এখন সেই জগৎশেঠকেই সর্ব্বদা অপমানিত করিতে লাগিলেন এবং সময় সময় তাঁহাকে মুসলমান করিবার ভয় দেখাইতেও কুণ্ঠিত হইলেন না (১) এইরূপ দুর্ব্ব্যবহারের ফলেই জগৎশেঠ সম্পূর্ণরূপে সিরাজের বিপক্ষ হইয়া দাঁড়াইলেন।

(১) পূর্ব্বে বলা হইয়াছে, সিংহাসন উপলক্ষে ঘেসেটিবেগমের সহিত সিরাজের

এই সময় ফরাসিসদিগের সহিত ইংরেজদিগের যুদ্ধ উপস্থিত হইল এবং ইংরেজেরা ফরাসিসদিগকে পরাভূত করিয়া দিয়া ফরাসডাঙ্গা ও কাশিমবাজারের সমস্ত কুঠী অধিকার করিলেন। ফরাসীসেনানী মোঁসে ল অতঃপর কতিপয় সেনাসহ মুরশিদাবাদে আসিয়া সিরাজের আলয়ে বাস করিতে লাগিলেন। ইংরেজেরা এই ঘটনার কথা জানিতে পারিয়া নবাবকে লিখিয়া পাঠাইলেন যে, ফরাসিসসেনাগণ মুরশিদাবাদে বাস করিবার অনুমতি পাইলে নবাবের সহিত সদ্ভাব রক্ষা করা ইংরেজদিগের পক্ষে কঠিন হইয়া দাঁড়াইবে। ফরাসিসসেনা মুরশিদাবাদে থাকিলে নবাবের পক্ষ প্রবল থাকিবে এবং তাঁহারা তথা হইতে প্রস্থান করিলে সিরাজের সর্ব্বনাশের পথ প্রশস্ত হইবে ভাবিয়া, নবাব দরবারের অধিকাংশ সভাসদই ইংরেজদিগের আপত্তি যে ন্যায়সঙ্গত

সংঘর্ষ হওয়ার উপক্রম হইলে, জগৎশেঠের কৌশলেই ঘেসেটিবিবী সিরাজের বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করিতে বিরত হইয়াছিলেন। বোধ হয় উপকারের প্রতিদান স্বরূপই সিরাজ এখন জগৎশেঠের সহিত পূর্ব্বোক্ত দুর্ব্যবহার করিয়াছিলেন।

লঙ সাহেবের প্রকাশিত ইংরেজ দপ্তরের কাগজপত্রে লিখিত আছে, "দিল্লীর দরবার হইতে সওকতজঙ্গ বাঙ্গালার নবাবী সনন্দ সংগ্রহ করিয়াছেন, এই কথা শুনিয়া সিরাজ জগৎশেঠকে নবাব দরবারে উপস্থিত হইবার আদেশ প্রদান কলিলেন এবং জগৎশেঠ তথায় উপস্থিত হইলেই, তিনি জগৎশেঠকে তাঁহার নিমিত্ত সনন্দ সংগ্রহ না করার নিমিত্ত যৎপরোনাস্তি ভর্ৎসনা করিতে লাগিলেন। পরে তিনি জগৎশেঠকে বলিলেন, 'যেরূপে হউক বণিকদিগের নিকট হইতে তিনকোটি টাকা সংগ্রহ করিতে হইবে।' জগৎশেঠ উত্তর করিলেন, 'বণিকদিগের অবস্থা এত শোচনীয় যে তাহাদের নিকট হইতে অর্থ সংগ্রহ করা অতি সুকঠিন ব্যাপার।' নবাব এই কথায় ক্রোধে উন্মত্ত হইয়া জগৎশেঠের গণ্ডদেশে চপেটাঘাত করিলেন। অবশেষে তাঁহাকে কারারুদ্ধ করিতেও কুণ্ঠিত হইলেন না"—Long's Unpublished Records, Page 77.

তাহা নবাবের নিকট বলিতে কুণ্ঠিত হইল না। অগত্যা নবাব ল সাহেবকে ডাকিয়া তাঁহাকে সেনাসহ আজিমাবাদে যাইতে বলিলেন। যাওয়ার সময় ফরাসীসেনানী নবাবকে বলিলেন, "যে কাল পর্য্যন্ত আমি মুরশিদাবাদে অবস্থান করিব, ততদিন কেহ আপনার কেশাগ্রও স্পর্শ করিতে সাহস করিবে না। আমার মুরশিদাবাদ পরিত্যাগের অব্যবহিত পরেই সভাসদগণ ইংরেজদিগের সহিত ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হইয়া আপনার সর্ব্বনাশ করিতে উদ্যত হইবে।" একথা যে বর্ণে বর্ণে সত্য তাহা সিরাজ যে না বুঝিলেন, এমন নহে। কিন্তু তৎকালে তিনি ইংরেজদিগকে যমের ন্যায় ভয় করিতেছিলেন; সুতরাং ফরাসীসেনানীর পরামর্শমতে কার্য্য করিতে তাঁহার সাহসে কুলাইয়া উঠিল না। অগত্যা ল সাহেব ও আর অপেক্ষা না করিয়া আজিমাবাদে প্রস্থান করিলেন।

ফরাসি সেনানী মুরশিদাবাদ পরিত্যাগ করিলেই পুনরায় ষড়যন্ত্রের সূচনা হইল। রায়দুর্ল্লভ ও মিরজাফরের সহিত সিরাজউদ্দৌলার এখন মনোমালিন্যের পরিসীমা ছিল না। তাঁহারা জগৎশেঠ ও অন্যান্য সভাসদগণকে লইয়া গোপনে মন্ত্রণা করিতে লাগিলেন। প্রায় সকল সভাসদই সিরাজের নৃশংস ও নির্দ্দয়ভাবে তৎপ্রতি বীতশ্রদ্ধ হইয়া পড়িয়াছিলেন। তাঁহারা এখন বৈরনির্য্যাতনের সুবিধা পাইয়া উৎসাহ-সহকারে পূর্ব্বোক্ত মন্ত্রণাসভায় যোগদান করিলেন। পূর্ব্বে বলা হইয়াছে যে, সিরাজ ঘেসেটিবিবীর যথাসর্ব্বস্ব লুণ্ঠন করিয়া তাঁহার মতিঝিলের প্রাসাদ ভূমিসাৎ করিয়াছিলেন। এই মহিলা এখন সেই সমস্ত অত্যাচারের প্রতিফল দিবার উদ্দেশ্যে ষড়যন্ত্রকারিগণের সহিত আগ্রহ সহকারে কথাবার্ত্তা চালাইতে লাগিলেন। সিরাজের উৎপীড়নে নিবাইসপত্নীর মনে দারুণ আঘাত লাগিয়াছিল; সুতরাং তিনি রাজ্যের প্রধান প্রধান লোকের নিকট বিশ্বস্ত অনুচরযোগে লিখিয়া পাঠাইলেন,

"ভূতপূর্ব্ব নবাব আলিবর্দ্দী খাঁ এবং তাঁহার জামাতা নিবাইস মহম্মদ আপনাদিগের অনেক উপকার করিয়া গিয়াছেন। এ হতভাগিনী সেই আলিবর্দ্দীর তনয়া এবং নিবাইসের ধর্ম্মপত্নী। পিতা ও স্বামীর কৃত উপকারের নিমিত্ত আমি আপনাদের কৃতজ্ঞতাভাজন বলিয়া বিবেচিত হইলে, আপনারা সিরাজের উচ্ছেদ সাধনোদ্দেশ্যে মিরজাফরের সহিত যোগদান করিতে অণুমাত্রও কুণ্ঠিত হইবেন না।" সিরাজকর্ত্তৃক মতিঝিলের প্রাসাদ লুণ্ঠিত হওয়ার সময় বিশ্বস্ত ও প্রাচীন পরিচারিকা ও খোজার সহায়তায়, ঘেসেটিবিবী কিয়ৎপরিমাণ ধনরত্ন সিরাজসেনার কর হইতে রক্ষা করিতে পারিয়াছিলেন। নবাবতনয়া সেই সমস্ত ধনরত্ন কৌশলে মীরজাফরের নিকট পাঠাইয়া দিলেন। মীরজাফর এখন সেই অর্থে প্রচুর সেনা সংগ্রহ করিলেন। অতঃপর জগৎশেঠ সকলের অগ্রণী হইয়া আমিনচাঁদের যোগে ইংরেজদিগকে সিরাজের বিরুদ্ধে উত্তেজিত করিতে লাগিলেন। রায়দুর্ল্লভও এই সময় ইংরেজ দরবারে একজন চর প্রেরণ করিলেন। আমির বেগ নামক জনৈক বিশ্বস্ত লোক মিরজাফরকর্ত্তৃক কলিকাতায় প্রেরিত হইয়া, ইংরেজদিগের নিকট সিরাজের সমস্ত অত্যাচার কাহিনী বিস্তৃতভাবে বলিলেন এবং সভাসদ্‌গণ যে সিরাজের বিরুদ্ধে মিরজাফরকে সাহায্য করিবেন বলিয়া প্রতিজ্ঞাপত্রে সাক্ষর করিয়াছেন, তাহাও প্রদর্শন করিলেন। আমির বেগ ইংরেজদিগকে উপসংহারে বলিলেন, 'ভদ্রমহোদয়গণ! আপনারা আর অলসতার আশ্রয় গ্রহণ করিয়া কালক্ষেপ করিবেন না। আপনারা সত্বর রণসজ্জা করিয়া সিরাজের সহিত সংগ্রামে লিপ্ত হইলেই আমরা অত্যাচারপরায়ণ সিরাজউদ্দৌলার উচ্ছৃঙ্খলতা হইতে আমাদিগকে ও বসুন্ধরাকে মুক্ত করিবার উপায় অবলম্বন করিতে অণুমাত্র বিলম্ব করিব না। এই কথা বলিয়া আমির বেগ নীরব হইলে ইংরেজদিগের

সহিত তাঁহার সন্ধির সর্ত্তসমূহ লিখিত ও পঠিত হইল। সন্ধিপত্রে লিখিত হইল যে, সিরাজের উচ্ছেদ সাধনোদ্দেশ্যে ইংরেজেরা সেনাবল দিয়া মীরজাফরের সহায়তা করিবেন এবং মীরজাফর তাঁহাদিগকে পারিশ্রমিক স্বরূপ নগদ তিনকোটি টাকা দিবেন। অতঃপর আমির বেগ ইংরেজ দরবারে ঘেসেটিবিবীর প্রসঙ্গ অবতারণ করিলেন। সিরাজের হস্তে ঘেসেটিবিবী যে সমস্ত লাঞ্ছনা ভোগ করিতেছিলেন, তাহা আমির বেগ বিশদভাবে বর্ণনা করিলে, ইংরেজদিগের বীরোচিত শোণিত রোষে ও ক্ষোভে উত্তপ্ত হইয়া উঠিল। সুতরাং তাঁহারা রায়দুর্ল্লভ ও মিরজাফরের প্রস্তাবে সম্মত হইতে অণুমাত্রও আপত্তি করিলেন না। সিরাজ ইতিপূর্ব্বে ইংরেজদিগের সহিত যে সন্ধি করিয়াছিলেন, তাহাতে কলিকাতা আক্রমণসম্বন্ধে ক্ষতিপূরণ দেওয়ার কথা ছিল। বোধ হয় এই সূত্র ধরিয়া ইংরেজেরা এখন সিরাজের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করিলেন এবং কর্ণেল ক্লাইব ইংরেজবাহিনীর অধ্যক্ষ্যরূপে সসৈন্যে মুরশিদাবাদের দিকে অগ্রসর হইতে লাগিলেন।" (১)

অক্ষয়বাবু লিখিয়াছেন, "সিরাজ মাণিকচাঁদের নিকট হইতে দশ লক্ষ টাকা দণ্ডস্বরূপ গ্রহণ করিয়া তাহাকে মুক্তি প্রদান করিলে, রায়দুর্ল্লভ রাজবল্লভ, জগৎশেঠ ও মীরজাফর সকলেই ভাবিলেন, মাণিকচাঁদ উপলক্ষ মাত্র; অতঃপর সকলকেই একে একে উৎপীড়ন করিয়া সিরাজউদ্দৌলা ইচ্ছানুরূপ অর্থ শোষণ করিবেন। সুতরাং স্বার্থ রক্ষার জন্য জগৎশেঠের মন্ত্রণাভবনে পুনরায় নৈশ-সম্মিলনের সংকেত স্থান হইয়া উঠিল। যাঁহারা গুপ্ত মন্ত্রণায় লিপ্ত হইতে লাগিলেন, তাঁহারা কেহই দেশের জন্য চিন্তা করিতেন না। জৈন জগৎশেঠ, মুসলমান

---

(1) Sair, vol. II pages 220 tc 229.

মীরজাফর, বৈদ্য রাজবল্লভ, কায়স্থ দুর্ল্লভরাম, সুদখোর উমিচাঁদ, প্রতিহিংসাপরায়ণ মাণিকচাঁদ, ইহাদের কাহারও সহিত কাহারও শোণিত সংশ্রব বা স্নেহবন্ধন ছিল না; কেবল স্বার্থরক্ষার জন্যই একে অপরের পৃষ্ঠরক্ষার্থ দলবদ্ধ হইয়াছিলেন। যাঁহাদের সহিত অগণিত প্রকৃতিপুঞ্জের সুখদুঃখের চিরসংশ্রব, তাঁহাদের মধ্যে কেবল কৃষ্ণনগরাধিপতি মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র ভুপ বাহাদুর এই গুপ্তমন্ত্রণায় যোগদান করিবার কথা শুনিতে পাওয়া যায়।" (২)

রাজবল্লভ যে এইরূপ কোন গুপ্ত মন্ত্রণার মধ্যে লিপ্ত ছিলেন, তাহা রেয়াজুসেলাতিন কিংবা অন্য কোন মুসলমান লেখকের ইতিহাসে লিখিত নাই। সিরাজের বিরুদ্ধে যে ষড়যন্ত্র হইয়াছিল, তৎসম্বন্ধে মোতাক্ষরীণে যাহা লিখিত আছে, তাহা পূর্ব্বে উদ্ধৃত করা হইয়াছে। অর্ম্মপ্রমুখ যে সমস্ত ইংরেজ লেখক এই সময়ের ইতিহাস সংকলন করিয়া গিয়াছেন তাঁহারা কেহই বলেন না যে, রাজবল্লভ এইরূপ কোন ষড়যন্ত্রে লিপ্ত ছিলেন। তবে নবীনবাবুর "পলাশীর যুদ্ধ" কাব্যে বর্ণিত হইয়াছে যে, সিরাজের বিরুদ্ধে শেঠভবনে যে গুপ্ত সভা হইয়াছিল, তাহাতে রাজবল্লভ যোগদান করিয়াছিলেন। বলা বাহুল্য যে, "পলাশীর যুদ্ধ" ইতিহাস নহে, উহা একখানি কাব্য মাত্র, সুতরাং ঐতিহাসিক অন্য প্রমাণ না থাকিলে, নিরঙ্কুশ কবির পলাসীর যুদ্ধের লিখিত বৃত্তান্ত সত্য বলিয়া পরিগৃহীত হইতে পারে না। এ কথা অস্বীকার্য্য নয় যে, ৺কার্ত্তিকচন্দ্র-রায়প্রণীত ক্ষিতীশ বংশাবলীতে লিখিত আছে, "নবাব সিরাজউদ্দৌলার অত্যাচারে উৎপীড়িত হইয়া রাজা মহেন্দ্র (রায়দুর্ল্লভ), রাজা রামনারায়ণ, রাজা রাজবল্লভ, রাজা কৃষ্ণদাস, মীরজাফর ও রাজা কৃষ্ণচন্দ্র প্রভৃতি

---

(২) সিরাজউদ্দৌলা, ৩১৪,৩১৫ পৃঃ।

শেঠভবনে মিলিত হন এবং সেই সভায় কৃষ্ণচন্দ্রের প্রস্তাবমতে স্থির হয় যে ইংরেজদিগের সহায়তায় সিরাজউদ্দৌলাকে সিংহাসনচ্যুত ও মীরজাফরকে তৎপদে অভিষিক্ত করা হইবে।” (১)

কার্ত্তিকেয় বাবু এই উক্তির সমর্থনে কোন প্রমাণই উদ্ধৃত করেন নাই। তবে তিনি পরবর্ত্তী অধ্যায়ে যাহা বলিয়াছেন তাহাতে স্পষ্টই প্রতীয়মান হয় যে, একমাত্র জনশ্রুতির উপর নির্ভর করিয়াই তিনি এই কথাগুলি বলিয়াছেন। কিন্তু সেই স্থানেই আবার অন্য কাহারও নাম উল্লেখ না করিয়া একমাত্র কৃষ্ণচন্দ্রেরই নাম উল্লেখ করিয়াছেন। সায়র মোতাক্ষরীণ পাঠে অবগত হওয়া যায়, যে সময় মমম় মুরশিদাবাদে সিরাজের বিরুদ্ধে ষড়্‌যন্ত্র চলিতেছিল, তৎকালে রামনারায়ণ আজিমাবাদে অবস্থান করিতেছিলেন এবং সিরাজের সিংহাসনচ্যুতির সংবাদ লইয়া কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হইয়া পড়িয়াছিলেন। অর্ম্ম সাহেবের ইতিহাসে লিখিত আছে, যে সমস্ত লোক আলিবর্দ্দীর অনুগ্রহে উন্নত পদবীতে আরোহণ করিয়াছিলেন, তাঁহাদের মধ্যে একমাত্র রামনারায়ণই সিরাজের বিপক্ষে যোগদান করেন নাই। (২) প্রোক্ত অবস্থা পর্য্যালোচনা করিলে প্রতীয়মান হয় যে, কার্ত্তিকেয় বাবু রামনারায়ণের ষড়্‌যন্ত্রে লিপ্ত হওয়ার সম্বন্ধে যাহা লিখিয়াছেন তাহা প্রকৃত নহে। বাঙ্গালী লেখকের ইতিহাসমধ্যে “ক্ষিতীশবংশাবলী” প্রাচীন গ্রন্থ বলিয়া পরিগণিত হইতে পারে না। এই পুস্তক ১৯৩২ সংবৎ বা ১৮৭৭ খৃষ্টাব্দে বিরচিত হইয়াছে। যে সমস্ত বাঙ্গালী লেখক এই সময়ের ইতিহাস সংকলন করিয়াছেন, তন্মধ্যে ৺মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কারই সর্ব্বাপেক্ষা প্রাচীনতম। বিদ্যালঙ্কার মহাশয়ের ‘রাজাবলি’ ১৮১০ খৃষ্টাব্দে বিরচিত

(1) Sair, vol. II, page 246

(2) Orme's Indoostan, vol. II, Page 186.

হইয়াছে। রাজাবলীতে লিখিত আছে, “সিরাজ প্রবীণ মন্ত্রিগণকে উপেক্ষা করিয়া অভিনব লোকদিগকে উচ্চ রাজকার্য্যে নিযুক্ত করিলে মহারাজ দুর্লভরাম, মীরজাফর, জগৎশেঠ, মহাতাপচাঁদ, মহারাজ স্বরূপচাঁদ প্রভৃতি পদস্থ লোকেরা অত্যন্ত অসন্তুষ্ট হইয়া উঠিলেন। সম্ভ্রান্তবংশীয়া মহিলাগণের ধর্ম্মনষ্ট করিয়া এবং কৌতুক দেখিবার নিমিত্ত গর্ভিণীর গর্ভ বিদারণ করিয়া সিরাজ ক্রমেই অধর্ম্মপথে অগ্রসর হইতেছিলেন। অতঃপর রাজবল্লভকে উপলক্ষ করিয়া সিরাজের সহিত ইংরেজদিগের মনোমালিন্য উপস্থিত হইল এবং সিরাজ সসৈন্যে কলিকাতায় গিয়া, ইংরেজদিগকে বিতাড়িত করিয়া দিয়া ঐ নগর অধিকার করিলেন। ইংরেজেরা এই দুর্ঘটনায় ভগ্নোদ্যম হইলেন না। তাঁহারা আরমাণী পিক্রর সহায়তায় মহারাজ দুর্লভরাম, জাফর আলি খাঁ, জগৎশেঠ, মহাতাপচাঁদ ও মহারাজ স্বরূপচাঁদপ্রভৃতি রাজ্যের প্রধান প্রধান ব্যক্তিগণের সহিত পরামর্শ করিয়া, কতিপয় সেনাসহ পলাসীর প্রাঙ্গণে উপস্থিত হইলেন।” (১)

উদ্ধৃত স্থানে যাহা লিখিত আছে, তাহাতে রাজবল্লভ যে ষড়্‌যন্ত্রে লিপ্ত ছিলেন এমন কথা নাই। এই পুস্তকপাঠে আরও অবগত হওয়া যায় যে, গ্রন্থকার রায়দুর্লভের শোচনীয় পরিণাম ও মীরজাফরের কুষ্ঠব্যাধিতে মৃত্যুর কথা বর্ণনা করিতে গিয়া উভয়কে ‘নিমকহারাম’ বলিতেও কুণ্ঠিত হন নাই। (২) অথচ তিনি আবার রাজবল্লভের কথা উল্লেখ করিতে গিয়া লিখিয়াছেন, ”তিনি বড় দাতা ছিলেন।” (৩) এতদ্দ্বারা প্রতীয়মান হইতেছে যে, মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কার মহাশয়ের মতে

(১) রাজাবলী, ১৫৬ পৃঃ হইতে ১৫৮ পৃঃ।

(২) রাজাবলী, ১৬৮ হইতে ১৬৯ পৃঃ।

(৩) রাজাবলী ১৫৬ পৃঃ।

সিরাজের বিরুদ্ধে যে ষড়্‌যন্ত্র হইয়াছিল, তাহাতে রাজবল্লভ লিপ্ত ছিলেন না। অতএব যে কার্ত্তিকেয় বাবু সিরাজের পক্ষাবলম্বী রামনারায়ণকে পর্য্যন্ত ষড়্‌যন্ত্রে বিজড়িত করিয়াছেন, তাঁহার কথার উপর নির্ভর করিয়া রাজবল্লভকে ষড়্‌যন্ত্রকারিগণের অন্যতম বলিয়া নির্দ্দেশ করা যাইতে পারে না।

কার্ত্তিকেয় বাবুর উক্তি যে প্রমাদপূর্ণ তাহা আর একটি অবস্থার প্রতি লক্ষ্য করিলেও স্পষ্ট বুঝা যায়। অর্ম্ম সাহেবের ইন্দুস্তানপাঠে অবগত হওয়া যায়, এই সময় একমাত্র মীরজাফরই যে বাঙ্গালার সিংহাসনলাভের প্রার্থী ছিলেন এমন নহে, ইয়ার লতিফ নামে দ্বিতীয় ব্যক্তিও তৎকালে ইংরেজদরবারে মীরজাফরের প্রতিদ্বন্দ্বিরূপে দণ্ডায়মান ছিল। (১) 'ইন্দুস্তানে' স্পষ্ট লিখিত আছে, 'রায়দুর্ল্লভ ও জগৎশেঠ ইয়ার লতিফের আমিনচাঁদ লালী ও পিক্র মীরজাফরের পৃষ্ঠপোষকতা করিতেছিলেন। অতএব রায়দুর্ল্লভপ্রভৃতি সকলে একযোগ হইয়া মীরজাফরকে নবাবীপদে অভিষিক্ত করার সংকল্পের কথা যে কার্ত্তিকেয় বাবু লিখিয়াছেন, তাহাই বা কিরূপে সম্ভবপর হইতে পারে?

উমাচরণ বাবু লিখিয়াছেন, "সিরাজের আচরণে উত্যক্ত হইয়া রায়রাঁইয়া মীরজাফরকে সঙ্গে লইয়া জগৎশেঠের আলয়ে পদার্পণ করিলেন। অতঃপর তিনি জগৎশেঠের নিকট সিরাজের উচ্ছেদসাধনের প্রস্তাব উপস্থিত করিলে, জগৎশেঠ তাঁহাকে রাজবল্লভের সহিত পরামর্শ করিতে বলিলেন। তদনুসারে তিনি রাজবল্লভের নিকট আসিয়া সেই প্রস্তাব উপস্থাপিত করিলে রাজবল্লভ রায়রাঁইয়াকে বলিলেন, 'সিরাজ আমাদের রাজা, তাঁহার বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করা ন্যায় ও ধর্ম্মবিরুদ্ধ। আপনারা সিরাজের উচ্ছেদসাধনে কৃতসংকল্প হইয়া থাকিলে, আমি এ

(1) Orme's Indoostan, vol. II, pages 148 and 149.

বিষয়ে কোন পরামর্শ দিতে প্রস্তুত নহি। ইচ্ছা করিলে আপনারা নবদ্বীপাধিপতির সহিত পরামর্শ করিতে পারেন।' অতঃপর রাজা কৃষ্ণচন্দ্রের নিকট সংবাদ প্রেরিত হইল এবং তিনি তদনুসারে গোপনে মুরশিদাবাদে আগমন করিলেন। জগৎশেঠ, মীরজাফর, রাজা বুনিয়াদ সিংহ, চুনিলাল, মতিলাল, খাজা ওয়াজেদ ও আমিনচাঁদপ্রভৃতি মিলিত হইয়া পরামর্শ করিতে বসিলেন। সিরাজকে সিংহাসনচ্যুত করিয়া মীরজাফরকে অভিষিক্ত করাই পরামর্শ স্থির হইল।"

উদ্ধৃত স্থলে রাজবল্লভ যে ষড়্‌যন্ত্রে লিপ্ত ছিলেন না এ কথা স্পষ্টরূপেই লিখিত আছে। তবে একথা স্বীকার্য্য যে, জনশ্রুতিতে রাজবল্লভকে ষড়্‌যন্ত্রকারিগণের অন্যতম বলিয়া নির্দ্দেশ করা হইয়াছে। কিন্তু ষড়্‌যন্ত্রে কোনরূপ সংশ্রব না থাকিলেও রাজবল্লভের নাম জনশ্রুতিতে প্রচারিত হওয়া অসম্ভব নহে। রায়দুর্ল্লভ ও দুর্ল্লভরাম যে ষড়্‌যন্ত্রে লিপ্ত ছিলেন, তাহা সমস্ত ইতিহাস-লেখকগণই একবাক্যে বলিয়া আসিতেছেন, 'রায়দুর্ল্লভ' এই নামের সহিত 'রাজবল্লভ' এই নামের কতকটা উচ্চারণগত সমতা আছে। বোধ হয় এ নিমিত্তই ষড়্‌যন্ত্রকারিগণের নাম উল্লেখ করিতে গিয়া কেহ কেহ ভ্রমে 'রায়দুর্ল্লভের' পরিবর্ত্তে রাজবল্লভের নাম উল্লেখ করিয়াছেন এবং কেহ বা একমাত্র রায়দুর্ল্লভের নামই করিয়াছেন। কালে লোকেরা কাহারও নিকট রায়দুর্ল্লভের নাম এবং কাহারও নিকট রাজবল্লভের নাম শুনিয়া, উভয়কেই ষড়্‌যন্ত্রকারী বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছে। সাধারণতঃ অজ্ঞ লোকের দ্বারাই জনশ্রুতির রচনা হইয়া থাকে; সুতরাং এরূপ স্থলে রামের পরিবর্ত্তে রহিম হইলে তাহাতে বিস্মিত হওয়ার কারণ নাই। স্বয়ং অক্ষয়বাবুও একস্থানে 'রায়দুর্ল্লভের' পরিবর্ত্তে 'রাজবল্লভ' লিখিয়াছেন, তাহা নিম্নলিখিত কয়েক পংক্তি পাঠ করিলেই বিদিত হওয়া যায়।

সিরাজকর্ত্তৃক কলিকাতা অধিকৃত হইলে, ইংরেজেরা ফলতায় গিয়া আশ্রয় গ্রহণ করেন এবং সেই স্থলে তাঁহাদের যে জাহাজ ছিল তাহাতে সকলের এক বৈঠক হয়। অক্ষয়বাবু সেই বৈঠক উপলক্ষ্য করিয়া লিখিয়াছেন, "ঘটনাক্রমে সেইদিন কলিকাতা অঞ্চল হইতে খোজা পিক্রু এবং এব্রাহিম জেকব্স্ নামক দুইজন আরমাণী বণিক ফলতায় আসিয়া উপনীত হইয়াছিলেন। তাঁহারা ইংরেজহিতৈষী উমিচাঁদের নিকট হইতে একখানি হস্তলিপি আনিয়াছিলেন। সর্ব্বসমক্ষে সেই পত্র পঠিত হইল। হায়! উমিচাঁদ, সেই পত্রে তিনি লিখিয়াছেন যে, "চিরদিনও যেমন এখনও সেইরূপভাবে তিনি ইংরেজদিগের কল্যাণকামনায় নিযুক্ত রহিয়াছেন। আর ইংরেজেরা যদি রাজা রাজবল্লভ, রাজা মাণিকচাঁদ, জগৎশেঠ, খোজা আজিদপ্রভৃতি পাত্রমিত্রের সঙ্গে গোপনে গোপনে চিঠি চালাইতে চাহেন, তিনি তাহাও যথাস্থানে পৌছাইয়া সদুত্তর আনাইয়া দিবেন।" (১)

অক্ষয়বাবু এই উক্তির সমর্থনোদ্দেশ্যে, লঙ সাহেবের প্রকাশিত ইংরেজ দপ্তরের কাগজপত্রের ১৭৫৬ খৃষ্টাব্দের ২২ আগষ্ট তারিখের সভার কার্য্য বিবরণ প্রমাণস্বরূপ উল্লেখ করিয়াছেন। প্রকৃত প্রস্তাবে ২২ আগষ্ট কোন সভা হয় নাই। ২৭শে আগষ্ট সভা হইয়াছে। তারিখ সম্বন্ধে অক্ষরবাবু ভুল করিয়াছেন। সভার কার্য্যবিবরণীতে লিখিত আছে ঃ—

This day the Major received a letter from Omichand assuring him of his good intention and of the desire he had to serve him; which letter he sent down by Petross and Abraham Jacobs, who, he writes, will explain his mind more freely. These people promis

(১) সিরাজউদ্দৌলা ২৩৩, ২৩৪ পৃঃ।

great things from Omichand as greatly in interest of the Honourable Company and advise the Major to write complementary letters to Raja Manickchand, Jagger Seat, Coza Wazid and *Raja Dawleps* which letter Omichand would get rendered into Persian and deliver with the originals.

বলা বাহুল্য যে, এ স্থলে রাজবল্লভের নাম গন্ধ পর্য্যন্তও নাই; পক্ষান্তরে রাজা দেউলেপের (Raja Dewleps) কথা লিখিত আছে। রাজা দেউলেপ ও রায়দুর্ল্লভ যে অভিন্ন ব্যক্তি সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। তৎকালীন ইংরেজেরা রায়দুর্ল্লভের নাম উচ্চারণ করিতে না পারিয়া যে রাজা দেউলেপ লিখিয়াছে, তাহা জগৎশেঠের পরিবর্ত্তে "জগর সিট" ও পিদ্রুসের পরিবর্ত্তে পেট্রোস্ প্রভৃতি দ্বারাই প্রমাণিত হইতেছে। অক্ষয়বাবুর ন্যায় একজন সুশিক্ষিত ব্যক্তিই যদি এ স্থলে রায়দুর্ল্লভের পরিবর্ত্তে রাজবল্লভ লিখিতে পারেন, তবে ষড়্যন্ত্রকারিগণের অন্যতম রায়দুর্ল্লভের স্থলে রাজবল্লভ নাম যে জনশ্রুতিতে ভুলে প্রকটিত হইয়াছে তাহাতে আশ্চর্য্যান্বিত হওয়ার কোন কারণ নাই।

রিয়াজ্ সেলাতিন হইতে প্রমাণ উদ্ধৃত করিয়া পূর্ব্বে প্রদর্শন করা হইয়াছে যে, রাজবল্লভ এই সময় মুরশিদাবাদ নগরে বন্দিভাবে কালযাপন করিতেছিলেন; এবং তাঁহার গতিবিধি পর্য্যবেক্ষণ করিবার উদ্দেশ্যে নবাবের লোকেরা সর্ব্বদা তাঁহাকে চক্ষে চক্ষে রাখিতেছিল। রাজবল্লভ যে সেই সমস্ত প্রহরীবর্গের চক্ষে ধূলি নিক্ষেপ করিয়া ষড়্যন্ত্রে যোগদান করিতে পারিয়াছিলেন তাহা কদাচ সম্ভবপর নহে। কৃষ্ণদাসকে উপলক্ষ করিয়াই যে সিরাজ ইংরেজদিগের সহিত কলহে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন, সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। কিন্তু অক্ষয় বাবু ষড়্যন্ত্রসম্বন্ধে রাজবল্লভের সংস্রব

থাকা বলিয়া যাহা লিখিয়াছেন তাহা সমস্তই কল্পনা-প্রসূত। ফলে অক্ষয় বাবু স্বীয়উক্তিসমর্থনোদ্দেশ্যে কোন প্রমাণই উদ্ধৃত করিতে পারেন নাই।

সপ্তম পরিচ্ছেদ

সিরাজউদ্দৌলার পরিণাম

অতঃপর যে ঘটনা উপস্থিত হইল, তাহাকে অনায়াসে গিরীয়ার যুদ্ধের পুনরভিনয় বলা যাইতে পারে। সায়র মোতাক্ষরীণে লিখিত আছে, "ক্লাইব রণসজ্জা করিয়া মুরশিদাবাদ অভিমুখে আসিতেছেন শুনিয়া সিরাজ নিরতিশয় চিন্তিত হইয়া পড়িলেন। তিনি এখন স্পষ্টই বুঝিতে পারিলেন, যাঁহাদিগকে এতদিন বিষদৃষ্টিতে নিরীক্ষণ করিতেছিলেন, তাঁহাদিগের চিত্তাকর্ষণ ব্যতীত এখন উপায়ান্তর নাই। সুতরাং সিরাজ এখন চতুরতা করিয়া সেই সমস্ত লোকদিগের সহিত প্রকাশ্যে সদ্ভাবরক্ষা করিবার প্রয়াস পাইতে লাগিলেন। দুর্ভাগ্যক্রমে এই কৌশলের কোনরূপ ফলোদয় হইল না। কবি বলিয়াছেন ঃ—

"সমগ্র বৎসর তুমি আমাকে উৎপীড়ন করিতে কুণ্ঠাবোধ কর নাই; এমন কি আমার হৃৎপিণ্ড পর্য্যন্ত বাহির করিতেও তোমার কোন কষ্ট হয় নাই। এখন তুমি কি আশা করিতে পার যে, তোমার ক্ষণিক আদরেই আমি তোমার পূর্ব্বকৃত সমস্ত অপরাধ বিস্মৃত হইয়া যাইব?"

অতঃপর সিরাজ কতিপয় সেনাসহ রায়দুর্ল্লভকে পলাসীপ্রাঙ্গণে প্রেরণ করিলেন এবং তাঁহাকে বলিয়া দিলেন যে, তিনি যেন পরিখা খনন করিয়া সর্ব্বদা যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত থাকেন। রায়দুর্ল্লভ প্রকাশ্যে নবাবের আদেশ প্রতিপালনের ভাণ করিয়া, গোপনে ইংরেজদিগের সহিত সন্ধির কথাবার্ত্তা চালাইতে লাগিলেন। যে সমস্ত রাজকীয় সেনার অধ্যক্ষরূপে রায়দুর্ল্লভ পলাসীতে প্রেরিত হইলেন, তাহাদিগকে তিনি পুরস্কারের লোভ দেখাইয়া ক্রমে বশীভূত করিয়া লইলেন। মীরজাফর এখন নিয়মিতরূপে দরবারে উপস্থিত হইতে আপত্তি করিলেন না। ক্লাইব সসৈন্যে আগমন করিতেছেন, শুনিয়া সিরাজ পূর্ব্বের ন্যায় আলস্যে কালযাপন না করিয়া যে সমস্ত সেনা মীরমদন ও মোহনলালের অধীন ছিল তাহাদিগকে লইয়াই পলাসীর প্রাঙ্গণে উপনীত হইলেন। প্রান্তরের অপরভাগে আম্রকুঞ্জের অভ্যন্তরে ইংরেজ ও তেলেঙ্গা সেনাগণকে রণবেশে সন্নিবেশিত করিয়া ক্লাইব শত্রু সেনার আগমন প্রতীক্ষা করিতেছিলেন। নবাব উপস্থিত হইলেই ইংরেজ পক্ষীয় কামান ও বন্দুক সুশৃঙ্খলভাবে ক্রমাগত গোলা বর্ষণ করিতে লাগিল। তৎকালে মীরজাফর সেনাদলসহ সুদূরে নিশ্চেষ্টভাবে দণ্ডায়মান রহিলেন। মীরমদন-প্রমুখ সেনানীগণ মীরজাফরের ব্যবহারদর্শনে হতাশ হইলেও প্রাণপণে যুদ্ধ করিতে ত্রুটী করিলেন না। এই সময় বিপক্ষের কামানসমূহ ঘন ঘন গোলাবর্ষণ করিতেছিল, সুতরাং মীরমদন অধিক দূর অগ্রসর হইতে পারিলেন না। অবশেষে মোহনলাল, মীরমদনকে সঙ্গে লইয়া ধীরে ধীরে সেনাসহ অতি কষ্টে আম্রকাননের নিকটবর্ত্তী হইলেন। এই সময় বিপক্ষ পক্ষ হইতে হঠাৎ একটি গোলা আসিয়া মীরমদনের এক-খানা পা উড়াইয়া লইয়া গেল। মীরমদন তৎক্ষণাৎ সংজ্ঞাশূন্য হইয়া ভূতলে পতিত হইলেন। সিরাজ এতদিন যে সমস্ত পাপানুষ্ঠান করিতেছিলেন এখন তাহার প্রায়শ্চিত্ত আরম্ভ হইল। মীরমদন অজ্ঞান অবস্থায় নবাবের

নিকট নীত হইয়া বহুকষ্টে কয়েকটি কথা বলিয়াই প্রাণত্যাগ করিলেন। এই অভাবনীয় দৃশ্যে সিরাজ একবারে বিহ্বল হইয়া পড়িলেন এবং এখন কি কর্ত্তব্য তাহা তিনি স্থির করিতে না পারিয়া মীরজাফরকে ডাকিয়া পাঠাইলেন। মীরজাফর প্রথম প্রথম তাঁহার আহ্বানে কর্ণপাত করিলেন না। অবশেষে পুনঃ পুনঃ লোক প্রেরিত হইলে তিনি সশস্ত্র প্রহরিবর্গসহ নবাবের নিকট আগমন করিলেন। মীরজাফর উপস্থিত হইলেই সিরাজ মস্তক হইতে শিরস্ত্রাণ খুলিয়া মীরজাফরের সম্মুখে স্থাপন করিলেন এবং বিনীতভাবে বলিলেন :—

"ইতিপূর্ব্বে আমি যে সমস্ত অন্যায় কার্য্য করিয়াছি তজ্জন্য আমি অনুতপ্ত হইতেছি। আপনি আমার আত্মীয় এবং আলিবর্দ্দী আপনার অনেক উপকার করিয়াছেন। আমি এখন আপনাকে আলিবর্দ্দীর ন্যায় সম্মান প্রদর্শন করিতেছি। আপনি অনুগ্রহপূর্ব্বক আমার পূর্ব্বানুষ্ঠিত দুষ্কার্য্যসমূহ বিস্মৃত হউন এবং আমার পূর্ব্ব পুরুষগণ আপনার যে সমস্ত উপকার করিয়াছেন, তাহা স্মরণ করিয়া সৈয়দবংশধরের ও আত্মীয়ের উপযুক্ত কার্য্য করুন। আমি আপনার নিকট আত্মসমর্পণ করিলাম, আপনি আমার জীবন ও সম্মান রক্ষা করুন।"

দুঃখের বিষয়, সিরাজের এইরূপ করুণ নিবেদনে মীরজাফরের পাষাণ হৃদয় অণুমাত্রও বিগলিত হইল না। সিরাজ যে ভাবে ঐ কথাগুলি বলিলেন, তাহাতে মনুষ্যত্ব থাকিলে মীরজাফর নিশ্চিতই সিরাজের সমস্ত অপরাধ বিস্মৃত হইতেন। কিন্তু তিনি তাহা না করিয়া বলিলেন :—

"অদ্য বেলা প্রায় অবসান হইয়াছে। এখন আর আক্রমণ করিবার সময় নাই। যে সকল সেনা অগ্রগামী হইতেছে, তাহাদিগকে প্রতিনিবৃত্ত হইবার নিমিত্ত এবং যে সকল সেনা যুদ্ধে লিপ্ত আছে, তাহাদিগকে প্রতিগমন করিবার নিমিত্ত আদেশ দেওয়াই কর্ত্তব্য। ভগবানের কৃপা

হইলে আগামী কল্য আমরা সকলে সমবেতভাবে রণসজ্জার ব্যবস্থা করিয়া শত্রুগণের সম্মুখীন হইব। (১)

সিরাজ উত্তর করিলেন, 'শত্রুসেনা রজনীযোগে অগ্রসর হইয়া শিবির আক্রমণ করিলে আমাদের আর বিপদের পরিসীমা থাকিবে না।' কিন্তু মীরজাফর তাঁহাকে এই বলিয়া প্রবোধ দিলেন যে, নৈশ আক্রমণ না হইতে পারে তৎসম্বন্ধে তিনি সমস্ত দায়িত্ব গ্রহণ করিতে প্রস্তুত আছেন।

তৎকালে মোহনলাল শত্রুশিবিরের অতি নিকটে আসিয়া যুদ্ধ করিতেছিলেন। মোহনলালের কামান অনবরত গোলা বর্ষণ করিয়া বিপক্ষের সেনা ক্ষয় করিতেছিল এবং তাঁহার পদাতিসেনাগণ বৃক্ষশ্রেণীর অন্তরালে আশ্রয় পাইয়া নিরাপদে শত্রুসেনার উপর গোলা নিক্ষেপ করিতেছিল। ঠিক এই সময়েই নবাবের লোক যুদ্ধে প্রতিনিবৃত্ত হওয়ার নিমিত্ত আদেশ প্রচার করিল। মোহনলাল বলিয়া উঠিলেন, 'যুদ্ধ এতদূর অগ্রসর হইয়াছে যে অবিলম্বেই জয় পরাজয়ের মীমাংসা হইবে। এই সংকট সময়ে শিবিরাভিমুখে প্রস্থানোদ্যত হইলেই সেনাগণ ছত্রভঙ্গ হইয়া পড়িবে ও পলায়ন ভিন্ন তাহাদের গত্যন্তর থাকিবে না। অতএব এখন প্রত্যাবর্ত্তনের সময় নাই।' সিরাজউদ্দৌলা মোহনলালের উত্তর পাইয়া মীরজাফরের অভিপ্রায় বুঝিবার জন্য তৎপ্রতি দৃষ্টি নিক্ষেপ করিলেন। মীরজাফর অবিচলিতভাবে উত্তর করিলেন, 'আমি যেরূপ বুঝিয়াছি, সেরূপ উপদেশ দিয়াছি। এখন তাহা পালন করা না করা সম্পূর্ণই নবাবের ইচ্ছাধীন।' সিরাজ মীর জাফরের উত্তরে হতবুদ্ধি হইয়া

---

(১) রিয়াজু সেলাতিনে এই কথার উল্লেখ নাই। রিয়াজু সেলাতিন-প্রণেতা বলেন, মীরমদন আহত হইয়া প্রাণত্যাগ করিলেই নবাব সেনা ছত্রভঙ্গ হইয়া পড়িল।
—Riazoo Salatin, page 375.

পড়িলেন এবং মীরজাফরের মতে মত দিয়া যুদ্ধে প্রতিনিবৃত্ত হওয়ার নিমিত্ত মোহনলালের নিকট বারংবার লোক পাঠাইতে লাগিলেন। অগত্যা মোহনলাল নবাবের আদেশ শিরোধার্য্য করিয়া প্রতিনিবৃত্ত হইলেন। কবি সত্যই বলিয়াছেন ঃ—

"সময় যখন মন্দ পড়ে, তখন যাহা অকর্ত্তব্য তাহাই লোকে করিতে প্রবৃত্ত হয়।"

মোহনলালকে প্রতিনিবৃত্ত হইতে দেখিয়াই তাহার সেনাগণ সাহসশূন্য হইয়া পড়িল। এই সময় নবাবের কতিপয় সেনাদল বিপক্ষের সহিত পরামর্শমতে পলায়নের ভাণ করিয়া সমরক্ষেত্র হইতে প্রস্থান করিতে লাগিল। মোহনলালের সেনাগণ তাহা দূর হইতে দেখিতে পাইয়া ছত্রভঙ্গ হইয়া গেল এবং বেগে রণাঙ্গন হইতে প্রস্থান ক[র]িল। এখন নবাবশিবিরে একটিমাত্র সেনাও রহিল না। সিরাজ দেখিলেন, সম্মুখে ইংরেজসেনা শ্রেণীবদ্ধভাবে অবস্থান করিতেছে এবং শিবিরাভ্যন্তরে গৃহশত্রুগণ বিচরণ করিতেছে। তখন তিনি ভয়ে ও বিস্ময়ে বিহ্বল হইয়া পড়িলেন এবং পলাসীর প্রাঙ্গণ হইতে পলায়নপূর্ব্বক সমস্ত রজনী পথ চলিয়া পরদিন বেলা ৮ঘটিকার সময় মুরশিদাবাদের প্রাসাদে উপস্থিত হইলেন, আসিয়াই তিনি প্রধান প্রধান সেনানীকে বলিলেন, যে পর্য্যন্ত আমি বিশ্রাম লাভ করিয়া কর্ত্তব্য স্থির না করি. সে পর্য্যন্ত আপনারা আমার রক্ষাকার্য্যে নিযুক্ত থাকিবেন।' দুঃখের বিষয়, এই আদেশ আর কেহ কার্য্যে পরিণত করিতে অগ্রসর হইল না ; এমন কি নবাবের শ্বশুর মির্জা ইদ্রিচ খাঁ পর্য্যন্তও অন্যান্য সেনানীর পদাঙ্ক অনুসরণ করিয়া জামাতার আদেশ প্রতিপালন করিতে পরাঙ্মুখ রহিলেন। সিরাজ শ্বশুরকে ডাকাইয়া আনিয়া তাঁহার পদতলে শিরস্ত্রাণসংস্থাপনপূর্ব্বক প্রাসাদের চতুর্দ্দিকে সেনা সমাবেশ করিতে

অনুরোধ করিলেও, শ্বশুর জামাতার কাতর প্রার্থনায় কর্ণপাত করা আবশ্যক মনে করিলেন না। এখন একজন সেনাও দেখিতে না পাইয়া সিরাজ প্রত্যেকের বাকি বেতন পরিশোধ করিবেন বলিয়া ঘোষণা করিয়া দিলেন। বেতনের লোভে অনেকেই উপস্থিত হইল এবং যে যাহা প্রাপ্য বলিল তাহাকেই তাহা দেওয়া হইল। কিন্তু বেতন দেওয়া শেষ হইলেই সকলে আবার প্রস্থান করিল। এইরূপে সিরাজ সমস্ত দিবস প্রাসাদে একাকী অবস্থান করিলেন। অবশেষে গভীর রজনীতে একখানি বস্ত্রাবৃত শকট আনাইয়া তন্মধ্যে প্রিয়তমা লুৎফন্নেছা ও কয়েকটি রমণীকে প্রচুর পরিমাণ ধনরত্নসহ সংস্থাপন করিলেন এবং তাহাদিগকে লইয়া রাত্রি ৩ ঘটিকার সময় প্রাসাদ হইতে পলায়মান হইলেন।

সিরাজ পলাসী হইতে প্রস্থান করিলেও মিরজাফর ক্লাইবের সহিত সাক্ষাৎ করিবার অভিপ্রায়ে তথায় এক দিবস অবস্থান করিলেন। অবশেষে তিনি ক্লাইবের সহিত কথাবার্ত্তা কহিয়া মুরশিদাবাদের দিকে অগ্রসর হইতে লাগিলেন। পথে আসিয়াই মীরজাফর শুনিতে পাইলেন যে, সিরাজউদ্দৌলা ইতিপূর্ব্বেই পলায়ন করিয়াছেন। মুরশিদাবাদে উপস্থিত হইয়া তিনি প্রথমতঃ মুনসরগঞ্জের প্রাসাদ অধিকার করিলেন। এ স্থলেই সকলে মীরজাফরকে নবাব বলিয়া ঘোষণা করিল। রায়দুর্ল্লভ এখন হইতে সর্ব্বপ্রধান সচিবের পদে নিযুক্ত হইয়া সমগ্র রাজকার্য্য পর্য্যবেক্ষণ করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। অবিলম্বে নূতন নবাবের আদেশে জামাতা কাশিম আলি খাঁ একদল সেনা লইয়া সিরাজের অনুসরণ করিতে লাগিলেন।

এদিকে সিরাজউদ্দৌলা মুরশিদাবাদ হইতে পলায়ন করিয়া ক্রমে ভগবান গোলায় উপস্থিত হইলেন; এবং তথা হইতে নৌকাযোগে আজিমাবাদ অভিমুখে যাত্রা করিলেন। নৌকাপথে তিনদিন অতীত হইল এবং এই কয়দিন আহারের কোনরূপ সুবন্দোবস্ত করিতে না পারিয়া

সিরাজ ও তাঁহার অনুচরবর্গ অনশনেই রহিলেন। চতুর্থ দিবসে ক্ষুধার তাড়না অসহ্য হইয়া উঠিল। সুতরাং সিরাজ সকলের নিমিত্ত খিচুড়ী রন্ধন করিবার অভিপ্রায়ে তীরে অবতরণ করিলেন। এই স্থানে সাহাদানা নামে এক ফকিব বাস করিত। বোধ হয় এই ফকিরকে কোন দিন সিরাজের হস্তে লাঞ্ছনা ভোগ করিতে হইয়াছিল। ফকির সিরাজকে দেখিবামাত্র প্রকাশ্যে আনন্দের ভাণ করিয়া রন্ধনের সুবন্দোবস্ত করিয়া দিতে লাগিল ও গোপনে শত্রুপক্ষের নিকট সিরাজের আগমনবার্ত্তা জ্ঞাপন করিল। মীরজাফরের ভ্রাতা মীর দাউদ এবং জামাতা কাশিম আলি খাঁ সংবাদ পাইয়াই তথায় সসৈন্যে উপস্থিত হইলেন। সিরাজ অনেক অনুনয় বিনয় করিলেন। পূর্ব্বে তিনি এই শ্রেণীর লোকদিগের সহিত কথা বলিতেও অবমাননা বোধ করিতেন; কিন্তু এখন তাঁহার কাতরোক্তিতেও তাহারা অণুমাত্র বিগলিত হইল না। কাশিম আলি লুৎফন্নেছাকে রুক্ষস্বরে রত্নপেটিকা বাহির করিয়া দিতে বলিলেন। সিরাজের প্রিয়তমা বেগম এরূপ অপমান জীবনেও সহ্য করেন নাই; তিনি মরমে মরিয়া গিয়া অশ্রুপূর্ণ লোচনে রত্নপেটিকা বাহির করিয়া দিলেন। পেটিকায় বহুলক্ষ টাকার মণিমুক্তা ছিল; কাশিম আলি তাহা সমস্তই আত্মসাৎ করিলেন। মীর দাউদ মনে করিলেন, অপারাপর রমণীগণের প্রতি অত্যাচার করিতে পারিলে তিনিও অনেক ধনরত্ন লাভ করিতে পারিবেন, সুতরাং তিনি সেই সমস্ত মহিলাগণের প্রতি বল প্রয়োগ করিতে উদ্যত হইলেন। রমণীগণ অত্যাচার সহ্য করিতে না পারিয়া অগত্যা সমস্ত ধনরত্ন মীর দাউদকে প্রদান করিলেন।

অতঃপর নবাবসেনা সিরাজকে বন্দী করিয়া পলায়নের ৮ দিন পরে মুরশিদাবাদে উপস্থিত করিল। এই সময় বেলা দ্বিতীয় প্রহর অতীত হইয়া গিয়াছিল এবং মীরজাফর মধ্যাহ্নকৃত্য সমাপন করিয়া নিদ্রার

সুকোমল ক্রোড়ে বিশ্রাম করিতেছিলেন, জাফরপুত্র মীরণ সিরাজের আগমনবার্ত্তা শুনিয়াই তাঁহাকে নিকটবর্ত্তী এক কক্ষে আবদ্ধ করিয়া তাঁহার শিরশ্ছেদের নিমিত্ত আদেশ দিয়া পাঠাইলেন। অনেকেই মীরণের জঘন্য আদেশ প্রতিপালন করিতে অস্বীকার করিল। কেবল মহম্মদী বেগ নামে জনৈক দুরাচার মীরণের প্রস্তাবে সম্মত হইল। দুঃখের বিষয় এই পাপিষ্ঠ একদিন হা অন্ন! হা অন্ন! করিয়া বেড়াইতেছিল এবং আলিবর্দ্দী ও তাঁহার সহধর্ম্মিণী তাহাকে আশ্রয় প্রদান করিয়া লালনপালন করিয়াছিলেন। আলিবর্দ্দী যে তাহাকে উন্নত পদবীতে আরোহণ করাইয়া দিয়াছিলেন, তাহা এই নরাধম বিস্মৃত হইয়া গেল এবং আলিবর্দ্দীর প্রিয়তম দৌহিত্রকে সংহার করিবার অভিপ্রায়ে কৃপাণহস্তে সিরাজের কক্ষে প্রবেশ করিল। সিরাজ মহম্মদী বেগকে দেখিয়াই বলিয়া উঠিলেন, 'আমাকে হত্যা করিবার উদ্দেশ্যেই কি তুমি এ স্থলে পদার্পণ করিয়াছ?' পিশাচের হৃদয়ে দয়ার লেশমাত্র ছিল না, সুতরাং সে অবিচলিতভাবে উদ্দেশ্য ব্যক্ত করিতে কুণ্ঠা বোধ করিল না। সিরাজ এখন নতজানু হইয়া ভগবানের নিকট বিগত জীবনের পাপানুষ্ঠান সমূহের নিমিত্ত ক্ষমা প্রার্থনা করিলেন এবং গদগদ কণ্ঠে মহম্মদী বেগের দিকে চাহিয়া বলিলেন, 'তাহারা তবে—তাহারা তবে এই সুবিশাল সাম্রাজ্যের এক কোণেও আমাকে নির্জ্জনে অবস্থান করিবার অনুমতি প্রদান করিবে না? অল্পমাত্র বৃত্তির উপর নির্ভর করিয়া তথায় জীবনযাপন করিতে পারিলেও আমি কৃতার্থ মনে করিব। এই সময় কি যেন চিন্তা করিয়া তিনি কিয়ৎকাল নিস্তব্ধ হইয়া রহিলেন এবং পুনরায় বলিতে লাগিলেন, 'না! না! তাহারা সম্মত—সম্মত হইবে না, আমাকে মরিতেই হইবে।' তিনি আর কোন কথা বলিবার অবসর পাইলেন না; ইতিমধ্যেই মহম্মদী বেগ কৃপাণ উত্তোলন করিয়া সিরাজকে খণ্ড

বিখণ্ড করিয়া ফেলিল। সিরাজ অতুলনীয় রূপের অধিকারী ছিলেন। মহম্মদি বেগের কয়েকটী আঘাত সিরাজের রমণীয় মুখমণ্ডলে নিপতিত হইল। 'যথেষ্ট—ইহাই যথেষ্ট, আমি চলিলাম—হোসেনকুলীর হত্যার প্রতিশোধ হইল'—এই বলিয়া সিরাজ প্রাণত্যাগ করিলেন! (১)

অতঃপর সিরাজের মৃতদেহ একটি হস্তীর পৃষ্ঠে সংস্থাপিত হইয়া, নূতন নবাবের রাজ্যাভিষেক ঘোষণা করিবার জন্যই যেন নগর প্রদক্ষিণ করিতে চলিল। অনেকে প্রত্যক্ষ করিয়া বলেন, হস্তী ক্রমে হোসেনকুলীর আলয়ের সমীপবর্ত্তী হইলেই মাহুত কোন কার্য্যোপলক্ষে তাহার গতিরোধ করিল এবং যে স্থানে দুই বৎসরপূর্ব্বে সিরাজ হোসেনকুলীকে হত্যা করিয়াছিলেন, ঠিক সেই স্থানে সিরাজের মৃতদেহ হইতে কয়েক বিন্দু রক্ত নির্গত হইয়া নিপতিত হইল।

নগরের অনেক স্থান ঘুরিয়া সিরাজের মৃতদেহ অবশেষে আমনা-বেগমের আলয়ের সমীপে আনীত হইল। আমনা এ পর্য্যন্ত পলাসীর যুদ্ধসম্বন্ধীয় বিপ্লবের কোনও বৃত্তান্তই অবগত ছিলেন না। হস্তী দ্বারদেশে উপনীত হইলেই লোকে কোলাহল করিয়া উঠিল। গোলমাল শুনিয়া সিরাজ-জননী প্রাচীরের বহির্ভাগে কি হইতেছে দেখিবার জন্য ঔৎসুক্য প্রকাশ করিলেন। অবশেষে তিনি যাহা জানিলেন, তাহাতে আর ধৈর্য্য রক্ষা করিতে পারিলেন না। হতভাগিনীর রমণীসুলভ লজ্জা এখন সুদূরে পলায়ন করিল; অবগুণ্ঠন ও পাদুকা দূরে নিক্ষিপ্ত হইল, তিনি এখন উন্মাদিনীর ন্যায় দৌড়িয়া আসিয়া পুত্রের মৃতদেহ চুম্বন করিতে লাগিলেন।

---

(১) রিয়াজু সেলাতিনে লিখিত আছে, সিরাজ মুরশিদাবাদে আনীত হইয়া মীরজাফরের আদেশে কারারুদ্ধ হইলেন এবং পরদিন মীরজাফর ইংরেজ সেনানীর উপদেশ ও জগৎশেঠের অনুরোধে বাধ্য হইয়া তাঁহাকে হত্যা করিলেন—Riazoo-salatin, page 376.

এই সময় তাঁহার সংজ্ঞা সম্পূর্ণরূপেই বিলুপ্ত হইয়াছিল এবং তিনি বক্ষে ও মুখে করাঘাত করিয়া আকুলকণ্ঠে রোদন করিতেছিলেন। মীরজাফরের বৈমাত্রেয় ভগ্নীর পুত্র খাদম হাসেন আপন প্রাসাদের ছাতের উপর হইতে সিরাজ-জননীর আর্ত্তনাদ প্রীতির সহিত আকর্ণন করিতেছিলেন। কিন্তু জনসংঘ এই করুণ দৃশ্য দেখিয়া অত্যন্ত সংক্ষুব্ধ হইয়া উঠিল এবং মীরজাফরকে এ নিমিত্ত অভিসম্পাত করিতেও কুণ্ঠিত হইল না। খাদম হাসেন অতঃপর ঘটনাস্থলে কয়েকজন চোপদার ও ভৃত্য প্রেরণ করিলেন তৎকালে সিরাজ-জননীর পুত্রশোকে আত্মবিস্মৃতি জন্মিয়াছিল। চোপদার ও ভৃত্যগণ তথায় আসিয়াই সেই মহিলার পৃষ্ঠে বজ্রমুষ্টি নিক্ষেপ করিতে লাগিল এবং লগুড়াঘাত করিয়া তাঁহাকে অন্তঃপুরমধ্যে তাড়াইয়া দিতেও সঙ্কুচিত হইল না। অন্য যে সমস্ত রমণী সিরাজ-জননীর অনুগমন করিয়াছিলেন তাঁহাদের অদৃষ্টেও ঠিক একরূপ লাঞ্ছনাই ঘটিল। (১)

উৎপীড়ক শত্রুকেও শোচনীয় অবস্থায় নিপতিত দেখিলে ভারতবাসীর মনে কষ্টের অবধি থাকিবে না। ইহা গুণ কি দোষ তাহা একমাত্র ভগবান্ই বলিতে পারেন। সুপ্রসিদ্ধ নবাব আলিবর্দ্দীর অতি যত্নের ধন সিরাজউদ্দৌলার শেষ দশা স্মরণ করিলে কাহার না হৃদয় বিদীর্ণ হইয়া যায়? ভারতবাসী কাহারও কার্য্যাকার্য্যের হিসাব ধরিয়া সমবেদনা অনুভব করিতে জানে না—তাহাদের স্নেহপ্রবণ হৃদয় লোকের দুরবস্থা দেখিলে স্বতই বিগলিত হইয়া উঠে। সুতরাং সিরাজ যে প্রজাপীড়ক ছিলেন ইহা জানিয়াও, তাঁহার শোচনীয় পরিণামে আমাদের আমনাবিবীর সহিত কণ্ঠ মিশাইয়া আকুলকণ্ঠে রোদন করিতে ইচ্ছা হয়। কিন্তু ভগবানের রাজ্যে কেহই ন্যায়ের পথ উল্লঙ্ঘন করিয়া পরিত্রাণ লাভ করিতে পারে

(1) Sair, vol. II. pages 229 to 244.

না। গিরীয়ার প্রান্তরে কিরূপ বিশ্বাসঘাতকতা করিয়া আলিবর্দ্দী প্রভু-পুত্র সরফরাজের সর্ব্বনাশ করিয়াছিলেন, তাহা পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে। আলিবর্দ্দী যুদ্ধে পরাভূত হইবার উপক্রম হইলে, সরফরাজের প্রধান মন্ত্রী আলিবর্দ্দীর সহিত ষড়যন্ত্র করিয়া সরফরাজকে বলিয়াছিলেন, "এখন বেলা প্রায় দ্বিতীয় প্রহর অতীত হইতে চলিল, অদ্য যুদ্ধ স্থগিত রাখিয়া আগামী কল্য যুদ্ধে লিপ্ত হওয়াই কর্ত্তব্য।" পলাসী-প্রাঙ্গণে মীরজাফরও প্রায় সেইরূপ কথা বলিয়াই সিরাজকে প্রবঞ্চিত করিলেন। বাঙ্গালার সিংহাসন অধিকার করিতে গিয়া আলিবর্দ্দী কৃতঘ্নতার চরম দৃষ্টান্ত প্রদর্শন করিয়াছিলেন। এখন আলিবর্দ্দীর উত্তরাধিকারী সিরাজউদ্দৌলাও কৃতঘ্ন মিরজাফরের হস্তেই বাঙ্গলার সিংহাসন হইতে বঞ্চিত হইলেন।

সায়র মোতাক্ষরীণপ্রণেতা বলিয়াছেন, সিরাজের অণুমাত্রও রাজোচিত গুণগ্রাম ছিল না। তিনি সিংহাসনে আরোহণ করিয়া নানারূপ অত্যাচার উৎপীড়নে প্রকৃতিপুঞ্জকে ব্যতিব্যস্ত করিয়া তুলিয়াছিলেন। অন্যের কথা দূরে থাকুক, সিরাজের শ্বশুর পর্য্যন্ত তৎপ্রতি এত বীতশ্রদ্ধ হইয়া দাঁড়াইয়া ছিলেন যে, তিনিও বিপদের সময় জামাতার সাহায্য করিতে অগ্রসর হন নাই। সায়র মোতাক্ষরীণেই লিখিত আছে, যৌবনমদে মত্ত সিরাজের অত্যাচারে জর্জ্জরিত হইয়াই রাজ্যের প্রধান প্রধান ব্যক্তিগণ মনে করিতেছিলেন, পরিণতবয়স্ক মীরজাফরকে সিংহাসনে বসাইতে পারিলে লোকে সুখে কাল কাটাইতে পারিবে এবং এই আশায়ই তাঁহারা সিরাজের উচ্ছেদসাধনোদ্দেশ্যে ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হইয়াছিলেন। যাঁহারা ষড়যন্ত্রকারিগণকে এ নিমিত্ত নিন্দা করেন তাঁহাদের জগতের ইতিহাস পর্য্যালোচনা করা কর্ত্তব্য। ইতিহাস আলোচনায় অবগত হওয়া যায়, যখনই যে রাজ্যে কোন রাজা অত্যাচার উৎপীড়ন করিয়া প্রজার সর্ব্বনাশ করিয়াছেন, তখনই তাঁহার রাজ্যে ষড়যন্ত্রের

সূত্রপাত হইয়াছে। ফলে প্রকৃতি রঞ্জন ও প্রজাপালনই রাজার প্রধান কর্ত্তব্য। যে রাজা এই কর্ত্তব্য পথ হইতে স্খলিতপদ হন, তিনি কখনও স্বীয় পদে প্রতিষ্ঠিত থাকিবার যোগ্য বলিয়া বিবেচিত হইতে পারেন না। যাঁহারা সিরাজের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হইয়াছিলেন, তাঁহাদিগকে কেহ কেহ রাজদ্রোহী বলিতেও কুণ্ঠিত নহেন। কিন্তু সিরাজ বিধিসঙ্গত রাজা ছিলেন কি না, এ বিষয়ের মীমাংসা না হইলে ষড়যন্ত্রকারিগণকে রাজদ্রোহীও বলা যাইতে পারে না। ইতিহাসজ্ঞ পাঠক মাত্রেই অবগত আছেন, আকবর সাহের সময় হইতে যে যে ব্যক্তি বাঙ্গালার শাসনদণ্ড পরিচালনা করিয়া গিয়াছেন, তাঁহারা সকলেই দিল্লীশ্বরের নিযুক্ত কর্ম্মচারী মাত্র ছিলেন। স্বয়ং আলিবর্দ্দীও সরফরাজের নামে মিথ্যা কথা রটনা করিয়া দিয়া দিল্লীহইতে শাসনের সনন্দ সংগ্রহ করেন এবং পরে সরফরাজের বিরুদ্ধে অভিযান করিতে প্রবৃত্ত হন। সিংহাসনে আরোহণ করিবার পূর্ব্বে কি পরে সিরাজ দিল্লী হইতে কোনরূপ সনন্দই সংগ্রহ করেন নাই। (১) বরং দেখা যায়, দিল্লীর দরবার হইতে সওকতজঙ্গ বাঙ্গালার শাসনকর্ত্তৃত্বের সনন্দ সংগ্রহ করিলে সিরাজ সসৈন্যে পূর্ণিয়ায় গিয়া তাঁহার নিধনসাধন করিয়াছিলেন। অতএব প্রমাণিত হইতেছে, সিরাজ যে কেবল বাঙ্গালার বিধিসঙ্গত নবাব ছিলেন না এমন নহে, তিনি দিল্লীশ্বরের নিযুক্ত কর্ম্মচারীকে

---

(1) The Nawab of Pyrnea was appointed by the king Nawab of Bengal. That he was joined by another considerable Raja and that he had begun hostilities and taken about 200 boats, that upon news of this Serajudowla had ordered Jaffarali Cawn and other principal officers to march with a force to oppose him, which they did, but returned on the 29th on account of a dispute between Nawab and Jager Shet, in which the former reproached the latter in not getting Pharmand—Long's Unpublished Letters, page 77.

হত্যা করিয়া স্বয়ং রাজদ্রোহ অপরাধ করিয়াছিলেন। যে ব্যক্তি স্বয়ংই রাজদ্রোহী, তাহাকে বিতাড়িত করিবার চেষ্টা করিলে কাহারও রাজদ্রোহ অপরাধ হইতে পারে না।

অনেকে আবার রায়দুর্ল্লভ ও জগৎশেঠকে এই ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হইতে দেখিয়া কঠোর কটাক্ষপাত করিয়া থাকেন। জগৎশেঠ ও আলিবর্দ্দীর মধ্যে স্নেহবন্ধন ছিল সত্য, কিন্তু এমন অনেকবার ঘটিয়াছে যে, আলিবর্দ্দী জগৎশেঠেরই অর্থসাহায্যে আসন্ন বিপদহইতে মুক্তিলাভ করিয়াছেন। আলিবর্দ্দীর মৃত্যুর পর ঘেসেটিবিবী ও সিরাজের মধ্যে সংঘর্ষ হইবার উমক্রম হইলে, জগৎশেঠই মতিঝিলে গিয়া ঘেসেটিবিবীকে সিরাজের বশ্যতা স্বীকার করিতে প্রণোদিত করিয়াছিলেন। জগৎশেঠ এইরূপ কৌশল না করিলে সিরাজ সিংহাসনে আরোহণ করিতে পারিতেন কি না সন্দেহ। কিন্তু সিরাজ সিংহাসনে আরোহণ করিয়াই সেই সমস্ত কথা বিস্মৃত হইলেন এবং নানা প্রকারে জগৎশেঠের প্রতি অত্যাচার উৎপীড়ন করিতে লাগিলেন। তিনি কখনও রাজ্যের সেই বর্ষীয়ান্ পুরুষকে "মুসলমানী" করিবার ভয় প্রদর্শন করিতেন, কখনও বা নানারূপ অশ্লীল কথা বলিয়া তাঁহাকে ঠাট্টা বিদ্রূপ করিতেন, কখনও বা তাঁহার গণ্ডদেশে চপেটাঘাত করিতেন এবং কখনও বা তাঁহাকে কারারুদ্ধ করিয়া রাখিতেন। দেবতারাও এই সমস্ত উৎপীড়ন সহ্য করিতে পারেন কি না জানি না; কিন্তু রক্তমাংসের শরীর লইয়া কেহই এরূপ অত্যাচার সহ্য করিতে পারে না।

এ কথা স্বীকার্য্য যে, আলিবর্দ্দীর অনুগ্রহেই রায়দুর্ল্লভ ও তাঁহার পিতা সৌভাগ্যের সোপানে আরোহণ করিয়াছিলেন। আলিবর্দ্দীর আমলে সমগ্র রাজ্যমধ্যে রায়দুর্ল্লভেরই সর্ব্বাপেক্ষা উচ্চ পদ ছিল। সিরাজ সিংহাসনে আরোহণ করিয়াই এই প্রবীণ অমাত্যকে যদৃচ্ছা

অপমান করিতে কুণ্ঠা বোধ করিলেন না। সিরাজের অত্যাচারে উৎপীড়িত হইয়া তাঁহার শ্বশুর প্রভৃতি ঘনিষ্ঠ আত্মীয়েরা পর্য্যন্ত বিপক্ষে দণ্ডায়মান হইয়াছিলেন ; সুতরাং রায়দুর্ল্লভ যে সহজে তৎপ্রতি বীতশ্রদ্ধ হইয়াছিলেন এমন অনুমান করা কখনও সঙ্গত নহে। সিরাজের অত্যাচারে উৎপীড়িত হইয়া দেশের সমস্ত লোকেই তাঁহার উচ্ছেদ কামনা করিতেছিল। অতএব রায়দুর্ল্লভ যে সিরাজের বিপক্ষে দাঁড়াইয়াছিলেন এজন্য তৎপ্রতি দোষারোপ করা কর্ত্তব্য নহে।

সিরাজের পরিণাম উপলক্ষ করিয়া সায়র মোতাক্ষরীণপ্রণেতা বলিয়াছেন :—

" * * * ইতিপূর্ব্বে সিরাজকে কখনও অর্থবিতরণে লিপ্ত হইতে দেখা যায় নাই ; বরং তিনি নিয়ত পরুষবাক্য প্রয়োগ করিয়া এবং লোকের প্রতি নানারূপ অত্যাচার উৎপীড়ন করিয়া তাহাদের মর্ম্মে মর্ম্মে যাতনা প্রদান করিয়াছেন। এখন সেই সমস্ত দুষ্কার্য্যের প্রতিফল পাওয়ার সময় উপস্থিত হইয়াছে এবং জগতে যত প্রকার লাঞ্ছনা আছে, তাহা সমস্তই সিরাজকে উপভোগ করিতে হইবে। কবি নিম্নলিখিতরূপে যাহা বলিয়াছেন তাহা স্মরণ রাখা সিরাজের একান্তই কর্ত্তব্য ছিল।

"হে ক্ষমতাশালী ব্যক্তিগণ! যাঁহারা তোমাদের পূর্ব্বে ক্ষমতা পরিচালনা করিয়া গিয়াছেন, তাঁহাদের প্রতি কদাচ অত্যাচার উৎপীড়ন করিও না। নিশ্চয় জানিও, জগৎ কখনও একই ব্যক্তির অধীন থাকিতে পারে না। যে ব্যক্তি যে পদে অবস্থিত আছে, তাঁহাকে সেই পদ হইতে বিচ্যুত করিতে চেষ্টা করিও না। যে পদে তুমি অবস্থিত আছ, সেই পদে যে তুমি চিরকালই অবস্থিত থাকিবে তাহার নিশ্চয়তা কি আছে? বিপুল ধনরত্ন অপেক্ষা লোকের শ্রদ্ধাভক্তি অনেক অধিক মূল্যবান্। বহু লোকের অশ্রদ্ধাভাজন হওয়া অপেক্ষা দরিদ্র হওয়াও বরং বাঞ্ছনীয় * * * " (১)

(1) Sair. vol. II pages 234 and 235.
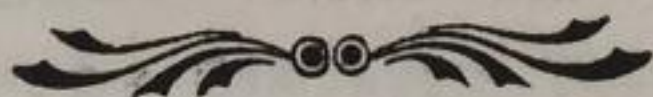
অষ্টম অধ্যায়

প্রথম পরিচ্ছেদ

পুনরায় রাজকার্য্যে

পূর্ব্বে বলা হইয়াছে, মীরজাফর বাঙ্গলার মসনদে আরোহণ করিয়া রায়দুর্ল্লভকে সর্ব্বপ্রধান অমাত্যপদে বরণ করিলেন এবং রাজ্যের সমস্ত কার্য্য তাঁহার পরামর্শ মতেই পরিচালিত হইতে লাগিল। আলিবর্দ্দী ও নিবাইস মহম্মদ দিল্লীর দরবার হইতে যথাক্রমে "মহবতজঙ্গ" ও "সাহামতজঙ্গ" উপাধি লাভ করিয়াছিলেন। মীরজাফর সিংহাসনে আরোহণ করিয়াই "মহবতজঙ্গ" উপাধি ধারণ করিলেন এবং পুত্র মীরণকে "সাহামতজঙ্গ" উপাধি দিয়া তাঁহার পদগৌরব বৃদ্ধি করিয়া দিলেন।

এই উপাধিলাভে মীরণের আর স্পর্দ্ধার পরিসীমা রহিল না। ভূতপূর্ব্ব সাহামতজঙ্গ নিবাইস মহম্মদ বিবিধ সদ্‌গুণের আধার ছিলেন। মীরণ নির্গুণ হইয়াও মনে করিলেন, তিনি "সাহামতজঙ্গ" উপাধির সহিত নিবাইস মহম্মদের সমস্ত গুণগ্রামেরও উত্তরাধিকারী হইয়াছেন। নিবাইসের আমলে রাজবল্লভই তাঁহার প্রধান অমাত্যপদে প্রতিষ্ঠিত ছিলেন এবং সিরাজের আদেশে তিনি পদচ্যুত হইয়া কারাগারে বাস করিতে ছিলেন, মীরণ এখন রাজবল্লভকে স্বীয় প্রধান সচিবের পদে

নিযুক্ত করিয়া এবং নিবাইসের অন্যান্য কর্ম্মচারিগণকে পূর্ব্ব পদ দিয়া নিবাইসের চরিত্র অভিনয় করিতে উদ্যত হইলেন। (১)

মোতক্ষরীণে লিখিত আছে, "সিরাজের শোচনীয় পরিণামের পর বাঙ্গালার সিংহাসন হস্তান্তরিত হইলেও তদ্দ্বারা সমস্ত অশান্তির অবসান হইল না। মীরজাফর সিংহাসনে সুপ্রতিষ্ঠিত হওয়ার পরই তাঁহার সহিত রায়দুর্ল্লভের মনোমালিন্যের সূত্রপাত হইয়া উঠিল। আলিবর্দ্দীর আমলে মীরজাফর রায়দুর্ল্লভের নিম্নপদস্থ রাজকর্ম্মচারী ছিলেন এবং অনেক সময় বিপদে পড়িয়া রায়দুর্ল্লভের সহায়তায় বিপদ হইতে উত্তীর্ণ হইয়াছেন। মীরজাফর এখন গত কথা সমস্ত বিস্মৃত হইয়া রায়দুর্ল্লভের উপর প্রভুত্বভাব পরিচালনা করিতে লাগিলেন। সিরাজের কনিষ্ঠ ভ্রাতা মির্জা মেহদি তৎকালে মীরজাফরের আদেশে কারাগারে বাস করিতে ছিলেন। রায়দুর্ল্লভ মীরজাফরের আচরণে অসন্তুষ্ট হইয়া মনে মনে মির্জা মেহদিকে সিংহাসনে বসাইবার কল্পনা কবিলেন। তৎকালে রায়-দুর্ল্লভের কোনরূপ অর্থাভাব ছিল না এবং সমস্ত সেনাগণই তৎপ্রতি একান্ত অনুরক্ত ছিল। মীরজাফর মনে করিলেন, মির্জা মেহদিকে সংহার না করিলে রায়দুর্ল্লভ তাঁহাকে উপলক্ষ করিয়াই পুনরায় বিপ্লবের আয়োজন করিবেন, সুতরাং মীরণের প্রতি রাজকুমার মেহদির নিধন ভার অর্পিত হইল। ভগবান্ এরূপ বিচিত্র উপাদানে মীরণের চরিত্র গঠন করিয়াছিলেন যে, পৈশাচিক কার্য্যে তাহার মনে অপূর্ব্ব আনন্দের উদয় হইত। অচিরে মীরণের সুবন্দোবস্তে (?) মির্জা মেহদি মানবলীলা সংবরণ করিলেন (২) ও আলিবর্দ্দীর পরিবারস্থ যাবতীয় মহিলাই ঢাকায় নির্ব্বাসিত হইলেন।

1. Sair, vol. II, page 253

(২) রায়দুর্ল্লভ যে এরূপ ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হইয়াছিলেন, তাহা অর্ম্ম সাহেবের

"এই সময় পূর্ণিয়া প্রদেশে বিশেষ গোলযোগ উপস্থিত হইল। সিরাজকর্ত্তৃক পূর্ণিয়া বিজিত হইলে, সেই প্রদেশ মোহনলালের পুত্রের শাসন-কর্ত্তৃত্বে অর্পিত হইয়াছিল। পূর্ব্বতম শাসনকর্ত্তা সৈয়দ আহম্মদের হাজি আলি খাঁ নামে এক পরিচারক ছিল। মোহনলালের পুত্রের আমলে এই পরিচারক ক্রমে দরবারের অধ্যক্ষপদে উন্নীত হইয়াছিল। মীর-জাফর সিংহাসনে আরোহণ করিলেই, হাজি আলি খাঁ সওকতজঙ্গের দেওয়ান অচলসিংহের সহিত ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হইল এবং মোহনলালের পুত্রকে কারারুদ্ধ করিয়া স্বয়ং শাসন-কর্ত্তৃত্ব পরিচালনা করিতে লাগিল।

"বিহার প্রদেশেও এই সময় সুবন্দোবস্তের অভাব ঘটিল। আলিবর্দ্দীর আমলহইতেই রামনারায়ণ বিহার প্রদেশের শাসনদণ্ড পরিচালনা করিতেছিলেন। যে বিপ্লবের ফলে সিরাজ সিংহাসনচ্যুত হইয়াছিলেন, তাহার বিন্দুবিসর্গ পর্য্যন্ত রামনারায়ণ অবগত ছিলেন না। আলিবর্দ্দীর বংশের উপর রামনারায়ণের এতদূর অনুরক্তি ছিল যে, এই বংশের ইষ্ট সাধনোদ্দেশ্যে তিনি প্রাণ পর্য্যন্ত পণ করিতে কুণ্ঠিত হইতেন না। সিরা-জের নিধন-বৃত্তান্ত শুনিয়া এই হিন্দু কর্ম্মচারী অত্যন্ত কষ্ট বোধ করিলেন এবং এই হত্যার প্রতিশোধ লইবার উদ্দেশ্যে, জমিদার পহ্লন সিং ও সুন্দর সিংহকে নিকটে ডাকিয়া পাঠাইলেন। তাঁহারা কেহই আসিলেন না দেখিয়া অগত্যা রামনারায়ণ প্রকাশ্যে মীরজাফরের বশ্যতা স্বীকার করিয়া, রাজকার্য্য পরিচালনা করিতে লাগিলেন।

"মীরজাফর বরাবর রামনারায়ণকে সন্দেহের চক্ষে নিরীক্ষণ করিতেছিলেন। সুতরাং তিনি আজিমাবাদে যাইবার ছলে সসৈন্যে

ইন্দুস্থানে লিখিত নাই। অর্ম্মসাহেবের মতে মীরজাফর রায়দুর্ল্লভের সর্ব্বনাশ করিতে উদ্যত হইয়া তাঁহার নামে ঐরূপ মিথ্যা ষড়যন্ত্রের কথা রচনা করিয়াছিলেন।—Orme's Indoostan, vol. 11, page 196 and 272.

রামনারায়ণের বিরুদ্ধে অভিযান করিবার সংকল্প করিলেন। ইতিমধ্যে পূর্ণিয়ার গোলযোগের বৃত্তান্ত তাঁহার কর্ণগোচর হইল। অগত্যা তিনি পূর্ব্বোক্ত সংকল্প স্থগিত রাখিয়া পূর্ণিয়া অভিমুখে যাত্রা করিলেন। এই সময় মীরণ নবাবের প্রতিনিধিস্বরূপ মুরশিদাবাদে অবস্থান করিতে লাগিলেন।

"মীরজাফর সসৈন্যে রাজমহল পর্য্যন্ত আসিলে, খাদম হাসন খাঁ তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিলেন। সিরাজ-জননী আমনা বেগমের উপর এই ব্যক্তি যে সমস্ত অত্যাচার করিয়াছিলেন তাহা পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে। মীরজাফরের পিতার জনৈক কাশ্মিরী উপপত্নীর গর্ভে খাদম হাসনের জন্ম হইয়াছিল। মীরজাফরের সহিত খাদম হাসনের বহুকাল যাবৎ সৌহৃদ্য ছিল, বয়সে ও লাম্পট্যদোষে কেহই অপর অপেক্ষা ন্যূন ছিলেন না। কথিত আছে, উভয়েই একযোগে অনৈসর্গিক বিলাস বাসনা চরিতার্থ করিতেন। খাদম হাসন প্রস্তাব করিলেন, 'আমাকে পূর্ণিয়ার শাসন-কর্ত্তৃত্ব প্রদান করিলে আমি নিজ ব্যয়ে সসৈন্যে পূর্ণিয়ায় গিয়া উপস্থিত গোলযোগ নিবারণ করিতে প্রস্তুত আছি।' মীরজাফর স্বভাবতই অলস ছিলেন; বিশেষতঃ এখন তিনি আজিমাবাদে যাইবার জন্য অধীর হইয়া পড়িয়াছিলেন, সুতরাং কোনরূপ আপত্তি না করিয়া তিনি খাদম হাসেনকে পূর্ণিয়ার শাসন-কর্ত্তৃত্বে নিযুক্ত করিলেন। অতঃপর খাদম হাসন সেনাসহ পূর্ণিয়ায় রওনা হইলেন। হাজি আলি খাঁ নবাবসেনার আগমন বার্ত্তা পাইয়াই ভয়ে পলায়মান হইয়াছিল; সুতরাং খাদম হাসন অতি সহজে পূর্ণিয়া অধিকার করিয়া তথায় শাসনদণ্ড পরিচালনা করিতে লাগিলেন।

এখন পূর্ণিয়াসম্বন্ধে নিশ্চিন্ত হইয়া মীরজাফর রাজমহল হইতে আজিমাবাদের দিকে যাত্রা করিলেন। রামনারায়ণ এই সংবাদ শুনিয়া

মনে করিলেন, ইংরেজদিগের সহিত সখ্যসংস্থাপন না করিলে তিনি নিরাপদ হইতে পারিবেন না। তৎকালে গোবিন্দমল্ল নামে জনৈক লোক জগৎশেঠের প্রতিনিধিস্বরূপ পাটনায় অবস্থান করিতেছিল। রামনারায়ণ এই গোবিন্দমল্লকে বশীভূত করিয়া ইংরেজশিবিরে প্রেরণ করিলেন। গোবিন্দমল্ল প্রথমতঃ মীরজাফরের নিকট আসিয়া তাঁহাকে বলিলেন, 'আপনি রামনারায়ণের কোনরূপ অনিষ্টাচরণ করিবেন না, একথা ইংরেজেরা প্রতিভূ হইয়া স্বীকার না করিলে, রামনারায়ণ আপনার সহিত সাক্ষাৎ করিতে সম্মত হইতেছেন না। মীরজাফর প্রতিশ্রুতি দিলে রামনারায়ণ পরদিন তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিলেন। অতঃপর কয়েকদিন আমোদ প্রমোদে কাটাইয়া মীরজাফর পুনরায় মুরশিদাবাদে প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন। এ স্থলে আসিয়াও তিনি আর রাজকার্য্যে মনোযোগ প্রদান না করিয়া, কেবল বিলাসবাসনা পরিতৃপ্ত করিতে লাগিলেন। সুতরাং রাজ্যশাসনভার এখন সম্পূর্ণরূপে মীরণের হস্তেই সমর্পিত হইল।" (১)

মীরণের বয়ঃক্রম এই সময় বিংশ বৎসরের কিঞ্চিদধিক হইয়াছিল। আলিবর্দ্দীর বৈমাত্রেয় ভগ্নী সাহা খানমের গর্ভে এই যুবক জন্মগ্রহণ করেন। পিতার সমস্ত দোষই পুত্রের চরিত্রে প্রতিফলিত হইয়াছিল। নিষ্ঠুরতা ও লাম্পট্যে মীরণের তুলনা খুঁজিয়া পাওয়া যায় কিনা সন্দেহ। লোকের জীবনসংহার করিতে পারিলে তাঁহার আর আনন্দের পরিসীমা থাকিত না। নরহত্যাকে তিনি পাপানুষ্ঠান মনে না করিয়া সুবিবেচনা ও ভবিষ্যদর্শনের কার্য্য বলিয়া মনে করিতেন। অনুকম্পা, স্নেহ, মমতা প্রভৃতি কোমল বৃত্তিসমূহ মীরণের হৃদয়ে অণুমাত্রও স্থান লাভ করিতে

---

(1) Sair, vol. II pages 246 tc 271.

পারিত না। তিনি সর্ব্বদা রমণীজনোচিত বেশভূষা করিতেন এবং রমণীকণ্ঠোচিতস্বরে কথাবার্ত্তা বলিতেন। সাহাজাহানাবাদ হইতে এই সময় চারি সহস্র লম্পট যুবক আসিয়া মীরণের আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছিল। তিনি সেই সমস্ত যুবকের সংসর্গে উচ্ছৃঙ্খলভাবে কালযাপন করিতেছিলেন। মীরজাফরকে বৃদ্ধবয়সে বারবণিতার সংসর্গে কাল-যাপন করিতে দেখিয়া, উপযুক্ত যুবক পুত্রও পিতার দৃষ্টান্ত অক্ষরে অক্ষরে অনুসরণ করিতে দ্বিধা বোধ করিতেছিলেন না। তিনি এতদূর গর্ব্বিত ছিলেন যে, কেহ কোন বিষয়ে প্রতিবাদ করিলে ধৈর্য্য রক্ষা করা তাঁহার পক্ষে কঠিন হইয়া উঠিত। মীরণের ধারণা ছিল যে, বুদ্ধিমত্তায় তিনি আলিবর্দ্দীর সমকক্ষ ছিলেন। কোন লোকের জীবনসংহার করিতে হইলে তিনি প্রায়ই বলিতেন, 'আলিবর্দ্দীর ন্যায় ভবিষ্যদৃষ্টি না থাকিলে আমি কখনই এইরূপ কার্য্যে লিপ্ত হইতাম না।' তিনি সর্ব্বদাই একখানি স্মারক-লিপি রক্ষা করিতেন এবং যাহাকে হত্যা করিতে হইবে, তাহার নাম উহাতে লিখিয়া রাখিতেন। মীরণ নিয়তই বলিতেন, 'কাহারও উপর সন্দেহ উপস্থিত হইলে তাহাকে ইহধাম হইতে অপসৃত করাই সর্ব্বাংশে কর্ত্তব্য।' (১

রাজ্যশাসনের ন্যায় গুরুভার এইরূপ একটী উচ্ছৃঙ্খল যুবকের পর্য্যবেক্ষণে কিরূপে পরিচালিত হইতে লাগিল তাহা সহজেই অনুমান করা যাইতে পারে। রাজকীয় সেনাগণ অনেকদিন পর্য্যন্ত বেতন না পাইয়া অসন্তুষ্ট হইয়া উঠিয়াছিল; কৃষকেরা করভারে উৎপীড়িত হইয়া আর্ত্তনাদ করিতেছিল এবং রাজ্যের সর্ব্বত্রই বিশৃঙ্খলতা পরিদৃষ্ট হইতেছিল। দুঃখের বিষয়, মীরজাফর কিংবা মীরণ এই সমস্ত বিষয়ের প্রতীকার-কল্পে সম্পূর্ণ উদাসীন থাকিয়া কেবলই বিলাস স্রোতে গা

(1) Sair, vol. II pages 241, 271 and 372.

ঢালিয়া দিলেন। এখন চুনীলাল, মণিলাল এবং সংবাদবিভাগের অধ্যক্ষ অনঙ্গ সিংহ ইচ্ছানুসারে রাজ্যের ধনরত্ন লুণ্ঠনকার্য্যে ব্রতী হইল। (১) যে সমস্ত লোক সিরাজের অত্যাচারে উৎপীড়িত হইয়া, পরিণতবয়স্ক মীরজাফরের শাসনকালে সুখে কালযাপন করিবেন ভরসায় সিরাজের উচ্ছেদসাধনে মীরজাফরের সহিত যোগদান করিয়াছিলেন, তাঁহারা পিতা ও পুত্রের কুশাসনে উভয়ের প্রতি খড়্গহস্ত হইয়া দাঁড়াইলেন। সকলেই এখন সিরাজের অত্যাচারকাহিনী বিস্মৃত হইয়া তাঁহার শোচনীয় পরিণামের নিমিত্ত পরিতাপ করিতে লাগিল। (২)

১৭৫৮ খৃষ্টাব্দের মে মাসে মীরজাফর আজিমাবাদ হইতে প্রত্যাবৃত্ত হইয়াছিলেন। তদবধিই রাজকীয় সেনাগণ প্রাপ্য বেতনের নিমিত্ত অত্যন্ত কোলাহল করিতেছিল। নবাব এখন সেনাগণের অসন্তোষ নিবারণকল্পে রায়দুর্ল্লভকে তাহাদের বেতন পরিশোধ করিতে বলিলেন। কিন্তু রায়দুর্ল্লভ অর্থাভাব জানাইয়া মীরজাফরের আদেশ প্রতিপালন করিলেন না। এ দিকে নন্দকুমার জগৎশেঠের আলয়ে গিয়া তাঁহাকে বলিলেন, 'রায়দুর্ল্লভ আদিষ্ট অর্থ প্রদান করিতে আর কিছুকাল বিরত থাকিলেই নবাব জগৎশেঠকে অর্থের জন্য পীড়াপীড়ি করিবেন।' জগৎশেঠ এই কথা শুনিয়া রায়দুর্ল্লভের প্রতি বিরক্ত হইয়া উঠিলেন। পূর্ব্বে বলা হইয়াছে, মীরজাফর রায়দুর্ল্লভের সর্ব্বনাশসাধন করিবার অবসর খুঁজিতেছিলেন ; কিন্তু জগৎশেঠের ভয়ে তিনি এতদিন মনোগত ভাব গোপনই রাখিয়াছিলেন। সিরাজউদ্দৌলার শাসনকালে রাজবল্লভ পদচ্যুত হইলে, ঢাকাবিভাগের শাসন-কর্ত্তৃত্ব রায়দুর্ল্লভের হস্তে ন্যস্ত হইয়াছিল। মীরজাফর এখন জগৎশেঠের বিরুদ্ধভাব জানিতে পারিয়া,

---

(1) Sair, vol. II. page 271.

(2) Sair, vol. 11, page 283.

১৭৫৮ খৃষ্টাব্দের ২৮শে জুলাই তারিখে ঢাকাবিভাগের সমস্ত কাগজপত্র ও শাসনভার রাজবল্লভের হস্তে অর্পণ করিবার নিমিত্ত রায়ছুর্ল্লভের প্রতি আদেশ প্রদান করিলেন। রায়ছুর্ল্লভ আসন্ন বিপদ্ দেখিয়া ধনরত্ন ও পরিবারসহ কলিকাতায় যাইবার অনুমতি চাহিলেন। নবাব এইরূপ অনুমতি দিতে সম্মত হইলেও মীরণ আপত্তি করিয়া বলিলেন, সেনাগণের প্রাপ্য বেতন কড়ায় গণ্ডায় পরিশোধ না করিলে রায়ছুর্ল্লভকে কলিকাতায় যাইতে দেওয়া হইবে না। এক্ষণে মীরণের আদেশে নবাবসেনা রায়ছুর্ল্লভের প্রাসাদ অবরোধ করিল। ইতিপূর্ব্বে রায়ছুর্ল্লভ বিস্তর সেনা সংগ্রহ করিয়া রাখিয়াছিলেন; সুতরাং শীঘ্রই উভয়পক্ষের রক্তপাত হওয়ার সম্ভাবনা হইয়া উঠিল। ইতিমধ্যে ক্রাফটন সাহেব রায়দুর্ল্লভের আলয়ে উপস্থিত হইয়া সমস্ত বৃত্তান্ত শুনিলেন এবং তিনি ওয়াট সাহেবের সহায়তায় নবাবের অনুমতি লাভ করিয়া রায়ছুর্ল্লভকে লইয়া কলিকাতায় চলিলেন।(১

এখন হইতে রাজবল্লভ পুনরায় ঢাকাবিভাগের শাসন-কর্ত্তৃপদে নিযুক্ত হইলেন। মীরজাফর কিংবা মীরণ কেহই রাজকার্য্যে অণুমাত্রও মনোযোগ করিতেন না। এই অমনোযোগিতার ফলে আমির বেগ হুগলীতে, রামনারায়ণ বিহারে, খাদম হাসন পূর্ণিয়ায় এবং রাজবল্লভ ঢাকায় সম্পূর্ণ স্বাধীনভাবে শাসনদণ্ড পরিচালনা করিতে লাগিলেন। (২)

উমাচরণ বাবু লিখিয়াছেন "রাজবল্লভের পুত্র কৃষ্ণদাসই এই সময় পিতার প্রতিনিধিপদে বরিত হইয়া ঢাকার শাসন-কর্ত্তৃত্বে প্রতিষ্ঠিত হইলেন এবং রাজবল্লভ মীরণের দেওয়ানস্বরূপ মুরশিদাবাদে অবস্থান করিতে লাগিলেন।

---

(1) Orme's Indoostan, vol. II, Page 357.

(2) Sair. vol. page 271 & 272.

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

বোজরগ উমেদপুর পরগণায়

তৎকালে সম্রাট্ দ্বিতীয় আলমগীর দিল্লীর সিংহাসনে অধিষ্ঠিত ছিলেন এবং সম্রাট্‌পুত্র আলিগহর উজির উমেদ উলমুলকের ভয়ে অন্যতম ওমরাহ নজিব খাঁর (১) আশ্রয় গ্রহণ করিয়া কালযাপন করিতেছিলেন। এলাহাবাদের শাসনকর্ত্তা মহম্মদকুলী খাঁ, বাঙ্গালার নবাব মীরজাফর ও তৎপুত্র মীরণের অযোগ্যতার বৃত্তান্ত অবগত হইয়া বঙ্গ অথবা বিহার প্রদেশ অধিকার করিবার সংকল্প করিলেন। মহম্মদ কুলীর আত্মীয় সুজাউদ্দৌলা সেই সময় অযোধ্যার শাসন-কর্ত্তৃত্বে নিযুক্ত ছিলেন। মহম্মদ কুলী বাঙ্গালায় অভিযান করা সম্বন্ধে পরামর্শ জিজ্ঞাসা করিলে সুজা-উদ্দৌলা সেই প্রস্তাব অনুমোদন করিয়া বলিলেন, 'এরূপ কোন অভিযান করিতে হইলে তাহা সম্রাট্‌পুত্র আলিগহরের নামে হওয়াই সুসঙ্গত।' সুতরাং মহম্মদ কুলী সাহাজাদা আলিগহরের নিকট লোক পাঠাইয়া তাঁহার সম্মতি গ্রহণ করিলেন এবং তাঁহাকে সঙ্গে লইয়া অবিলম্বে সেনাবলসহ বাঙ্গালা অভিমুখে রওনা হইলেন। বিহারের জমিদার সুন্দরসিংহ ও পহলন সিংহ আলিবর্দ্দীর একান্ত অনুরক্ত ছিলেন এবং সিরাজের নিধনবৃত্তান্ত শুনিয়া তাঁহারা উভয়েই মীরজাফরের উপর

---

(১) সায়র মোতাক্ষরীণ প্রণেতার জন্মদাতা।

ক্রুদ্ধ হইয়াছিলেন। আলিগহর সসৈন্যে বাঙ্গালার দিকে অগ্রসর হইলে সেই জমিদারদ্বয় তাঁহার পক্ষাবলম্বন করিবেন বলিয়া স্থির করিলেন।

রামনারায়ণ এই অভিযানের বৃত্তান্ত পরম্পর শুনিয়া নিরতিশয় শঙ্কিত হইয়া পড়িলেন এবং লোক পাঠাইয়া ইংরেজদিগের পাটনার কুঠীর অধ্যক্ষ আমিয়েট সাহেব ও মুরশিদাবাদে নবাব মীরজাফর ও তৎপুত্র মীরণকে সেই সংবাদ জ্ঞাপন করিলেন। সম্রাট্‌তনয়ের বিরুদ্ধে একাকী দণ্ডায়মান হইতে পারেন মীরজাফরের তাদৃশ সেনাবল ছিল না; সুতরাং তিনি সাহায্যার্থে ক্লাইবকে সসৈন্যে আসিবার জন্য লিখিয়া পাঠাইলেন।

ক্রমে আলিগহর সসৈন্যে বারাণসী পর্য্যন্ত আসিলেন; কিন্তু মুরশিদাবাদ হইতে এপর্য্যন্ত কোন সেনাই রামনারায়ণের সাহায্যার্থে আজিমাবাদে উপস্থিত হইল না। তৎকালে মোগলসেনার নামে সকলের হৃদ্‌কম্প উপস্থিত হইত, সুতরাং রামনারায়ণ কোনরূপ সাহায্য না পাইয়া মনে মনে অত্যন্ত চিন্তিত হইয়া পড়িলেন। এখন তিনি প্রকাশ্যে সাহসঅবলম্বনপূর্ব্বক সেনাসংগ্রহ করিলেন এবং তাহাদিগকে লইয়া নগরের বহির্ভাগে সাহাজাদার আগমন প্রতীক্ষা করিতে লাগিলেন।

কিয়ৎকাল পরেই আলিগহর কর্ম্মনাশার অপর তীরে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। এই সুদীর্ঘকাল মধ্যেও মুরশিদাবাদ হইতে কোন সেনাই রামনারায়ণের সহায়তাকল্পে উপনীত হইল না। অগত্যা রামনারায়ণ আমিয়েট সাহেবের সহিত পরামর্শ করিয়া শত্রুপক্ষের সহিত সন্ধির প্রস্তাব চালাইতে লাগিলেন। এইরূপে কিছুকাল গত হইলে রামনারায়ণ সংবাদ পাইলেন যে, মীরণ ও কর্ণেল ক্লাইব সসৈন্যে তাঁহার সাহায্যার্থ অগ্রসর হইতেছেন। এখন রামনারায়ণ প্রচার করিয়া

দিলেন যে, তিনি সাহাজাদার সহিত কোনরূপ সন্ধির সর্ত্তে আবদ্ধ হইতে প্রস্তুত নহেন। মহম্মদকুলী এই ঘটনায় অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইয়া পাটনা নগরী অবরোধ করিলেন। ইতিমধ্যে সুজাউদ্দৌলা মহম্মদকুলীর অনুপস্থিতি সুযোগে এলাহাবাদের দুর্গ অধিকার করিয়াছেন শুনিয়া তিনি অবরোধ পরিত্যাগ পূর্ব্বক সসৈন্যে এলাহাবাদের দিকে প্রস্থান করিলেন।

রামনারায়ণ যে ইতিপুর্ব্বে সাহাজাদার সহিত সন্ধির কথাবার্ত্তা চালাইয়াছিলেন, সেই সংবাদ মুরশিদাবাদে পৌছিতে বেশী বিলম্ব হয় নাই। মীরজাফর তাহা শুনিয়া অত্যন্ত চিন্তিত হইয়া পড়িয়াছিলেন এবং কলিকাতায় দূত পাঠাইয়া ক্লাইবকে মুরশিদাবাদে আনাইয়াছিলেন। ক্লাইব মুরশিদাবাদে আসিলেই মীরজাফর সংবাদ পাইলেন যে, রাম নারায়ণ সাহাজাদার সহিত সন্ধির প্রস্তাব ভঙ্গ করিয়া দিয়াছেন এবং মোগলসেনা পাটনা নগরী অবরোধ করিয়া রহিয়াছে। তখন আর কাল বিলম্ব না করিয়া মীরজাফর, মীরণ এবং ক্লাইব প্রচুর সেনাসহ পাটনাভিমুখে অগ্রসর হইলেন। তাঁহারা রাজমহল পর্য্যন্ত আসিলে, ক্লাইব ও মীরণকে পাটনায় পাঠাইয়া দিয়া মীরজাফর তথায় শিবির সন্নিবেশ করিরা অবস্থান করিতে লাগিলেন। মীরণ ও ক্লাইব পাটনায় উপস্থিত হইবার পূর্ব্বেই শুনিলেন যে, সাহাজাদা অবরোধ পরিত্যাগ করিয়া দূরে চলিয়া গিয়াছেন। সুতরাং ক্লাইব ও মীরণকে পাটনা উদ্ধারকল্পে কোনরূপ অসুবিধা ভোগ করিতে হইল না। এ দিকে তাঁহারা পাটনায় উপস্থিত হইলেই সাহাজাদা স্বয়ং সন্ধির প্রস্তাব করিয়া পাঠাইলেন। ক্লাইবও আগ্রহ সহকারে সেই প্রস্তাবে সম্মত হইয়া, মীরণের সমভিব্যাহারে মুরশিদাবাদের দিকে প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন।

মীরজাফর ইতিপূর্ব্বেই পাটনা উদ্ধারের বৃত্তান্ত শুনিয়া রাজধানীতে উপস্থিত হইয়াছিলেন। এ স্থলে আসিয়াই তিনি আগাবাকরের পুত্র মহম্মদ

সাদককে তোপে উড়াইয়া দিয়া বিজয়োৎসব সম্পন্ন করিলেন (১)। এই দুরাত্মাই একদিন সিরাজউদ্দৌলার প্ররোচনায় ঢাকার ডিপুটি নায়েব নাজিম হাসন উদ্দিনকে হত্যা করিয়াছিল। বিধাতার নির্ব্বন্ধে এতদিন পরে সেই হত্যাকাণ্ডের প্রতিশোধ হইল।

আগাবাকর নিহিত হইলেই বোজরগ উমেদপুর পরগণা বাজেয়াপ্ত হইয়া রাজবল্লভের সংরক্ষণে অর্পিত হইয়াছিল। মহম্মদ সাদক পূর্ব্বোক্ত-রূপে পরলোক গমন করিলে মীরজাফর ঐ পরগণার জমিদারী রাজ-বল্লভকে প্রদান করিলেন।(২)

বোজরগ উমেদপুর পরগণা বর্ত্তমান বাকরগঞ্জ জিলায় অবস্থিত। বাঙ্গালার সুপ্রসিদ্ধ নবাব সায়েস্তা খাঁর পুত্র বোজরগ উমেদের নাম অনুসারে এই পরগণার নামকরণ হইয়াছে। (৩) দয়াল চৌধুরী নামক জনৈক হিন্দু একদা এই পরগণার স্বত্বাধিকারী ছিলেন। মুরশিদকুলী খাঁর শাসনকালে আগাবাকর সেই অঞ্চলের ওহদাদারী কার্য্য করিতেন। দুর্ভাগ্যক্রমে দয়াল চৌধুরীর এক পরমা সুন্দরী কন্যা ছিল। আগাবাকর সেই মহিলার রূপের কথা শুনিয়া, তাঁহাকে স্বীয় অঙ্কশায়িনী করিবার অভিপ্রায়ে সেনা পাঠাইয়া দয়াল চৌধুরীর গৃহ অবরোধ করিলেন।

---

(1) Sair, vol. II, page 232.

(2) Hunter's Statistical Account of Backergunge, page 283.

শোভাবাজারের রাজবংশের আদি পুরুষ রাজা নবকৃষ্ণ ১৭৭৭ খৃষ্টাব্দের ১৮ই নবেম্বর গবর্ণর জেনারেল সমীপে যে আবেদন করেন তাহাতে লিখিত আছে, আলিবর্দ্দীর শাসনকালে রাজবল্লভ বোজরগ উমেদপুর পরগণার জমিদারী স্বত্ব খিলাত স্বরূপ প্রাপ্ত হইয়াছিলেন—Raja Nava Kissen's life by N. N. Ghose, p. 84. ফলে এই সময় তিনি ঐ পরগণার সংরক্ষণভার মাত্র প্রাপ্ত হইয়াছিলেন।

(3) History of Backergunge by Beveridge, page 94.

দুর্দ্দান্ত মুসলমান সেনার বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হইয়া তনয়ার সম্ভ্রম রক্ষা করিতে পারেন, দয়াল চৌধুরীর এরূপ শক্তি কি সামর্থ্য ছিল না। প্রত্যেক হিন্দুই পরিবারস্থ মহিলাগণের জীবন অপেক্ষা তাঁহাদের সম্মানকেই অধিক মূল্যবান্ মনে করেন। সুতরাং দয়াল চৌধুরী অনন্যোপায় হইয়া পরিবারস্থ যাবতীয় মহিলাগণেরই জীবন সংহার করিলেন এবং আত্মরক্ষার উদ্দেশ্যে তথা হইতে পলায়মান হইলেন। এইরূপ ভগ্নোদ্যম হইলে আগাবাকরের আর ক্রোধের পরিসীমা রহিল না। সেই পাষণ্ড এখন প্রতিহিংসা-পরায়ণ হইয়া নবাব দরবারে দয়াল চৌধুরীর বিরুদ্ধে বিদ্রোহের অভিযোগ করিল। নবাব অতঃপর দয়াল চৌধুরীর সমস্ত সম্পদ্ বাজেয়াপ্ত করিয়া, বোজরগ উমেদপুর পরগণার জমিদারী স্বত্ব আগাবাকরকে প্রদান করিলেন। (১)

এক সময় বোজরগ উমেদপুর পরগণা নিবিড় জঙ্গলে পরিপূর্ণ ছিল। ১৭২৮ খৃষ্টাব্দে নবাব সুজাখাঁর আমলে ঐ পরগণার সমস্ত জমি পরতাল হইলে, প্রজার নিকট প্রাপ্য মোট স্থিতের পরিমাণ ৬০০০৲ টাকা ও সেই স্থিতের হারাহারী ধরিয়া মোট রাজস্বের পরিমাণ ৪৬৫৭৲ টাকা নির্দ্ধারিত হইয়াছিল।

তৎকালে আবাদের সৌকর্য্যার্থে তদানীন্তন জমিদার পরগণার অন্তর্গত গর-আবাদি ভূমি খণ্ডে খণ্ডে বিভাগ করিয়া, ভিন্ন ভিন্ন ব্যক্তিকে তালুকদারী বন্দোবস্ত দিয়াছিলেন। তালুকদারগণের সহিত জমিদারের এইরূপ চুক্তি হইয়াছিল যে, তাঁহারা জমিদারকে আবাদি ভূমির উপর বিঘা প্রতি নির্দ্দিষ্ট হারে খাজনা প্রদান করিবেন। সুতরাং জমিদার সরকার হইতে প্রত্যেক বৎসরই জমির পরতাল হইয়া তালুকদারগণের দেয় খাজনার পরিমাণ নির্দ্ধারণ করা হইত।

(1) History of Backergunge by Beveridge, page 434.

তালুকদারেরা বন্দোবস্ত গ্রহণ করিয়াই জঙ্গল আবাদ করিতে প্রবৃত্ত হইল। ক্রমে আপন আপন তালুকের অধিকাংশ ভূমি হাসিল করিয়াও ফেলিল। এইরূপে যে যে স্থান পূর্ব্বে নিবিড় জঙ্গলে পরিপূর্ণ ছিল, তাহা অচিরে-শুপারি বাগান ও ধান্যক্ষেত্রে পরিণত হইয়া অপূর্ব্ব শ্রীধারণ করিল। সমগ্র পরগণাই নদী-মাতৃক ছিল ; কালে সেই সমস্ত নদীতে নূতন নূতন চর পরগণার অবশিষ্ট ভূমির সহিত সংলগ্নভাবে পয়স্থ হইয়া উহার আয়তন অনেক পরিমাণে বৃদ্ধি করিল। ক্রমে তথায় বহুসংখ্যক নিমকের তাফালও সংস্থাপিত হইল এবং সেই সূত্রে জমিদারের প্রচুর আয় হইতে লাগিল। অবশেষে ১৭৬০ খৃষ্টাব্দে অর্থাৎ ১৭২৮ খৃষ্টাব্দ হইতে ৩৩ বৎসরের মধ্যে বোজরগ উমেদপুর পরগণা এতদূর সমৃদ্ধিসম্পন্ন হইয়া উঠিল যে, উহার বার্ষিক আয় দুই লক্ষ টাকা হইয়া দাঁড়াইল। (১)

আগাবাকর নিহত হইলে ১৭৫৪ খৃষ্টাব্দে বোজরগ উমেদপুর পরগণার তত্ত্বাবধানের ভার রাজবল্লভের উপর ন্যস্ত হইল। তৎকালে আগাবাকরের আত্মীয়গণের প্ররোচনায় প্রায় অধিকাংশ প্রজাই ধর্ম্মঘট করিয়া রাজবল্লভকে কর প্রদান করিল না। এইরূপ সমস্যার সময় অনেকেই প্রজাবিদ্রোহ দমনকল্পে বল প্রয়োগ করিতেন সন্দেহ নাই। কিন্তু রাজবল্লভ পাশব শক্তির আশ্রয় গ্রহণ না করিয়া কৌশল অবলম্বন করিলেন।

তৎকালে কি হিন্দু কি মুসলমান, সকলেরই সংস্কার ছিল যে, মগ কিংবা খৃষ্টীয়ানেরা গৃহে পদার্পণ করিলেই লোকের জাতিপাত হইয়া থাকে। রাজবল্লভ মনে করিলেন, এইরূপ কোন জাতীয় লোককে কর সংগ্রাহকের কার্য্যে নিযুক্ত করিতে পারিলে, প্রজাগণ জাতিনাশের ভয়ে সহজেই তহশীল কাছারীতে আসিয়া কর প্রদান করিবে। এই সময় হুগলির নিকটবর্ত্তী বেন্দেল নামক স্থানে পর্টুগীজদিগের একটি উপনিবেশ ছিল।

(1) History of Backergnnge by Beveridge, pages 94 to 96.

রাজবল্লভ তথা হইতে চারিজন পর্টুগীজ আনাইয়া তাহাদিগকে বোজরগ উমেদপুর পরগণার কর সংগ্রাহকের পদে নিযুক্ত করিলেন। পর্টুগীজচতুষ্টয় বর্ত্তমান বরিশাল সহরের অদূরবর্ত্তী শিবপুর গ্রামে গৃহপ্রতিষ্ঠা করিয়া করসংগ্রহকার্য্যে প্রবৃত্ত হইলেন। তাঁহারা রাজবল্লভের নির্দ্দেশমতে ঘোষণা করিয়া দিলেন যে, কেহ কাছারীতে আসিয়া কিস্তিমতে খাজনা প্রদান না করিলে তহশীলদারগণ তাহার আলয়ে পদার্পণপূর্ব্বক অতিথিসৎকার গ্রহণ করিবেন। প্রজাগণ এই ঘোষণার কথা শুনিয়া হতবুদ্ধি হইয়া পড়িল। পর্টুগীজেরা গৃহে পদার্পণ করিলে জাতিপাত হইবে আশঙ্কায় এখন সকলে কাছারীতে উপস্থিত হইয়া দেয় খাজনা পরিশোধ করিতে লাগিল। (১)

এই সময় তথায় কোন খৃষ্টীয় ভজনালয়ই প্রতিষ্ঠিত ছিল না। পর্টুগীজ তহশীলদারগণ এ নিমিত্ত অত্যন্ত অসুবিধা বোধ করিয়া রাজবল্লভের নিকট জনৈক খৃষ্টীয় ধর্ম্মযাজক প্রেরণ করিবার নিমিত্ত আবেদন করিয়া পাঠাইলেন। তদনুসারে তিনি ফ্রা র‍্যাফেল, ডি এগ্নস নামক জনৈক ধর্ম্মযাজককে বেন্দেল হইতে আনাইয়া শিবপুরে সংস্থাপন করিলেন এবং তাঁহার ভরণপোষণ ও ভজনালয়ের ব্যয় নির্ব্বাহার্থ, বোজরগ উমেদপুর পরগণা হইতে কিয়ৎপরিমাণ ভূমি তালুকস্থত্রে বন্দোবস্ত করিয়া দিলেন। বর্ত্তমানে সেই সমস্ত ভূমি "মিশন তালুক" নামে আখ্যাত এবং সেই তালুকের আয় হইতেই শিবপুরস্থ খৃষ্টীয় ভজনালয়ের ব্যয় নির্ব্বাহিত হইতেছে।

পূর্ব্বোক্ত উপায়ে বোজরগ উমেদপুর পরগণার শান্তি সংস্থাপিত হইলে, ১৭৫৯ খৃষ্টাব্দে রাজবল্লভ আমিন নিযুক্ত করিয়া পরগণার অন্তর্গত প্রত্যেক তালুকের হাসিল ভূমির পরিমাণ নির্ণয় করাইলেন এবং তদনুসারে

(1) History of Backergunge by Beveridge, page 438.

১৭৬০ খৃষ্টাব্দে প্রজার নিকট প্রাপ্য খাজনার পরিমাণ দুই লক্ষ টাকা ধার্য্য হইল। (২)

যে স্থানে তহশীল কাছারী সংস্থাপিত ছিল তাহা এখন "গোলাবাড়ী" নামে আখ্যাত। রাজবল্লভ যে কেবল খাজনা ধার্য্য করিয়াই নিশ্চিন্ত রহিলেন এমন নহে; তিনি পরগণার প্রজাগণের হিতকল্পে বিবিধ অনুষ্ঠান করিতেও বিস্মৃত হইলেন না। শস্যচ্ছেদনের সময় উপস্থিত হইলেই রাজবল্লভের কর্ম্মচারিগণ তাঁহার উপদেশমতে প্রচুর পরিমাণ শস্য ক্রয় করিয়া তাহা কাছারী বাড়ীতে সঞ্চয় করিতে লাগিল। অনেকেই বলেন, শস্যসঞ্চয় উদ্দেশ্যে যে গৃহ নির্ম্মিত হইল তাহার দৈর্ঘ্য এক মাইলেরও অধিক ছিল। কথিত আছে যে, দুর্ভিক্ষ উপস্থিত হইলে রাজবল্লভের কর্ম্মচারিগণ সঞ্চিত শস্য দুর্ভিক্ষক্লিষ্ট প্রজাগণমধ্যে বিতরণ করিয়া তাহাদিগকে মৃত্যুর কবল হইতে রক্ষা করিত। এইরূপ শস্য সঞ্চয়ের নিমিত্তই রাজবল্লভের কাছারী বাড়ী উক্তকালে "গোলাবাড়ী" নামে আখ্যাত হইয়াছিল।

শ্রীযুক্ত কৈলাসচন্দ্র সিংহ ১২৮৯ সনের বান্ধব পত্রিকার ১৬ পৃষ্ঠায় লিখিয়াছেন:—

"মুরাদ আলি ও রাজবল্লভ ক্রূর, নির্দ্দয় ও স্বার্থপর ছিলেন। রাজকার্য্যে প্রবৃত্ত হইয়াই তাঁহারা প্রজার সর্ব্বনাশ করিয়া ধন সঞ্চয় করিতে লাগিলেন। পূর্ব্ব হইতেই মহাশয় যশোবন্ত সিংহ ঢাকা নেয়াবতের দেওয়ান পদে নিযুক্ত ছিলেন। তিনি মুরাদ আলি ও রাজবল্লভের আচরণে ত্যক্ত হইয়া স্বীয় পদ ত্যাগ করিলেন। যশোবন্ত সিংহের কার্য্য পরিত্যাগে সেই দুর্ব্বিনীতদিগের অত্যাচার বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইতে লাগিল। তৎকালে

(2) History of Backergunge by Beveridge, page 96.

পূর্ব্ববঙ্গের যে অবস্থা হইয়াছিল, তাহা স্মরণ করিলে হৃদয় বিদীর্ণ হইয়া যায়। কি প্রজা, কি ভূম্যধিকারী, রাজবল্লভকে উৎকোচ দ্বারা সন্তুষ্ট না রাখিতে পারিলে কাহারও নিস্কৃতি ছিল না। এই সময় রাজবল্লভ জমিদারদিগের সর্ব্বনাশ সাধন করিয়া জমিদারী সঞ্চয় করিতে লাগিলেন। ভাটি প্রদেশস্থ বোজরগ উমেদপুর পরগণাই তাহার প্রথম ভূ-সম্পত্তি।"

তিনি আবার ষষ্ঠ সংখ্যক নব্যভারতের ৭৮ পৃষ্ঠায় লিখিয়াছেন ঃ—

"বোজরগ উমেদপুর পরগণা সম্বন্ধে রাজবল্লভের অনেক কীর্ত্তি আছে। উত্তরকালে যখন রাজবল্লভ ঢাকার দেওয়ান হইয়াছিলেন, তখন প্রাচীন জমা ওয়াশীল বাকী কাটিয়া ঐ পরগণার বার্ষিক পূর্ব্ব রাজস্ব ৪৬৪৭৲ টাকা লিখিয়া বৃদ্ধি হারে তিনি ৬০০০৲ টাকা মাত্র প্রদান করিতেন। পরে যখন এই পরগণা তাঁহার হস্তচ্যুত হইল, অমনি তাহার বার্ষিক রাজস্ব ৬০০০৲ টাকা হইতে ২০১২৭৪৲ টাকা হইয়াছিল। ঐরূপ অনুচিত রাজস্ব বৃদ্ধি হইতে দশবৎসরও অতীত হয় নাই।

"যপ্‌সা নিবাসী আনন্দনাথ বাবুর নিকট জ্ঞাত হইয়াছি, রাজবল্লভের জ্ঞাতি, যপ্‌সানিবাসী লালা রামপ্রসাদ রায়, বোজরগ উমেদপুর পরগণা ক্রয় করিয়াছিলেন। কিন্তু রাজবল্লভ চক্রান্ত করিয়া তাঁহাকে তপে আব্দুলাপুর ও অন্য কয়েকখানি গ্রাম মাত্র দিয়া উক্ত পরগণাটি আত্মসাৎ করিয়াছেন।"

রাজবল্লভ সংক্রান্ত বৃত্তান্ত লিখিতে গিয়া কৈলাসবাবু অন্যান্য স্থলেও যেরূপ সত্যের মর্য্যাদা লঙ্ঘন করিয়াছেন, এ স্থলেও তাহার ব্যতিক্রম ঘটে নাই। কিরূপে বোজরগ উমেদপুর পরগণা আগাবাকরের বিদ্রোহের পর বাজেয়াপ্ত হইয়া রাজবল্লভের শাসনে অর্পিত হয় এবং কিরূপেই বা ১৭৬০ খৃষ্টাব্দে তিনি ঐ পরগণার জমিদারী স্বত্ব লাভ করেন, তাহা এই অধ্যায়ে বর্ণনা করিয়া প্রমাণ প্রয়োগ উদ্ধৃত করা হইয়াছে। এ স্থলে

তাহার পুনরুল্লেখ নিষ্প্রয়োজন। কৈলাস বাবু পূর্ব্বোক্তরূপে যাহা যাহা লিখিয়াছেন তাহা সমস্তই মিথ্যা ও বিদ্বেষমূলক।

রাজবল্লভ কখনও পূর্ব্ব জমা ওয়াশীল বাকী কাটিয়া অধিক পরিমাণ রাজস্বের স্থলে অল্পমাত্র ৪৬৪৭৲ টাকা লিখিয়া রাখেন নাই এবং নবাব সরকারে প্রতিপত্তি লাভ করিবার অভিপ্রায়ে বৃদ্ধিহারে ৬০০০৲ টাকাও রাজস্বস্বরূপ প্রদান করেন নাই। পূর্ব্বে প্রদর্শিত হইয়াছে যে, ১৭২৮ খৃষ্টাব্দে এই পরগণার বার্ষিক মোট স্থিত ৬০০০৲ টাকা ধার্য্য হইয়াছিল, এবং সেই সময় মোট স্থিতের হারাহারী ধরিয়া বার্ষিক দেয় রাজস্বের পরিমাণ ৪৬৪৭৲ টাকা নির্দ্ধারিত হইয়াছিল। যে সময় বোজরগ উমেদপুর পরগণা রাজবল্লভের হস্তগত হয়. তাহার অন্ততঃ ২৬ বৎসর এবং রাজবল্লভের রাজকার্য্যলাভের কিছুকাল পূর্ব্বে এই ঘটনা সংঘটিত হইয়াছিল। দুঃখের বিষয় কৈলাসবাবু এই সূত্র ধরিয়াই সত্যের মর্য্যাদা লঙ্ঘনপূর্ব্বক রামকে রহিম বলিতে প্রয়াস পাইয়াছেন।

ফলে, বোজরগ উমেদপুর পরগণার রাজস্ব কখনও ২০১২৭৪৲টাকা ধার্য্য হয় নাই। পূর্ব্বে বলা হইয়াছে যে, নানা কারণে জমিদারীর অবস্থা ক্রমে উন্নত হইয়াছিল এবং তালুকদারগণসহ হাসিল ভূমির বিঘা প্রতি নির্দ্দিষ্ট হারে খাজানা দেওয়ার চুক্তি ছিল বলিয়া, ১৭৫৯ খৃষ্টাব্দের জরীপে পূর্ব্বাপেক্ষা অনেক জমি হাসিল সাব্যস্ত হওয়ায় তদুপরি কর ধার্য্য হইয়াছিল এবং এই কারণে বার্ষিক স্থিতের পরিমাণও দুইলক্ষ টাকায় পরিণত হইয়াছিল। কৈলাস বাবু রাজবল্লভের সততাসম্বন্ধে সন্দেহ উদ্রেক করিবার অভিপ্রায়েই দশবৎসরে ৬০০০৲ টাকা স্থলে ২০১২৭৪৲ টাকা রাজস্ব হওয়ার কথা লিখিয়াছেন। তাঁহার এই উক্তি যে সম্পূর্ণ মিথ্যা তাহা বিভারেজ সাহেবকৃত বাকরগঞ্জের ইতিহাস পাঠ করিলেই বিদিত হইবে। তাহাতে লিখিত আছে, "বোজরগ উমেদপুর পরগণাসহ সমগ্র

রাজনগর পরগণার রাজস্ব ১৭৮৭ খৃষ্টাব্দ হইতে ১৭৯২ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত ৯৭১৯৪৲ টাকা ধার্য্য ছিল এবং কোম্পানীর কর্ম্মচারিগণ স্বহস্তে কর সংগ্রহের ভার লইয়াও প্রজাগণ হইতে এই পরিমাণ টাকা সংগ্রহ করিতে পারে নাই। টমসন সাহেব ১৭৯২ খৃষ্টাব্দে বোজরগ উমেদপুর পরগণাসহ সমগ্র রাজনগর পরগণার রাজস্ব ১৮৭১০৭৲ টাকা ধার্য্য করেন এবং রাজবল্লভের উত্তর পুরুষেরা এইরূপ গুরুতর রাজস্ব বহন করিতে অসমর্থ হইলে, সম্পূর্ণ জমিদারী বাকী রাজস্বের দায়ে নীলাম হইয়া গিয়াছিল।” অতএব কৈলাসবাবু যে মিথ্যা কথা লিখিয়া লেখনী কলঙ্কিত করিয়াছেন সে সম্বন্ধে অণুমাত্রও সন্দেহ নাই।

জপ্‌সানিবাসী লালা রামপ্রসাদ কখনও বোজরগ উমেদপুর পরগণার জমিদারী ক্রয় করেন নাই। যে আনন্দনাথ বাবুর দোহাই দিয়া কৈলাস বাবু লিখিয়াছেন, “রামপ্রসাদকে বঞ্চিত করিয়া রাজবল্লভ এই পরগণা হস্তগত করিয়াছিলেন,” তিনিই আবার আমাদিগকে লিখিয়া জানাইয়াছেন :—

“লালা রামপ্রসাদ যখন ওয়দাদার (ওহদাদার) ছিলেন, তখন আগা-বাকরের মৃত্যু হয় এবং রাজবল্লভ তখন ঢাকায় নবাবের সহকারী। তখন মৃত ব্যক্তির সম্পত্তি খাস হইয়া ওয়াদাদারের (ওহাদাদারের) হস্তেই ন্যস্ত থাকিত, পরে বিলি বন্দোবস্ত হইত। পাছে রামপ্রসাদ নিজে এই জমিদারী হস্তগত করেন, এই জন্য তাঁহাকে অসন্তুষ্ট না করিয়া তপে আব্দুলাপুর ও বোজরগ উমেদপুর পরগণা হইতে জোয়ার হাসনাবাদ রামপ্রসাদকে দিয়া রাজা ঐ পরগণা ক্রয় করেন।”

উদ্ধৃত স্থলে স্পষ্টই বুঝা যাইতেছে যে, আনন্দনাথ বাবুর মতেও বোজরগ উমেদপুর পরগণা কখনও লালা রামপ্রসাদ ক্রয় করেন নাই এবং রাজবল্লভের চক্রান্তেও তিনি ঐ পরগণা হইতে বঞ্চিত হন নাই।

ফলতঃ আনন্দনাথ বাবু যাহা লিখিয়াছেন, তাহাও প্রকৃত নহে। পূর্ব্বে প্রমাণ প্রয়োগ দ্বারা প্রদর্শিত হইয়াছে যে, আগাবাকরের বিদ্রোহের পর এই পরগণা বাজেয়াপ্ত হইয়া রাজবল্লভের সংরক্ষণে অর্পিত হইয়াছিল। পরিশিষ্টে টমসন সাহেবের যে রিপোর্ট উদ্ধৃত করা হইল তদ্দৃষ্টে প্রতীয়মান হইবে, বোজরগ উমেদপুর পরগণা রাজবল্লভের সংরক্ষণে অর্পিত হওয়ার পর, রাজবল্লভেরই নিয়োগ মতে লালা রামপ্রসাদ সেই পরগণা পর্য্যবেক্ষণ করিতেন। যে জমিদারী বাজেয়াপ্ত হইয়া রাজবল্লভের শাসনে অর্পিত হইয়াছিল, তাহা কিরূপে রামপ্রসাদ হস্তগত করিতে পারিতেন তাহা সহজে বোধগম্য নহে। রাজবল্লভ রামপ্রসাদকে নিরতিশয় প্রীতির চক্ষে নিরীক্ষণ করিতেন। রাজবল্লভ যে সমস্ত বহুব্যয়সাধ্য যজ্ঞানুষ্ঠান করিয়াছেন, তাহা সমস্তই রামপ্রসাদের অধ্যক্ষতায় সুচারুরূপে নির্ব্বাহিত হইয়াছিল। টমসন সাহেবের রিপোর্ট অনুসারে এবং উমাচরণ বাবুর মতে রামপ্রসাদ রাজবল্লভের প্রধান কর্ম্মচারী ছিলেন। অতএব রামপ্রসাদ যে তপে আব্দুলাপুর ও জোয়ার হাসনাবাদ পাইয়াছিলেন, তাহা রাজবল্লভের অনুগ্রহের ফলেই হইয়াছিল।

পূর্ব্বে কৈলাস বাবুর যে সমস্ত উক্তি উদ্ধৃত করা হইয়াছে তাহাতে বুঝা যায়, মুরাদ আলির শাসনকালেই রাজবল্লভ বোজরগ উমেদপুর পরগণা হস্তগত করেন। কিন্তু ইতিহাসপাঠে অবগত হওয়া যায়, ১৭৪০ খৃষ্টাব্দে গিরীয়ার যুদ্ধাবসানে. মুরাদ আলি কার্য্যহইতে অপসৃত ও নিবাইস তৎপদে নিযুক্ত হন এবং ১৭৫৪ খৃষ্টাব্দে ঐ পরগণা রাজবল্লভের হস্তগত হয়। এতদ্দ্বারা স্পষ্টই দেখা যায় যে, মুরাদ আলির শাসনকর্তৃত্ব শেষ হওয়ার অন্ততঃ চতুর্দ্দশ বৎসর পর হইতে রাজবল্লভের সহিত বোজরগ উমেদপুর পরগণার সম্বন্ধ সংস্থাপিত হইয়াছিল। কৈলাস বাবু লিখিয়াছেন, "এই পরগণাসম্বন্ধে রাজবল্লভের অনেক কীর্ত্তি আছে।" কেবল গালগল্প না

করিয়া তিনি যদি একটি কীর্ত্তির (?) কথাও বলিতে পারিতেন, তবুও তাঁহাকে ধন্যবাদ দেওয়া যাইত। দুঃখের বিষয় তিনি একটি "কীর্ত্তির" কথাও উল্লেখ করিতে পারেন নাই। বিদ্রোহীর সম্পত্তি চিরকালই রাজবিধি অনুসারে বাজেয়াপ্ত হইয়া থাকে। আগাবাকর বিদ্রোহী হইলে নবাবের আদেশে তাঁহার জমিদারী বাজেয়াপ্ত হইয়াছিল। এ বিষয়ে রাজবল্লভের কি অপরাধ হইতে পারে, তাহা সুতীক্ষ্ণবুদ্ধিসম্পন্ন কৈলাস বাবুর ন্যায় ব্যক্তি ভিন্ন অন্য কেহ বুঝিতে পারিবে না।

কৈলাস বাবু রাজবল্লভের অত্যাচারসম্বন্ধে যে সমস্ত প্রলাপোক্তি করিয়াছেন, তৎসম্বন্ধে ৯ম অধ্যায়ের চতুর্থ পরিচ্ছেদে বিস্তৃতভাবে আলোচনা করা হইল।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

সংগ্রামক্ষেত্রে

ক্লাইবের সহিত সন্ধি করিয়া আলিগহর চিতোরপুর নামক স্থানে বাস করিতে লাগিলেন। ইতিমধ্যে মীরজাফরের ভূতপূর্ব্ব সেনানী দিলির খাঁ ও বিহার প্রদেশের অন্যতম জমিদার কঙ্কর খাঁ সাহাজাদাকে লিখিয়া পাঠাইলেন যে, তিনি বাঙ্গালার নবাবের বিরুদ্ধে অভিযান করিলেই তাঁহারা সাহাজাদার পক্ষাবলম্বন করিবেন। অতঃপর আলিগহর কিয়ৎ-

পরিমাণ সেনা সংগ্রহ করিয়া চিতোরপুর হইতে পুনরায় আজিমাবাদের দিকে অগ্রসর হইলেন।(১)

রামনারায়ণ এই সংবাদ পাইয়া বহুসংখ্যক সেনা লইয়া পাটনা পরিত্যাগ করিলেন। পথিমধ্যে কাপ্তান ক্রাফ্‌টন কতিপয় সেনা লইয়া তাঁহার সহিত মিলিত হইলেন। এখন উভয়ে টিকরীতে আসিয়া শিবির সন্নিবেশপূর্ব্বক সাহাজাদার আগমন প্রতীক্ষা করিতে লাগিলেন।

আলিগহর আজিমাবাদের প্রান্তভাগে কর্ম্মনাশা নদী পার হইয়াই সংবাদ পাইলেন যে, সম্রাট্ দ্বিতীয় আলমগীর গুপ্ত ঘাতকের হস্তে মানব লীলা সংবরণ করিয়াছেন। তখন তিনি সময়োপযোগী একখানি সিংহাসন প্রস্তুত করাইয়া তাহাতে আরোহণ করিলেন এবং সাহ্ আলম নাম ধারণ-পূর্ব্বক আপনাকে সম্রাট্ বলিয়া ঘোষণা করাইলেন। এই ঘটনার অল্প কয়েক দিন পরেই দেহবা নদীর তীরে রামনারায়ণের সেনার সহিত অভিনব সম্রাটের সেনার সংঘর্ষ উপস্থিত হইল। দিলীর খাঁ এই যুদ্ধে প্রাণ বিসর্জ্জন দিলেন এবং কাপ্তান ক্রাফ্‌টন ও তৎপক্ষীয় বহুসংখ্যক সেনা এই আহবে প্রাণত্যাগ করিল। স্বয়ং রামনারায়ণ গুরুতররূপে আহত হইয়া সমর ক্ষেত্রহইতে পলায়নপূর্ব্বক আজিমাবাদে প্রবেশ করিলেন। (২)

মীরজাফর এই সংবাদ পাইয়া একদল দেশীয় সেনা ও একদল ইংরেজ সেনা রামনারায়ণের সাহায্যকল্পে পাঠাইয়াছিলেন। মীরণ অধ্যক্ষরূপে এবং রাজবল্লভ মীরণের সহকারিস্বরূপ দেশীয় সেনার সঙ্গে প্রেরিত হইলেন।

নবাবসেনা ক্রমে উদয়নালার নিকট আসিলে সম্রাট্‌সেনার সহিত

---

(1) Sair, vol. II, page 332.

(2) Sair, vol. II. pages 335 to 343.

তাহাদের সাক্ষাৎ হইল। কাদিরত খাঁ ও কামগর খাঁ সম্রাট্‌সেনা পরিচালনা করিয়া বিশেষ বীরত্বপ্রদর্শন করিলেন। মীরণের সেনানী আমিন খাঁ আহত হইলেন এবং রাজবল্লভ বিপক্ষের বেগ সহ্য করিতে অসমর্থ হইয়া পলায়ন করিবেন বলিয়া স্থির করিলেন। এই সময় কাদিরত খাঁ কতিপয় সহচর লইয়া নবাবের গোলন্দাজ সেনাগণকে প্রচণ্ডবেগে আক্রমণ করিলেন। গোলন্দাজ সেনাগণের সম্মুখে এমন একটি সুবৃহৎ কামন ছিল যে, তাহা বহন করিতে চারিশত বলীবর্দ্দের প্রয়োজন হইত। কাদিরত খাঁ ও তাঁহার সহচরগণ সেই কামানের সম্মুখে আসিলেই একটি গোলা আসিয়া কাদিরত খাঁর মাহুতের প্রাণ সংহার করিল। কাদিরত খাঁ তাহাতেও ভগ্নোদ্যম না হইয়া পদদ্বয়ের আঘাতেই হস্তী চালাইতে লাগিলেন এবং দুই হস্তে কেবল বিপক্ষের উপর শর সন্ধানে নিযুক্ত রহিলেন। কাদিরৎ খাঁ যে সমস্ত শর নিক্ষেপ করিতে ছিলেন তন্মধ্যে একটি আসিয়া মীরণের শরীরে বিদ্ধ হইল। অনেকক্ষণ কাদিরত খাঁ এরূপ বীরত্ব প্রদর্শন করিতে পারিলেন না; ইতিমধ্যেই একটি গোলা আসিয়া কাদিরত খাঁর প্রাণসংহার করিল। এই সেনানীর পতনের সঙ্গে সঙ্গেই সম্রাট্‌সেনা ছত্রভঙ্গ হইয়া ইতস্ততঃ পলায়ন করিল। সুতরাং এবার জয়লক্ষ্মী মীরণেরই অঙ্কশায়িনী হইলেন। (১)

উমাচরণ বাবু লিখিয়াছেন, "যুদ্ধের প্রারম্ভে মীরণ পৃষ্ঠভঙ্গ দিয়া সংগ্রাম স্থান হইতে কিঞ্চিৎ ব্যবধানে অবস্থান করিতে লাগিলেন। এই সময় সম্রাট্‌সেনা আসিয়া প্রচণ্ডবেগে মীরণের ধনাগার আক্রমণ করিল। রাজবল্লভ তৎকালে অদূরে অবস্থান করিতেছিলেন, তিনি এখন সসৈন্যে আসিয়া সম্রাট্‌সেনাগণকে বিতাড়িত করিয়া দিয়া মীরণের ধনাগার রক্ষা করিলেন।"

(1) Riazoo Salatin, pages 380 & 381.

সম্রাট্ এখন অনন্যোপায় হইয়া কঙ্কর খাঁর সহায়তায় বহরে পলায়ন করিলেন। সে স্থলে দুই কি তিন দিন বিশ্রাম করিয়া তিনি শত্রুসেনা-গণকে পশ্চাতে রাখিয়া, পার্ব্বত্য পথ দিয়া মুরশিদাবাদ আক্রমণ করিবার সংকল্প করিলেন। অতঃপর তিনি কতিপয় সেনা লইয়া সেই পথে মুরশিদাবাদের দিকে অগ্রসর হইতে লাগিলেন। মীরণ এই কথা শুনিতে পাইয়া অনতিবিলম্বে সম্রাটের অভিযানের কথা মুরশিদাবাদে লিখিয়া পাঠাইলেন এবং সম্রাটের গতিরোধ করিবার উদ্দেশ্যে স্বয়ং সসৈন্যে মুরশিদাবাদে প্রত্যাবৃত্ত হইলেন। দুর্জ্জয় সিংহ রামনারায়ণের সেনার অধিনায়ক হইয়া মীরণের পশ্চাৎ পশ্চাৎ চলিলেন। সম্রাটের অভিযানের বৃত্তান্ত শুনিয়া মীরজাফরও অতিশয় বিচলিত হইলেন, কিন্তু তিনি এখন সাহস-শূন্য না হইয়া ইংরেজ ও তেলেঙ্গা সেনা লইয়া অগ্রসর হইতে লাগিলেন।

ক্রমে উভয় পক্ষের সেনা অগ্রসর হইলে দামোদর নদীর এক তীরে সম্রাট্‌সেনা ও অপর তীরে নবাব সেনা শিবির সন্নিবেশ করিল। এই সময় নবাবের পক্ষে অসংখ্য সেনা ছিল; সম্রাট্‌সেনানী কঙ্কর খাঁ তাহা দেখিতে পাইয়া আর সম্মুখে অগ্রসর হইলেন না এবং পৃষ্ঠভঙ্গ দিয়া আজিমাবাদের দিকে প্রস্থান করিলেন।

ফরাসিসসেনানী সুপ্রসিদ্ধ মোসেমঁল তৎকালে চিৎপুরে অবস্থান করিতেছিলেন। সম্রাটের আহ্বানমতে তিনি এখন সসৈন্যে আজিম-বাদের নিকট উপস্থিত হইলেন ও তথা হইতে বহর গিয়া সম্রাটের আগমন প্রতীক্ষা করিতে লাগিলেন। অল্প কয়েক দিনমধ্যেই সম্রাট্ ও কঙ্কর খাঁ দামোদরের তটহইতে প্রত্যাবৃত্ত হইয়া ল সাহেবের সহিত মিলিত হইলেন।

পাটনার এখন দুরবস্থার পরিসীমা রহিল না। নগরের প্রায় সমস্ত

সেনা লইয়াই দুর্জ্জয় সিংহ ইতিপূর্ব্বে মীরণের পশ্চাদ্বর্ত্তী হইয়াছিলেন। রামনারায়ণ অগত্যা আমিয়েট সাহেবের সাহায্যে নগর রক্ষার বন্দোবস্ত করিলেন। এদিকে সম্রাট্‌সেনাও তৎক্ষণাৎ আসিয়া নগর অবরোধ করিল। কিয়ৎকাল এইরূপভাবে অবরোধ চলিলেই পাটনা নগরী শত্রুহস্তে নিপতিত হইত. কিন্তু ইতিমধ্যে বর্দ্ধমান হইতে একদল ইংরেজ সেনা আসিয়া রামনারায়ণের সাহায্যকল্পে দাঁড়াইল। সম্রাট্‌সেনা এখন তাহাদের সম্মুখীন হইতে না পারিয়া গয়ামনপুরায় প্রস্থান করিল।

পূর্ণিয়ার শাসনকর্ত্তা খাদম হাসেনের সহিত মীরণের অণুমাত্রও প্রীতিবন্ধন ছিল না। সম্রাট্ দ্বিতীয়বার বিহারে অভিযান করিলেই খাদম হাসন মীরজাফরের পক্ষ ত্যাগ করিয়া সম্রাটের পক্ষ অবলম্বন করিল। সম্রাট্ গয়ামনপুরা আসিলে খাদম হাসন তাঁহার সহিত যোগ দিবার অভিপ্রায়ে, সসৈন্যে আসিয়া আজিমাবাদের পাদসঞ্চারিণী ভাগীরথীর অপর তটস্থ হাজিপুরনামক স্থানে শিবিরসন্নিবেশ করিল। রামনারায়ণের পক্ষ হইতে নক্স সাহেব ও সীতাব রায় খাদম হাসনকে বিতাড়িত করিবার উদ্দেশ্যে সসৈন্যে প্রেরিত হইলেন। খাদম হাসনের সেনাদল নক্স সাহেব ও সীতাবরায়ের সেনাদলের উপর আপতিত হইয়া তাঁহাদিগকে ব্যতিব্যস্ত করিয়া তুলিল, কিন্তু অবশেষে খাদম হাসন পরাভূত হইয়া বেতিয়ার দিকে প্রস্থান করিল। এই যুদ্ধে সীতাব রায় যেরূপ অসামান্য বীরত্ব প্রদর্শন করিলেন তাহা সবিশেষ উল্লেখ যোগ্য।

সম্রাট্ আজিমাবাদ অবরোধ করিলেই রামনারায়ণ সেই সংবাদ মুরশিদাবাদে লিখিয়া পাঠাইয়াছিলেন। পূর্ণিয়ার শাসনকর্ত্তা খাদম হাসন যে সম্রাটের পক্ষাবলম্বন করিয়া সসৈন্যে অগ্রসর হইতেছেন তাহাও নবাব দরবারে অবিদিত রহিল না। সুতরাং মীরজাফর ব্যস্ত হইয়া রামনারায়ণের সহায়তার নিমিত্ত মীরণকে সসৈন্যে প্রেরণ করিলেন।

মীরণ ও রাজবল্লভ তদনুসারে দ্রুতপদে পাটনায় আসিয়া শুনিতে পাইলেন যে. সম্রাট্ ইতিপূর্ব্বেই অবরোধপরিত্যাগপূর্ব্বক গয়ামনপুরা প্রস্থান করিয়াছেন। অতএব তাঁহারা আর কালবিলম্ব না করিয়া খাদম হাসনের অনুসরণে বেতিয়ার দিকে অগ্রসর হইতে লাগিলেন।

খাদম হাসন প্রস্থান করিতে করিতে ক্রমে গণ্ডকী নদীর তীরে উপস্থিত হইলেন। এস্থলে আসিয়া তিনি দেখিতে পাইলেন যে, নদী জলে এরূপ পরিপূর্ণ হইয়া গিয়াছে যে বহুসংখ্যক নৌকা সংগ্রহ করিতে না পারিলে তিনি কোন ক্রমেই সমস্ত সেনা ও দ্রব্যসম্ভার লইয়া তাহা উত্তীর্ণ হইতে পারিবেন না। খাদম হাসন এখন বিষম সঙ্কটে পড়িলেন। সম্মুখে দুস্তর বেগবতী স্রোতস্বতী এবং পশ্চাৎভাগে প্রবল শত্রুসেনা, এই উভয় অন্তরায়ের মধ্যে নিপতিত হইয়া তিনি কি কর্ত্তব্য স্থির করিতে পারিলেন না। অগত্যা তিনি দ্রব্যসম্ভার দূরে নিক্ষেপ করিয়া গুরুভার লঘু করিলেন এবং সেনাগণকে লইয়া মীরণ-সেনাগণকে বহুদূরে ফেলিয়া দ্রুতগতিতে নদীর তীর অবলম্বনে অগ্রসর হইতে লাগিলেন। খাদম হাসনের সেনাগণ এখন এক নিবিড় জঙ্গলে প্রবেশ করিয়া পথভ্রান্ত হইয়া পড়িলেই রজনী সমাগত হইল। আহার্য্য ও বিশ্রামস্থানের অভাবে সকলে এই স্থলে সমস্ত রজনী হস্তিপৃষ্ঠে অনশনে কাটাইল।

রাত্রি দশ ঘটিকার সময় সেনাসহ ক্রমে অগ্রসর হইয়া মীরণ নদী তীরে উপস্থিত হইলেন। তৎকালে প্রবলবেগে ঝড় বহিতেছিল. মুষল-ধারায় বৃষ্টিপাত হইতেছিল এবং সমস্ত গগনমণ্ডল নীরদ বসনে আবৃত হইয়া দিঙ্‌মণ্ডল নিবিড় অন্ধকারে পরিপূর্ণ করিয়াছিল। সুতরাং মীরণ আর অগ্রসর না হইয়া নদীতীরেই শিবির সংস্থাপন করিলেন। অতঃপর তিনি এক সমুন্নত পটমণ্ডপে প্রবেশ করিয়া তথায় অনুচরবর্গসহ রহস্যালাপে নিযুক্ত হইলেন। কিন্তু তখন রজনীর অবস্থা এমনই ভীষণ

হইয়া দাঁড়াইয়াছে যে, তিনি মনে মনে অত্যন্ত শঙ্কিত হইয়া উঠিলেন এবং নিরাপদ হইবার উদ্দেশ্যে একটি নর্ত্তকী ও কতিপয় অনুচরসহ ক্ষুদ্র এক পটমণ্ডপে প্রবেশ করিলেন। বারবিলাসিনী এস্থলে আসিয়া কোমলকণ্ঠে সুমধুর গান গাহিতে লাগিল, কিন্তু মীরণের নিকট তাহা ভাল বোধ হইল না। নর্ত্তকী অগত্যা তাঁহাকে অভিবাদন করিয়া বিদায় গ্রহণ করিলে, জনৈক ভৃত্য আসিয়া প্রভুর হাত পা টিপিতে লাগিল এবং একজন অনুচর নিকটে বসিয়া বিবিধ খোস গল্পের অবতারণা করিল। এই সময় হঠাৎ বিদ্যুৎ ঝল্‌সিয়া উঠিল এবং তৎক্ষণাৎ বিকট শব্দে মীরণের কক্ষে বজ্র নিপতিত হইয়া তাঁহার ভবলীলা শেষ করিয়া দিল। (১)

মুরশিদাবাদ হইতে আজিমাবাদে যাত্রার প্রাক্কালে মীরণ যে এক ভয়ানক কার্য্যের অনুষ্ঠান করিয়াছিলেন, তাহা স্মরণ করিলে এখনও শরীর রোমাঞ্চিত হয়, আলিবর্দ্দীর পরিবারবর্গ ইতিপূর্ব্বে নবাবের আদেশে ঢাকায় নির্ব্বাসিত হইয়া অতি কষ্টে কালযাপন করিতেছিলেন। মীরণ তাঁহাদিগকে নিধন করিবার নিমিত্ত প্রথমতঃ ঢাকার কোতোয়াল যশরত খাঁর প্রতি আদেশ প্রদান করেন। যশরত এই পৈশাচিক আদেশ প্রতিপালন করিতে অস্বীকার করিলে, বাখর খাঁ নামে জনৈক জমাদার একশত অনুচরসহ মুরশিদাবাদ হইতে ঢাকায় প্রেরিত হইল। মীরণ এই জমাদারের সহিত যশরতের বরাবরে যে পত্র দিলেন, তাহাতে ঘেসাটিবিবী ও আমনাবিবীকে তাহার হস্তে সমর্পণ কবিবার কথা লিখিত ছিল। অগত্যা যশরতকে সেই জমাদারের হস্তে আলিবর্দ্দীর তনয়া-দ্বয়কে সমর্পণ করিতে হইল। রজনীর দ্বিতীয় যাম অতীত হইলে

(1) Sair voll. I, pages 362 to 366.

বাখর খাঁ উভয় মহিলাকে মুরশিদাবাদে নেওয়ার প্রলোভন দিয়া একখানি নৌকায় আরোহণ করাইল এবং তাঁহাদিগকে লইয়া নদী বাহিয়া চলিল। নৌকা ক্রমে এক নির্জ্জন স্থানে উপস্থিত হইলে বাখর খাঁ মহিলাদ্বয়ের নিকট আসিয়া বলিল, "আপনারা এখন স্নান করিয়া নূতন বস্ত্র পরিধান করুন।" জ্যেষ্ঠা ঘেসাটিবিবী জমাদারের প্রকৃত উদ্দেশ্য বুঝিতে পারিয়া শঙ্কায় আকুলকণ্ঠে রোদন করিতে লাগিলেন। কনিষ্ঠা আমনা অতি তেজস্বিনী রমণী ছিলেন, তিনি জ্যেষ্ঠাকে প্রবোধ দিয়া বলিলেন, "দিদি! কেন ভয় করিতেছ? এবং কেনই বা এত ব্যাকুলিত হইয়া অশ্রু বিসর্জ্জন করিতেছ? একদিন ত মরিতে হইবেই— আজ সেই শেষ দিন হইলেই বা ক্ষতি কি?" এই কথা কয়টি বলিয়া আমনা কিয়ংকাল নিস্তব্ধ হইয়া রহিলেন এবং পুনরায় স্থিরভাবে বলিতে লাগিলেন, "আমরা যে কত পাপ করিয়াছি তাহার পরিসীমা নাই বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। ভগবান্ যে এ ভাবে মীরণের উপর আমাদের সমস্ত পাপের বোঝা চাপাইয়া দিয়া আমাদিগকে মরিবার অবসর দিয়াছেন, তজ্জন্য তাঁহাকে ধন্যবাদ করিতেছি।" অতঃপর উভয়ে স্নান করিয়া নববস্ত্র পরিধান করিলেন এবং ললাটে ও সমস্ত অঙ্গে কারবালার পবিত্র মৃত্তিকা লেপন করিয়া জগৎপিতার নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করিলেন ও ঘাতকের দিকে ফিরিয়া তাহাকে বলিলেন, "তোমার প্রভুর আদেশ প্রতিপালন করিতে অণুমাত্রও বিলম্ব করিও না।" ঘাতক এই দৃশ্য দেখিয়া বিচলিত হইল ও এখন কি কর্ত্তব্য তৎসম্বন্ধে ইতস্ততঃ করিতে লাগিল। এই অবসরে উভয় ভগিনী ঊর্দ্ধদিকে হস্তোত্তলন করিলেন এবং কনিষ্ঠা বলিতে লাগিলেন, "হে সর্ব্বশক্তিমান পরমেশ্বর! আমরা উভয়েই অনেক পাপ করিয়াছি সত্য, কিন্তু এ পর্য্যন্ত মীরণের কোনরূপ অনিষ্টাচরণ করি নাই। মীরণ যে সমস্ত সম্পদ্ উপভোগ

করিতেছে তাহা সমস্তই আমাদের প্রসাদে হইয়াছে। সেই সমস্ত উপকারের প্রতিদান-কল্পে এই নরপিশাচ এখন আমাদিগকে হত্যা করিতে উদ্যত হইয়াছে। তোমার চরণে আমাদের বিনীত নিবেদন এই যে, তুমি আমাদের পরলোক গমনের পর সুকঠিন বজ্রে পাপিষ্ঠের মস্তক চূর্ণ বিচূর্ণ করিয়া দিয়া ন্যায়ের মর্য্যাদা রক্ষা কর এবং আমাদের সন্তান সন্ততির প্রতি যে সমস্ত অত্যাচার অবিচার হইতেছে তাহার সমুচিত প্রতিফল প্রদান করিতেও কুণ্ঠিত না হও।" অতঃপর উভয়ে নেমাজ পাঠ করিয়া কারবালার পবিত্র মৃত্তিকা চুম্বন করিলেন এবং একে অন্যের হস্তধারণ করিয়া নদীগর্ভে ঝম্প প্রদানপূর্ব্বক চিরকালের নিমিত্ত মীরণের অত্যাচার হইতে অব্যাহতি লাভ করিলেন। (১)

কেহ কেহ বলেন, যে রজনীতে মহিলাদ্বয় নিধন প্রাপ্ত হইয়াছিলেন, সেই রজনীতেই মীরণ বজ্রাহত হইয়া প্রাণত্যাগ করেন। কাহারও মতে এই ঘটনার একমাস পরে মীরণ বজ্রাহত হন। ফলে মীরণের ভয়াবহ পরিণাম বিধান করিয়া ভগবান যে ন্যায়ের মর্য্যাদা রক্ষা করিয়াছেন সে বিষয়ে সন্দেহ নাই।

---

(1) Sair voll. II, pages 368 to 371.

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

সম্রাট্ সদনে

একমাত্র মীরণ ও রাজবল্লভই যে খাদম হাসনের পশ্চাদ্বর্ত্তী হইয়াছিলেন এমন নহে। ইংরেজবাহিনী সহ কর্ণেল ক্লাইব এবং রামনারায়ণের সেনাদল সহ দুর্জ্জয়সিংহও তৎকালে তাঁহার অনুসরণ করিয়াছিলেন।

মীরণের পটমণ্ডপে বজ্র নিপতিত হইবার অল্প পরেই ঝড়বৃষ্টির বিরাম হইল এবং কতিপয় প্রহরী পটমণ্ডপে প্রবেশ করিয়া দেখিতে পাইল যে, নবাবপুত্র চির নিদ্রায় নিমগ্ন রহিয়াছেন। প্রহরিগণ এই ভয়াবহ দৃশ্যে বিস্ময়াবিষ্ট হইলেও কোনরূপ গোলযোগ না করিয়া নিঃশব্দে তথা হইতে আসিয়া শিবিরের প্রধান প্রধান কর্ম্মচারীর নিকট উপস্থিত হইল এবং তাঁহাদিগকে জাগরিত করিয়া গোপনে তাঁহাদের নিকট সমস্ত বৃত্তান্ত বিস্তৃতভাবে বলিল। (১)

এই সময় রাজবল্লভই মীরণের সহকারিরূপে রাজকীয় সেনার অনুগমন করিয়াছিলেন। সুতরাং সেনাপতির মৃত্যুতে তিনিই এখন সেনাদলের নেতৃত্বভার গ্রহণ করিলেন। (২) মীরণের মৃত্যুসংবাদ প্রচারিত হইলে সেনাগণ ভগ্নোৎসাহ হইয়া পড়িবে আশঙ্কায় তিনি এখন এই ঘটনা গোপন রাখিবার সংকল্প করিলেন। পরদিন প্রাতে রাজবল্লভ

---

(1) Sair, vol. II, page 366.

(2) Sair, vol. II, page 375.

কর্ণেল ক্লাইবের নিকট গিয়া স্বীয় সংকল্পের কথা বলিলে, তিনি রাজবল্লভের মতেরই অনুমোদন করিলেন। (১)

উমাচরণবাবু লিখিয়াছেন, "ভৃত্যের নিকট মীরণের মৃত্যুসংবাদ জ্ঞাত হইয়া রাজবল্লভ মনে করিলেন, বিপক্ষেরা এই সংবাদ জানিতে পারিলে তাহাদের সাহস বাড়িয়া যাইবে; সুতরাং তিনি মীরণের মৃত্যু বিবরণ গোপন করাই শ্রেয়ঃ মনে করিয়া, যে পটমণ্ডপে মীরণ চির-নিদ্রাভিভূত ছিলেন, তথায় প্রবেশ করিলেন এবং মৃতদেহ নানাবিধ বসনভূষণে সুসজ্জিত করিয়া ভৃত্যদিগকে বলিয়া দিলেন যে, মৃত্যুর পূর্ব্বে নবাবপুত্রের যেরূপ পরিচর্য্যা করা হইত, এখনও যেন তাহার ভাণ করা হয়।"

---

(১) সায়র মোতাক্ষরীণে লিখিত আছে, "একজন বিশ্বস্ত লোক পর দিন প্রাতে মীরণের মৃত্যুসংবাদ কর্ণেল ক্লাইবের নিকট প্রচার করিলে, তিনি মীরণের মৃত্যুসংবাদ গোপন রাখা সম্বন্ধে যে পরামর্শ হইয়াছিল, তাহা অনুমোদন করিলেন"—Sair vol. II Page 372.

উমাচরণ বাবুর মতে রাজবল্লভই মীরণের মৃত্যুসংবাদ গোপনে রাখার পরামর্শ করিয়াছিলেন। প্রতাপ বাবুর নিকট যে হস্তলিখিত পুস্তক পাওয়া গিয়াছে, তাহাতেও ঐ উক্তিই সমর্থিত হইয়াছে। মহারাজের ভ্রাতার বংশধর ৺জানকী নাথ সেন ডাক্তার মহাশয়ও বলিয়াছেন যে, রাজবল্লভের পরামর্শমতেই মীরণের মৃত্যুসংবাদ গোপন রাখা হইয়াছিল। সায়র মোতাক্ষরীণে এই ঘটনা যে রাজবল্লভের পরামর্শে হইয়াছিল, তাহা স্পষ্টরূপে লিখিত নাই সত্য; কিন্তু তিনি যে মীরণের সেনার নেতৃত্ব গ্রহণ করিয়াছিলেন সে কথার উল্লেখ আছে। মূল সায়র মোতাক্ষরীণে লিখিত আছে "দেশীয় লোকেরা এই সময় মীরণের মৃত্যু সংবাদ গোপন রাখিবার জন্য কর্ণেল ক্লাইবকে পরামর্শ দিল।" ফলতঃ তৎকালে যে দুই দল দেশীয় সেনা ছিল তন্মধ্যে এক দলের নেতা দুর্জ্জয় সিংহ এবং অপর দলের নেতা রাজবল্লভ ছিলেন। অল্পবয়স্ক দুর্জ্জয় সিংহ অপেক্ষা পরিণতবয়স্ক ও প্রতিভাশালী রাজবল্লভের মস্তিষ্কহইতেই যে এই পরামর্শ বহির্গত হইয়াছিল তাহা সিদ্ধান্ত করাই সুসঙ্গত।

অনন্তর মীরণের মৃতদেহ একটি হস্তীর পৃষ্ঠে উত্তোলন করিয়া হাওদার মধ্যে এরূপ ভাবে রাখা হইল যে, লোকে মনে করিতে লাগিল, মীরণ পীড়িত অবস্থায় তথায় শয়ন করিয়া রহিয়াছেন। রাজবল্লভ, দুর্জ্জয় সিংহ এবং কর্ণেল ক্লাইব আর কালবিলম্ব না করিয়া সসৈন্যে খাদম হাসনের অনুসরণ করিলেন। মীরণের মৃতদেহ হস্তিপৃষ্ঠে শায়িত অবস্থায় তাঁহাদের সঙ্গে সঙ্গে চলিতে লাগিল। খাদম হাসন এই সমবেত সেনার সম্মুখীন হইতে সাহসী না হইয়া অযোধ্যার দিকে প্রস্থান করিলেন। অতঃপর সেই সমবেত বাহিনী বেত্তিয়ার দুর্গের নিকট আসিয়া তথায় শিবির সন্নিবেশ করিল ও নিকটবর্ত্তী জমিদারগণের দেয় রাজস্ব আদায় করিয়া পুনরায় আজিমাবাদের পথে অগ্রসর হইল। সকলে আজিমাবাদে আসিলে, দুর্জ্জয়সিংহ স্বীয় সেনাদল লইয়া রাম নারায়ণের সহিত যোগদান করিলেন এবং রাজবল্লভ মীরণ-সেনার অধ্যক্ষপদে বরিত হইয়া জাফর খাঁর উদ্যানে শিবিরসন্নিবেশ করিয়া রহিলেন। (১)

মীরণ সেনাগণকে নিয়মিতরূপে বেতন প্রদান করিতেন না; সুতরাং তাহাদের বেতন বাবদ প্রায় এক লক্ষ টাকা এই সময় প্রাপ্য ছিল। আজিমাবাদের পথে মীরণের মৃত্যুসংবাদ রাষ্ট্র হইয়া পড়িলেই সেনাগণ প্রাপ্য বেতনের নিমিত্ত কোলাহল করিতে লাগিল। অবশেষে কর্ণেল ক্লাইব ও দুর্জ্জয় সিংহের সহায়তায় রাজবল্লভ সেনাগণকে অতি কষ্টে প্রবোধ দিয়া, তাহাদিগকে লইয়া আজিমাবাদে আসিলেন। জাফর খাঁর উদ্যানে শিবির সন্নিবিষ্ট হইলেই সেনাগণ প্রাপ্য বেতনের নিমিত্ত পুনরায় কোলাহল আরম্ভ করিল। তৎকালে রাজবল্লভের হস্তে উপযুক্ত পরিমাণ অর্থের সংস্থান ছিল না; সুতরাং তিনি সেনাগণের প্রাপ্য

(1) Sair, vol. II, pages 375 to 376.

বেতন পরিশোধ করিতে অক্ষম হইলেন। এই ঘটনায় সেনাগণ উগ্রমূর্তি ধারণ করিয়া পাটনা নগরী বিকম্পিত করিয়া তুলিল। তাহাদের উচ্ছৃঙ্খলতায় কয়েকদিনের নিমিত্ত নগরের হাট বাজার বন্ধ হইয়া গেল এবং স্বয়ং রাজবল্লভ প্রায় বন্দীর ন্যায় কালযাপন করিতে লাগিলেন। অগত্যা তিনি পাটনা কুঠীর অধ্যক্ষ আমিয়েট সাহেবের নিকট হইতে ধারে বনাত কিনিয়া তাহা বেতনের পরিবর্ত্তে সেনাগণকে প্রদান করিলে তাহারা পুনরায় শান্তমূর্ত্তি ধারণ করিল। (১)

বর্ষাকালের প্রায় অবসান হইলে সেনাগণ আবার প্রাপ্য বেতন উপলক্ষ করিয়া বিদ্রোহী হইয়া উঠিল। একদিন মীর ফজলে আলি ও আছমতুল্লানামক দুইজন সৈনিক রাজবল্লভের দেওয়ানখানায় আসিয়া বলিল, প্রাপ্য বেতন না পাওয়া পর্যন্ত তাহারা সে স্থান পরিত্যাগ করিবে না। অল্প কিছুকাল পরেই দীন মহম্মদ প্রমুখ কতিপয় সেনাও রাজবল্লভের সহিত সাক্ষাতের ভাণ করিয়া তথায় প্রবেশ করিল। রাজবল্লভ তৎকালে কক্ষান্তরে ক্ষৌরী হইতেছিলেন; মীর ফজল আলি

(1) The news of the quarrel of the Sepoys, formerly the deceased Newab's, with Maharaja Rajballab for their wages and of his going to the city, I have before wrote you. Maharaja is greatly ashamed and distressed by them, nor will they release him till the money is paid. This quarrel has put the city into confusion for 4 or 5 days and the bazar, roads and gats have been stopped. Cossimaly Khan has wrote several letters to Mr. Amyat and to me once to make the Sepoys contented by some means and to send Maharaja Rajballab down to the city in a boat. Mr Amayat has not interfered in the quarrel. My situation Your Excellency must be acquainted with. I am almost dead and the Sepoys for their wages are ready to assassinate me with their creeses, but through your favour and riches they have been prevented. The deceased Nawab's Sepoys' wages is not yet settled and every one says that a lac of rupees is their due :—From Ram Narayan, A. D. 1760, Long's Unpublished Records, Page 237.

প্রভৃতি প্রায় ত্রিশজন সেনা এখন সেই কক্ষেই উপস্থিত হইল। রাজবল্লভ সকলকে বলিলেন, উপযুক্ত অর্থের সংস্থান হইলেই তাহাদের বেতন পরিশোধ করা হইবে। তাহারা এই কথায় সন্তুষ্ট না হইয়া রাজবল্লভকে লইয়া দেওয়ানখানায় প্রবেশ করিল। এই সময় দেওয়ানখানায় বহুসংখ্যক সেনা সমবেত হইয়াছিল, তাহারা সকলে এখন রাজবল্লভকে ঘিরিয়া দাঁড়াইল। রাজবল্লভের অনুচরগণ এই সংবাদ পাইয়া দ্রুতপদে দেওয়ানখানার দিকে ধাবমান হইল। তাহারা সে স্থলে আসিলেই যে উভয় পক্ষের মধ্যে সংঘর্ষ হইয়া বিস্তর রক্তপাত হইবে এ বিষয়ে কাহারও সন্দেহ রহিল না। এই সমস্যার সময় রাজবল্লভ অগ্রসর হইয়া উভয় পক্ষকেই সুমিষ্ট বচনে আপ্যায়িত করিলেন এবং সকলেই তাঁহার বাক্যকৌশলে সন্তুষ্ট হইয়া স্ব স্ব স্থানে প্রস্থান করিল। (১)

---

(1) I have endeavoured much to get money, but without success, and have been obliged to borrow some broadcloth of Mr. Amyat to deliver the Sepoys in lieu of their wages. This the 1st day of Rubbee-u-sannee, Surabond. Mir. Fazle Aly Syed and Asmatullah Khan came into my Dewankhana, where they seated themselves and declared that they would not move tlll they get their pay and Sheik Din Mahomed and others came to visit me and seated themselves also. I was shaving in another room Mir Fazl Aly and 20 or 30 others consulted with Asmatulla Khan and came to me and spoke both soft and sweet words, and I represented things to them in proper manner and promised to do my utmost endeavour to satisfy them, but they did not listen to me and brought me out into the Dewankhana, where there were many people and placed me among them. Upon which my own people came running to my assistance and a skirmish was likely to have ensued and the consequence whereof would have been the city being plundered and the Sircar's business greatly detrimented. For these reasons I prevented it and gave them good words and sometimes after they departed—From Maharaja Rajballab, December 1760—Long's Unpublished Records, page 240.

সম্রাট্‌ সাহ আলম তৎকালে গয়ামনপুরায় শিবিরসন্নিবেশ করিয়া বিহারপ্রদেশলুণ্ঠনে নিযুক্ত ছিলেন। বর্ষাকালে সম্রাটের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করিলে কোনরূপ ফলোদয় হইবে না ভাবিয়া রাজবল্লভ, রাম-নারায়ণ এবং ইংরেজ সেনানী কর্ণেল ক্লাইব বর্ষাবসান পর্য্যন্ত আজিমা-বাদে অবস্থান করাই সুসঙ্গত মনে করিলেন। ইতিমধ্যে কর্ণেল ক্লাইব কার্য্যভার ত্যাগ করিয়া স্বদেশে যাত্রা করিলে মেজর কর্ণাক তৎপদে নিযুক্ত হইয়া ইংরেজ সেনার অধ্যক্ষতা করিতে লাগিলেন।

বর্ষাবসান হইলে রাজবল্লভ, রামনারায়ণ এবং মেজর কর্ণাক স্ব স্ব সেনাদল লইয়া সম্রাটের অনুসরণে বহির্গত হইলেন এবং হিলসা নামক স্থানে সম্রাট্‌সেনাগণকে সম্পূর্ণরূপে পরাভূত করিয়া দিয়া সম্রাটের ফরাসী সেনানী ল সাহেবকে বন্দী করিলেন। অতঃপর রাজবল্লভ বিহারের সীমা পর্য্যন্ত সম্রাট্‌সেনার পশ্চাদ্ধাবমান হইলে, সম্রাটের সেনানী কঙ্কর খাঁ পার্ব্বত্য প্রদেশে এবং সম্রাট্‌সেনাগণ গয়ামনপুরায় প্রস্থান করিল। এখন আর সম্রাট্‌সেনার অনুসরণ করা নিষ্প্রয়োজন মনে করিয়া রাজবল্লভ বিজয়পতাকাউড্ডীনপূর্ব্বক আজিমাবাদে প্রত্যাবর্ত্তন করিতে লাগিলেন। (১)

সম্রাট্‌ যুদ্ধে পরাভূত হইলেও বিজেতৃগণ তাঁহার সহিত সন্ধি করা সুসঙ্গত বলিয়াই মনে করিলেন। তদনুসারে রাজবল্লভের উপদেশ অনুসারে সীতাব রায় সন্ধির প্রস্তাব লইয়া সম্রাট্‌শিবিরে উপস্থিত হইলেন। (২) সম্রাট্‌ প্রথমতঃ সন্ধি করিতে অসম্মত হইলেও অবশেষে

---

(1) Riazoo Salatin, page 383, 384. সায়র মোতাক্ষরীণে লিখিত আছে, "এই যুদ্ধ মেজর কর্ণাকের অধ্যক্ষতায় পরিচালিত হইয়াছিল এবং রাজবল্লভ ও রামনারায়ণ তাঁহার সহকারী ছিলেন"—Sair, vol. II, page 401.

(2) Riazoo Salatin, page 385.

অভিজ্ঞ অমাত্যগণের পরামর্শে ইংরেজশিবিরে পদার্পণ করিতে আপত্তি করিলেন না। পরদিন প্রাতঃকালে তিনি ইংরেজশিবিরের দিকে অগ্রসর হইতে লাগিলেন। সম্রাট্‌কে প্রত্যুদ্‌গমন করিবার উদ্দেশ্যে মেজর কর্ণাক অগ্রবর্ত্তী হইয়া সম্রাটের সহিত পথে সাক্ষাৎ করিলেন। অবশেষে তাঁহারা সকলে গয়াহইতে দেড়ক্রোশ দূরস্থিত জামুলী নদীর তীরে আসিলে, সম্রাট্‌সেনাগণ তথায় শিবিরসন্নিবেশ করিয়া অবস্থান করিতে লাগিল। কিন্তু সম্রাট্ ইংরেজসেনানীর অনুরোধমতে কিয়ৎদূর অগ্রসর হইয়া নিকটবর্ত্তী আম্রকাননে সংস্থাপিত একটি পটমণ্ডপে প্রবেশ করিলেন। এস্থলে সম্রাট্ হস্তিপৃষ্ঠহইতে অবতরণ করিলেই রাজবল্লভ, রামনারায়ণ এবং মেজর কর্ণাক অগ্রসর হইলেন এবং সম্রাট্‌কে রীতিমতে অভিবাদন করিয়া তাঁহার সম্মুখে 'নজর' রাখিয়া দিলেন। অতঃপর সম্রাট্ তাঁহাদিগকে প্রত্যভিবাদন করিয়া শ্রান্তিঅপনোদন করিবার উদ্দেশ্যে বিশ্রামভবনে প্রবেশ করিলেন। (১)

কথিত আছে যে, সম্রাট্ এই সময় রাজবল্লভের সম্মুখে একখানি তরবারি ও একটি কলমদানী সংস্থাপন করিয়া তন্মধ্যে যে কোনটি গ্রহণ করিবার নিমিত্ত রাজবল্লভকে বলিলে, তিনি কলমদানীর পরিবর্ত্তে তরবারি গ্রহণ করেন এবং তাহাতে সম্রাট অত্যন্ত সন্তুষ্ট হইয়া তাঁহাকে "সলরজঙ্গ" উপাধি প্রদান করেন। (২)

---

(১) Sair, vol. II, pages 401 to 406.

(২) উমাচরণ বাবু লিখিয়াছেন, রাজবল্লভ তরবারি গ্রহণ না করিয়া কলমদানীই গ্রহণ করিয়াছিলেন।

কিন্তু কৈলাস বাবু নব্যভারত পত্রিকার ষষ্ঠ সংখ্যায় লিখিয়াছেন, 'সাহ আলমের সহিত মীরণের যে যুদ্ধ হয় তাহাতে রাজবল্লভের কোন সংস্রব নাই।"

রাজবল্লভের জীবনীপ্রণেতা ৺চন্দ্রকুমার রায় তৎপ্রণীত পুস্তকে এই যুদ্ধে রাজবল্লভ লিপ্ত থাকা ও সম্রাট্‌হইতে সলরজঙ্গ উপাধি পাওয়ার কথা লিখিয়াছেন

পরদিন সম্রাট্ সসৈন্যে গয়ামনপুরায় প্রস্থান করিলেন এবং তথায় কতিপয় দিবস বিশ্রাম করিয়া পুনরায় সেনাদলসহ অগ্রসর হইতে লাগিলেন। ক্রমে সকলে আজিমাবাদের প্রান্তভাগে উপস্থিত হইলে, রামনারায়ণ নগরমধ্যে এবং মেজর কর্ণাক বাঁকিপুরে প্রবেশ করিলেন। সম্রাট্ ও রাজবল্লভ নগরে প্রবেশ না করিয়া যথাক্রমে মতিপুর সরোবরের তটে ও জাফর খাঁর উদ্যানে শিবির সন্নিবেশ করিয়া অবস্থান করিতে

বলিয়া কৈলাস বাবু আবার সেই স্থলেই লিখিয়াছেন, "এরূপ নির্লজ্জ গ্রন্থকার কুত্রাপি দেখি নাই।"

ফলে, সায়র মোতাক্ষরীণেও রিয়াজু সেলাতিন হইতে প্রমাণ উদ্ধৃত করিয়া পূর্ব্বে প্রদর্শন করা গিয়াছে যে, রাজবল্লভ এই সমস্ত যুদ্ধে ঘনিষ্ঠভাবেই লিপ্ত ছিলেন। এই সমস্ত প্রমাণ সত্ত্বেও যিনি কৈলাস বাবুর ন্যায় বলিতে সাহস করেন যে, রাজবল্লভ ঐ সমস্ত যুদ্ধে লিপ্ত ছিলেন না, তাঁহার মুখে অন্যকে নির্লজ্জ বলা কদাচ শোভা পায় না। কৈলাস বাবু স্বয়ংই নির্লজ্জ কিনা তাহা তিনি নিজেই বিবেচনা করিয়া দেখিবেন।

সাহ আলমের প্রদত্ত তরবারি স্বচক্ষে দেখিয়াছেন, এমন অনেক প্রাচীন ব্যক্তি অদ্যাপি বিদ্যমান আছেন। মহারাজের উত্তরপুরুষ, অশীতিপর বৃদ্ধ শ্রীযুক্ত শশিভূষণ সেন মহোদয় বলেন, তিনি বহুবার ঐ তরবারির পাদদেশে পারস্য ভাষায় "আলিগহর" নামটি খোদিত অবস্থায় দেখিয়াছেন। ৺ জানকীনাথ সেন মজুমদারও এই বৃত্তান্ত বহুবার বলিয়াছেন। বিগত ১৩১৪ সনের আশ্বিন মাসে তরবারিসংক্রান্ত তথ্য সংগ্রহের উদ্দেশ্যে রাজবল্লভের উত্তরপুরুষগণের বর্ত্তমান আবাসস্থল পালঙ্গ গ্রামে গিয়াছিলাম। তথায় গিয়া জানিতে পারি যে, মহারাজবংশের জনৈক বধূরাণী সূর্য্যমণির গৃহে সেই তরবারি বিদ্যমান রহিয়াছে। তদনুসারে পূর্ব্বোক্ত মহিলার আলয়ে উপস্থিত হইলে তিনি আমাকে সাহআলমের প্রদত্ত বলিয়া একখানা তরবারি প্রদর্শন করেন। দেখা গেল যে, তরবারির এক ঊর্দ্ধভাগ ভগ্ন হইয়া গিয়াছে এবং পাদদেশ জঙ্কারে এরূপ পরিপূর্ণ হইয়াছে যে, তথায় কোন অক্ষর খোদিত ছিল কিনা বুঝা যায় না।

লাগিলেন। এই সময় সংবাদ আসিল যে, মীরজাফরকে সিংহাসন-চ্যুত করিয়া মীরকাশেম যে ইতিপূর্ব্বে বাঙ্গলার মসনদে আরোহণ করিয়াছেন, তিনি সসৈন্যে পাটনা অভিমুখে আসিতেছেন। (১)

জপসা-নিবাসী বৃদ্ধ আনন্দকুমার রায় মহাশয় বলিয়াছেন, রাজবল্লভের সহিত জপসাগ্রামস্থ সুপ্রসিদ্ধ রামমোহন কোবারীর পারস্য ভাষায় অনেক চিঠিপত্র আদান প্রদান হইত; সেই সমস্ত চিঠিতে তিনি রাজবল্লভের "সলরজঙ্গ" উপাধি লিখিত থাকা দেখিয়াছেন। দৈববিড়ম্বনায় রামমোহন কোবারীর আবাসস্থল এখন কীর্ত্তিনাশার কুক্ষিগত এবং তাঁহার বংশধরগণ হৃতসর্ব্বস্ব ও দুরবস্থাপন্ন। সেই সমস্ত চিঠিপত্র যে কোথায় আছে তাহা অনেক অনুসন্ধান করিয়াও ঠিক করিতে পারি নাই।

(1) Sair, voll, I, page 406.

নবম অধ্যায়

প্রথম পরিচ্ছেদ

বিহারের শাসনকর্তৃত্বে

যে ভাবে মীরজাফর পদচ্যুত হইলেন এখন তাহাই বর্ণনা করা হইবে। মীরণের মৃত্যুসংবাদ মুরশিদাবাদে পৌছিলে মীরজাফর কিংকর্ত্তব্য বিমূঢ় হইয়া পড়িলেন। তৎকালে জামাতা মীরকাশেম রঙ্গপুরের ফৌজদারপদে নিযুক্ত ছিলেন। মীরজাফর এখন তাঁহাকে পূর্ণিয়ার শাসনকর্তৃত্ব প্রদান করিয়া মুরশিদাবাদে আনাইলেন। মীরণের প্ররোচনায় ইতিপূর্ব্বে মীরজাফরের সহিত মীরকাশেমের সদ্ভাবের অভাব ঘটিয়াছিল ; কিন্তু এখন মীরকাশেম ব্যতীত শ্রম-বিমুখ মীরজাফরের অন্য কোন অবলম্বনই রহিল না।

এই সময় কোনও কার্য্যোপলক্ষে কলিকাতা কৌন্সিলে মীরজাফরের জনৈক বিশ্বস্ত লোক পাঠাইবার আবশ্যকতা হইয়া উঠিল। মীরজাফর মীরকাশেমকেই সেই উদ্দেশ্যে কলিকাতায় পাঠাইয়া দিলেন। মীরকাশেম নবাবের অভিপ্রেত সমস্ত কার্য্য সুচারুরূপে সম্পন্ন করিয়া, ভান্সিটার্ট প্রমুখ কৌন্সিলের সমস্ত সদস্যগণের সহিতই আলাপ পরিচয় করিয়া লইলেন। মীরজাফরও জামাতার যোগ্যতার সন্তুষ্ট হইয়া রাজকীয় প্রায় সমস্ত কার্য্যভারই তৎপ্রতি অর্পণ করিলেন। (১)

Sair, vol. II, pages 374 to 375.

কিয়ৎকাল অতীত হইলে, মীরকাশেম রাজকীয় কার্য্যের ভাণ করিয়া পুনরায় কলিকাতায় আসিয়া উপস্থিত হইলেন এবং কৌন্সিলের সমস্ত সদস্যের নিকট মীরজাফরের অযোগ্যতার কথা বলিলেন। ভান্সিটার্ট সাহেব মীরকাশেমের সহিত আলাপ করিয়া বুঝিতে পারিলেন যে, শাসনভার মীরকাশেমের হস্তে অর্পিত হইলে রাজকীয় সমস্ত কার্য্য সুচারুরূপে চলিবে। সুতরাং তিনি মীরকাশেমের নিকট প্রস্তাব করিলেন যে, তিনি মীরজাফরকে উপযুক্ত বৃত্তি প্রদান করিতে ও তৎপ্রতি প্রভুজনোচিত সম্মান প্রদর্শন করিতে সম্মত হইলে তাঁহাকে সহকারী নবাবের পদ প্রদান করা যাইতে পারে। মীরকাশেম সেই প্রস্তাবের অনুমোদন করিলে উভয়ের মধ্যে স্থির হইল যে, পূর্ব্বোক্ত সংকল্প কার্য্যে পরিণত করিবার উদ্দেশ্যে স্বয়ং ভান্সিটার্ট সাহেবই মুরশিদাবাদে আগমন করিবেন। (১)

কলিকাতায় যাইবার প্রাক্কালে আলি ইব্রাহিম খাঁ নামক জনৈক বন্ধুকে মীরকাশেম মুরশিদাবাদে রাখিয়া গিয়াছিলেন। মীরকাশেম কলিকাতায় প্রস্থান করিলেই, সেই সুহৃদ্‌বর পূর্ব্বসংকেতমতে নগরের প্রধান প্রধান ব্যক্তিগণকে মীরকাশেমের পক্ষাবলম্বী করিবার নিমিত্ত চেষ্টা করিতে লাগিলেন। আলি ইব্রাহিম অযোগ্য লোক ছিলেন না; সুতরাং তাঁহার চেষ্টার ফলে ক্রমে অনেকেই মিরকাশেমের পক্ষাবলম্বী হইয়া দাঁড়াইলেন। (২)

ইংরেজদিগের সহিত সমস্ত বন্দোবস্ত ঠিক করিয়া মীরকাশেম কলিকাতাহইতে মুরশিদাবাদে আসিতে লাগিলেন। ইতিপূর্ব্বে আলি ইব্রাহিম খাঁ বন্ধুর নির্দ্দেশমতে বহুসংখ্যক লোকজন লইয়া তাঁহার

(1) Sair, vol. II, page 379.

(2) Sair, vol. II, page 376.

প্রত্যুদ্‌গমন করিবার উদ্দেশ্যে পলাসীপ্রাঙ্গণে উপস্থিত ছিলেন। মীর-কাশেম এখন পলাসীহইতে সেই সমস্ত লোকজনের সহিত বিশেষ আড়ম্বরসহকারে মুরশিদাবাদে প্রবেশ করিলেন।

মীরকাশেম কলিকাতা পরিত্যাগ করিলেই ভান্সিটার্ট ও হেষ্টিংস বহুসংখ্যক ইংরেজসেনা লইয়া তাঁহার পশ্চাদ্বর্ত্তী হইলেন। তাঁহারা উভয়ে মুরশিদাবাদের অপর তীরে আসিয়া শিবিরসন্নিবেশ করিলে, মীরজাফর তাঁহাদের সহিত সাক্ষাৎ করিবার জন্য তথায় নৌকাপথে গমন করিলেন। ইতিপূর্ব্বে মীরকাশেম যে সমস্ত ষড়্‌যন্ত্র করিয়া আসিয়াছিলেন, তাহার অণুমাত্রও নবাব অবগত ছিলেন না। ভান্সিটার্ট সাহেবের সহিত সাক্ষাৎ হইলেই তিনি মীরজাফরকে সমস্ত কথা খুলিয়া বলিলেন। মীর-জাফর প্রস্তাবিত বিষয়ে সম্মতি না দিয়া শীঘ্র শীঘ্র নৌকারোহণে মুরশিদাবাদে প্রত্যাবর্ত্তন করিতে লাগিলেন। কিয়ৎদূর অগ্রসর হইয়াই তিনি মীরকাশেমকে দ্বিতীয় এক নৌকায় ইংরেজ শিবিরের দিকে যাইতে দেখিতে পাইলেন। নবাব বুঝিতে পারিলেন, মীরকাশেমের সহিত ইংরেজদিগের সাক্ষাৎ হইলেই তাঁহারা সকলে একযোগে তাঁহার অনিষ্টা-চরণে প্রবৃত্ত হইবেন। সুতরাং তিনি মীরকাশেমকে প্রত্যাবর্ত্তন করিবার নিমিত্ত সঙ্কেত করিলেন। চতুর চূড়ামণি মীরকাশেম তাহা দেখিতে না পাওয়ার ভাণ করিয়া ইংরেজশিবিরের দিকে চলিতে লাগিলেন।

পরদিন প্রাতে ভান্সিটার্ট সাহেব ইংরেজ সেনাসহ ভাগীরথী উত্তীর্ণ হইয়া রাজপ্রাসাদের বহিঃপ্রাঙ্গণে উপস্থিত হইলেন। অতঃপর মীর-কাশেমও আসিয়া তথায় তাঁহাদের সহিত যোগদান করিলেন। নবাব তৎকালে আত্মরক্ষার্থ সেনাসমাবেশ করিয়া অন্তঃপুরে অবস্থান করিতে-ছিলেন। বহিঃপ্রাঙ্গণ হইতে ভান্সিটার্ট সাহেব নবাবকে পুনঃপুন লিখিয়া পাঠাইলেন যে, মীরকাশেমকে প্রতিনিধি শাসন-কর্ত্তৃপদে নিযুক্ত করিলে

তাঁহার ইষ্ট ভিন্ন অনিষ্ট হওয়ার সম্ভাবনা নাই। কিন্তু নবাব ভান্সিটার্টের প্রস্তাবে কোন ক্রমেই সম্মত হইলেন না। অগত্যা ইংরেজ সেনা অন্তঃপুরের দ্বারদেশে আসিয়া কামান দাগিবার উদ্যোগ করিল এবং নবাব সেনা তাহা দেখিতে পাইয়াই ভয়ে পলায়মান হইল। এখন ভান্সিটার্ট সাহেব মীরকাশেমকে সিংহাসনে আরোহণ করাইয়া, তাঁহাকে নবাব বলিয়া সংবর্দ্ধনা করিলেন ও অন্তঃপুরের প্রত্যেক দ্বারে তেলেঙ্গাসেনাসমাবেশ করিয়া অন্তঃপুর রক্ষা করিতে লাগিলেন। মুরশিদাবাদ অথবা কলিকাতা এই উভয়ের কোন্‌স্থলে অবস্থান করা অভিপ্রেত ইহা ভান্সিটার্ট সাহেব জানিতে চাহিলে, মীরজাফর কলিকাতায় অবস্থান করিবেন বলিয়াই মত প্রকাশ করিলেন। অনতিবিলম্বে মীরজাফরকে কলিকাতা লইয়া যাওয়ার নিমিত্ত বহুসংখ্যক নৌকার বন্দোবস্ত করা হইল। মণিবেগম নামক প্রিয়তমা নর্ত্তকী ও রাজকোষের সমস্ত মণিমুক্তা লইয়া মীরজাফর সেই সমস্ত নৌকায় কলিকাতা অভিমুখে প্রস্থান করিলেন।

১৭৬০ খৃষ্টাব্দের ৪ঠা মার্চ্চ তারিখে মীরকাশেম নবাবীপদে অভিষিক্ত হইয়া অপ্রতিহতগতিতে শাসনদণ্ড পরিচালনা করিতে লাগিলেন। প্রথমতঃ তিনি বীরভূমের রাজাকে নির্দ্দিষ্ট রাজস্ব অপেক্ষা অধিক অর্থ প্রদান করিবার জন্য আদেশ দিয়া পাঠাইলেন। রাজা সেই অন্যায় আদেশ প্রতিপালন করিতে অসম্মত হইলে, মীরকাশেম সসৈন্যে বীরভূমে গিয়া তাঁহাকে যুদ্ধে পরাভূত করিলেন। এই সময় বীরভূমের নিকটবর্ত্তী বোদগাঁনামক স্থানে মীরকাশেমের শিবির সন্নিবিষ্ট ছিল। মীরকাশেম এস্থলে অবস্থানকালেই শুনিতে পাইলেন যে, রাজবল্লভ রামনারায়ণ ও মেজর কর্ণাক সম্রাটের সহিত আজিমাবাদের প্রান্তভাগে উপনীত হইয়া প্রীতিবন্ধন সুদৃঢ় করিতেছেন। কিয়ৎকাল পূর্ব্বে সম্রাটের সহিত রাজবল্লভ ও রামনারায়ণপ্রভৃতির সংগ্রামক্ষেত্র ভিন্ন অন্যত্র সাক্ষাৎ হয় নাই।

সুতরাং এত শীঘ্র যে তাঁহাদের মধ্যে সৌহার্দ্দ সংস্থাপিত হইয়াছে, তাহা দেখিতে পাইয়া সন্দিগ্ধচিত্ত মীরকাশেমের মনে ঘোরতর সন্দেহের ছায়া নিপতিত হইল। এখন তিনি আর কালবিলম্ব না করিয়া শিবিরভঙ্গ পূর্ব্বক সসৈন্যে পাটনা অভিমুখে যাত্রা করিলেন। (১)

পাটনায় আসিয়া মীরকাশেম নগরের পূর্ব্বপ্রান্তে জাফর খাঁর উদ্যানের সন্নিকটে শিবিরসন্নিবেশ করিয়া অবস্থান করিতে লাগিলেন। মীরকাশেম সিংহাসনে আরোহণ করা অবধি এ পর্য্যন্ত তাঁহার সহিত রাজবল্লভ ও রামনারায়ণের সাক্ষাৎলাভ ঘটিয়া উঠে নাই। তিনি পাটনায় পদার্পণ করিলেই, রাজবল্লভ ও রামনারায়ণ তাঁহাকে নবাব বলিয়া সংবর্দ্ধনা করিলেন। অতঃপর রামনারায়ণ নগরে প্রবেশ করিলেন, কিন্তু রাজবল্লভ স্বীয় সেনাদল লইয়া নবাবসেনার সহিত যোগদানপূর্ব্বক মীরকাশেমের পার্শ্বে অবস্থান করিতে লাগিলেন। (২)

মেজর কর্ণাক প্রমুখ ইংরেজসেনানীগণ এখন মীরকাশেমকে সম্রাটের সহিত পরিচিত করিবার জন্য আগ্রহ প্রকাশ করিলেন। কিন্তু মীরকাশেম অভিমানভরে অথবা সন্দেহের বশবর্ত্তী হইয়া সম্রাট্‌শিবিরে যাইতে

---

(1) Sair, vol. II Page 395 to 406.
(2) Sair, vol II. Page 407.

✓ জানকী নাথ সেন মহাশয় বলিয়াছেন, রাজবল্লভ এরূপে স্বীয় সেনাদল সহ মীরকাশেমের সহিত যোগদান করিয়া সম্পূর্ণরূপে তাঁহার করায়ত্ত হইলে, রামনারায়ণ রাজবল্লভকে "কমবক্ত বাঙ্গালী" বলিয়া গালী দিয়াছিলেন। কিন্তু সায়র মোতাক্ষরীণে লিখিত আছে, মির্জ্জা সেমন উদ্দিন নামে মীরকাশেমের জনৈক বন্ধু মীরণ-সেনাগণকে বশীভূত করিবার উদ্দেশ্যে ইতিপূর্ব্বে পাটনায় প্রেরিত হইয়াছিলেন (Sair, vol. II, Page 390.) বোধ হয় এই সুহৃদ্‌বরের প্ররোচনায়ই রাজবল্লভ সহজে মীরকাশেমের বশ্যতা স্বীকার করিয়াছিলেন।

অসম্মত হইলেন। অবশেষে স্থির হইল যে, ইংরেজদিগের কুঠীতেই সম্রাটের সহিত মীরকাশেমের সাক্ষাৎ হইবে। অতঃপর সম্রাটের শুভাগমন উপলক্ষে ইংরেজদিগের বাণিজ্য-কুঠী দরবারগৃহের উপযুক্ত সাজসজ্জায় পরিশোভিত করা হইল। সিংহাসনের অভাবে আহারের নিমিত্ত ইংরেজরা যে টেবিল ব্যবহার করেন, তাহার দুইখানি একত্রিত করিয়া সম্রাটের বসিবার আসন করা হইল। যে গৃহে দরবার হইবে তাহা অতি সুচারুরূপে সুসজ্জিত করিতে অণুমাত্রও ত্রুটি করা হইল না। নির্দ্দিষ্ট সময়ে সম্রাট্ দরবারগৃহে প্রবেশ করিয়া পূর্ব্বোক্ত আসনে উপবেশন করিলে, ইংরেজরা শ্রেণীবদ্ধভাবে আসনের উভয় পার্শ্বে দণ্ডায়মান হইলেন এবং মেজর কর্ণাক সম্মুখে আসিয়া রীতিমতে সম্রাটের অভিবাদন করিলেন। প্রায় একঘণ্টা পর মীরকাশেম তথায় উপস্থিত হইয়া কুর্ণিশ করিতে করিতে সম্রাটের সমীপস্থ হইলেন এবং বশ্যতার চিহ্নস্বরূপ তাঁহার সমক্ষে এক সহস্র এক আশ্রফি সংস্থাপন করিলেন। সম্রাট্ও প্রচলিত নিয়মানুসারে মীরকাশেমকে খিলাত প্রদান করিলে স্থির হইল যে, মীরকাশেম রাজস্বস্বরূপ বার্ষিক ২৪ লক্ষ টাকা সম্রাট্কে প্রদান করিবেন। (১)

ভান্সিটার্ট সাহেব প্রেসিডেণ্টের পদ লাভ করিলে, কলিকাতা কৌন্সিলের সদস্যগণ দুই দলে বিভক্ত হইয়াছিলেন, যে দল প্রেসিডেণ্টের বিরুদ্ধবাদী ছিল, আমিয়েট সাহেবই সেই দলের নেতৃত্ব করিতেন। অধিকাংশ সদস্য ভান্সিটার্টের পক্ষাবলম্বী ছিলেন বলিয়া, তাঁহার দলই প্রবল হইয়া দাঁড়াইয়াছিল। মীরকাশেমকে নবাবীপদে নিয়োগ করা বিষয়ে ভান্সিটার্ট সাহেবই অগ্রণী ছিলেন। সুতরাং আমিয়েট সাহেব ও তাঁহার দলস্থ লোকেরা মীরকাশেমের শত্রু হইয়া উঠিলেন।

(1) Sair, vol. 11, Page 408.

রামনারায়ণ প্রকাশ্যে মীরকাশের বশ্যতা স্বীকার করিলেও, গোপনে আমিয়েট সাহেবের সহিত যোগদান করিয়া তাঁহার অনিষ্টসাধনে প্রবৃত্ত হইলেন। ক্লাইব স্বদেশে গমন করিলে কুট সাহেব ইংরেজ সেনার অধিনায়কত্ব লাভ করেন। কুট সাহেব এই পদে নিযুক্ত হইয়া আজিমাবাদে আসিলেই রামনারায়ণ কৌশলে তাঁহার সহিত সখ্যতাসংস্থাপন করিলেন। অতঃপর একদিন তিনি কুট সাহেবকে বলিয়া পাঠাইলেন, নবাব ইংরেজ সেনার উপর অতর্কিতভাবে আপতিত হইবার উদ্দেশ্যে আয়োজন উদ্যোগ করিতেছেন। কুট সাহেব অত্যন্ত সরল লোক ছিলেন, তিনি রামনারায়ণের ধূর্ত্ততা বুঝিতে অক্ষম হইয়া, পরদিন প্রভাত হইবার পূর্ব্বেই কতিপয় অশ্বারোহীসহ মীরকাশেমের শিবিরের সন্নিধানে উপস্থিত হইলেন। কুট সাহেব মনে করিয়াছিলেন, তিনি নবাবকে যুদ্ধোদ্যমে ব্যাপৃত অবস্থায় দেখিতে পাইবেন। কিন্তু তিনি আসিয়া দেখিতে পাইলেন যে, নবাব নিদ্রাগত রহিয়াছেন এবং তাঁহার শিবিরে যুদ্ধোদ্যমের চিহ্ন পর্য্যন্ত বিদ্যমান নাই। তখন ইংরেজসেনানী সাতিশয় লজ্জিত হইলেন এবং নবাব জাগরিত হইবামাত্র এইরূপ অভদ্রতার নিমিত্ত তাঁহার নিকট ক্ষমা প্রার্থনার উদ্দেশ্যে জনৈক সেনানীকে রাখিয়া তথা হইতে প্রস্থান করিলেন। অতঃপর নবাব গাত্রোত্থান করিলেই কুট সাহেবের নিযুক্ত লোক তাঁহার সমীপে আসিয়া বলিল, "জাঁহাপনার সহিত সাক্ষাৎ করিবার উদ্দেশ্যে কুট সাহেব এস্থলে আসিয়াছিলেন, কিন্তু আপনি নিদ্রামগ্ন আছেন জানিতে পারিয়া তিনি প্রত্যাবর্ত্তন করিয়াছেন।" মীরকাশেম সমস্ত বৃত্তান্ত শুনিয়া অত্যন্ত বিরক্ত হইলেন এবং কুট সাহেব যে সমস্ত অভদ্রোচিত আচরণ করিয়াছেন, তাহা কলিকাতা কৌন্সিলে লিখিয়া পাঠাইলেন। কৌন্সিলের সদস্যগণ এজন্য কুট সাহেবকে বিশেষরূপে

তিরস্কার করিলে, তিনি অত্যন্ত অপমানিত বোধ করিয়া কার্য্য পরিত্যাগ পূর্ব্বক স্বদেশে প্রস্থান করিলেন। [১]

মীরকাশেম পূর্ব্ব হইতে রামনারায়ণের উপর খড়্গহস্ত ছিলেন, কিন্তু কলিকাতা কৌন্সিলের সদস্যগণ রামনারায়ণের পৃষ্ঠপোষক ছিলেন বলিয়া তিনি ভয়ে এ পর্য্যন্ত রামনারায়ণের কোনরূপ অনিষ্ট সাধন করিতে অগ্রসর হন নাই। কুটসাহেবসংক্রান্ত ঘটনায় রামনারায়ণের সমস্ত চক্রান্ত প্রকাশ হইয়া পড়িলে কৌন্সিলের সমস্ত সদস্যই রামনারায়ণের পক্ষ পরিত্যাগ করিলেন এবং রামনারায়ণকে উপযুক্ত প্রতিফল দিবার নিমিত্তও নবাবকে অনুরোধ করিয়া পাঠাইলেন। নবাব এই সুযোগে রামনারায়ণকে দরবারে আনাইয়া তাঁহার নিকট নিকাশ তলব করিলেন এবং নিকাশ না দেওয়া বলিয়া তাঁহাকে কারারুদ্ধ করিয়া রাখিলেন। আজিমাবাদে রামনারায়ণের বিশেষ প্রতিপত্তি ছিল। নবাব মনে করিলেন এস্থলে রামনারায়ণকে রাখিলে ভবিষ্যতে গোলযোগ হইবার সম্ভাবনা আছে, সুতরাং তিনি আর কালবিলম্ব না করিয়া রামনারায়ণকে মুরশিদাবাদের কারাগারে পাঠাইয়া দিলেন। [২]

এই সময় অর্থাৎ ১৭৬০ খৃষ্টাব্দের শেষভাগে মীরকাশেম রাজবল্লভকে বিহারের শাসন-কর্ত্তৃপদে নিয়োগ করিলে, তিনি বিহারের শাসনদণ্ড পরিচালনা করিতে লাগিলেন। [৩]

---

(1) Sair, vol. II, pages 415 to 416.

(2) Sair, vol. II, pages 417 to 419.

(3) Sair, vol II, page 425.

শ্রীযুক্ত কৈলাসচন্দ্র সিংহ ষষ্ঠ সংখ্যক নব্যভারতের ৫০০ পৃষ্ঠায় লিখিয়াছেন, "রামনারায়ণ এই সময় পাটনার গবর্ণর ছিলেন, তৎপর সীতাব রায় ঐ পদ প্রাপ্ত হন।"

ভাগলপুরের ফৌজদার আতা কুলী খাঁর পুত্র কেলর আলি খাঁ ও হায়দর আলি খাঁ, নবাবের মাতুল-ভ্রাতা মীর আব্দুল হাসন খাঁর সহিত একযোগ হইয়া গোরকপুরের রাজার বিরুদ্ধে অভিযান করিয়াছিলেন। গোরকপুরের রাজার সহিত এই সময় যে যুদ্ধ হয়, তাহাতে আব্দুল হাসন খাঁ নিহত হন। মীরকাশেম তাহাতে মনে করিতেছিলেন, ফৌজদার পুত্র-যুগলের অনবধানতার ফলেই এইরূপ দুর্ঘটনা সংঘটিত হইয়াছে। অতঃপর কুট সাহেব মোসেল সাহেবের বিরুদ্ধে অভিযান করিবার সংকল্প করিয়া ভাগলপুরে উপস্থিত হইলে, পূর্ব্বোক্ত ভ্রাতৃযুগল তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিলেন। তাঁহারা কু অভিপ্রায়ে কুট সাহেবের সহিত ঘনিষ্ঠতা করিতেছেন সন্দেহ করিয়া, নবাব এখন তাঁহাদের উপর অত্যন্ত অসন্তুষ্ট হইলেন। অবিলম্বে কেলর আলি খাঁ ও হায়দর আলি খাঁকে ধৃত করিবার জন্য নবাব দরবার হইতে পাটনার শাসনকর্ত্তা রাজবল্লভের প্রতি আদেশ প্রচারিত হইল। ভ্রাতৃদ্বয় নবাবের আদেশ শ্রবণমাত্রেই পলায়ন করিলেন এবং রাজবল্লভের নিযুক্ত চরেরা তাহাদের অনুসন্ধানে নগর প্রদক্ষিণ করিতে লাগিল। এই সময়, একদা সায়র মোতাক্ষরীণ-প্রণেতা গোলাম হোসেন সাহেব রাজপথ দিয়া কোথাও গমন করিতেছিলেন; রাজবল্লভের চরেরা তাঁহাকেই পূর্ব্বোক্ত ভ্রাতৃ-যুগলের অন্যতম মনে করিয়া, তৎক্ষণাৎ ধৃত করিল ও তাঁহাকে লইয়া রাজবল্লভের দরবারে উপস্থিত হইল। এ স্থলে আসিয়া তিনি আত্ম পরিচয় দিলেই রাজবল্লভ তাঁহাকে চিনিতে পারিয়া অত্যন্ত লজ্জিত

উদ্ধৃত উক্তির সহিত কৈলাসবাবুর পূর্ব্ব ও পরবর্ত্তী উক্তি মিলাইয়া দেখিলে বিদিত হইবে যে, কৈলাসবাবুর মতে রাজবল্লভ কখনও বিহারের শাসনকর্ত্তৃপদে নিযুক্ত ছিলেন না। এখন জিজ্ঞাস্য এই যে, কৈলাসবাবুর উপর নির্ভর করিয়া সায়র মোতাক্ষরীণের ন্যায় প্রামাণিক ইতিহাসকেও অবিশ্বাস করিতে হইবে কি?

হইলেন এবং প্রভূত শিষ্টাচারের সহিত ক্ষমা প্রার্থনা করিয়া তাঁহাকে সসম্মানে বিদায় প্রদান করিলেন। (১)

১৭৬৩ খৃষ্টাব্দের প্রথমভাগ পর্য্যন্ত রাজবল্লভ এই পদে নিযুক্ত রহিলেন। বোধ হয় এই সময়েই, গয়াক্ষেত্রস্থিত বিষ্ণুপাদপদ্মে প্রত্যহ তুলসী অর্পণ করার নিমিত্ত তিনি জনৈক পাণ্ডাকে বিক্রমপুরের অন্তর্গত 'মাছুয়া মান্দ্রা' নামক তালুক উৎসর্গ করেন। পাণ্ডা প্রবরের উত্তরপুরুষ ব্রজলাল কুঠী অদ্যাপি সেই তালুক উপভোগ করিতেছেন। বর্ত্তমান সময়ে এই তালুকের আয় প্রায় এক সহস্র টাকা হইবে। উৎসর্গের সময় তালুকের অন্তর্গত প্রজাগণ যে কর প্রদান করিত, উৎসর্গগ্রহীতা ও তাঁহার উত্তর পুরুষগণের অনবধানতানিবন্ধন অদ্যাপি সেই করের পরিবর্ত্তন হয় নাই। পার্শ্ববর্ত্তী নিরিখে জমা ধার্য্য হইলে তালুকের আয় চতুর্গুণ বৃদ্ধি হইতে পারে।

প্রাচীন মগধের আধুনিক নাম বিহার। মহাভারতের সময় সুপ্রসিদ্ধ জরাসন্ধ এ স্থলের শাসনদণ্ড পরিচালনা করিয়া গিয়াছেন। রাজবল্লভ যে বিহারের শাসনকর্ত্তৃত্বে নিযুক্ত হইয়াছিলেন তাহা আলোচনা করিলে, নবদ্বীপাধিপতি কৃষ্ণচন্দ্র রায়ের হস্তচালনায় প্রাপ্ত শ্লোকটির কথা স্বতই আসিয়া মনে উদিত হয়। অতএব পুনরুক্তি দোষ সত্ত্বেও নিম্নে সেই শ্লোক উদ্ধৃত করা গেল :—

কিংবা পৃচ্ছসি রে মূঢ় বারংবারং পুনঃপুনঃ।
পূর্ব্বং রাজা জরাসন্ধ ইদানীং রাজবল্লভঃ॥

---

(1) Sair. vol. II pages 426 and 427.

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

কারাবাসে

সিংহাসনে আরোহণ করিয়াই মীরকাশেম দেখিতে পাইলেন, রাজকোষ শূন্য হইয়া পড়িয়াছে এবং বহুকাল যাবৎ যে সমস্ত মণিমুক্তাদি নেজামতে সঞ্চিত হইতেছিল, তাহা সমস্তই মীরজাফর কলিকাতা যাত্রাকালে আত্মসাৎ করিয়াছেন। এ দিকে রাজকীয় সেনাগণের বেতন বাবদ অনেক টাকা পাওনা হইয়াছে, আর পলাশীর যুদ্ধের প্রাক্কালে মীরজাফর ইংরেজ কোম্পানীকে যে টাকা দিতে প্রতিশ্রুত হইয়াছিলেন, তাহার অধিকাংশই এ পর্য্যন্ত পরিশোধ করা হয় নাই।(১)

এখন তিনি আলি ইব্রাহিম খাঁর সহায়তায় সেনাগণের প্রাপ্যের প্রকৃত পরিমাণ নির্দ্ধারণ করিলেন; কিন্তু সমগ্র পাওনা একেবারে পরিশোধ করিতে পারেন, মীরকাশেমের এরূপ অর্থসংস্থান ছিল না। অগত্যা এরূপ স্থির হইল যে, তিন তুল্য কিস্তিতে সেনাগণের সমস্ত পাওনা পরিশোধ করা হইবে। অর্থের অসংস্থাননিবন্ধন জগৎশেঠের নিকট হইতে ধার করিয়া প্রথম কিস্তির টাকা পরিশোধ করিবেন ও ভবিষ্যতে প্রত্যেক মাসের প্রাপ্য বেতন সেই মাসে অতীত হইলেই দেওয়া হইবে। পূর্ব্বোক্ত সুবন্দোবস্তের ফলে, সেনাবিভাগে ইতিপূর্ব্বে যে অসন্তোষ-বহ্নি প্রজ্বলিত হইতেছিল তাহা সম্পূর্ণরূপে নির্ব্বাপিত হইয়া গেল। (২)

---

(1) Sair, vol. II pages 390 and 391.
(2) Sair, vol. II, page 253

মীরজাফরের নিকট অঙ্গীকার-সূত্রে ইংরেজ কোম্পানীর অনেক টাকা পাওনা ছিল। মীর কাশেম তাহা পরিশোধ করার সংকল্প করিয়া, বর্দ্ধমান প্রদেশ এই নিয়মে ইংরেজ কোম্পানীর অধিকারে প্রদান করিলেন যে, ইংরেজ কোম্পানী সেই প্রদেশের রাজস্ব হইতে ক্রমে মীরজাফরের দেয় টাকা আদায় করিয়া লইবেন। সিংহাসনে আরোহণ করিতে পারিলে তিনি দুই লক্ষ টাকা কৌন্সিলের সদস্যগণকে পুরস্কারস্বরূপ প্রদান করিবেন বলিয়া অঙ্গীকার করিয়াছিলেন। সেই পরিমাণ টাকা দেওয়া যাইতে পারে. রাজকোষে এরূপ অর্থ ছিল না। মীরকাশেম অগত্যা স্বীয় মণিমুক্তাদি এই নিয়মে কোম্পানীর কর্ম্মচারিগণের নিকট আবদ্ধ রাখিলেন যে, অঙ্গীকৃত টাকা পরিশোধ হইলেই তাঁহারা ঐ সমস্ত মণিমুক্তাদি নবাবকে প্রত্যর্পণ করিবেন।

অতঃপর মীরকাশেম স্বকীয় ব্যয়সংক্ষেপবিষয়ে মনোভিনিবেশ করিলেন। পূর্ব্ব পূর্ব নবাবের আমল হইতে একমাত্র প্রমোদের উদ্দেশ্যেই রাজকীয় পশুশালায় ও চিড়িয়াখানায় যে সমস্ত অনাবশ্যক পশু ও পক্ষী সংগৃহীত হইতেছিল, তাহার অধিকাংশ এখন বিক্রীত হইয়া বিক্রয়লব্ধ অর্থ রাজকোষে সঞ্চিত হইল।

কিরূপে প্রচুর অর্থাগম হইতে পারে, মীরকাশেম কেবল তাহাই চিন্তা করিতে লাগিলেন। কোন্ কোন্ কর্ম্মচারী তহবিল তছরূপ করিয়া অর্থ সঞ্চয় করিতেছিলেন, তাহা মীরকাশেম সিংহাসনে আরোহণের পূর্ব্ব হইতেই অবগত ছিলেন। তিনি এখন সেই সমস্ত কর্ম্মচারিগণকে নিকাশের ছলে দরবারে আনাইয়া তাঁহাদের সঞ্চিত অর্থের অধিকাংশ আত্মসাৎ করিলেন। মীরজাফরের নবাবী আমলের যে সমস্ত খোজা ও পরিচারিকার হস্তে মীরজাফর ও মীরণের সংসারের ব্যয় নির্ব্বাহিত হইত, যে সমস্ত খোজা ও পরিচারিকার নিকট তাঁহাদের ধনরত্নাদি

গচ্ছিত ছিল এবং যে সমস্ত খোজা ও পরিচারিকা মীরজাফর ও মীরণের নিকট হইতে কোন উপঢৌকন প্রাপ্ত হইয়াছিল, মীরকাশেম এখন তাহাদিগকে কারারুদ্ধ করিয়া অর্থের জন্য পীড়াপীড়ি করিতে লাগিলেন। খোজা ও পরিচারিকাগণ মীরকাশেমের উৎপীড়ন সহ্য করিতে না পারিয়া অগত্যা সমস্ত সঞ্চিত ধনরত্নই মীরকাশেমকে প্রদান করিল। আলিবর্দ্দীর আমলে যে সমস্ত খোজা ও পরিচারিকা আলিবর্দ্দীর কিংবা তাঁহার ভ্রাতুষ্পুত্রগণের সংসারে চাকুরী করিত, মীরকাশেম তাহাদের উপরও অত্যাচার উৎপীড়ন করিয়া অর্থশোষণ করিতে কুণ্ঠিত হইলেন না। জগৎসিংহ নামে জনৈক হিন্দু জানকীরাম ও দুর্ল্লভরামের সহকারি পদে নিযুক্ত থাকিয়া প্রভূত অর্থ সঞ্চয় করিয়াছিলেন। বার্দ্ধক্যে পদার্পণ করিয়া তিনি রাজকার্য্য পরিত্যাগপূর্ব্বক নিভৃতে কালযাপন করিতেছিলেন। মীরকাশেমের অপরিমিত অর্থলালসা দর্শনে অত্যাচারের ভয়ে, জগৎসিংহ এখন তাঁহার সমস্ত সঞ্চিত অর্থের নির্ঘণ্ট নবাবদরবারে উপস্থাপিত করিলেন। মীরকাশেম অনুগ্রহপূর্ব্বক সেই অর্থের কিয়দংশ মাত্র জগৎসিংহকে প্রত্যর্পণ করিয়া অবশিষ্ট সমস্তই রাজকোষভুক্ত করিয়া লইলেন। অতঃপর নবাব গোলাম হোসেন খাঁ নামক জনৈক মুসলমানের ধনবত্তার কথা শুনিয়া তাঁহার প্রতি অত্যাচার করিতে লাগিলেন। গোলাম হোসেন সমস্ত সঞ্চিত অর্থ মীরকাশেমের শ্রীপাদ-পদ্মে অর্পণ করিয়া লাঞ্ছনার হস্ত হইতে অব্যাহতি লাভ করিলেন। অতঃপর নবাব জমিদারগণের রক্তশোষণে প্রবৃত্ত হইলেন। পূর্ব্ব হইতেই তিনি এই শ্রেণীর উপর অত্যন্ত বীতশ্রদ্ধ ছিলেন। নবাবীপদ লাভ করিয়াই মীরকাশেম ঘোষণা করিয়া দিলেন যে, প্রত্যেক জমিদারকেই দেয় রাজস্ব অপেক্ষা অনেক অধিক টাকা বর্ষে বর্ষে নবাব সরকারে প্রদান করিতে হইবে। বীরভূমের রাজা এই আদেশপ্রতিপালন না

করিয়া যেরূপ প্রতিফল পাইলেন তাহা পূর্ব্বেই উল্লেখ করা হইয়াছে। অন্যান্য জমিদারগণ ভয়ে আর দ্বিরুক্তি না করিয়া কায়ক্লেশে আদিষ্ট অর্থ প্রদানপূর্ব্বক নবাবের সহিত সদ্ভাব রক্ষা করিলেন। এই উপায়ে শূণ্য রাজকোষ অল্পদিন মধ্যেই ধনরত্নে পরিপূর্ণ হইয়া উঠিল এবং নবাবের উচ্চাকাঙ্ক্ষাও ঘৃতসিক্ত অনলশিখার ন্যায় ক্রমে বর্দ্ধমান হইতে চলিল।

যে ইংরেজদিগের সহায়তার ফলে শ্বশুর মীরজাফরকে পদচ্যুত করিয়া সিংহাসনে আরোহণ করিয়াছিলেন, নবাব এখন সেই ইংরেজ-দিগকেই এদেশ হইতে বিতাড়িত করিবার উপায় চিন্তা করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। বাঙ্গালা-প্রবাসী ইংরেজদিগের তৎকালে প্রভূত সেনাবল ছিল এবং তাঁহাদের সমস্ত সেনাই উৎকৃষ্ট পাশ্চাত্য প্রণালীতে সমর-কৌশল শিক্ষা করিয়া দুর্দ্ধর্ষ হইয়া উঠিয়াছিল। নবাবসরকারে এখন যে সমস্ত সেনা নিযুক্ত ছিল, তাহারা সকলেই দেশীয় প্রণালীতে সমর-কৌশল অভ্যাস করিয়াছিল। নবাব স্পষ্টই বুঝিতে পারিলেন, সুশিক্ষিত ইংরেজসেনার বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হইলে অশিক্ষিত দেশীয় সেনাগণ পরাভূত হইবে। সুতরাং তিনি সমস্ত রাজকীয় সেনাকেই পাশ্চাত্য প্রণালীতে রণকৌশল শিক্ষা দিবার নিমিত্ত উৎসুক হইয়া পড়িলেন। গর্গিণ খাঁ নামক জনৈক আরমাণী রাজকীয় গোলন্দাজ সেনার অধ্যক্ষপদে বরিত হইলেন। প্রতীভাশালী গর্গিণ খাঁ অনেক চেষ্টা করিয়া মুঙ্গেরে কামান ও বন্দুকনির্ম্মাণের এক কারখানা স্থাপন করিলেন। অচিরে সেই কারখানা হইতে তাৎকালিক ইউরোপীয় বন্দুক ও কামান অপেক্ষা উৎকৃষ্টতর কামান ও বন্দুক প্রস্তুত হইতে লাগিল। (১) গর্গিণ খাঁ ব্যতীত বহুসংখ্যক হিন্দুস্থানী এবং বিদেশীয় লোকও রাজকীয় সমরবিভাগের বিভিন্ন কার্য্যে নিযুক্ত হইয়া সেনা

(1) Sair, vol. II, page 421.

বিভাগের অনেক উন্নতিসাধন করিলেন। এই শোষোক্ত ব্যক্তিগণ মধ্যে মহম্মদ তকী খাঁর নামই সমধিক উল্লেখযোগ্য। তিনি নবাবের অনুমতিক্রমে বহুসংখ্যক দৃঢ়কায় ও সাহসী পুরুষকে সৈনিক পদে নিযুক্ত করিলেন ও প্রত্যহ কৃত্রিম যুদ্ধাভিনয় করিয়া তাহাদিগকে সমরকৌশল শিক্ষা দিতে লাগিলেন। অশ্বারোহী ও গোলন্দাজ সেনাগণ পাশ্চাত্য রীতি অনুসারে শিক্ষালাভ করিয়া সংগ্রাম-নৈপুণ্যে অভ্যস্ত হইয়া উঠিল। (১)

পূর্ব্বোক্তরূপে শক্তিসঞ্চয়পূর্ব্বক মীর কাশেম আপনাকে নিরাপদ মনে করিয়া ক্রমেই বিবিধ অত্যাচারে লিপ্ত হইতে লাগিলেন। বাঙ্গালার প্রধান প্রধান জমিদারগণ এখন নবাবদরবারে উপস্থিত হইবার নিমিত্ত রাজকীয় আদেশ প্রাপ্ত হইলেন। কঙ্কর খাঁ এই আদেশ প্রতিপালন না করিয়া নবাবের অত্যাচার হইতে সুদূরে অবস্থান করিবার উদ্দেশ্যে, সেনাসহ রামগড়ের পার্ব্বত্য প্রদেশে পলায়ন করিলেন। জমিদার বুনিয়াদ সিংহ ও ফতে সিংহ নবাবের আদেশ মান্য করিয়া দরবারে উপস্থিত হইলেই রাজকীয় আদেশে তাঁহারা কারারুদ্ধ হইলেন। পহ্লনসিংহ-প্রমুখ সাহাবাদের জমিদারগণ দলবদ্ধ হইয়া নবাবের অত্যাচার হইতে আত্মরক্ষা করিতে লাগিলেন। নবাব অবিলম্বে তাঁহাদের বিরুদ্ধে সেনা প্রেরণ করিলে তাঁহারা যুদ্ধে লিপ্ত না হইয়া অযোধ্যার দিকে প্রস্থান করিলেন। সমস্ত পলাতক জমিদারের অধিকারভুক্ত ভূসম্পত্তি নবাব অতঃপর বাজেয়াপ্ত করিয়া খাসদখলে আনিলেন।

মীরকাশেম স্বভাবতই সন্দিগ্ধচিত্ত ছিলেন। তিনি এখন রাজ্যের প্রধান প্রধান ব্যক্তিগণের পারিবারিক রহস্য সংগ্রহ করিবার উদ্দেশ্যে

(১) Sair, vol. II. page 432.

প্রচুর অর্থব্যয় করিয়া গুপ্তচর নিযুক্ত করিলেন। রাজা শুকলাল গুপ্তচর বিভাগের অধ্যক্ষ নিযুক্ত হইয়া প্রত্যেক ছোট বড় রাজকর্ম্মচারী ও জমিদারগণের গৃহচ্ছিদ্র অনুসন্ধান করিতে ব্যস্ত হইলেন। নান্নুমাল নামে জনৈক গুপ্তচর বিদ্বেষবশে অনেকের বিরুদ্ধে মিথ্যা সংবাদ প্রদান করিতেও কুণ্ঠা বোধ করিল না। এই শ্রেণীর অনেক গুপ্তচরের প্রদত্ত মিথ্যা সংবাদের উপর নির্ভর করিয়া রাজ্যমধ্যে বিবিধ অত্যাচার উৎপীড়ন চলিতে লাগিল। সোনানী সাহ সাদতুল্লা, রাজস্ব কর্ম্মচারী সীতারাম এবং অপর তিনজন লোক কেবলমাত্র সন্দিগ্ধ হইয়াই নবাবের আদেশে নিহত হইলেন। ফলে বাঙ্গালার অবস্থা এমন হইয়া দাঁড়াইল যে, লোকে এখন সামাজিকভাবে পরস্পর আলাপ পরিচয় করিতেও কুণ্ঠিত হইতে লাগিল। (১)

অতঃপর নবাব ইংরেজদিগের সম্মুখ হইতে সুদূরে অবস্থান করিবার অভিপ্রায়ে মুঙ্গেরে রাজধানী স্থানান্তর করিবার সংকল্প করিলেন। এই সময় রাজবল্লভ ও কৃষ্ণদাস নিশ্চিন্তমনে পাটনায় অবস্থান করিতেছিলেন। নবাব মুঙ্গেরে যাওয়ার সমস্ত আয়োজন করিয়া হঠাৎ রাজবল্লভকে পদচ্যুত করিলেন এবং তাঁহাকে ও কৃষ্ণদাসকে ধৃত করিয়া মুঙ্গেরে লইয়া চলিলেন। সকলে মুঙ্গেরে উপস্থিত হইলে, রাজবল্লভ ও কৃষ্ণদাস তত্রত্য সুরক্ষিত দুর্গে কারারুদ্ধ হইলেন এবং তাঁহাদের সমস্ত ধনরত্ন লুণ্ঠন করিবার উদ্দেশ্যে নবাব সেনানী আগা রেজা সসৈন্যে রাজনগর যাত্রা করিলেন। (২)

আগা রেজা ক্রমে আসিয়া পোড়াগাছা নামক স্থানে উপনীত হইলেন।

---

(1) Sair, vol II, pages 426 and 427.

(2) Sair vol. II page 431 and History of Backergunge by Beveridge, page 96.

রাজনগর হইতে এ স্থল প্রায় তিন ক্রোশ দূরে অবস্থিত ছিল এবং বর্ত্তমানে উহা কীর্ত্তিনাশার কুক্ষিগত হইয়াছে। আগা রেজা পোড়াগাছা আসিয়াই রাজনগরে একজন দূত প্রেরণ করিলেন। রাজবল্লভের বিষয় সম্পত্তি তৎকালে তদীয় তৃতীয় পুত্র গঙ্গাদাসের কর্ত্তৃত্বাধীন ছিল। দূত আসিয়া আগা রেজার নির্দ্দেশমতে গঙ্গাদাসকে বলিল, "নবাব কাশিম আলির নিয়োগমতে রাজবল্লভের সমস্ত সম্পত্তি হস্তগত করিবার অভিপ্রায়ে আগা রেজা এস্থলে আগমন করিয়াছেন। এই কার্য্যে কেহ প্রতিবন্ধকতাচরণ করিলে, রাজনগরের দুর্দ্দশার পরিসীমা থাকিবে না; পক্ষান্তরে কোনরূপ বিঘ্ন উপস্থিত না হইলে, আগা রেজা কোনরূপ অত্যাচার না করিয়া রাজবল্লভের সমস্ত বিভব হস্তগত করিয়াই রাজনগর পরিত্যাগ করিবেন।" তৎকালে রাজনগর রক্ষার উদ্দেশ্যে বহুসংখ্যক বেতনভোগী সেনা নিযুক্ত ছিল। তাহারা আগা রেজার আগমনবার্ত্তা শুনিয়াই সমরসজ্জা করিয়া আসিয়া রণক্ষেত্রে আগা রেজার সহিত বল পরীক্ষার জন্য গঙ্গাদাসের অনুমতি প্রার্থনা করিল। গঙ্গাদাস তৎকালে অল্পবয়স্ক ছিলেন, সুতরাং উপস্থিতক্ষেত্রে কি কর্ত্তব্য তাহা স্থির করিবার জন্য বর্ষীয়ান্ আত্মীয়গণের নিকট পরামর্শ জিজ্ঞাসা করিয়া পাঠাইলেন। প্রত্যেকেই বলিলেন, "রাজবল্লভ ও কৃষ্ণদাস এখন মুঙ্গেরের দুর্গে কারারুদ্ধ আছেন, অতএব আগা রেজার বিরুদ্ধাচরণ করিলেই নবাবের হস্তে তাঁহাদের লাঞ্ছনার পরিসীমা থাকিবে না।" গঙ্গাদাস এই কথা শুনিয়া স্বীয় সেনাগণকে আর আগারেজার বিরুদ্ধাচরণে লিপ্ত হইতে অনুমতি প্রদান করিলেন না। সেনাগণ অগত্যা দুঃখিতচিত্তে স্ব স্ব স্থানে প্রস্থান করিল এবং গঙ্গাদাস সেই দূতমুখে আগা রেজাকে বলিয়া পাঠাইলেন, "নবাবের আদেশ প্রতিপালন বিষয়ে কোনরূপ বাধা উপস্থিত হইবে না।"

রাজপরিবারস্থ মহিলাগণমধ্যে কৃষ্ণদাসের সহধর্ম্মিণী অতিশয় সুচতুরা এবং বুদ্ধিমতী ছিলেন। তিনি মনে করিলেন, সঞ্চিত সমস্ত অর্থই সহজে শত্রুর হস্তে সমর্পণ করা কদাচ সুসঙ্গত হইতে পারে না। অতঃপর তিনি শত্রুর আগমনের পূর্ব্বে অধিকাংশ মূল্যবান্ অথচ অল্পভারবিশিষ্ট মণিমুক্তাদি প্রাসাদের গোপনীয় স্থানে লুক্কায়িত করিয়া, শত্রুসেনার সন্দেহ উদ্রেক না হয় এই উদ্দেশ্যে, অবশিষ্ট সমস্ত সম্পত্তি প্রকাশ্যস্থানে রাখিয়া দিলেন। (১)

যথাসময়ে আগা রেজা সসৈন্যে রাজনগরে আসিয়া রাজবল্লভের প্রাসাদে প্রবেশ করিলেন। প্রাসাদের প্রকাশ্য স্থানে যে সমস্ত ধনরত্ন ছিল, তাহা অবিলম্বে তাঁহার হস্তগত হইলেও যে সমস্ত মণিমুক্তাদি গোপনীয় স্থানে রক্ষিত ছিল নবাবসেনা তাহার কোন সন্ধানই পাইল না। ইতিপূর্ব্বে আগা রেজা দূতমুখে বলিয়াছিলেন, "রাজবল্লভের ধনরত্ন হস্তগত করা উপলক্ষে কোনরূপ বাধা বিঘ্ন উপস্থিত না হইলে তিনি কোনরূপ অত্যাচার করিবেন না।" কিন্তু রাজভবন লুণ্ঠন করিয়াই তিনি সে সমস্ত কথা বিস্মৃত হইলেন। এখন নবাব সেনাগণ উচ্ছৃঙ্খল-ভাবে রাজনগরমধ্যে নানারূপ অত্যাচার উৎপীড়ন করিতে লাগিল।

---

(১) শ্রীযুক্ত বাবু আনন্দনাথ রায় "আগা রেজা" নামক প্রবন্ধে এইরূপ বলেন। কিন্তু প্রতাপ বাবুর নিকট যে হস্তলিখিত পুস্তক পাওয়া গিয়াছে তাহাতে লিখিত আছে, "রাজবল্লভ ও কৃষ্ণদাস মুঙ্গেরের দুর্গে কারারুদ্ধ হওয়ার প্রাক্কালে কৃষ্ণদাসের সহধর্ম্মিণী স্বামী ও শ্বশুরের সহিত পাটনায় অবস্থান করিতেছিলেন। রাজবল্লভ ও কৃষ্ণদাস কারারুদ্ধ হইলে পরও কিয়ৎকাল সেই মহিলা পাটনায়ই অবস্থান করেন এবং তৎকালে পুরুষবেশ ধারণ করিয়া প্রত্যহ মুঙ্গেরের কারাগারে গিয়া স্বামীর চরণ বন্দনা করিয়া আসিতেন। আগা রেজা রাজনগর লুণ্ঠন করিয়া প্রত্যাবৃত্ত হইলে তিনি দেবর গোপালকৃষ্ণের সমভিব্যাহারে রাজনগরে আগমন করেন।"

এই সময় রাজনগরের যেরূপ শোচনীয় অবস্থা হইল তাহা স্মরণ করিলেও হৃদ্‌কম্প উপস্থিত হয়। দুর্দ্দান্ত নবাবসেনাগণ উলঙ্গ কৃপাণ হস্তে প্রত্যেক গৃহস্থের আলয়ে প্রবেশ করিয়া গৃহস্থিত রমণীগণের গাত্রালঙ্কার বলপূর্ব্বক উন্মোচন করিতেও প্রবৃত্ত হইল এবং গুপ্তধনের সন্ধান জানিবার উদ্দেশ্যে যাহাকে সম্মুখে পাইল তাহাকেই উৎপীড়ন করিতে লাগিল। অধিকাংশ নগরবাসী নবাবসেনাগণের অত্যাচারের ভয়ে সমস্ত ধনরত্ন ও গৃহদ্বার ফেলিয়া পলায়ন করিল। আগা রেজা ও তাঁহার সেনাগণ প্রায় একমাস কাল রাজনগরে অবস্থান করিয়া এরূপ অত্যাচার স্রোত প্রবাহিত করিলেন যে, সেই অঞ্চলের প্রায় সমস্ত স্থানই জনমানবশূন্য হইয়া পড়িল। ফলতঃ আগারেজার অত্যাচারে রাজনগরে এই আতঙ্কের সঞ্চার হইল যে অদ্যাপি সেই অঞ্চলের অনেক জননী রোরুদ্যমান শিশুকে শান্ত করিবার নিমিত্ত "এই আগা রেজা আসিতেছে" বলিয়া ভয় প্রদর্শন করিয়া থাকেন এবং অতি দুরন্ত শিশুও আগা রেজার নাম শুনিয়াই ক্রন্দন পরিত্যাগ করিয়া শান্তিভাব অবলম্বন করে।

কাহারও মতে এই বিপ্লবের সময় সুপ্রসিদ্ধ কৃষ্ণদেব বিদ্যাবাগীশের ভবনে কোনওরূপ অত্যাচার হয় নাই। কি জন্য যে বিদ্যাবাগীশের ভাগ্য সুপ্রসন্ন হইয়াছিল, তাহার কারণ জনশ্রুতিতে নিম্নলিখিতরূপে প্রকটিত আছে :—

আগা রেজা রাজনগরে পদার্পণ করিয়াই কিয়ৎকাল পরে জ্বরে শয্যাগত হইয়া পড়িলেন। এই সময় একদিন বিদ্যাবাগীশ মহাশয় নবাবসেনানীর শিবিরের নিকট দিয়া কোনও স্থানে যাইতেছিলেন। আগা রেজা কৃষ্ণদেবের ব্রাহ্মণ পণ্ডিতোচিত বেশদর্শনে তাঁহাকে চিকিৎসক মনে করিয়া নিকটে ডাকিয়া পাঠাইলেন। বিদ্যাবাগীশ শিবিরে উপস্থিত

হইলেই আগা রেজা তাঁহাকে উপস্থিত ব্যাধির প্রতিকার-কল্পে কি ঔষধ ব্যবহার করা কর্ত্তব্য তাহার পরামর্শ জিজ্ঞাসা করিলেন। কৃষ্ণদেব মনে করিলেন, কোন উপায়ে আগা রেজার ন্যায় পাষণ্ডকে যমালয়ে প্রেরণ করিতে পারিলে নগরবাসিগণের আর লাঞ্ছনা ভোগ করিতে হইবে না। অতএব তিনি যে চিকিৎসক নহেন এ কথা প্রকাশ না করিয়া এবং ডাবের জল পান করিলে রোগী প্রাণত্যাগ করিবেন ভাবিয়া, কৃষ্ণদেব আগা রেজাকে ডাবের জল পান করিবার আদেশ প্রদান করিলেন। সৌভাগ্যক্রমে আগা রেজা পৈত্তিকজ্বরে আক্রান্ত হইয়াছিলেন; সুতরাং তাঁহার নারিকেল জল এই ক্ষেত্রে অতি সুফল প্রসব করিল। অল্পদিন মধ্যেই আগা রেজা রোগমুক্ত হইলেন এবং কৃতজ্ঞতার নিদর্শন স্বরূপ বিদ্যাবাগীশের ভবনে কোনরূপ অত্যাচার হইতে দিলেন না।”

কি জন্য যে মীরকাশেম রাজবল্লভের উপর খড়্গহস্ত হইয়া দাঁড়াইলেন তাহা নিঃসন্দেহরূপে বলা সুকঠিন। রাজবল্লভের উত্তর-পুরুষগণ মধ্যে সম্পত্তিসম্বন্ধে বিরোধ উপস্থিত হইলে, তদীয় অন্যতম পৌত্র পীতাম্বর সেন ১৭৯৮ খৃষ্টাব্দের জুন মাসে গবর্ণর জেনারেল সমীপে যে আবেদন পত্র প্রেরণ করেন তাহাতে লিখিত আছে, “আমরা মহারাজ রাজবল্লভের উত্তরপুরুষ। তিনি ইংরেজ কোম্পানীর পরমহিতৈষী ছিলেন। এইরূপ ইংরেজ প্রীতির নিমিত্তই কাশিম আলি খাঁ রাজবল্লভ ও কৃষ্ণদাসকে ভাগীরথীসলিলে নিক্ষেপ করিয়া সংহার করেন এবং আগা রেজাকে রাজনগরে প্রেরণ করিয়া তাঁহার সমস্ত ধনরত্ন হস্তগত করিতেও কুণ্ঠিত হন নাই।” (১) কৃষ্ণদাসঘটিত ব্যাপারে যে ইংরেজ কোম্পানীর সহিত রাজবল্লভের ঘনিষ্ঠতা হইয়াছিল, সে বিষয়ে সন্দেহ

---

(2) History of Backergunge by Beveridge, page 96.

নাই। কিন্তু একমাত্র পীতাম্বর সেনের উপর নির্ভর করিয়া এ° বিষয়ে কোন স্থির সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া সুসঙ্গত নহে। ইংরেজপ্রীতি রাজবল্লভের মৃত্যুর কারণ না হইলেও, পীতাম্বর সেন গবর্ণর জেনারেলের অনুগ্রহলাভের আকাঙ্ক্ষায়, তাহাই রাজবল্লভের মৃত্যুর কারণ বলিয়া নির্দ্দেশ করিতে পারেন। মোতাক্ষরীণ, রিয়াজুসেলাতিন প্রভৃতি মুসলমান লেখকের ইতিহাসে এ সম্বন্ধে কোন কারণই উল্লিখিত হয় নাই। কিন্তু মোতাক্ষরীণপাঠে অবগত হওয়া যায়, এই সময় মীরকাশেমের অর্থলালসা অপরিমিতরূপে বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইয়াছিল এবং তিনি একমাত্র গুপ্তচরের প্রদত্ত সংবাদের উপর নির্ভর করিয়া রাজ্যের প্রধান প্রধান ব্যক্তিগণের উপর নানারূপ অত্যাচার অবিচার করিতেছিলেন। রাজবল্লভের ধনবত্তার কাহিনী তৎকালে কাহারও নিকট অবিদিত ছিল না। সম্ভবতঃ সেই কাহিনী শুনিয়াই মীরকাশেম রাজবল্লভের সমস্ত বিভব হস্তগত করিবার নিমিত্ত লোলুপ হইয়া উঠিয়াছিলেন এবং সহজে কার্য্যোদ্ধার করিবার উদ্দেশ্যে রাজবল্লভ ও তৎপুত্রকে বন্দী করিয়া কারাগারে নিক্ষেপ করিয়াছিলেন। কোনও গুপ্তচর রাজবল্লভসম্বন্ধে বিরুদ্ধ সংবাদ দেওয়াও অসম্ভব নহে এবং সন্দিগ্ধচিত্ত মীরকাশেম যে একমাত্র সেই সংবাদের উপর নির্ভর করিয়া রাজবল্লভের অনিষ্টসাধন করিয়াছিলেন; তাহা সিদ্ধান্ত করিলেও অন্যায় হইবে না। উমাচরণ বাবু লিখিয়াছেন:—

"মহারাজ রাজবল্লভ নবাবের অনুমতিক্রমে কিয়ৎকালের নিমিত্ত রাজকার্য্য হইতে অবসর গ্রহণ করিয়া তীর্থ যাত্রা করেন। এই সময় কতিপয় 'সূচক' ব্যক্তি রাজবল্লভ সম্বন্ধে নানারূপ অলীক কথা প্রচার করিতে প্রবৃত্ত হয়। কাশিম আলি সেই সমস্ত 'সূচকের' কুহকে মুগ্ধ হইয়া রাজবল্লভের প্রতি খড়্গহস্ত হইয়া উঠেন।"

১৮৭৭ সনের "কলিকাতা রিভিউ" নামক পত্রিকায় বিভারিজ সাহেব "নিম্নবঙ্গে ওয়ারেন হেষ্টিংস" নামে একটী প্রবন্ধ প্রচার করেন তাহাতে লিখিত আছে ঃ—

"মীরণের মৃত্যুর পর রাজবল্লভ ও মীরকাশেম এই উভয়ের মধ্যে কে তাঁহার পদে নিযুক্ত হইবে এ বিষয়ে তর্ক উপস্থিত হয়। হেষ্টিংস্ সাহেব এক সুদীর্ঘ পত্রে উভয়ের গুণাগুণ সমালোচনা করিয়া মীরকাশেমই যোগ্যতর বলিয়া প্রতিপন্ন করেন। তাঁহারই পরামর্শ মতে মীরকাশেমকে মনোনীত করা হয়। প্রথমে প্রস্তাব করা হইয়াছিল যে, মীরকাশেমকে দেওয়ানী ও ডিপুটী নবাবের পদে দেওয়া হইবে। কিন্তু মীরজাফর তাহাতে অসম্মত হইলে তাঁহাকে পদচ্যুত করিয়া মীরকাশেমকে নবাবীপদে বরণ করা হয়।"

বিভারিজ সাহেব ঐ প্রবন্ধে আরও লিখিয়াছেন ঃ—"রাজবল্লভকে মীরণের পদে নিযুক্ত করিলে যে যোগ্যতার অধিক সম্মান করা হইত তাহা এই সুদীর্ঘ সময় পরে পর্য্যালোচনা করা বৃথা। আমার মতে হেষ্টিংস্ সাহেব নিয়োগ সম্বন্ধে ভ্রমে পতিত হইয়াছিলেন। মীরজাফর রাজবল্লভকে প্রীতির চক্ষে নিরীক্ষণ করিতেন এবং মীরণের পদে কাহাকে নিয়োগ করা উচিত, এ বিষয়ে মীরজাফরের পরামর্শ দেওয়ার অধিকারও ছিল। মীরকাশেম অপেক্ষা রাজবল্লভের নিয়োগ অধিকতর সুসঙ্গত এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। কারণ রাজবল্লভকে ব্যক্তিগতভাবে কোন ক্ষমতা দেওয়ার কথা ছিল না। তিনি মীরণের অপ্রাপ্তবয়স্ক পুত্র সিদুর অভিভাবকস্বরূপ কার্য্য করিবেন এইরূপ প্রস্তাবই করা হইয়াছিল। সিদু যে মীরজাফরের ন্যায্য উত্তরাধিকারী এ বিষয়ে কাহারও বোধ হয় মতভেদ হইবে না। অতএব রাজবল্লভকে মীরণের পদে নিযুক্ত করিলে মীরজাফরের কোনরূপ ঈর্ষার কারণ হইত না। পক্ষান্তরে মীরকাশেম

দেওয়ানীপদে নিযুক্ত হইলে, মীরজাফরের অন্তঃকরণ পদচ্যুত হওয়ার আশঙ্কায় অভিভূত হইয়া পড়িল।”

পূর্ব্বোক্ত অবস্থা পর্য্যালোচনা করিলে স্পষ্টই দেখা যায় যে, মীরকাশেম রাজবল্লভকে প্রতিদ্বন্দ্বী বলিয়া মনে করিতেন এবং কখনও তাঁহাকে প্রীতির চক্ষে নিরীক্ষণ করিতে পারেন নাই। মীরকাশেমের বিদ্বেষভাবই যে রাজবল্লভের লাঞ্ছনার অন্যতম কারণ, তাহা অনায়াসে নির্দ্ধারণ করা যাইতে পারে।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

সলিল-শয্যায়

স্বর্গীয় ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর মহাশয় বলিয়া গিয়াছেন, ‘উপকৃত ব্যক্তি পদমর্য্যাদা লাভ করিলে সর্ব্বদা উপকারীকে বিদ্বেষের চক্ষে নিরীক্ষণ করিয়া থাকে।’ বিদ্যাসাগর মহাশয়ের উক্তি যে ভিত্তিশূন্য নহে তাহা বলা বাহুল্য মাত্র। মীরকাশেম অতি নগণ্য অবস্থা হইতে ইংরেজের অনুগ্রহে বাঙ্গালার নবাবীপদে উন্নীত হইয়াছিলেন। এজন্য ইংরেজ-দিগের সমক্ষে মীরকাশেমকে সর্ব্বদাই সঙ্কুচিত হইয়া থাকিতে হইত। সুতরাং নবাবীপদে সুদৃঢ় হইয়া তিনি যে কেন ইংরেজদিগকে বিদ্বেষের চক্ষে নিরীক্ষণ করিতেছিলেন, তাহার কারণ সহজেই অনুমান করা যাইতে পারে। এই সময় বাণিজ্যসম্বন্ধীয় কয়েকটি ঘটনা উপস্থিত হইলে মীরকাশেম আর সেই বিদ্বেষভাব গোপন রাখিতে পারিলেন না।

সম্রাট্ আরঙ্গজেবের সহিত ইংরেজদিগের যে সন্ধিপত্র সাক্ষরিত হইয়াছিল, তদনুসারে বার্ষিক তিন সহস্র টাকা প্রদান করিলেই ইংরেজ কোম্পানী নবাবের অধিকারমধ্যে বিনা শুল্কে বাণিজ্য করিতে পারিবেন এবং যে কোন পণ্যদ্রব্যে কলিকাতা কৌন্সিলের প্রেসিডেণ্ট সাক্ষর করিয়া দস্তক প্রদান করিবেন, তাহার উপর নবাবের কর্ম্মচারিগণের কোনরূপ শুল্কের দাবি করিবার অধিকার থাকিবে না স্থিরীকৃত হয়। সন্ধিপত্রের সর্ত্তানুসারে একমাত্র কোম্পানীর পণ্যদ্রব্যই পূর্ব্বোক্তরূপে শুল্কের দায় হইতে অব্যাহতি লাভ করিয়াছিল।

পলাশীর যুদ্ধের পর ইংরেজদিগের প্রতিপত্তি ক্রমশঃ বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইলে, কোম্পানীর কর্ম্মচারিগণ স্ব স্ব মূলধনদ্বারা স্বতন্ত্রভাবে বাণিজ্য করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। যে পর্য্যন্ত ক্লাইব এ দেশে ছিলেন, সে পর্য্যন্ত কোম্পানীর কর্ম্মচারিগণ আপন আপন পণ্যদ্রব্যের উপর নির্দ্ধারিতহারে শুল্ক প্রদান করিতে কোনরূপ আপত্তি উত্থাপন করিতেন না। ক্লাইব প্রস্থান করিবার অব্যবহিত পরেই মীরকাশেম বাঙ্গলার সিংহাসনে অধিরোহণ করিলেন এবং সঙ্গে সঙ্গে কোম্পানীর কর্ম্মচারিগণও নিজ নিজ পণ্যের উপর শুল্ক প্রদান করিতে বিরত হইলেন। ক্রমে তাঁহাদের স্পর্দ্ধা এতদূর বৃদ্ধি পাইল যে, তাঁহারা কোম্পানীর নিশান উড়াইয়া যেখানে সেখানে দেশীয় বণিক্ ও রাজকর্ম্মচারিগণের উপর বিভিন্নপ্রকার অত্যাচার উৎপীড়ন করিতে লাগিলেন। পূর্ব্বে একমাত্র প্রেসিডেণ্টই কোম্পানীর পণ্যদ্রব্যসম্বন্ধে দস্তক স্বাক্ষর করিয়া দিতেন। এখন কোম্পানীর প্রত্যেক কর্ম্মচারিই যাহাকে তাহাকে বিনা শুল্কে বাণিজ্য করিবার অধিকার প্রদান করিয়া দস্তক সাক্ষর করিয়া দিতে লাগিলেন। নবাবের কর্ম্মচারিগণ এই শেষোক্ত শ্রেণীস্থ পণ্যের উপর শুল্ক দাবি করিলে, ইংরেজ কুঠীর দুর্দ্দান্ত অধ্যক্ষগণ সিপাহি ও বরকন্দাজ পাঠাইয়া

সেই সমস্ত কর্ম্মচারিগণকে ধৃত করিতে লাগিল এবং তাঁহাদিগকে কারাগারে নিক্ষেপ করিয়া লাঞ্ছনা দিতেও কুণ্ঠিত হইল না। ক্রমে ইংরেজেরা অধিকতর উচ্ছৃঙ্খল হইয়া উঠিলেন। দেশীয় কোন বণিক্ হইতে কোন পণ্যদ্রব্য ক্রয় করিলে তাঁহারা তাহার উপযুক্ত মূল্য প্রদান করিতে বিরত হইলেন এবং কোন পণ্য দ্রব্য বিক্রয় করিলে দেশীয় বণিক্‌দিগের হইতে আপনাদের ইচ্ছামত মূল্য আদায় করিতে লাগিলেন। এইরূপ অত্যাচারের ফলে দেশীয় বণিক্‌দিগের সর্ব্বনাশ হইল, কোম্পানীর কর্ম্মচারিগণ সমৃদ্ধিসম্পন্ন হইয়া উঠিলেন এবং নবাবের ক্ষমতা একেবারে খর্ব্ব হইয়া গেল। মীরকাশেম এই সমস্ত অত্যাচারকাহিনী লিপিবদ্ধ করিয়া বারংবার কলিকাতাকৌন্সিলে অভিযোগ উপস্থাপিত করিলেন। কিন্তু একমাত্র ভান্সিটার্ট ও হেষ্টিংস্ ব্যতীত অন্য কোন সদস্যই তাঁহার অভিযোগ কর্ণপাত পর্য্যন্ত করিলেন না। এখন নবাব ও ইংরেজসম্প্রদায়মধ্যে মনোমালিন্যের আর পরিসীমা রহিল না এবং প্রত্যেক পক্ষই আত্মরক্ষার আয়োজন কল্পে কালক্ষয় করিতে লাগিলেন। এই সময় ভান্সিটার্ট সাহেব একদিন মুঙ্গেরে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। নবাব এখন প্রেসিডেন্ট সাহেবের চিত্তবিনোদনের ভাণ করিয়া কৃত্রিম যুদ্ধাভিনয়ের আয়োজন করিলেন। নবাবসেনাগণ ইতিপূর্ব্বে পাশ্চাত্য প্রণালীতে শিক্ষালাভ করিয়াছিল। সুতরাং ভান্সিটার্ট সাহেব কৃত্রিম যুদ্ধাভিনয় দর্শনে অত্যন্ত সন্তুষ্ট হইয়া নবাবকে স্মিতমুখে বলিলেন:—

"আপনার সেনাগণের রণকৌশল দর্শন করিয়া আমি অম্লানবদনে স্বীকার করিতে প্রস্তুত আছি যে, ইহারা সকলেই সুশিক্ষিত হইয়াছে। কিন্তু আপনি সর্ব্বদা মনে রাখিবেন, এই সমস্ত সেনাগণ দেশীয় অন্য সেনার বিরুদ্ধে কৃতকার্য্য হইতে পারিলেও পাশ্চাত্যসেনার বিরুদ্ধে

দণ্ডায়মান হইতে সমর্থ হইবে না। কখনও ইংরেজদিগের বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হইলে আপনি নিশ্চিতই ভগ্নোদ্যম হইবেন। আপনার সহিত ইংরেজদিগের সংঘর্ষ উপস্থিত হইলেই আপনার সেনাগণ পৃষ্ঠপ্রদর্শন করিতে কালবিলম্ব করিবে না এবং তাহার ফলে আপনার সম্মান ও ভারতবর্ষীয় প্রত্যেক জাতির সম্মান চিরকালের নিমিত্ত অন্তর্হিত হইয়া যাইবে। পাশ্চাত্যেরা অতঃপর ভারতবাসী প্রত্যেককেই অবজ্ঞার চক্ষে নিরীক্ষণ করিবে ও তাঁহাদিগকে শৃগালকুক্কুরের ন্যায় অধমজীব বলিয়া মনে করিতেও কুণ্ঠিত হইবে না। ইংরেজদিগের সহিত প্রতিদ্বন্দ্বিতা করিতে হইলে অর্থবল ও যুক্তির আশ্রয় ব্যতীত আপনি অন্য কোন উপায়েই কৃতকার্য্য হইতে পারিবেন না। অতএব যুদ্ধোদ্যমে বিরত হইয়া, আমি যেরূপ মীমাংসা করিয়া দিয়াছি, তদনুসারে আচরণ করিতে আপনি কদাচ বিস্মৃত হইবেন না। সর্ব্বদা এরূপভাবে চলিবেন, যেন এদেশের লোক সুখশান্তিতে জীবনযাপন করিতে পারে এবং আপনার নাম তাহাদের হৃদয়ে চিরকাল জাগরূক থাকে। ইংরেজদিগের সহিত কলহে প্রবৃত্ত হইলেই আপনার সর্ব্বনাশ হইবে, অসংখ্যলোক সর্ব্বস্বান্ত হইবে এবং সমগ্রদেশ হাহাকারধ্বনিতে পূর্ণ হইয়া যাইবে।”

নবাব উত্তর করিলেন, “ইংরেজদিগের নাম লইয়া বহুসংখ্যক লোক শুল্ক না দিয়া ব্যবসায় পরিচালনা করিতেছে; ইহাতে ইংরেজদিগের অল্প অল্প লাভ হইলেও নবাবসরকারের বিলক্ষণ ক্ষতি হইতেছে। আমার মতে একমাত্র কোম্পানীর পণ্যের উপর হস্তক্ষেপ না করিয়া, কোম্পানীর কর্ম্মচারিগণের পণ্যের উপর শুল্ক আদায় করিতে পারিলেই সমস্ত গোলযোগের মীমাংসা হইতে পারে।”

ভান্সিটার্ট সাহেব বলিলেন, “আমি এখন এ বিষয়ের কোন সদুত্তর দিতে সমর্থ নহি। কলিকাতায় গিয়া কোনরূপ

সুবন্দোবস্ত করিতে পারিলে আমি আপনাকে মুঙ্গেরে সংবাদ পাঠাইয়া দিব।”

অতঃপর ভান্সিটার্ট সাহেব কলিকাতা যাত্রা করিলেই তাঁহার কোন পত্রের অপেক্ষা না করিয়া নবাব সরকারী কর্ম্মচারিগণকে লিখিয়া পাঠাইলেন যে, কলিকাতা কৌন্সিলের সহিত বাণিজ্যশুল্কসম্বন্ধে শীঘ্রই সুবন্দোবস্ত হওয়ার সম্ভাবনা আছে, অতএব যাহাতে ইংরেজকর্ম্মচারিগণ নিজ নিজ পণ্যদ্রব্য বিনাশুল্কে স্থানান্তর করিতে না পারে, সে বিষয়ে উপযুক্ত সাবধানতা অবলম্বন করিবে। এই আদেশ পাইয়াই রাজকীয় কর্ম্মচারিগণ নানাস্থানে ইংরেজকর্ম্মচারিগণের পণ্যদ্রব্য আবদ্ধ করিতে লাগিল। তৎকালে ইলিস্ সাহেব আজিমাবাদের কুঠীতে এবং ব্যাট্সন্ সাহেব ঢাকার কুঠীতে অধ্যক্ষপদে নিযুক্ত ছিলেন। তাঁহারা উভয়েই পূর্ব্বোক্ত ঘটনায় ক্রুদ্ধ হইয়া উঠিলেন ও সেনা পাঠাইয়া আবদ্ধকারী রাজকর্ম্মচারিগণকে ধৃত করিয়া আনিলেন এবং তাহাদিগকে বিচারার্থ কলিকাতা কৌন্সিলে পাঠাইবার উদ্দেশ্যে কারারুদ্ধ করিয়া রাখিলেন।

তৎকালে গর্গিন খাঁর প্ররোচনায় মীরকাশেম নেপালরাজের বিরুদ্ধে অভিযানে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন এবং এই অভিযানে নবাবসেনাগণ সম্পূর্ণরূপে পরাভূত হইলে তিনি তাহাদের সঙ্গে আজিমাবাদে প্রত্যাবর্ত্তন করিতেছিলেন। আজিমাবাদ আসিয়াই নবাব শুনিতে পাইলেন যে, আজিমাবাদ ও ঢাকার কুঠীর অধ্যক্ষগণ রাজকর্ম্মচারিগণকে ধৃত করিয়া কলিকাতায় পাঠাইয়া দিয়াছেন। এখন তিনি বিস্ময়াবিষ্ট হইয়া সংকল্প করিলেন যে, ইংরেজকুঠীর অধ্যক্ষগণকে কারারুদ্ধ না করিতে পারিলে আর সম্মানরক্ষা হয় না। সুতরাং অবিলম্বে ইংরেজকুঠীতে সৈন্য পাঠাইবার সুবন্দোবস্ত করিয়া নবাব মুঙ্গেরে যাত্রা করিলেন।

এদিকে নবাবের সেনাগণ প্রভুর আদেশানুসারে কতিপয় ইংরেজকর্ম্ম-

চারীকে ধৃত করিয়া মুঙ্গেরে পাঠাইয়া দিল। কলিকাতা কৌন্সিলের সদস্যগণ এই ঘটনায় উত্তেজিত হইয়া স্থির করিলেন যে, নবাবকে অবিলম্বে কারারুদ্ধ ইংরেজকর্ম্মচারিগণের মুক্তিপ্রদান করিতে হইবে এবং তিনি ইংরেজকর্ম্মচারিগণের পণ্যদ্রব্যের উপর কোন শুল্কের দাবী করিতে পারিবেন না। একমাত্র ভান্সিটার্ট সাহেব এই প্রস্তাব অনুমোদন না করিলেও অধিকাংশ সদস্যের মতে তাহা পরিগৃহীত হওয়ায় ভান্সিটার্ট সাহেবকে অগত্যা তদনুসারেই কার্য্য করিতে হইল। কৌন্সিলের মন্তব্য নবাবদরবারে প্রেরিত হইলে মীরকাশেম লিখিয়া পাঠাইলেন যে, তিনি এখন হইতে কি দেশীয় কি ইংরেজ, কোন বণিক্‌হইতেই শুল্ক আদায় করিবেন না, কিন্তু ইংরেজরা ইতিপূর্ব্বে যে সমস্ত রাজকর্ম্মচারিগণকে কারারুদ্ধ করিয়া রাখিয়াছেন, তাহাদিগকে মুক্তিপ্রদান না করিলে তিনিও ইংরেজকর্ম্মচারিগণকে মুক্তিপ্রদান করিতে প্রস্তুত নহেন। কৌন্সিলের সদস্যগণ এইরূপ উত্তর পাইয়া অধিকতর উত্তেজিত হইয়া উঠিলেন এবং অধিকাংশ সদস্যের মতে স্থির হইল যে, নবাবকে দেশীয় বণিক্‌সম্প্রদায় হইতে রীতিমত শুল্ক আদায় করিতেই হইবে। কৌন্সিলের দ্বিতীয় মন্তব্য অনুসারে আমিয়েট্ সাহেব পূর্ব্বোক্ত মন্তব্য স্বয়ং জ্ঞাপন করিবার জন্য মুঙ্গেরে যাত্রা করিলেন। ভান্সিটার্ট সাহেব এই সময় নবাবকে গোপনে লিখিয়া পাঠাইলেন যে. "আপনি সন্ধির সর্ত্তানুসারে আচরণ করিতে কদাচ বিস্মৃত হইবেন না। কৌন্সিলের সদস্যগণ ভিন্ন ভিন্ন কুঠী হইতে আসিয়া কলিকাতায় মিলিত হইয়াছেন। সুতরাং বিরুদ্ধপক্ষের সংখ্যাধিক্যের নিমিত্ত আমি কিছুই করিয়া উঠিতে পারিতেছি না। আপনি ইংরেজকর্ম্মচারিগণকে হঠাৎ কারারুদ্ধ করিয়াছেন বলিয়া কৌন্সিলে এখন আমার কোন প্রতিপত্তি নাই। আমিয়েট্ সাহেব মুঙ্গেরে চলিলেন; তিনি আপনার নিকট যে প্রস্তাব উপস্থাপিত করিবেন, আপনার মতবিরুদ্ধ

হইলেও আপনি তাহাতে সম্মত হইতে আপত্তি করিবেন না। পাঁচ কি ছয় মাসমধ্যেই বিরুদ্ধবাদী সদস্যগণ পদচ্যুত হইবেন। অতএব আপনি আমিয়েট্ সাহেবের উপযুক্ত অভ্যর্থনা করিয়া তাঁহার প্রস্তাবে সম্মত হইতে অণুমাত্রও আপত্তি করিবেন না। এখন যে সমস্যা উপস্থিত হইয়াছে, তাহাতে আমিয়েট্ সাহেবের প্রস্তাবে সম্মত না হইলে আপনার সহিত ইংরেজদিগের যুদ্ধ অনিবার্য্য হইয়া উঠিবে। যে অবস্থায় নিপতিত হইয়াছি, তাহাতে আমি যে আপনার ইচ্ছানুরূপ কার্য্য করিতে পারি এরূপ সম্ভাবনা নাই।"

নবাব এই পত্র পাইয়া গর্গিন খাঁর নিকট পরামর্শ জিজ্ঞাসা করিলেন। কিন্তু গর্গিন খাঁ বলিলেন, "বর্ত্তমান সময়ে আপনি ও ইংরেজেরা শক্তিসম্বন্ধে তুল্য আসনে আসীন আছেন। যদি এখন ইংরেজদিগের প্রস্তাবে আপনি সম্মতি প্রদান করেন, তবে আপনার ক্ষমতা খর্ব্ব হইয়া যাইবে এবং ইংরেজ-দিগের প্রতিপত্তি বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইবে।" নবাব এই পরামর্শই সুসঙ্গত মনে করিয়া আমিয়েট্ সাহেবের প্রস্তাবে সম্মত হইবেন না বলিয়া স্থির করিলেন। ইংরেজদিগের সহিত যুদ্ধ অনিবার্য্য হইয়া উঠিয়াছে দেখিয়া নবাব মনে করিলেন, শেঠভ্রাতৃগণকে কোন উপায়ে কারারুদ্ধ করিতে পারিলে তাঁহারা আর ইংরেজের পক্ষাবলম্বন করিতে পারিবেন না এবং তাহা হইলে ইংরেজের পক্ষও অনেক পরিমাণে দুর্ব্বল থাকিয়া যাইবে। তৎকালে জগৎশেঠ মহাতাপচাঁদ এবং রাজা স্বরূপচাঁদ মুর্শিদাবাদে অবস্থান করিতেছিলেন। মীরকাশেম মহম্মদতকী খাঁর নিকট লিখিয়া পাঠাইলেন, তিনি যেন মহাতাপচাঁদ ও স্বরূপচাঁদের আবাসস্থল সসৈন্যে অবরুদ্ধ করিয়া রাখেন এবং আরমাণী সেনানী মার্কার উপস্থিত হইলে তাঁহার হস্তে ঐ ভ্রাতৃদ্বয়কে সমর্পণ করেন। তদনুসারে মহম্মদ তকী খাঁ শেঠভবন অবরুদ্ধ করিলেন এবং আরমাণীসেনাপতি মার্কার সাহেব শেঠযুগলকে

ধৃত করিয়া আনিয়া মুঙ্গেরে উপস্থিত হইল। মহাতাপচাঁদ ও স্বরূপচাঁদ এখন নজরবন্দী অবস্থায় মুঙ্গেরে বাস করিতে লাগিলেন।

এই ঘটনার অব্যবহিত পরেই আমিয়েট্ সাহেব মুঙ্গেরে আসিয়া কৌন্সিলের প্রস্তাব নবাবদরবারে উপস্থাপিত করিলেন। নবাব ভান্সিটার্ট সাহেবের সুপরামর্শ অবহেলা করিয়া আমিয়েট্ সাহেবের উপযুক্ত অভ্যার্থনাও করিলেন না। অগত্যা আমিয়েট্ সাহেব ত্যক্তবিরক্ত হইয়া মুঙ্গের পরিত্যাগপূর্ব্বক কলিকাতায় যাত্রা করিলেন। কিন্তু নবাবের আদেশে আমিয়েট্ সাহেবের সহচর হে সাহেবকে সরকারী কর্ম্মচারিগণের মুক্তির প্রতিভূস্বরূপ মুর্শিদাবাদে অবস্থান করিতে হইল।

কলিকাতা যাইবার প্রাক্কালে আমিয়েট্ সাহেব গোপনে পাটনার কুঠীর অধ্যক্ষ ইলিস সাহেবকে বলিলেন, 'ইংরেজদিগের সহিত নবাবের যুদ্ধ অনিবার্য্য হইয়া উঠিয়াছে। অতএব আর কালবিলম্ব না করিয়া আপনি সমরায়োজনে প্রবৃত্ত হইবেন।' আমিয়েট্ সাহেব প্রস্থান করিলেই ইলিস সাহেব পাটনানগরী অবরোধ করিলেন। নবাবসেনাগণ তৎকালে যুদ্ধার্থ প্রস্তুত ছিল না; সুতরাং ইলিস সাহেব অতি সহজেই পাটনা অধিকার করিতে সমর্থ হইলেন। পরদিন নবাবসেনাগণ যুদ্ধে প্রস্তুত হইয়া ইলিস সাহেবকে বিতাড়িত করিয়া দিয়া পাটনানগরী উদ্ধার করিল। ইলিস সাহেব এখন সেনাদলসহ বাঁকিপুরাভিমুখে প্রস্থান করিতেছিলেন, ইতিমধ্যে আর্ম্মাণী সেনানী মার্কার আসিয়া তাঁহাকে সসৈন্যে বন্দী করিলেন। নবাব এই সংবাদে আনন্দে উৎফুল্ল হইয়া ঘোষণা করিয়া দিলেন যে, রাজকীয় কোন সেনা ইংরেজ জাতীয় কোন লোক দেখিতে পাইলেই তাহাকে হত্যা করিবে। তৎকালে আমিয়েট্ সাহেব মুর্শিদাবাদ পর্য্যন্ত আসিয়াছিলেন। মুর্শিদাবাদনগরে নবাবের যে সমস্ত সেনা ছিল, তাহারা আমিয়েট সাহেবের সন্ধান পাইয়া তাঁহাকে অনুচরবর্গসহ কাটিয়া

খণ্ড বিখণ্ড করিয়া ফেলিল এবং তৎপরে কাশিমবাজারের কুঠীতে আপতিত হইয়া কুঠীর সমস্ত মালপত্র লুণ্ঠন করিল।

এখন নবাব জাফর খাঁ, আশাম খাঁ এবং মীর হৈবৎউল্লাকে এক এক দল সেনা দিয়া এই বলিয়া মুরশিদাবাদে পাঠাইয়া দিলেন যে, তাঁহারা মহম্মদ তকী খাঁর সহিত যোগদান করিয়া ইংরেজ সেনাগণের গতিরোধ করিবেন।

আমিয়েট সাহেবের নিধনবৃত্তান্ত কলিকাতায় পৌঁছিলে কলিকাতা প্রবাসী সমস্ত ইংরেজ রোষে ও ক্ষোভে উত্তেজিত হইয়া উঠিলেন। যে ভ্যান্সিটার্ট সাহেব এতদিন নবাবের পক্ষাবলম্বী ছিলেন, তিনি পর্য্যন্ত এখন আর স্থির থাকিতে পারিলেন না। অল্পকালমধ্যে কৌন্সিলের সদস্যগণ এক সভার অধিবেশন করিলেন এবং তাহাতে মীরকাশেমের বিরুদ্ধে যুদ্ধঘোষণাপ্রস্তাব সর্ব্বসম্মতি ক্রমে পরিগৃহীত হইল। অতঃপর সকল সদস্য আসিয়া মীরজাফরকে নবাব বলিয়া সংবর্দ্ধনা করিলেন।

কতিপয় দিবসমধ্যে ইংরেজবাহিনী মীরজাফরকে লইয়া মুরশিদাবাদ অভিমুখে যাত্রা করিল। এদিকে মহম্মদ তকী খাঁও মীরকাশেমের সেনাসহ ইংরেজদিগের গতিরোধ করিতে মুরশিদাবাদ হইতে ধাবমান হইলেন। সৈয়দ মহম্মদ খাঁ তৎকালে মুরশিদাবাদের অধ্যক্ষপদে নিযুক্ত ছিলেন। মুঙ্গের হইতে যে তিন দল সেনা মহম্মদ তকীর সাহায্যার্থে প্রেরিত হইয়াছিল, সৈয়দ মহম্মদ খাঁ একমাত্র মহম্মদ তকীর প্রতি বিদ্বেষের বশবর্ত্তী হইয়া সেই তিন দলের অধ্যক্ষগণকে মহম্মদ তকীর সহিত যোগ দান করিতে নিষেধ করিলেন। তদনুসারে প্রত্যেক দলের নেতাই স্বতন্ত্রভাবে সৈন্য চালনা করিয়া ইংরেজসেনার দিকে অগ্রসর হইতে লাগিলেন। সর্ব্বপ্রথম মীর হৈবতুল্লা ও আলাম খাঁর সহিত ইংরেজসেনার সাক্ষাৎ হইল। ইংরেজ সেনার বেগ সহ্য

করিতে অপারগ হইয়া উভয় সেনানীই মহম্মদ তকীর শিবিরের দিকে প্রস্থান করিলেন। ইংরেজসেনা কাটোয়ার সন্নিহিত হইলেই মহম্মদ তকী তাঁহাদের গতিরোধ করিবার উদ্দেশ্যে অগ্রসর হইতে লাগিলেন। মুঙ্গের হইতে যে তিনজন সেনানী পূর্ব্বোক্তরূপে প্রেরিত হইয়াছিলেন, তাঁহারা তখনও মহম্মদ তকীর অনুসরণ করিলেন না। অগত্যা মহম্মদ তকী একাকীই রণাভিনয়ে নিযুক্ত হইলেন। তাঁহার সুশিক্ষিত এবং সাহসী সেনাগণ বূহ ভেদ করিয়া ইংরেজসেনাগণকে ছিন্ন ভিন্ন করিতেছিল। ইতিমধ্যে বিপক্ষ পক্ষ হইতে এক গোলা আসিয়া মহম্মদ তকীর পাদদেশে নিপতিত হইল। গোলার আঘাতে মহম্মদ তকীর অশ্ব পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হইলেও, তিনি অণুমাত্রও বিচলিত না হইয়া দ্বিতীয় অশ্বে আরোহণপূর্ব্বক সৈন্যচালনা করিতে লাগিলেন। এই সময় আর একটি গোলা মহম্মদ তকীর স্কন্ধ ভেদ করিয়া গেল : কিন্তু তাহাতেও তিনি বিচলিত না হইয়া কেবলই অগ্রসর হইতে লাগিলেন। ইংরেজ সেনাগণ এই সাহসী সেনাপতির বীরোচিত বেগ সহ্য করিতে অক্ষম হইয়া পলায়নের পথ খুঁজিতে প্রবৃত্ত হইল। ইতিমধ্যে নূতন একদল ইংরেজসেনা গুপ্তস্থান হইতে আসিয়া রণাঙ্গনে প্রবেশ করিল। এই নূতন দল সমরে লিপ্ত হইয়াই অবিশ্রান্ত গোলাবর্ষণ করিতে লাগিল, গোলার আঘাতে মহম্মদ তকী ও তাঁহার সেনাগণ মৃত্যুমুখে নিপতিত হইলেন এবং সঙ্গে সঙ্গে মীরকাশেমের সৌভাগ্যসূর্য্যও চিরকালের নিমিত্ত অস্তাচলে গমন করিল।

মুরশিদাবাদের অধ্যক্ষ সৈয়দ মহম্মদ এই পরাজয়ের বার্ত্তা শ্রবণ করিয়া অত্যন্ত ক্ষুব্ধ হইয়া পড়িলেন এবং নগর রক্ষার কোনরূপ সুবন্দোবস্ত না করিয়াই রাজকোষের ধনরত্নসহ মুঙ্গেরের দিকে পলায়মান হইলেন। তাঁহার পলায়নের অব্যবহিত পরেই মীরজাফর বিজয়দৃপ্ত ইংরেজবাহিনী-সহ মুরশিদাবাদে আসিয়া নগরী অধিকার করিলেন।

অতঃপর সূতিতে ইংরেজসেনার সহিত মীরকাশেমের সেনার বল পরীক্ষা হইল। মীর হৈবজুল্লা, আরমাণী সেনানী মার্কার এবং পাশ্চাত্য জাতীয় সমক এস্থলে মীরকাশেমের সেনা পরিচালনা করিলেন। কিন্তু বিজয়লক্ষ্মী এবারেও ইংরেজ সেনাগণের অঙ্কশায়িনী হইলেন। মীর-কাশেমের সেনাগণ এখন উদয়নালায় আসিয়া আশ্রয়গ্রহণ করিল।

ইতিপূর্ব্বে মীরকাশেম পরিবারবর্গ ও ধনরত্নসমূহ রোটাসের দুর্গে প্রেরণ করিবার ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। সূতির দুর্ঘটনার সংবাদ পাইয়া তিনি মনে মনে স্থির করিলেন, উদয়নালার যুদ্ধের পরিণাম দেখিয়া তিনি মুঙ্গের হইতে আজিমাবাদে প্রস্থান করিবেন। উদয়নালা রাজমহল পাহাড় হইতে উত্তরবাহিনী হইয়া গঙ্গানদীতে পতিত হইয়াছে। ইহার তটদ্বয় এত উচ্চ ও বন্ধুর যে কেহ সহজে তাহার উপর দিয়া গমনাগমন করিতে পারে না। এই ক্ষুদ্রায়তন স্রোতস্বতীর উপর কিয়ৎকাল পূর্ব্বে মীরকাশেম একটি ইষ্টকের ও একটি প্রস্তরের সেতু নির্ম্মাণের ও তথা হইতে কিয়ৎদূর ব্যবধানে একটি পরিখা খননের আদেশ দিয়াছিলেন। মীরকাশেমের সেনাগণ এখন এস্থলে অবস্থান করিয়াই শত্রুসেনার আগমন প্রতীক্ষা করিতে লাগিল এবং তিনি স্বয়ং তাহার অনতিদূরে শিবিরসন্নিবেশ করিবেন সংকল্প করিয়া মুঙ্গের পরিত্যাগের আয়োজনে ব্যস্ত হইয়া উঠিলেন।

একস্থান হইতে স্থানান্তরে যাইতে হইলে মীরকাশেম সচরাচর রজনী-যোগেই যাত্রা করিতেন। জ্যোতিষশাস্ত্রে মীরকাশেমের প্রগাঢ় শ্রদ্ধা ছিল; সুতরাং তিনি জনৈক জ্যোতিষী আনাইয়া হিজরী ১১৭৭ অব্দের চতুর্ব্বিংশ মহরমে যাত্রার দিন ঠিক করিলেন। যে রজনীতে যাত্রা করিবেন বলিয়া স্থির হইল, সেইদিন অপরাহ্নে শেষ দরবার করিবার জন্যই যেন মীরকাশেম দরবারগৃহে আগমন করিলেন। তৎকালে

বর্ষাসুলভ জলদজালে দিঙ্‌মণ্ডল আচ্ছন্ন ছিল এবং যে পৈশাচিক অভিনয় করিতে কৃতসংকল্প হইয়া নবাব তথায় আগমন করিয়াছিলেন, তাহা দর্শন করিতে সংকুচিত হইয়াই যেন দিবাকর নীরদ বসনে স্বীয় বদনমণ্ডল আচ্ছন্ন করিয়াছিলেন। দরবারগৃহে আসিয়াই মীরকাশেম সমস্ত বন্দিবর্গকে তথায় উপস্থাপিত করিবার জন্য আদেশ প্রচার করিলেন। মীরকাশেমের আদেশে ইতিপূর্ব্বে রামনারায়ণ, রাজবল্লভ, কৃষ্ণদাস, রায়রায়ান উমেদ রায় টিকরির জমিদার রাজা ফতে সিংহ, রাজা বুনিয়াদ সিংহ, সাহ আবদুল্লা ও শেঠ ভ্রাতৃযুগল মুঙ্গেরের দুর্গে আবদ্ধ ছিলেন। নবাবের আদেশে পূর্ব্বোক্ত সমস্ত বন্দীই প্রহরিপরিবেষ্টিত হইয়া দরবারগৃহে আনীত হইল।(১) এই সময় নবাব রাজবল্লভকে সম্বোধন করিয়া জলদগম্ভীর স্বরে বলিলেন ঃ—

"বন্দি! অদ্য তোমার মৃত্যু অবশ্যম্ভাবী। যে ভাবে তোমার মরিবার বাসনা থাকে তাহা স্পষ্ট করিয়া বল। আমি তোমার সেই শেষ প্রার্থনা পূর্ণ করিতে আপত্তি করিব না।"

রাজবল্লভ নিষ্ঠাবান্ হিন্দু ছিলেন। জাহ্নবীসলিলে দেহপাত হইলে পরলোকে অমরধামে বিচরণ করিতে পারিবেন, এই বিশ্বাস তাঁহার হৃদয়ে বদ্ধমূল ছিল। সুতরাং তিনি বিনীতভাবে নিবেদন করিলেন ঃ—

"জাঁহাপনা! এই বন্দীর শেষ প্রার্থনা পূর্ণ করা আপনার অভিপ্রেত হইলে, আদেশ করুন, যেন জাহ্নবী সলিলে নিক্ষেপ করিয়া আমার জীবন সংহার করা হয়।"

"আচ্ছা তাহাই হইবে," বলিয়া মীরকাশেম প্রহরিবর্গের প্রতি আদেশ করিলেন, "রাজবল্লভ ও কৃষ্ণদাসের বক্ষে এক এক খণ্ড শিলা বন্ধন

---

(1) Sair, vol II. pages 442 to 443.

করিয়া উভয়কে দুর্গের উপরিভাগ হইতে ভাগীরথীর সলিলে নিক্ষেপ করিতে হইবে।”

আদেশ প্রচারিত হইবার অব্যবহিত পরেই প্রহরিগণ, রাজবল্লভ ও কৃষ্ণদাসকে দুর্গের উপরিভাগে লইয়া গেল এবং প্রত্যেকের বক্ষে এক এক খণ্ড গুরুভার বিশিষ্ট শিলা বন্ধন করিয়া তাঁহাদিগকে মৃত্যুর জন্য প্রস্তুত হইতে বলিল (১)।

তৎকালে সন্ধ্যা সমাগত হইয়া ঘনান্ধকার বিস্তার করিয়াছিল। দুর্গের পাদদেশ চুম্বন করিয়া পুণ্যসলিলা ভাগীরথী খরবেগে প্রবাহমাণা হইতেছিলেন এবং রাজবল্লভ ও কৃষ্ণদাস অন্তিম সময় অতি সন্নিহিত জানিয়া মনে প্রাণে ইষ্টদেবতার নাম জপ করিতেছিলেন। ঠিক সেই সময়ে একজন প্রহরী রাজবল্লভের পশ্চাৎভাগে আসিয়া তাঁহাকে সবলে ধাক্কা দিল। রাজবল্লভ দণ্ডায়মান ছিলেন, ধাক্কার বেগে তিনি তৎক্ষণাৎ রাম রাম শব্দ করিয়া নদীগর্ত্তে নিপতিত হইলেন। অবিলম্বে কৃষ্ণদাসও এই ভাবেই পিতার অনুসরণ করিলেন। রাজবল্লভ যে ‘রাম রাম’ শব্দ করিলেন, তাহা সান্ধ্য সমীরণের সহায়তায় ভাগীরথীর কূলে কূলে প্রতিধ্বনিত হইল। মুঙ্গেরের অধিবাসিগণ ও নদীস্থিত নাবিকগণ সেই অন্তিম বাণী শুনিয়া আতঙ্কে শিহরিয়া উঠিল। নৃশংস মীরকাশেম এইরূপে একটী প্রতিভার বিনাশসাধন করিয়া নিজেরই সর্ব্বনাশের পথ প্রশস্ত করিল। (২)

মুরশিদাবাদ কীরিটেশ্বরীর আলয়ে রাজবল্লভ এক মন্দির ও তন্মধ্যে

---

(১) সায়র মোতাক্ষরীণের মতে প্রত্যেকের গলদেশে বালুকাপূর্ণ কলসী বন্ধন করা হইয়াছিল—Sair, vol, 11 page 493.

(২) জন্মভূমি পত্রিকায় শ্রীযুক্ত অঘোর নাথ দত্ত “মুঙ্গের” নামক যে প্রবন্ধ লিখিয়াছেন তাহা অবলম্বনে লিখিত।

এক পাষাণময় শিবলিঙ্গ প্রতিষ্ঠাপিত করিয়াছিলেন। সেই শিবলিঙ্গ রাজবল্লভেশ্বের নামে আখ্যাত। কথিত আছে, যে সময় রাজবল্লভ মুঙ্গেরের দুর্গের উপরিভাগহইতে ভাগীরথীসলিলে নিক্ষিপ্ত হইয়া প্রাণত্যাগ করেন, তৎকালে এক বিরাট্ শব্দ করিয়া রাজবল্লভেশ্বরও বিদীর্ণ হইয়াছিলেন। অদ্যাপি সেই মন্দির ও ভগ্ন শিবলিঙ্গ কীরিটেশ্বরীর আলয়ে বিদ্যমান রহিয়াছে।

ভাগীরথীর যে স্থানে রাজবল্লভ ও তৎপুত্র নিক্ষিপ্ত হইয়াছিলেন, অধুনা তথায় এক পাষাণময় দ্বীপের আবির্ভাব হইয়াছে। ঐ দ্বীপ 'মৈন পথল' নামে আখ্যাত। কেহ কেহ বলেন, রাজবল্লভ ও কৃষ্ণদাসের বক্ষে যে শিলা বন্ধন করা হইয়াছিল, তাহাই ক্রমে বর্দ্ধিতায়তন হইয়া ঈদৃশ আকারে পরিণত হইয়াছে। শীত বসন্ত এবং গ্রীষ্ম ঋতুতে এই দ্বীপ ভাগীরথীর সলিলে অর্দ্ধ নিমগ্ন অবস্থায় থাকে; কিন্তু বর্ষাকালে উহা সম্পূর্ণরূপেই জলমগ্ন হইয়া যায়। বর্ষার খরস্রোতে কোন নৌকা হঠাৎ এই স্থানে আহত হইয়া চূর্ণীকৃত না হয়, এই উদ্দেশ্যে তথায় এক সমুন্নত পতাকা উড্ডীয়মান থাকে। (১)

এই শোচনীয় পরিণামের সময় রাজবল্লভের বয়ঃক্রম ৫৬ বৎসরের অধিক হয় নাই এবং কৃষ্ণদাস মাত্র ৩২ বৎসরে পদার্পণ করিয়াছিলেন। ৺চন্দ্রকুমার রায় প্রণীত পুস্তকে লিখিত আছে যে, রাজবল্লভের জীবনী সম্বন্ধে সংস্কৃত ভাষায় এক পুস্তক বিরচিত হইয়াছিল এবং তাহাতে নিম্নলিখিত শ্লোকটি বিদ্যমান আছেঃ— ২)

---

(১) মুঙ্গেরপ্রবাসী শ্রীযুক্ত কেদারনাথ ঘোষ মহাশয়ের বর্ণিত বৃত্তান্ত অবলম্বনে লিখিত।

(২) ৺চন্দ্রকুমার রায় প্রণীত জীবনী ৫১ পৃঃ। দুঃখের বিষয়, অনেক চেষ্টা করিয়াও সেই সংস্কৃত গ্রন্থের সন্ধান পাই নাই।

অমায়াং শ্রাবণে মাসে সোমবারে দিবাগতে।
নিমগ্নৌ জন্যজনকা বাস্তাং ভাগীরথী জলে ॥

এতদ্দ্বারা ও সায়র মোতাক্ষরীণের লিখিত বৃত্তান্ত পাঠে অনুমান হয় যে ১৭৬৩ খৃষ্টাব্দের জুলাই মাসের অমাবস্যা তিথিতে রাজবল্লভ প্রাণত্যাগ করেন।

সায়র মোতাক্ষরীণের মতে, একমাত্র শেঠ ভ্রাতৃদ্বয় ব্যতীত রামনারায়ণ-প্রমুখ অপর সমস্ত বন্দিগণের গলেই মীরকাশেম বালুকাপূর্ণ স্থালি বন্ধনপূর্ব্বক প্রত্যেককে, দুর্গের উপরিভাগ হইতে ভাগীরথীর সলিলে নিক্ষেপ করিয়াছিলেন এবং উদয়নালায় আসিয়া যুদ্ধের পর বার নামক স্থানে তিনি শেঠ যুগলকে দ্বিখণ্ডিত করিয়াছিলেন (১)। কিন্তু সায়র মোতাক্ষরীণের ইংরেজি অনুবাদক হাজি মস্তাফা সাহেবের মতে শেঠ ভ্রাতৃদ্বয় এবং অন্য বন্দিগণ একই সময় একই ভাবে নিক্ষিপ্ত হইয়াছিলেন।

৺কার্ত্তিকেয় বাবু প্রণীত ক্ষিতীশ বংশাবলীতে লিখিত আছে, "রাজা কৃষ্ণচন্দ্র ও তৎপুত্র এই সময় মুঙ্গেরের দুর্গে আবদ্ধ ছিলেন সুদীর্ঘ পূজার আয়োজন করিয়া আসন্ন মৃত্যু হইতে রক্ষা পাইয়াছিলেন। কৃষ্ণচন্দ্র ও তৎপুত্র পূজায় নিবিষ্ট, মীরকাশেমের চর তাঁহাদিগকে দরবারে লইয়া যাইবার নিমিত্ত উপস্থিত হয়। কৃষ্ণচন্দ্র পূজাসমাপনান্তে যাইবেন বলিয়া দূতকে অপেক্ষা করিতে বলেন। এই অবসরে ইংরেজসেনা মুঙ্গেরে উপস্থিত হইলে মীরকাশেম কৃষ্ণচন্দ্র ও তৎপুত্রকে হত্যা করিবার অবসর না পাইয়া অতি ব্যস্ততার সহিত মুঙ্গের হইতে প্রস্থান করেন।" (২)

সায়রমোতাক্ষরীণপাঠে অবগত হওয়া যায় যে, তৎকালে কোন ইংরেজ সেনাই মুঙ্গেরে উপস্থিত হয় নাই। অতএব ক্ষিতীশ বংশাবলীর

---

(1) Sair, vol. II, page 493

(২) ক্ষিতীশ বংশাবলী, ১২৬ পৃঃ।

লিখিত বৃত্তান্ত প্রমাদপূর্ণ বলিয়াই বোধ হইতেছে। সম্ভবতঃ চতুর চূড়ামণি কৃষ্ণচন্দ্র প্রহরিগণকে উৎকোচে বশীভূত করিয়া পলায়ন করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন।

কি জন্য যে মীরকাশেম এই সমস্ত প্রধান প্রধান ব্যক্তিগণের জীবন সংহার করিলেন, তাহা সায়র মোতাক্ষরীণে নিম্নলিখিতরূপে বর্ণিত আছে ঃ—

"উদয়নালা যাত্রা করিবার প্রাক্কালে মীরকাশেমের নরশোণিত-পিপাসা প্রবল হইয়া উঠিল। গর্গিণ খাঁর প্ররোচনায় এবং স্বীয় অবস্থার পর্য্যালোচনার ফলে তিনি সেই পিপাসা প্রবলতর করিয়া তুলিলেন। দরবারের প্রধান প্রধান লোকদিগের ভাবান্তরদর্শনে মীরকাশেমের অন্তঃকরণ শান্তিশূন্য হইয়া পড়িল। ইংরেজদিগের সহিত কলহনিবন্ধন যে সমস্যা উপস্থিত হইয়াছে তাহাতে বন্দিগণ সম্বন্ধে কি ব্যবস্থা কর্ত্তব্য তাহা তিনি স্থির করিতে পারিলেন না। কারাগারে বন্দীর সংখ্যা অনেক ছিল, তাহাদিগকে শাসনে রাখিতে পারেন মীরকাশেমের এরূপ ক্ষমতা ছিল না। বন্দিগণকে মুক্তি প্রদান করিলে তাহারা বিপক্ষের সহিত যোগদান করিয়া অনিষ্ট ঘটাইতে পারে এরূপ আশঙ্কাও তাঁহার মনে উদিত হইতেছিল। অবশেষে তিনি অনেক চিন্তা করিয়া স্থির করিলেন যে বন্দিগণকে নিহত করিলে তাঁহাকে আর কোন বিপদে পড়িতে হইবে না।" (১)

ফলে সন্দিগ্ধচিত্ত মীরকাশেম এইরূপে রাজ্যের প্রধান প্রধান ব্যক্তিগণকে নিহত করিয়া দেশের শান্তি বিনষ্ট করিয়া দিয়াছিলেন। তাঁহার এইরূপ অপরিণামদর্শিতার ফলেই ইংরেজেরা অতি সহজে এদেশে আত্মপ্রতিষ্ঠা করিতে সমর্থ হইয়াছেন।

(1) Sair, vol. II page 492,

বড় আশা করিয়া মীরকাশেম অতঃপর উদয়নালায় উপস্থিত হইলেন। ইংরেজ সেনাগণ এস্থল আক্রমণ করিতে আসিয়া প্রথম প্রথম কৃতকার্য্য হইতে পারিল না। কোন্ পথে উদয়নালায় প্রবেশ করিতে হয়, তাহা অবশেষে ইংরেজসেনাগণ কৌশলে অবগত হইল ও সেই পথে উদয়নালায় প্রবেশ করিয়া উদয়নালা অধিকার করিল।

অতঃপর মীরকাশেম যে তথা হইতে প্রস্থান করেন, মুঙ্গেরের দুর্গ ইংরেজের হস্তে নিপতিত হইলে তিনি যে বাঙ্গালা দেশ পরিত্যাগ করিয়া অযোধ্যার নবাবের আশ্রয়গ্রহণ করেন এবং অযোধ্যার নবাব তাঁহার সর্ব্বস্ব লুণ্ঠন করিলে, তিনি যে ফকিরের বেশে শেষ জীবন যাপন করেন, ইতিহাসজ্ঞ পাঠক মাত্রেই অবগত আছেন, অনাবশ্যক বোধে তাহার বিস্তৃত বর্ণনা এস্থলে পরিত্যক্ত হইল।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

চরিত্রসমালোচনায়

পূর্ব্ব পূর্ব্ব অধ্যায়ে যাহা বর্ণনা করা হইল তদ্দৃষ্টে প্রতীয়মান হইবে যে, রাজবল্লভ নাওয়ার মহালের ক্ষুদ্র মুহুরীর পদ হইতে ক্রমে উন্নতিলাভ করিয়া ঢাকা ও বিহার প্রদেশের শাসন কর্ত্তৃত্বেও নিযুক্ত হইয়াছিলেন; এহেন ব্যক্তির প্রতিভা যে অসামান্য তাহা বলা বাহুল্য মাত্র।

রাজবল্লভের দানশীলতা এখন প্রবাদবাক্যে পরিণত। সমকালবর্ত্তী লোকদিগের মধ্যে কেহ তাঁহার ন্যায় মুক্তহস্তে অর্থবিতরণ করিয়াছেন কি না সে বিষয়ে সন্দেহ আছে। ১৮৩০ খৃষ্টাব্দে মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কার "রাজাবলী" নামক যে ইতিহাসপ্রণয়ন করেন তাহাতে লিখিত আছে, "বাদসাহী দেওয়ান রাজা রাজবল্লভ ছিলেন। তিনি বড় দাতা ছিলেন।" (১) রাজবল্লভের মৃত্যুর ৪৭ বৎসর পরে এই গ্রন্থ বিরচিত হইয়াছিল, স্থতরাং গ্রন্থকারের এইরূপ উক্তির উপর অনায়াসে আস্থা স্থাপন করা যাইতে পারে। বারাণসীধাম, বর্দ্ধমান, শ্রীখণ্ড, মুরশিদাবাদ, রাজনগর ও বিক্রমপুরের অন্যান্য স্থানে রাজবল্লভ যে সমস্ত দেবালয় ও জলাশয়ের প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন, তাহার কতক কতক বিবরণ পূর্ব্ব পূর্ব্ব অধ্যায়ে বর্ণিত হইয়াছে এবং অধিকাংশ বাহুল্য বোধে পরিত্যক্ত হইয়াছে। সুদীর্ঘ "তালতলার" খালদ্বারা বিক্রমপুরের যে পরিমাণ উপকার হইয়াছে তাহা বিক্রমপুরবাসিগণ সকলেই অবগত আছেন। বহু অর্থব্যয় করিয়া একমাত্র রাজবল্লভই এই খাল খনন করাইয়া দিয়াছিলেন। বর্ত্তমান সময়ে শীত ঋতুতে তালতলার খাল প্রবহমাণ থাকে না বলিয়া উমাচরণ বাবু আক্ষেপ করিয়া লিখিয়াছেন, "বিক্রমপুরে বহুসংখ্যক ধনবান্ ব্যক্তি বিদ্যমান থাকিতেও এই খালের আর সংস্কার হইল না।"

রাজবল্লভ যে সমস্ত দেবতার প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন, তাঁহাদের প্রত্যেকের সেবার নিমিত্ত তিনি প্রচুর ভূসম্পত্তিও উৎসর্গ করিয়া দিয়াছিলেন। শ্রীক্ষেত্রস্থিত জগন্নাথ দেবের সেবার নিমিত্ত বাকরগঞ্জের অন্তর্গত বিহারিপুর নামক তালুক এবং গয়াক্ষেত্রস্থিত বিষ্ণুপাদপদ্মে

---

* রাজাবলী, ১৪৯পৃঃ

তুলসী অর্পণ করিবার নিমিত্ত বিক্রমপুরের অন্তর্গত মাছুয়ামান্দা নামক তালুক উৎসর্গীকৃত হইয়াছিল। বিহারিপুর তালুকের বার্ষিক আয় এক হাজার টাকার ন্যূন নহে। "রাজা লক্ষ্মীনারায়ণের" সেবার নিমিত্ত ফরিদপুরের অন্তর্গত "মৈষাকান্দি" ও "বাসুদেবপুর" নামে যে দুইখানি গ্রাম উৎসর্গীকৃত হইয়াছিল, তাহার বার্ষিক আয়ও প্রায় এক সহস্র টাকা হইবে। রাজনগরে যে সমস্ত ব্রাহ্মণের বাস ছিল তাঁহাদের অধিকাংশই রাজবল্লভের প্রদত্ত নিষ্কর উপভোগ করিতেন। বিক্রমপুর ও তৎ সমীপবর্ত্তী স্থানে রাজবল্লভ যে সমস্ত নিষ্কর দিয়া গিয়াছেন তাহার সংখ্যাও কম নহে। অনেক দিন পর্য্যন্ত তিনি প্রত্যহ এক এক জন ব্রাহ্মণকে সোয়া বিঘা পরিমাণ ভূমি দান করিতেন। রাজবল্লভের স্বাক্ষরযুক্ত যে দানপত্রের প্রতিলিপি এই পুস্তকে সন্নিবিষ্ট হইয়াছে, তাহা সেই প্রাত্যহিক দানের নিদর্শনপত্র ভিন্ন আর কিছু নহে। "গয়ালীরা" যে তাঁহাদের বসতি ভূমি নিষ্কর ভোগ করিতেন তাহাও রাজবল্লভের অনুগ্রহের ফল বলিয়াই উমাচরণ বাবু লিখিয়াছেন। মুঙ্গেরে সীতাকুণ্ড. নামে যে এক তীর্থ আছে তাহার যাজকগণ অনেক ভূমি নিষ্কর ভোগ করিয়া থাকেন। অনেকে বলেন. এই সমস্ত নিষ্কর রাজবল্লভকর্তৃকই প্রদত্ত হইয়াছিল। উমাচরণ বাবু লিখিয়াছেন, একদা কোন মহারাষ্ট্রীয় ব্রাহ্মণ কন্যাদায় জানাইয়া রাজবল্লভের নিকট অর্থ যাচ্ঞা করিতে আসিলে তিনি তাঁহাকে লক্ষ মুদ্রা দান করিয়াছিলেন।

অগ্নিষ্টোম. অত্যগ্নিষ্টোম. রাজপেয় প্রভৃতি বহুব্যয়সাধ্য যজ্ঞ করিয়া রাজবল্লভ যে মুক্তহস্তে অর্থ বিতরণ করিয়াছেন, তাহা পূর্ব্বেই উল্লেখ করা হইয়াছে। মুরশিদাবাদের অন্তর্গত কিরীটেশ্বরীর আলয়ে তিনি কিরীটকোণ যজ্ঞ করিয়া কিরীটেশ্বরীর মন্দিরের উত্তরাংশে 'রাজবল্লভেশ্বর' নামক শিবমন্দিরের প্রতিষ্ঠা করেন। এই ব্যাপারে নবদ্বীপাধিপতি

কৃষ্ণচন্দ্র রায় সদস্যরূপে উপস্থিত ছিলেন এবং নানাদেশীয় ব্রাহ্মণ পণ্ডিত ও রাজা, ভূম্যধিকারী নিমন্ত্রিত হইয়া সেই অনুষ্ঠানে যোগদান করিয়াছিলেন।

নিষ্ঠাবান্ হিন্দু হইলেও রাজবল্লভ ধর্ম্মসম্বন্ধে উদারমত পোষণ করিতেন। বরিশাল জিলার অন্তর্গত শিবপুর গ্রামে যে খৃষ্টান ভজনালয় বিদ্যমান আছে, তাহার ব্যয় "মিশন তালুকের" আয় হইতে নির্ব্বাহিত হইয়া থাকে। এই মিশন তালুক রাজবল্লভকর্ত্তৃকই প্রদত্ত হইয়াছিল।

সংস্কৃতসাহিত্য ও হিন্দুশাস্ত্রের উন্নতির জন্য তিনি অর্থব্যয় করিতে কখনও কুণ্ঠিত হন নাই। রাজনগরে যে সমস্ত চতুষ্পাঠী ছিল তাহাদের প্রত্যেকটিতেই রাজবল্লভ বৃত্তি নির্দ্দিষ্ট করিয়া দিয়াছিলেন। যে কোন ছাত্র রাজনগরের চতুষ্পাঠীতে সবিশেষ প্রতিভার পরিচয় দিত, রাজবল্লভ তাঁহাকেই নিজব্যয়ে নবদ্বীপ পাঠাইয়া সুশিক্ষিত করাইতেন, এবং শিক্ষা সমাপ্ত হইলে তাঁহার জীবিকা সংস্থানের নিমিত্ত আবশ্যক পরিমাণ বৃত্তির নির্দ্ধারণ করিয়া দিতেন। সুপ্রসিদ্ধ কৃষ্ণদেব বিদ্যাবাগীশ যে কৃষ্ণদেবপুর পরগণার জমিদারিস্বত্ব লাভ করিয়াছিলেন, অনেকে বলেন তাহাও রাজবল্লভই দান করিয়াছিলেন। (১) উমাচরণ বাবু বলেন যে, রাজবল্লভ উৎসব উপলক্ষ ভিন্নও, সময় সময় ব্রাহ্মণ পণ্ডিত ও চতুষ্পাঠীর ছাত্রদিগকে নিমন্ত্রণ করিয়া আনাইয়া, তাঁহাদিগের দ্বারা বিবিধ শাস্ত্রের আলোচনা করাইতেন এবং আলোচনা শেষ হইলে প্রত্যেককে উপযুক্ত পারিতোষিক দিয়া উৎসাহিত করিতেন। বিক্রমপুরে যে এক সময় ব্রাহ্মণপণ্ডিতের বাহুল্য ঘটিয়াছিল, তাহা রাজবল্লভের উৎসাহ-দানের ফল ভিন্ন আর কিছুই নহে।

---

(১) কাহারও মতে গঙ্গাগোবিন্দ সিংহের অনুগ্রহেই বিদ্যাবাগীশ মহাশয় এই জমিদারী লাভ করেন।

ঢাকা, মুরশিদাবাদ, রাজমহল, মুঙ্গের ও বারাণসীধামে রাজবল্লভের আবাসগৃহ ছিল। রাজকার্য্যহইতে অবসর গ্রহণ করিয়া শেষ জীবন বারাণসীধামে অতিবাহিত করিয়া পূণ্যতোয়া ভাগীরথীর সলিলে জীবন বিসর্জ্জন করিবেন, এই অভিপ্রায়ে জপ্সানিবাসী সুপ্রসিদ্ধ রামানন্দ সরকারের তত্ত্বাবধানে তিনি মণিকর্ণিকার ঘাটে নবরত্ন, পঞ্চরত্ন ও সপ্তদশরত্ন নামক তিনটি সুরম্য মন্দির ও বাঙ্গালীটোলায় একটি সুবৃহৎ হাবেলী নির্ম্মাণ করাইয়াছিলেন। মীরকাশেমের নৃশংশতায় রাজবল্লভের সেই আশা আর পূর্ণ হইতে পারে নাই। উমাচরণ বাবু লিখিয়াছেন যে, এই সমস্ত আবাসস্থানের প্রত্যেকটিতেই অতিথিসেবার সুবন্দোবস্ত ছিল এবং অতিথিগণকে শীতকালে শীতবস্ত্র ও গ্রীষ্মকালে ছত্রাদি প্রদান করিয়া তথায় তাঁহাদের সৎকার করা হইত।

নিরুপবীত বৈদ্যসন্তানগণমধ্যে যজ্ঞোপবীতপ্রথা প্রচলন, অক্ষতযোনি হিন্দুবিধবাগণের পুনর্ব্বিবাহবিষয়ক উদ্যোগ এবং "চন্দন" প্রভৃতি অনুষ্ঠানকল্পে রাজবল্লভ যে বহু অর্থব্যয় করিয়াছেন তাহা পূর্ব্বেই উল্লেখ করা হইয়াছে।

থোড় (১) রাজবল্লভের পিতা কৃষ্ণজীবনের অতি প্রিয় খাদ্য ছিল। এজন্য রাজবল্লভ পিতার বার্ষিক শ্রাদ্ধোপলক্ষে ভোজ্যের সহিত পুরোহিতকে "থোড়" দান করিতেন। রাজপুরোহিত উহা অকিঞ্চিৎকর জ্ঞানে সর্ব্বদাই ফেলিয়া রাখিতেন এবং এক দরিদ্র ব্রাহ্মণ তাহা সংগ্রহ করিয়া নিজ বাটিতে লইয়া যাইত। রাজবল্লভ ইহা লক্ষ্য করিয়া একবার বার্ষিক শ্রাদ্ধোপলক্ষে স্বর্ণনির্ম্মিত" থোড়" দান করিলেন। পুরোহিত এবার তাহা না ফেলিয়া নিতে উদ্যত হইলে সেই দরিদ্র ব্রাহ্মণ আসিয়া

(১) কলাগাছের সারাংশ।

তাহা দাবি করিয়া বসিল। থোড় কাহার প্রাপ্য এ বিষয়ে উভয়ে কিয়ংকাল বাদানুবাদ করিয়া অবশেষে রাজবল্লভের নিকট বিচারপ্রার্থী হইল। রাজবল্লভ বলিলেন যে, দরিদ্র বাহ্মণই থোড় পাইবার অধিকারী, সুতরাং স্বর্ণনির্ম্মিত থোড় দরিদ্র ব্রাহ্মণই পাইলেন। অতঃপর রাজবল্লভ প্রতিবর্ষেই ভোজ্যের সহিত স্বর্ণনির্ম্মিত থোড় দান করিতেন এবং সেই দরিদ্র ব্রাহ্মণ তাহা পাইয়া ক্রমে অবস্থার উন্নতি করিল। অদ্যাপি সেই ব্রাহ্মণের বংশধরেরা বিদ্যমান আছেন। পূর্ব্ববঙ্গের কোন কোন স্থানে থোড়ের অপর নাম 'আঠীয়া।' সুতরাং সেই ব্রাহ্মণের উত্তরপুরুষগণ 'আঠীয়া ব্রাহ্মণ' নামে অভিহিত হইয়া থাকেন।

সামাজিক নিয়মানুসারে যে কোন জাতীয় ব্যক্তি রাজবল্লভের সহিত সংশ্লিষ্ট ছিল, রাজবল্লভ তাহাকেই উপযুক্ত বৃত্তি প্রদান করিয়াছিলেন। কথিত আছে, তাঁহার রজক ও ক্ষৌরকার পর্য্যন্ত এতদূর সমৃদ্ধিসম্পন্ন ছিল যে তাহারাও ইষ্টকনির্ম্মিত অট্টালিকায় বাস করিত। রাজবল্লভের জন্মের সময় তাঁহার জন্মস্থান 'দাওনীয়া' গ্রামের যে অবস্থা ছিল তাহা পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে। একমাত্র রাজবল্লভেরই অর্থবলে ও চেষ্টার ফলে সেই নগণ্য গ্রাম সুপ্রসিদ্ধ ও রমণীয় 'রাজনগরে' উন্নীত হইয়াছিল। পারসিক ভাষার অধ্যাপনার নিমিত্ত রাজনগরে যে সমস্ত বিদ্যালয় ছিল তাহার সমস্তই রাজবল্লভের অর্থে পরিপুষ্ট হইত। রাজনগরের প্রাসাদে প্রতিমাসে দেবার্চ্চনা ও শ্রাদ্ধাদি কার্য্য এবং প্রতি পর্ব্বোপলক্ষে উৎসবের অনুষ্ঠান হইত। রাজবল্লভ সেই সমস্ত ব্যাপারে সামাজিক ও দরিদ্র লোকদিগকে পরিতোষপূর্ব্বক ভোজন করাইতেন।

গুরুবংশীয় কোন বালিকার বিবাহের ব্যয়ভার রাজবল্লভ নিজে বহন করিয়াছিলেন। সেই বিবাহ উপলক্ষে দেশীয় সমস্ত ঘটকই নিমন্ত্রিত হইয়াছিল। রাজা কৃষ্ণদাস ঘটকবিদায়ের ভার প্রাপ্ত হইয়া কি হারে

সহচার (১) করিতে হইবে জিজ্ঞাসা করিলে, উপস্থিত সকলেই বলিল যে, ষোলটাকাহারে সহচার করিলে কাহারও কোন আপত্তি থাকিবে না। রাজা কৃষ্ণদাস সেই ষোল টাকাই সহচার ধরিয়া তাহার ত্রিগুণ হারে প্রত্যেক ঘটককে প্রদান করিলেন। সেই অবধি বিক্রমপুরস্থ ব্রাহ্মণসমাজে ঘটকবিদায় উপলক্ষে সহচারের ত্রিগুণ টাকা দেওয়ার প্রথা প্রবর্ত্তিত হইয়াছে।

রাজবল্লভের দানশীলতাসম্বন্ধে একটি কিংবদন্তী প্রচলিত আছে যে, একদা কোন ব্রাহ্মণ স্বীয় দুরবস্থা জানাইয়া রাজবল্লভের নিকট তাঁহার একদিনের আয় ভিক্ষা প্রার্থনা করিলেন। তিনি ব্রাহ্মণকে সন্ধ্যার সময় পুনরায় আসিতে বলিয়া বিদায় প্রদান করিলেন। দিবসের অধিকাংশ সময় অতীত হইলেও কোন অর্থের সমাগম হইল না দেখিয়া রাজবল্লভ নিরতিশয় চিন্তিত হইয়া পড়িলেন। অবশেষে প্রদোষের অব্যবহিত পূর্ব্বে প্রচুর অর্থের সমাগম হইল এবং রাজবল্লভ তাহা সমস্তই সেই ব্রাহ্মণকে প্রদান করিলেন। বলা বাহুল্য যে ব্রাহ্মণ এইরূপে প্রায় লক্ষ টাকা পাইয়াছিলেন।

রাজবল্লভের অনুগ্রহের ফলে বহুসংখ্যক লোক দরিদ্র অবস্থাহইতে উন্নত পদবীতে আরোহণ করিয়াছেন। এই সমস্ত লোকদিগের মধ্যে লালা কীর্ত্তিনারায়ণ ও জানকীবল্লভ রায় এবং কবি গুণাকর ভরতচন্দ্রের নামই সমধিক উল্লেখযোগ্য।

লালা কীর্ত্তিনারায়ণ বৈকুণ্ঠপুর পরগণার জমিদারবংশের আদিপুরুষ। এই জমিদারবংশ এখন বিক্রমপুরের অন্তর্গত শ্রীনগর গ্রামে বাস

(১) সহচার বলিতে ব্রাহ্মণ পণ্ডিতের সর্ব্বোচ্চ বিদায় বুঝায়। যিনি সর্ব্বাপেক্ষা উপযুক্ত, তিনি পূর্ণ সহচার এবং অবশিষ্টেরা গুণানুসারে পূর্ণ সহচারের অংশমাত্র পাইয়া থাকেন।

করিতেছেন। কীৰ্ত্তিনারায়ণ দরিদ্রের গৃহে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। একদা দারিদ্র্যের তাড়না সহ্য করিতে অক্ষম হইয়া তিনি রাজবল্লভের নিকট আগমন করেন। তৎকালে কীৰ্ত্তিনারায়ণের কৈশোরও অতিক্রান্ত হয় নাই। রাজবল্লভ কীৰ্ত্তিনারায়ণের অশ্রুসিক্ত নয়ন দর্শন করিয়া স্নেহ-বিগলিত হইয়া পড়েন এবং অনুগ্রহপূৰ্ব্বক তাঁহাকে স্বীয় বিষয়সংক্রান্ত কার্য্যে নিযুক্ত করেন। কীৰ্ত্তিনারায়ণ তীক্ষ্ণ বুদ্ধি সম্পন্ন ছিলেন; সুতরাং যোগ্যতা প্রদর্শন করিয়া তিনি শীঘ্রই রাজবল্লভের চিত্তাকর্ষণ করিতে সমর্থ হন। রাজবল্লভ অবশেষে কীৰ্ত্তিনারায়ণকে ঢাকার নবাব সরকারে কোন এক কার্য্যে নিযুক্ত করেন। কালে কীৰ্ত্তিনারায়ণ উচ্চ রাজকার্য্য লাভ করিয়াছিলেন। (১)

---

(১) কীৰ্ত্তিনারায়ণের উত্তরপুরুষ শ্রীযুক্ত রাজেন্দ্রকুমার বসু মহোদয়ের প্রধান কার্য্যকারক শ্রীযুক্ত রাজমোহন চট্টোপাধ্যায় মহাশয় এই কথা বলেন। কিন্তু কীৰ্ত্তি-নারায়ণের সহোদর রামভদ্র বসু মহাশয়ের বৃদ্ধ প্রপৌত্র শ্রীযুত কাশীনাথ বসু-মহাশয় বলেন, "কীৰ্ত্তিনারায়ণ রাজবল্লভের নিজ বিষয়সংক্রান্ত কোন কার্য্যে নিযুক্ত ছিলেন না। তিনি প্রথমতঃ রাজবল্লভের অধীন রাজকৰ্ম্মচারী ছিলেন ও পরে তাঁহার তুল্যপদ লাভ করিয়াছিলেন।" কিন্তু বিক্রমপুর সানসিদ্ধিনিবাসী শ্রীযুক্ত শ্যামাকান্ত মিত্র মহোদয় বলেন, "আমরা বাল্যকাল হইতেই শুনিয়া আসিতেছি যে, কীৰ্ত্তিনারায়ণের পিতা কংশনারায়ণ বসু ইদিলপুর হইতে বিক্রমপুরের অন্তর্গত রায়েসবর গ্রামে গৃহ প্রতিষ্ঠা করেন। কংশনারায়ণের অবস্থা অতি শোচনীয় ছিল। কীৰ্ত্তিনারাণ যখন বালক মাত্র তখন একদিন তাঁহার জননী অর্থাভাবের নিমিত্ত কীৰ্ত্তিনারায়ণকে তিরস্কার করেন। কীৰ্ত্তিনারায়ণ এই ঘটনায় মৰ্ম্মাহত হইয়া গোপনে রাজনগরে উপস্থিত হন ও রাজবল্লভের নিকট স্বীয় দুরবস্থার কথা জ্ঞাপন করেন। রাজবল্লভ দয়াপরবশ হইয়া কীৰ্ত্তিনারায়ণকে প্রথমতঃ স্বীয় বিষয়সংক্রান্তকার্য্যে নিযুক্ত করেন ও পরে তাঁহাকে নবাবসরকারে প্রবেশ করাইয়া দেন।" রাজবল্লভের উত্তরপুরুষ শ্রীযুক্ত বাবু প্রতাপ চন্দ্র সেন মহাশয়ের নিকট যে হস্তলিখিত পুস্তক পাওয়া গিয়াছে তাহাতেও শ্যামাকান্ত

জানকীবল্লভ রায় বাকরগঞ্জ জিলার অন্তর্গত কলসকাঠীগ্রামনিবাসী জমিদারবংশের আদি পুরুষ। কথিত আছে জানকীবল্লভের সহোদরগণ তাঁহার প্রাণবিনাশে উদ্যত হইলে, তিনি সহোদরপত্নীগণের সহায়তায় পলায়ন করিয়া ছদ্মবেশে রাজবল্লভের আলয়ে আসিয়া উপস্থিত হন। কিয়ৎকাল সেই স্থলে এইভাবে অবস্থান করিয়া একদিন তিনি রাজবল্লভের নিকট আত্মপরিচয় প্রদান করেন। রাজবল্লভ অতঃপর তাঁহার হৃত সম্পত্তির উদ্ধার করিয়া দিলে জানকীবল্লভ স্বপদে পুনঃ প্রতিষ্ঠিত হন। জানকীবল্লভের উত্তরপুরুষগণ এখন বাকরগঞ্জ জিলার সুপ্রসিদ্ধ ভূম্যধিকারী। তাঁহারা যে এখন অরঙ্গপুরের জমিদারী ভোগ করিতেছেন, তাহাই সেই হৃত সম্পত্তি বলিয়া কেহ কেহ বলেন। কিন্তু কলসকাঠী

বসু এবং রাজমোহন বসুর উক্তিই সমর্থিত হইয়াছে। কীর্ত্তিনারায়ণ 'লালা' অপেক্ষা উচ্চতর উপাধি লাভ করিতে সমর্থ হন নাই। নবাবী আমলে যাঁহারা শাসনকর্ত্তৃত্বে নিযুক্ত হইতেন, তাঁহারা "রায়", "রাজা" ও 'মহারাজ"প্রভৃতি উপাধি লাভ করিতেন। এই সময় যাঁহারা আমলাশ্রেণীস্থ কর্ম্মচারী ছিলেন, তাঁহারাই "লালা" বলিয়া অভিহিত হইতেন। কীর্ত্তিনারায়ণ যে কোন প্রদেশের শাসনকর্ত্তৃত্বে নিযুক্ত ছিলেন, একথা কোন ইতিহাসে পাওয়া যায় না। অতএব কালীনাথবাবুর লিখিত বৃত্তান্ত যে সত্য, তাহা কিরূপে নির্দ্ধারণ করা যাইতে পারে?

শ্রীযুক্ত বসন্তকুমার সেন, বি-এল, মহাশয় বলেন:—"কীর্ত্তিনারায়ণ রাজবল্লভের নিজ বিষয়সংক্রান্তকার্য্যে নিযুক্ত থাকাকালেই আপন অবস্থা অনেক উন্নত করিয়া পৈত্রিক ভদ্রাসনের শ্রীবৃদ্ধি করেন এবং স্বগ্রাম রায়েসবরকেও শ্রীনগর আখ্যা দেন। একদিন রাজবল্লভ কৌতুকচ্ছলে কীর্ত্তিনারায়ণকে বলেন, কীর্ত্তিনারায়ণ! রায়েসবর হইতে শ্রীনগর কত দূর?" কীর্ত্তিনারায়ণ হাসিয়া উত্তর করেন, "মহারাজ! বিলদাওনিয়া হইতে রাজনগর যতদূর।" বিলদাওনিয়া রাজবল্লভের সময়ই রাজনগর আখ্যা পাইয়াছিল; সুতরাং রাজবল্লভ কীর্ত্তিনারায়ণের এই উত্তর শুনিয়া এতদূর সন্তুষ্ট হইলেন যে, অবিলম্বে তাঁহাকে ঢাকার নবাবসরকারে প্রবেশ করাইয়া দিলেন।"

নিবাসী শ্রীযুক্ত চণ্ডীচরণ তর্কবাগীশ মহাশয়ের মতে, এমদাদ খাঁ নামে জনৈক মুসলমান রাজপুরুষের সহায়তায় জানকীবল্লভ অরঙ্গপুরের জমিদারী উদ্ধার করিয়াছিলেন। এবিষয়ে রাজবল্লভ জানকীবল্লভের কোনরূপ সহায়তা করিয়াছেন কিনা তাহা তর্কবাগীশ মহাশয় নিশ্চিতরূপে বলিতে পারেন না। কিন্তু প্রতাপ বাবুর নিকট যে হস্তলিখিত পুস্তক পাওয়া গিয়াছে, তাহাতে রাজবল্লভের চেষ্টায় অরঙ্গপুরের জমিদারীর উদ্ধার হওয়ার কথা স্পষ্ট লিখিত আছে। তর্কবাগীশ মহাশয় বলেন, "জানকী বল্লভের পুত্র রঘুনাথ রায় রাজবল্লভের জমিদারী বোজরগ্ উমেদপুর পরগণার অন্যতম কর্ম্মচারী ছিলেন। একদা প্রাতে রঘুনাথ রাজবল্লভের দরবারে উপস্থিত হইলে রাজবল্লভ দেখিতে পান যে, রঘুনাথের ললাটে ব্রাহ্মণোচিত ফোটা বিদ্যমান নাই। রাজবল্লভ এইরূপ রীতিবিরুদ্ধ আচরণের কারণ জিজ্ঞাসা করিলে রঘুনাথ বলেন, 'আমার এমন একটুকু স্থানও নাই যে উহাকে আমি নিজস্ব বলিতে পারি। অতএব পরের মৃত্তিকা হরণ করিয়া ফোটা দেওয়া অপেক্ষা ফোটা না দেওয়াই ভাল মনে করিয়া আমি ফোটা দিতে বিরত হইয়াছি।' রাজবল্লভ রঘুনাথের উত্তরে সন্তুষ্ট হইয়া তাঁহাকে বোজরগ্ উমেদপুর পরগণার অন্তর্গত তিনখানি গ্রাম দান করেন। এখন সেই তিনখানি গ্রাম "কচুয়া তালুক" নামে আখ্যাত, এবং ঐ তালুকের বার্ষিক আয় ২০ সহস্র টাকার কম নহে। রঘুনাথের উত্তরপুরুষেরা অদ্যাপি সেই তালুক উপভোগ করিতেছেন।"

অনেকেই অন্নদামঙ্গল, বিদ্যাসুন্দর, রসমঞ্জরী প্রভৃতি কাব্য প্রণেতা রায় গুণাকর ভারতচন্দ্রের নাম অবগত আছেন। রায় গুণাকরের পূর্ব্ব-পুরুষগণ সম্পন্ন জমিদার ছিলেন। বর্দ্ধমানের রাজা কীর্ত্তিচন্দ্রের সহিত বিরোধ উপস্থিত হইলে তিনি রায় গুণাকরের সমস্ত সম্পত্তি অন্যায়রূপে হস্তগত করেন। রাজবল্লভ তৎকালে উচ্চপদে প্রতিষ্ঠিত ছিলেন। ভারত

চন্দ্র রাজবল্লভের নিকট আসিয়া কীর্ত্তিচন্দ্রের অত্যাচারের কথা জানাইলে, তিনি অনুসন্ধানে জ্ঞাত হইলেন যে কীর্ত্তিচন্দ্র সত্য সত্যই রায় গুণাকরের ভূসম্পত্তি অন্যায় মতে হস্তগত করিয়াছেন। তখন তিনি চেষ্টা করিয়া কীর্ত্তিচন্দ্রকে রায় গুণাকরের সমস্ত সম্পত্তি প্রত্যর্পণ করিতে বাধ্য করেন। কবিবর এই ঘটনায় কৃতজ্ঞ হইয়া রসমঞ্জরিতে লিখিয়াছেন ঃ—

"কৃষ্ণচন্দ্র মহারাজ, সুরেন্দ্র ধরণী মাঝ
কৃষ্ণনগরেতে রাজধানী।
সিন্ধু অগ্নি রাহু মুখে, শশী ঝাঁপ দেয় সুখে
যার যশে হয়ে অভিমানী॥
তার পরিজন নিজ, ফুলের মুখুটী দ্বিজ
ভরদ্বাজ ভারত ব্রাহ্মণ।
ভুরশুট রাজ্যবাসী, নানা কাব্য অভিলাষী
যে বংশে "প্রতাপ নারায়ণ"॥
রাজবল্লভের কার্য্য, কীর্ত্তিচন্দ্র নিল রাজ্য,
মহারাজা রাখিলা স্থাপিয়া।
রসমঞ্জরীর রস, ভাষায় করিতে বশ
আজ্ঞা দিলা রসে মিশাইয়া॥

প্রভূত ক্ষমতা এবং ঐশ্বর্য্যের অধিকারী হইয়াও রাজবল্লভ শুদ্ধাচারী এবং বিলাস-শূন্য ছিলেন। বিক্রমপুরস্থ প্রাচীন সম্প্রদায় একবাক্যে রাজবল্লভের পূতচরিত্রতাবিষয়ে সাক্ষ্য প্রদান করেন। তিনি জীবনে কোনরূপ মাদক দ্রব্যই স্পর্শ করেন নাই। কথিত আছে যে, একদা তিনি তৃতীয় পুত্র গঙ্গাদাসকে বহুমূল্য আলবোলায় তামাকু সেবন করিতে দেখিয়া, ঐ আলবোলা রাজসাগরের জলে নিক্ষেপ করিয়াছিলেন এবং জ্যেষ্ঠ পুত্র রামদাসের উচ্ছৃঙ্খলতার বৃত্তান্ত শুনিয়া তাঁহাকে কারাগারে

আবদ্ধ করিয়া রাখিয়াছিলেন। রাজবল্লভের সমকালবর্ত্তী লেখকগণ তাঁহাকে "দাতা" "শুদ্ধাচারী" বলিয়াই বর্ণনা করিয়াছেন। ঘেসেটি বেগমসংক্রান্ত যে কলঙ্কের কথা কৈলাস বাবু আরোপ করিয়াছেন, তাহা যে মিথ্যা তাহা পূর্ব্বে প্রদর্শিত হইয়াছে। উমাচরণ বাবু লিখিয়াছেন যে, রাজবল্লভের পার্শ্বে দুইজন ব্রাহ্মণ নিয়ত অবস্থান করিত এবং সর্ব্বদা "রাম" "রাম" শব্দ করিয়া তাঁহার হৃদয়ে ধর্ম্মভাব জাগরূক রাখিত। মৃত্যুর অব্যবহিত পূর্ব্বে যে তিনি রাম নাম উচ্চারণ করিয়াছিলেন তাহাতে সিদ্ধান্ত হয়, পবিত্র রামনামই তিনি ইষ্ট মন্ত্রের ন্যায় জপ করিতেন।

রাজবল্লভ যে কেবল স্বয়ং বিলাসশূন্য ছিলেন, এমন নহে। তাঁহার পরিবারস্থ মহিলাগণও বিলাসের কোন ধার ধারিতেন না। তাঁহারা নিঃসংকোচে সমস্ত গৃহকার্য্য স্বহস্তে নির্ব্বাহিত করিতেন, জ্যেষ্ঠা সহধর্ম্মিণী শশিমুখীর তত্ত্বাবধানে রন্ধনপ্রভৃতি যাবতীয় কার্য্যই সম্পন্ন হইত। আহারের সময় উপস্থিত হইলে তিনি নিজ হস্তে পরিবেশন করিয়া সকলকে পরিতোষমতে ভোজন করাইতেন। একদা রাজবল্লভ পুত্রগণ-সহ এক পংক্তিতে বসিয়া ভোজন করিতে বসিলে, শশিমুখী পরিবেশন করিতে আসিয়া চতুর্থ পুত্র রতনকৃষ্ণের পাত্রে সরু চাউলের অন্ন পরিবেশন করেন। রাজবল্লভের নিয়ম ছিল যে, পরিবারস্থ সকলেই সাধারণ চাউলের অন্ন আহার করিবে। সুতরাং তিনি রতনকৃষ্ণের পাত্রে সরু চাউলের অন্ন দেখিয়া বিদ্রূপচ্ছলে শশিমুখীকে বলিলেন, "রতনকৃষ্ণের পাত্রে অন্নের পরিবর্ত্তে নারিকেল কোরা দেওয়া হইল কেন?" শশিমুখী অপ্রতিভ হইয়া উত্তর করিলেন, "মোটা চাউলের অন্নে রতনকৃষ্ণের অসুখ হয়।" রাজবল্লভ এই উত্তরে অসন্তুষ্ট হইয়া বলিলেন যে, রতনকৃষ্ণ গৃহে অবস্থান করিয়া কেবল বিলাসপরায়ণ হইতেছে. অতএব তাহাকে আর দেশে রাখা হইবে না। বলা বাহুল্য যে অতঃপর

রাজবল্লভ রতনকৃষ্ণকে কার্য্যস্থলে লইয়া গিয়া মিতাচার শিক্ষা দিয়াছিলেন।

দেশীয় শিল্পে রাজবল্লভের প্রগাঢ় অনুরাগ ছিল। কর্ম্মকার, কুম্ভকার, স্বর্ণকার, কাংস্যবণিক্, তন্তুবায় প্রভৃতি নানাজাতীয় শিল্পী তাঁহারই যত্নে রাজনগরে উপনিবেশিত হইয়াছিল এবং তিনি সর্ব্বদা তাহাদিগকে শিল্পোন্নতিবিষয়ে উৎসাহ প্রদান করিতেন। রাজবল্লভের উৎসাহে রাজনগরে শিল্পের এতই উন্নতি হইয়াছিল যে, সমগ্র পূর্ব্ববঙ্গে রাজনগরের শিল্পকার্য্য আদর্শ স্থানীয় বলিয়া পরিগণিত হইয়াছিল।

রাজবল্লভের অমায়িকতা সর্ব্বজনবিদিত ছিল। তাঁহার উন্নতির চরমসীমা উপস্থিত হইলেও রামানন্দসরকারপ্রভৃতি বাল্য সহচরগণ তাঁহার অকৃত্রিম বন্ধুত্বহইতে বঞ্চিত হন নাই। মালখাঁনগরনিবাসী দেবীদাস বসু মহাশয়কে বিপদ্ হইতে উদ্ধার করিয়া তিনি যে বাল্যস্মৃতির মর্য্যাদা রক্ষা করিয়াছিলেন, তাহা পূর্ব্বেই উল্লেখ করা হইয়াছে। জপ্‌সার রামমোহন কোয়ারীর চেষ্টায় তিনি রাজকার্য্যে প্রবেশ করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন, এ নিমিত্ত তিনি কৃতজ্ঞতার চিহ্নস্বরূপ তাঁহার আলয়ে বর্ষে বর্ষে ভেট প্রেরণ করিতেন। তিনি শিক্ষককে কিরূপ সম্মান করিতেন তাহা রঘুনন্দনসংক্রান্ত বৃত্তান্তপাঠে অবগত হওয়া যায়। বিহারের শাসন-কর্ত্তৃত্বে নিযুক্ত হইয়া রাজবল্লভ সায়রমোতাক্ষরীণপ্রণেতা গোলাম হোসেন সাহেবের সহিত যেরূপ সদ্ব্যবহার করিয়াছিলেন তাহাতে স্পষ্টই দেখা যায় যে, উচ্চপদলাভ সত্ত্বেও তাঁহার কখনও আত্মবিস্মৃতি ঘটে নাই।

রাজনৈতিক ক্ষেত্রেও রাজবল্লভ সামান্য প্রতিভার পরিচয় প্রদান করেন নাই। তাঁহারই চেষ্টার ফলে নিবাইস একদা বাঙ্গালায় প্রভূত শক্তিশালী হইয়া উঠিয়াছিলেন। ঘেসেটিবিবী সিরাজ উদ্দৌলার সহিত

সন্ধি না করিলে, রাজবল্লভের পৃষ্ঠপোষকতায় বাঙ্গালার সিংহাসন অধিকার করিতে পারিতেন সন্দেহ নাই। বোজরগ্ উমেদপুর পরগণায় প্রজা-বিদ্রোহ উপস্থিত হইলে তিনি বিনা রক্তপাতে যে ভাবে উহা দমন করিয়াছিলেন তাহা অনেক রাজপুরুষেরই অনুকরণযোগ্য। মীরণের আকস্মিক মৃত্যুর পর, সেই বৃত্তান্ত গোপন রাখিয়া তিনি যে ভাবে সমগ্র সেনাদল পাটনায় আনিয়াছিলেন সেইরূপ কৌশল কয়জন সেনানী প্রদর্শন করিতে পারে? সম্রাট্ সাহ আলমের সহিত বাঙ্গালার নবাবের যে সন্ধি হইয়াছিল, তাহাতেও রাজবল্লভ দৌত্য-কৌশল প্রদর্শন করিতে ত্রুটি করেন নাই। ফলে রাজবল্লভের প্রতিভা সর্ব্বতোমুখী ছিল এবং সেই প্রতিভার সহায়তায় তিনি সকল বিষয়েই আত্মপ্রতিষ্ঠা করিতে পারিতেন। রাজবল্লভসম্বন্ধে যে সমস্ত অলৌকিক কিংবদন্তী প্রচলিত আছে, তাহা সমস্তই তাঁহার কৃতিত্বের পরিচায়ক ভিন্ন আর কিছুই নহে।

সামাজিক সংস্কারে কিংবা অপ্রচলিত ধর্ম্মানুষ্ঠানসমূহের পুনঃ প্রবর্ত্তন বিষয়ে রাজবল্লভ যে অগ্রণী ছিলেন, তাহা বিধবাবিষয়কআন্দোলন ও যজ্ঞানুষ্ঠান প্রভৃতি কার্য্যদ্বারাই সিদ্ধান্ত হয়।

দুঃখের বিষয় শ্রীযুক্ত কৈলাসচন্দ্র সিংহ মহাশয় একমাত্র বিদ্বেষের বশবর্ত্তী হইয়া ১২৮৯ সনের বান্ধব পত্রিকায় ৭৬ পৃষ্ঠায় নিম্নলিখিত মতে প্রলাপোক্তি করিয়াছেন ঃ—

"মুরাদ আলি ও রাজবল্লভ ক্রূর, নির্দ্দয় ও স্বার্থপর ছিলেন। রাজকার্য্যে নিযুক্ত হইয়াই তাঁহারা প্রজার সর্ব্বনাশ করিয়া ধনসঞ্চয় করিতে লাগিলেন। পূর্ব্ব হইতেই মহাশয় যশোবন্ত সিংহ ঢাকার নেজামতের দেওয়ানপদে। নিযুক্ত ছিলেন। তিনি মুরাদ আলি ও রাজবল্লভের আচরণে নিতান্ত ত্যক্ত হইয়া স্বীয় পদ পরিত্যাগ করিলেন। যশোবন্ত সিংহের কার্য্য

পরিত্যাগ সেই দুর্ব্বিনীতদিগের অত্যাচার বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। তৎকালে পূর্ব্ববঙ্গে যে অবস্থা হইয়াছিল, তাহা স্মরণ করিলে হৃদয় বিদীর্ণ হয়। কি রাজা, কি ভূম্যধিকারী, রাজবল্লভকে উৎকোচদ্বারা সন্তুষ্ট রাখিতে না পারিলে কাহারও নিষ্কৃতি ছিল না। এই সময় রাজবল্লভ জমিদার-দিগের সর্ব্বনাশ করিয়া জমিদারী সঞ্চয় করিতে লাগিলেন। ভাটি প্রদেশস্থ বোজরগ্ উমেদপুর পরগণা তাঁহার প্রথম ভূসম্পত্তি।"

পূর্ব্বোক্ত কথার সমর্থনোদ্দেশ্যে কৈলাস বাবু আবার ষষ্ঠসংখ্যক নব্যভারতের ৫৭৫ পৃষ্ঠায় লিখিয়াছেন ঃ—

"রাজবল্লভ কিরূপ অত্যাচারী ছিলেন, তাহা সমসাময়িক মুসলমান ইতিহাসলেখকগণ বিশেষ লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন। বিখ্যাত ইতিহাস লেখক Major Stuart (ষ্টুয়ার্ট সাহেব) সেই সমস্ত ইতিবৃত্ত হইতে সার সংগ্রহ করিয়া তাহা তৎপ্রণীত বাঙ্গালার ইতিহাসে প্রকাশ করিয়া গিয়াছেন ঃ—

রাজবল্লভের সমসাময়িক মুসলমান লেখকগণ যে সমস্ত ইতিহাস প্রণয়ন করিয়াছেন, তন্মধ্যে সায়র মোতাক্ষরীণ, রিয়াজু সেলাতিন, তারিফি মুজাফরী এবং চাহার গুলজার নামক পুস্তকই সমধিক প্রসিদ্ধ। এই সমস্ত ইতিহাসে রাজবল্লভের অত্যাচরসম্বন্ধে একবর্ণও লিখিত নাই এবং মুসলমান লেখকপ্রণীত অন্য কোন ইতিহাসেও যে রাজবল্লভ অত্যাচারী বলিয়া বর্ণিত হইয়াছেন, তাহাও জানা যায় না। কৈলাস বাবু ঐতিহাসিকের ধর্ম্মে জলাঞ্জলি দিয়া কেবল কল্পনার সহায়তাই ঐরূপ প্রলাপোক্তি করিয়াছেন। ষ্টুয়ার্ট সাহেবের ইতিহাসে লিখিত আছে ঃ—

"A. D. 1737—38. Nefisa Begum persuaded her husband (Suja Khan) to recall Gallibaly and promote Moradaly to the government of Dacca. He appointed

Rajballab, his Peshkar or Head clerk of the Boat Department and commenced his reign with many acts of oppression. Jeswant Roy then resigned his appointment and went to Murshidabad. Upon this the new government gave loose to their violence and rapacity, till they reduced the country to comparative poverty and desolation."

ইহার অব্যবহিত পূর্ব্বেই ষ্টুয়ার্ট সাহেব লিখিয়াছেনঃ—

"A. D. 1734. The superintendence of the Boat Department was given to Muradaly who had an accountant called Rajballab." (Stuart's History of Bengal, page 268).

উদ্ধৃত বাক্যের কোন স্থলেই লিখিত নাই যে, রাজবল্লভ কাহারও নিকট হইতে উৎকোচ গ্রহণ করিয়াছেন, অথবা কাহারও ভূসম্পত্তি অপহরণ করিয়াছেন। উদ্ধৃতস্থানে "They" শব্দটি "New Government" কে বুঝাইতেছে। মেজর ষ্টুয়ার্ট সাহেবের উল্লিখিত উক্তিতে এইমাত্র লিখিত আছে যে, মুরাদ আলি শাশনকর্ত্তৃত্ব লাভ করিলে রাজবল্লভ নাওয়ার বিভাগের পেস্কারীপদে উন্নীত হইয়াছিলেন। 'জাহাঙ্গীরনগর" নামক পরিচ্ছেদে বর্ণনা করা হইয়াছে এবং ইতিহাসজ্ঞ পাঠকমাত্রই অবগত আছেন, শাসনবিভাগহইতে নাওয়ারবিভাগ স্বতন্ত্র। অতএব New Goverment শব্দদ্বারা রাজবল্লভকে লক্ষ্য করা হয় নাই। মুরাদ আলির শাসনকালে পূর্ব্ববঙ্গে যে কৈলাস বাবুর হৃদয়বিদারক শোচনীয় অবস্থা হইয়াছিল, তাহাও উদ্ধৃত স্থানে লিখিত নাই।

পূর্ব্বে বলা হইয়াছে, মুরাদ আলির শাসনকর্ত্তৃত্ববিলোপ হওয়ার অন্তত: চতুর্দ্দশ বৎসর পরে, অর্থাৎ ১৭৫৪ খৃষ্টাব্দে বোজরগ উমেদপুর

পরগণা আগাবাকরের বিদ্রোহনিবন্ধন বাজেয়াপ্ত হইয়া রাজবল্লভের হস্তগত হইয়াছিল এবং ঐ সময় নিবাইস মহম্মদ ঢাকার শাসনকর্ত্তৃত্বে নিযুক্ত ছিলেন। নিবাইস মহম্মদের শাসনকালে রাজবল্লভ কিরূপভাবে রাজকার্য্য পরিচালনা করিয়াছেন তাহা কৈলাস বাবু নিজেই ১২৮৯ সনের বান্ধব পত্রিকার ৭৭ পৃষ্ঠায় নিম্নলিখিতরূপে বর্ণনা করিয়াছেন ঃ—

"নিবাইস মহম্মদ রাজবল্লভকে পূর্ব্বপদে স্থিরতর রাখিয়াছিলেন। কিন্তু তাঁহার অত্যাচারের লাঘব হইয়াছিল। রাজবল্লভ কিছুকাল বিড়াল তপস্বীর ন্যায় কালযাপন করিয়াছিলেন।" (১)

অতএব দেখা যাইতেছে, যে সময় রাজবল্লভের অত্যাচারের লাঘব হইয়াছিল এবং তিনি অন্ততঃ প্রকাশ্যে সদ্ব্যবহার করিতেছিলেন, তখন বোজরগ উমেদপুর পরগণা রাজবল্লভের হস্তগত হইয়াছিল। কৈলাস বাবু নিজেই বলিতেছেন, "ভাটি প্রদেশস্থ বোজরগ উমেদপুর পরগণাই রাজবল্লভের প্রথম ভূসম্পত্তি।" সুতরাং কৈলাস বাবুর সমস্ত উক্তি পর্য্যালোচনা করিলে প্রতীয়মান হইবে যে, মুরাদ আলির শাসনকালে রাজবল্লভ কোন জমিদারী সঞ্চয় কিংবা কোন জমিদারের সর্ব্বনাশ করিতে পারেন না। রাজদ্রোহীর সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করা অত্যাচারের মধ্যে পরিগণিত নহে। সুশাসন রক্ষা করিতে গিয়া প্রত্যেক রাজাই এরূপ কার্য্যে ব্রতী হইয়া থাকেন। সুসভ্য ইংরেজ শাসনেও বিদ্রোহীর সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করার প্রথা প্রবর্ত্তিত আছে। মুরশিদাবাদ দরবার হইতে বোজরগ উমেদপুর পরগণা বাজেয়াপ্ত হইয়াছিল, এ বিষয়ে রাজবল্লভের কোন অপরাধ নাই।

---

(১) এস্থলেও বিদ্বেষ-বহ্নিকুণ্ড কৈলাস বাবু ভ্রমে পতিত হইয়াছেন। ফলে, নিবাইস ঢাকার শাসনকর্তৃত্ব লাভ করার সময় রাজবল্লভ নাওয়ার বিভাগের অধ্যক্ষ ছিলেন এবং নিবাইসের আমলে তিনি দেওয়ান হইয়াছিলেন।

ফলে কৈলাস বাবু রাজবল্লভের অত্যাচারসম্বন্ধে যে সমস্ত কথা লিখিয়াছেন তাহা সমস্তই অপ্রকৃত ও বিদ্বেষমূলক। বিদ্বেষের বশবর্ত্তী হইয়া কেহ কেহ যে সত্যের মর্য্যাদা লঙ্ঘন করিতেও কুণ্ঠিত হয় না তাহা কৈলাস বাবুর দৃষ্টান্ত দেখিয়া স্পষ্টই বুঝিতে পারা যায়। অর্ম্ম সাহেব কৃত "ইন্দুস্তান" নামক ইংরেজী ইতিহাস রাজবল্লভের সমকালে বিরচিত হইয়াছিল। অনেক পাশ্চাত্য লেখক উক্ত ইতিহাসকে প্রমাণিক বলিয়া গ্রহণ করিয়াছেন এবং স্বয়ং কৈলাস বাবু ও ১২৮৯ সনের বান্ধব পত্রিকার ৭৭ পৃষ্ঠায় অর্ম্ম সাহেবকে একজন "বিখ্যাত ঐতিহাসিক" বলিয়া ব্যাখ্যা করিয়াছেন। এই ইতিহাসে এবং সায়র মোতাক্ষরীণে অনেক রাজপুরুষের অত্যাচারকাহিনী বিশদরূপে বর্ণিত হইয়াছে; কিন্তু রাজবল্লভের অত্যাচারসম্বন্ধে একটী বর্ণও লিখিত নাই। যদি রাজবল্লভ প্রকৃত প্রস্তাবেই অত্যাচারী হইতেন, তবে নিশ্চিতই অর্ম্ম সাহেব কৃত ইতিহাসে এবং সায়র মোতাক্ষরীণ প্রভৃতি পুস্তকে সে কথার উল্লেখ থাকিত।

রাজবল্লভ যে সমস্ত ব্যয়বাহুল্য করিয়াছেন, তদ্দৃষ্টে কাহারও সন্দেহ হইতে পারে যে, অত্যাচার ব্যতীত ঐ পরিমাণ ধনসঞ্চয় করা কাহারও সাধ্যায়ত্ত নহে। এস্থলে স্মরণ রাখা কর্ত্তব্য যে, রাজবল্লভ ঢাকা ও বিহারের শাসনকর্ত্তৃপদে নিযুক্ত ছিলেন। তাঁহার মাসিক বেতন যে কি তাহা অবশ্যই জানা যায় না; কিন্তু ইতিহাসপাঠে অবগত হওয়া যায় যে, রাজবল্লভ অপেক্ষা নিম্নপদস্থ হুগলির ফৌজদারের বেতন বার্ষিক আড়াই লক্ষ টাকা ছিল (১) এবং রাজবল্লভের পরবর্ত্তী ঢাকার শাসনকর্ত্তা মহম্মদ রেজা খাঁ বেতনস্বরূপ বার্ষিক নয় লক্ষ টাকা পাইতেন (২)।

(1) Orme's Indoostan, vol. II page 137.
(2) Long's Unpublished Records, page xii.

ঢাকা হইতে মুরশিদাবাদে রাজধানী স্থানান্তরিত হইলে, ঢাকাঁবিভাগের প্রজাসাধারণের উপর এক স্বতন্ত্র কর ধার্য্য হইয়াছিল। যে ব্যক্তি ঐ বিভাগের শাসনকর্ত্তৃত্বে নিযুক্ত হইতেন. তিনিই সেই কর পাইতেন (২)। অতএব নিয়মিতরূপে রাজবল্লভের যে প্রচুর আয় হইত তাহা অনায়াসে নির্দ্ধারণ করা যাইতে পারে। উমাচরণ বাবু বলেন যে. আগাবাকরের সমস্ত ধনরত্ন লইয়া রাজবল্লভ মুরশিদাবাদের দরবারে উপস্থিত হইলে, নবাব সন্তুষ্ট হইয়া তাহার অর্দ্ধাংশ রাজবল্লভকে দিয়াছিলেন। বলা বাহুল্য যে আগাবাকরের প্রচুর নগদ সম্পত্তি ছিল। রাজনগর নির্ম্মাণের সমস্ত ব্যয় রাজবল্লভ নবাব-সরকার হইতে পাইয়াছিলেন বলিয়া উমাচরণ বাবুর পুস্তকে লিখিত আছে। "নজরাণা" তৎকালে আদব কায়দার মধ্যে পরিগণিত ছিল এবং "নজরাণা" স্বরূপও রাজবল্লভের কম আয় হইত না। বোজরগ উমেদপুর পরগণার আয়ও যৎসামান্য ছিল না। পূর্ব্বোক্ত আয়ের বিষয় পর্য্যালোচনা করিলে প্রতীতি হয় যে, ব্যয়বাহুল্য করিতে রাজবল্লভের কোনরূপ অসদুপায়ে অর্থোপার্জ্জনের আবশ্যকতা হয় নাই।

অনেকে আবার "নজরাণা" আদায় সম্বন্ধেও রাজবল্লভের প্রতি কটাক্ষ করিয়াছেন। পূর্ব্বে প্রদর্শিত হইয়াছে যে. নজরাণা তৎকালে প্রচলিত নিয়মানুসারে বিধিসঙ্গত ছিল। পাশ্চাত্যজাতিসমূহ সময় সময় "নজরাণা" দিতে অসম্মত হইলে, রাজবল্লভকে তাহাদের সম্বন্ধে কঠোরতা অবলম্বন করিতে হইয়াছিল সন্দেহ নাই। ফলে পাশ্চাত্যেরা এইরূপে অসম্মত হইয়া রাজবিধি লঙ্ঘন করিয়াছিল ; অতএব রাজবল্লভ যে তাঁহাদের সম্বন্ধে ঐ উপলক্ষে কঠোরতার আশ্রয় লইয়াছিলেন. তদ্দ্বারা বরং তাঁহার দৃঢ়তাই প্রকাশ পায়।

(2) Hunter's Statistical Account of Dacca, page 127.

কেহ কেহ বলেন, রাজবল্লভ-প্রমুখ কতিপয় ব্যক্তির অন্যায় আচরণে মুসলমান রাজত্বের অবসান হইয়াছে। সিরাজউদ্দৌলাসংক্রান্ত যড়যন্ত্রে যে রাজবল্লভ লিপ্ত ছিলেন না তাহা পূর্ব্বে প্রদর্শিত হইয়াছে। ফলে মুসলমানরাজত্ব মুসলমান শাসনকর্ত্তৃগণের দোষেই বিনষ্ট হইয়াছে। আলিবর্দ্দীর পর যে যে ব্যক্তি বাঙ্গালার সিংহাসন অধিকার করিয়াছেন, তাঁহাদের কাহারও পদোচিত যোগ্যতা ছিল না। সিরাজ অত্যাচার ও অবিচারের-স্রোত প্রবাহিত করিয়া দিয়া ধ্বংসমুখে নিপতিত হইয়াছিলেন। মীরজাফর দুরাচার মীরণের হস্তে শাসনভার অর্পণ করিয়া কেবল অহিফেন সেবনেই কালযাপন করিতেছিলেন। উচ্ছৃঙ্খল-প্রকৃতি মীরণ এই সুযোগে রাজ্যমধ্যে যেরূপ অশান্তি-বন্যা প্রবাহিত করিয়া দিয়াছিল, তাহা পূর্ব্বেই বর্ণনা করা হইয়াছে। মীরজাফরের অণুমাত্রও রাজোচিত গুণগ্রাম ছিল না। তাঁহার দুর্ব্বলতার ফলেই পলাসীর যুদ্ধের পর ইংরেজজাতির প্রতিপত্তি অনেক পরিমাণে বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইয়াছিল। সমসাময়িক লেখকগণ মীরজাফরকে "ক্লাইবের গর্দ্দভ" বলিয়াই বর্ণনা করিয়া গিয়াছেন। কিন্তু তৎকাল পর্য্যন্তও ইংরেজের হৃদয়ে ভারতশাসনের উচ্চাকাঙ্ক্ষা উদিত হয় নাই। অবশেষে মীরকাশেম কলিকাতায় গিয়া মীরজাফরের বিরুদ্ধে যড়যন্ত্র করিতে প্রবৃত্ত হন এবং ইংরেজের সহায়তায় শ্বশুরকে পদচ্যুত করিয়া বাঙ্গালার সিংহাসন অধিকার করেন। এই সময় হইতেই ইংরেজের মনে দৃঢ় প্রতীতি হইল যে, তাঁহারা ইচ্ছা করিলে নবাবকে ভিক্ষুক ও ভিক্ষুককে নবাব করিতে পারেন। মীরকাশেম ইংরেজদিগের সহিত যড়যন্ত্রে লিপ্ত না হইয়া, শাসন-সংক্রান্ত কার্য্যে মীরজাফরের সহায়তা করিলে নবাবের ক্ষমতা অনেক পরিমাণে রক্ষিত হইতে পারিত সন্দেহ নাই। কৃতঘ্নতা ও বিশ্বাসঘাতকতাদ্বারা মীরকাশেম যে রাজ্য লাভ করিলেন তাহাও তাঁহার অপরিণামদর্শিতার

ফলে উপভোগ্য হইল না। নবাবীপদ লাভ করিয়াই তিনি দেশীয় ধনবান্ ব্যক্তিগণের ধনরত্নলুণ্ঠনে প্রবৃত্ত হইলেন এবং গুপ্তচর নিযুক্ত করিয়া প্রজাসাধারণকে ব্যতিব্যস্ত করিয়া তুলিলেন। সায়র মোতাক্ষরীণে লিখিত আছে যে, গুপ্তচরের ভয়ে এই সময়ে সকলে সামাজিকভাবে পরস্পর আলাপ পরিচয় করিতেও কুণ্ঠিত হইতে লাগিল। অবশেষে বাণিজ্য-শুল্কসম্বন্ধে ইংরেজদিগের সহিত মীরকাশেমের বিরোধের সূত্রপাত হইল। এ কথা স্বীকার্য্য যে ইংরেজেরা সেই সময় ন্যায়ের মর্য্যাদা রক্ষা করেন নাই। কিন্তু ভান্সিটার্ট সাহেব তদুপলক্ষে মীরকাশেমকে যে সমস্ত উপদেশ দিয়াছেন, তদনুসারে তিনি কার্য্য করিলে সমস্ত গোলযোগের মীমাংসা হইয়া যাইত এবং মীরকাশেমও নবাবীপদ অক্ষুণ্ণ রাখিয়া ক্রমে শক্তিসঞ্চয় করিতে পারিতেন। সন্দিগ্ধচিত্ত মীরকাশেম সকলকে কেবল সন্দেহের চক্ষেই নিরীক্ষণ করিতেন এবং এই সন্দেহের বশবর্ত্তী হইয়া তিনি রাজ্যের প্রধান প্রধান ব্যক্তিগণকে একদিনে নৃশংসরূপে হত্যা করিলেন। এই ঘটনায় উপযুক্ত চালকের অভাবে, প্রজাশক্তি একেবারে দুর্ব্বল হইয়া পড়িল। প্রজাশক্তির সাহায্য না পাইলে যে রাজশক্তি স্থায়ী হইতে পারে না, মীরকাশেম এই তত্ত্বে আস্থাবান্ ছিলেন না। সুতরাং তিনি ক্রমাগত প্রজাশক্তি দুর্ব্বল করিয়া রাজশক্তি বৃদ্ধি করিবার প্রয়াস পাইয়াছিলেন। এ নিমিত্তই মীরকাশেমকে একমাত্র রাজশক্তির উপর নির্ভর করিয়া শাসনদণ্ড পরিচালনা করিতে হইয়াছিল। মীরকাশেম একমাত্র রাজশক্তি বৃদ্ধি করিবার উদ্দেশ্যে যে সমস্ত সেনাসংগ্রহ করিয়াছিলেন, তাহাদিগকে তিনি পাশ্চাত্য প্রণালীতে সুশিক্ষিত করিতে সাধ্যানুসারে চেষ্টা করিতেও ত্রুটি করেন নাই সত্য; কিন্তু তাঁহার সেনাদল যে ইংরেজদিগের প্রবল শক্তি পর্য্যুদস্ত করিবার উপযুক্ত ছিল না, তাহা ভান্সিটার্ট সাহেব তাঁহাকে স্পষ্টরূপেই বুঝাইয়া দিয়াছিলেন।

দুর্ভাগ্যবশতঃ মীরকাশেম ভান্সিটার্ট সাহেবের হিতোপদেশ না শুনিয়া নিতান্ত অর্ব্বাচীনের ন্যায় সমরানলে ঝম্প প্রদান করিলেন সবং সঙ্গে সঙ্গে মুসলমানরাজলক্ষ্মী চিরকালের জন্য অন্তর্হিত হইল।

ইংরেজ যে এদেশের রাজত্বলাভ করিলেন. তাহা বোধ হয় ভারতবর্ষের কল্যাণোদ্দেশ্যে ভগবানেরই অভিপ্রেত, শিখদিগের ধর্ম্মগ্রন্থে লিখিত আছে "শিখসম্প্রদায়ের নবম গুরু সম্রাট্ আরঙ্গজেবকর্ত্তৃক কারারুদ্ধ হইয়া সম্রাটের অন্তঃপুরের দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করিলে. সম্রাটের জিজ্ঞাসামতে তিনি বলিয়াছিলেন, আমি পশ্চিম দিকে চাহিয়া দেখিলাম মুসলমান রাজত্ব শীঘ্রই রসাতলে ডুবিবার উপক্রম হইয়াছে এবং পৃথিবীর পশ্চিম প্রান্ত হইতে গৌরকান্তি টুপিধারী একজাতি ভারতবর্ষের সিংহাসন অধিকার করিবার উদ্দেশ্যে অগ্রসর হইতেছে।" হিন্দুগণ প্রাচীন আদর্শ হইতে স্খলিতপদ হইয়া মুসলমানকর্ত্তৃক রাজ্যচ্যুত হইয়াছিলেন এবং মুসলমানগণ বিলাসসাগরে নিমগ্ন হইয়া নানারূপে ন্যায়ের মর্য্যাদা লঙ্ঘন করিতেছিলেন। হিন্দুরাজত্বের অবসানসময়ে যে অবনতির-স্রোত প্রবাহিত হইতেছিল. মুসলমান শাসনকালে তাহা রুদ্ধ না হইয়া ক্রমেই বর্দ্ধিতায়তন হইয়া উঠিয়াছিল। মুসলমানরাজগণের আমলে লোক-শিক্ষার প্রসার অণুমাত্রও বর্দ্ধিত হয় নাই বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। বরং দেখা যায়, পূর্ব্বে ভারতবর্ষে যে সমস্ত শাস্ত্রের আলোচনা হইত তাহার অধিকাংশই এই সময় অপ্রচলিত হইয়া পড়িয়াছিল। ভারতবর্ষ যে জগতের শিক্ষাগুরু এ কথা এখন অনেকেই স্বীকার করেন। এই পবিত্র ক্ষেত্র হইতেই প্রথম সভ্যতার আলোক উদ্ভাসিত হইয়া সমস্ত জগৎ আলোকিত করিয়াছিল। সাহিত্য. জ্যোতিষ, গণিত, জ্যামিতি, দর্শন ও চিকিৎসা বিজ্ঞান প্রভৃতি সর্ব্বপ্রথম ভারতবর্ষেই আবিষ্কৃত হইয়া-ছিল। এখন যাঁহারা সুসভ্যজাতি বলিয়া পরিগণিত, তাঁহারা সভ্যতার

প্রথম অবস্থায় সকল শাস্ত্রেরই মূলতত্ত্ব ভারতবর্ষ হইতে সংগ্রহ করিয়া আপনাদের অবস্থা কত উন্নত করিয়াছেন। পক্ষান্তরে ভারতবর্ষ হইতে সে সমস্ত শাস্ত্র ক্রমে বিলুপ্ত হইয়া ভারতবাসিগণের অজ্ঞানান্ধকার বৃদ্ধি করিয়া দিতেছিল। গ্রীকবীর আলেকজাণ্ডার ভারতবর্ষীয় চিকিৎসকগণের চিকিৎসানৈপুণ্য দেখিয়া বিস্ময়াবিষ্ট হইয়াছিলেন; কিন্তু মোগলরাজত্বের শেষভাগে মুসলমান সম্রাট্‌গণের পরিবারস্থ মহিলাগণের চিকিৎসার নিমিত্ত ইংরেজ ডাক্তার বাউটন সাহেবের শরণ লইতে হইয়াছিল। ইংরেজরাজত্ব আরম্ভ হইবার পূর্ব্বে মোগল ও মহারাষ্ট্রীয়েরা ভারতবর্ষে সর্ব্বাপেক্ষা ক্ষমতাশালী জাতি বলিয়া পরিগণিত ছিল। মোগলদিগের যে অবস্থা হইয়া দাঁড়াইয়াছিল তাহা পূর্ব্বে বলা হইয়াছে। মহারাষ্ট্রীয়েরা এই সময় সন্নীতিমার্গ পরিত্যাগ করিয়া কেবল প্রকৃতিপুঞ্জের ধনরত্ন লুণ্ঠনে ব্যস্ত ছিলেন। সুবিশাল ভারতবর্ষে কেবল বিশ্বাসঘাতকা ও আত্মকলহের তাণ্ডব নৃত্য জনসাধারণের মনে ভীতি সঞ্চার করিতেছিল। প্রকৃতিপুঞ্জের অণুমাত্রও আত্মরক্ষার ক্ষমতা ছিল না। প্রবল ব্যক্তি অব্যাহতভাবে দুর্ব্বলের প্রতি অত্যাচার উৎপীড়ন করিতেছিল। ভারতবর্ষের এইরূপ শোচনীয় অবস্থা বিদূরিত করিতে এক মহতী শক্তির প্রয়োজন হইয়াছিল। বোধ হয় ভগবান্ এই নিমিত্তই সেই সমস্যার সময় ইংরেজকে ভারতে প্রেরণ করিয়াছিলেন। পলাসীর রণক্ষেত্র এবং মীরকাশেমের অধঃপতনই জগদীশ্বরের সেই মঙ্গলময়ী ইচ্ছার সোপান স্বরূপ হইয়া দাঁড়াইয়াছিল। তাৎকালিক কোন লোকে একথা বুঝিতে পারিয়াছে কিনা সন্দেহ। এমন কি ইংরেজেরা পর্য্যন্ত সেই তত্ত্ব তৎকালে যে হৃদয়ঙ্গম করিতে সমর্থ হন নাই, তাহা তাঁহাদের পরবর্ত্তী কয়েক বৎসরের কার্য্যাবলীদ্বারা সপ্রমাণ হয়।

এখন সকলেই দেখিতেছেন, ইংরেজরাজত্ব সুপ্রতিষ্ঠিত হইলে

ভারতবর্ষে অশান্তির পরিবর্ত্তে শান্তি আসিয়া অধিকার করিয়াছে। শিক্ষার পবিত্র আলোক ক্রমে জনসাধারণমধ্যে পরিব্যাপ্ত হইতেছে, এবং স্বেচ্ছাচারের পরিবর্ত্তে রাজবিধি সমূহ প্রবর্ত্তিত হইয়াছে। ভারতবর্ষের সর্ব্বাঙ্গীণ উন্নতিসাধন হওয়ার এখনও অনেক বিলম্ব আছে সন্দেহ নাই, কিন্তু দেশের কল্যাণসাধন প্রধানতঃ দেশীয় লোকের হস্তেই নিহিত রহিয়াছে। অদ্যাপি দেশের লোক স্বার্থ পরিত্যাগ করিতে শিক্ষা করে নাই। এখনও আমরা অসত্যকে ত্যাগ করিয়া সত্যের আশ্রয় গ্রহণ করি নাই। কায়িক ও মানসিক উভয়বিধ শিক্ষাই যে জাতীয় উন্নতি সাধনের প্রকৃষ্ট উপায় তাহা আমাদের সম্পূর্ণরূপে হৃদয়ঙ্গম হয় নাই। লোকশিক্ষাই জাতীয়-উন্নতির সোপান-স্বরূপ; লোকশিক্ষার সুবন্দোবস্ত না হইলে জাতীয় উন্নতির আশা করা বিড়ম্বনা মাত্র। রাজশক্তির সাহায্য না পাইলে প্রজাশক্তি যে সহজে উন্নতিলাভ করিতে পারে না একথা সত্য, কিন্তু তজ্জন্য প্রজাশক্তিকে যে সকল কার্য্যেই রাজশক্তির মুখাপেক্ষী হইয়া থাকিতে হইবে এ কথার কোন মূল্য নাই। আমরা এতদিন রাজশক্তির সাহায্যের উপর অনুচিতরূপে নির্ভর করিয়া নিশ্চেষ্টভাবে কালযাপন করিতেছিলাম বলিয়াই আমাদের আশানুরূপ উন্নতি সাধিত হয় নাই। প্রজাশক্তি নিরুদ্যম থাকিলে রাজশক্তি শত চেষ্টা করিয়াও রাজ্যের সর্ব্বাঙ্গীণ উন্নতিসাধন করিতে সমর্থ হয় না। অতএব এখন প্রজাশক্তির উদ্বোধন আবশ্যক হইয়া পড়িয়াছে। প্রজাশক্তি নিয়ন্ত্রিত হইয়া কার্য্য করিলে ইংরাজরাজ যে উপযুক্ত সাহায্য করিতে অগ্রসর হইবেন, সে বিষয়ে অণুমাত্রও সন্দেহ নাই। ন্যায়ের উপরই ইংরেজরাজত্ব প্রতিষ্ঠিত আছে এবং ইংরেজরাজ যে পর্য্যন্ত ন্যায়ের মর্য্যাদা রক্ষা করিয়া চলিবেন, সে পর্য্যন্ত তাঁহাদের রাজত্ব অক্ষুণ্ণই থাকিবে। কবিবর নবীনচন্দ্র সেন বলিয়াছেন :—

ধর বৎস! এই ন্যায়পরতাদর্পণ
বিধিকৃত, ব্রিটিশের রাজানিদর্শন।
যত দিন পূর্ব্বরাজ্যে ব্রিটিশ শাসন
থাকিবে অপক্ষপাতী বিশদ এমন
তত দিন এই রাজ্য হইবে অক্ষয়।
এই মহারাজনীতি, মোহান্ধ যবন
ভুলিয়াছে, এই পাপে ঘটিবে নিরয়।
এই পাপে কত রাজ্য হয়েছে পতন।
ভীষণ সংহার অসি রাজ্যের উপর
ঝোলে সূক্ষ্ম ন্যায়সূত্রে বিধাতার করে।
যবনের অত্যাচার সহিতে না পারি
হতভাগ্য বঙ্গবাসী চিরপরাধীন
লয়েছে আশ্রয় তব, দমি অত্যাচারী
যেই ধূমকেতু, বঙ্গ আকাশে আসীন
স্বর্গচ্যুত করি তারে নিজ বাহুবলে
শান্তির শারদ-শশী করিতে স্থাপন।
ভাবে নাই এই ক্ষুদ্র নক্ষত্রের স্থলে
উদিবে নিদাঘ তেজে ব্রিটিশ তপন।
এই আশ্রিতের প্রতি হইলে নির্দ্দয়
ডুবিবে ব্রিটিশ রাজ্য ডুবিবে নিশ্চয়।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

উত্তর পুরুষে

রাজবল্লভ যে সমস্ত ভূসম্পত্তি রাখিয়া গিয়াছিলেন, তন্মধ্যে কার্ত্তিকপুর, সুজাবাদ এবং রাজনগর পরগণাই সমধিক প্রসিদ্ধ। পূর্ব্ব অধ্যায়ে যে বোজরগ উমেদপুর পরগণার নামের উল্লেখ করা গিয়াছে, তাহা এই রাজনগর পরগণাতেই অন্তর্ভুক্ত হইয়াছিল।

রাজা রামদাস রাজবল্লভের মৃত্যুর পূর্ব্বে এবং কৃষ্ণদাস রাজবল্লভের সঙ্গে সঙ্গে পরলোক গমন করিয়াছিলেন। সুতরাং রাজবল্লভের মৃত্যুর পর তদীয় তৃতীয় পুত্র রাজা গঙ্গাদাসের হস্তেই পিতৃত্যক্ত সমস্ত ভূসম্পত্তির শাসনভার ন্যস্ত হইল। এই সময় কার্ত্তিকপুরের সুপ্রসিদ্ধ মুসলমান ভূম্যধিকারিগণ সাতিশয় প্রবল হইয়া উঠিলেন এবং ছলে বলে সমগ্র কার্ত্তিকপুর পরগণা গ্রাস করিয়া বসিলেন। বোজরগ উমেদপুর পরগণার অবস্থাও এই সময় অত্যন্ত শোচনীয় হইয়া দাঁড়াইল। ডবিন নামে জনৈক ইংরেজ ইতিপূর্ব্বে তথায় দুইটি মাত্র কুঠি সংস্থাপন করিয়াছিলেন। রাজবল্লভের মৃতুর অব্যবহিত পরেই তিনি পরগণার বিভিন্ন অংশে বহুসংখ্যক কুঠি সংস্থাপন করিলেন। অতঃপর কুঠির কর্ম্মচারিগণ প্রজাবর্গের অধিকারে কোন বৃক্ষ দেখিতে পাইলেই বিনা মূল্যে তাহা ছেদন করিতে লাগিল এবং দেশীয় পণ্যদ্রব্য ক্রয় করিয়া উপযুক্ত মূল্যের অর্দ্ধাংশ পর্য্যন্ত প্রদান করাও আবশ্যক মনে করিল না। যে সমস্ত গৃহস্থ কুঠির অনতিদূরে বাস করিত। তাহাদের কুলবালাগণের

সতীত্ব পর্য্যন্ত রক্ষা করা এখন দুঃসাধ্য হইয়া উঠিল। কেহ এই সমস্ত অত্যাচারকাহিনী কর্ত্তৃপক্ষের কর্ণগোচর করিলে তাহার আর লাঞ্ছনার পরিসীমা থাকিত না। প্রজাগণের তাফালে (১) যে কিছু লবণ উৎপন্ন হইতেছিল, কুঠির কর্ম্মচারিগণ তাহা সমস্তই বিনামূল্যে আত্মসাৎ করিতে লাগিল। এখন তাহারা জমিদারের অনুমতি অপেক্ষা না করিয়াই সুন্দরবনের নানাস্থানে লবণের তাফাল সংস্থাপন করিতে ব্রতী হইল। পূর্ব্বে ব্যবসায়পরিচালনা করিতে হইলে জমিদারকে নির্দ্দিষ্টহারে কর দিতে হইত। এখন ইংরেজবণিকগণ বোজরগ উমেদপুর পরগণার জমিদারকে সেইরূপ কোন কর দেওয়া আবশ্যক মনে করিলেন না। জমিদারের পক্ষ হইতে কেহ কোম্পানীর দস্তক দেখিতে চাহিলে, কুঠির কর্ম্মচারিগণ তাহাকে লগুড়াঘাতে আপ্যায়িত করিতে অণুমাত্রও সংকোচ বোধ করিল না। ইংরেজ বণিকের কোন পণ্য জমিদারীর মধ্যে দস্যু-কর্ত্তৃক লুণ্ঠিত হইলে, জমিদারের নিকট হইতেই তাহার ক্ষতিপূরণ আদায় হইতে লাগিল। অনেক সময় কুঠির কর্ম্মচারিগণ দস্যুকর্ত্তৃক কুঠির পণ্যদ্রব্য লুণ্ঠিত হইয়াছে, এইরূপ মিথ্যা কথা রটনা করিয়া দিয়াও জমিদারের উপর ক্ষতিপূরণ দাবী করিতে অগ্রসর হইল এবং জমিদার এইরূপ অন্যায় দাবী প্রদান করিতে বিলম্ব করিলে, তাহারা কাছারীতে বরকন্দাজ পাঠাইয়া জমিদারের কর্ম্মচারিগণকে ধৃত করিয়া কুঠিতে নিয়া অশেষ লাঞ্ছনা দিতেও ত্রুটি করিল না। অধীন তালুকদারের নিকট হইতে খাজনা আদায় করাও দুরূহ ব্যাপার হইয়া দাঁড়াইল। জমিদারপক্ষে ঐরূপ কর সংগ্রহের চেষ্টা হইলেই কুঠির কর্ম্মচারিগণ

---

(১) লবণ প্রস্তুতের বহুমুখবিশিষ্ট চুল্লী।

তালুকদারের পক্ষাবলম্বন করিয়া জমিদারের কর্ম্মচারিগণকে ভগ্নোদ্যম করিয়া দিতে লাগিল। (১)

রাজা গঙ্গাদাস অত্যন্ত শিষ্টশান্ত লোক ছিলেন এবং তাঁহার বয়ঃক্রমও অধিক ছিল না। সুতরাং তিনি এই সমস্ত বিপৎপাতে নিরতিশয় অধীর হইয়া জমিদারী ইস্তাফা দিবেন বলিয়া স্থির করিলেন। তৎকালে জপসানিবাসী লালা রামপ্রসাদ ও বিক্রমপুর শ্রীনগরনিবাসী লালা কীর্ত্তিনারায়ণ অনেক প্রবোধ দিলে রাজা গঙ্গাদাস সেই কার্য্য হইতে বিরত হইলেন। ক্রমে দুই বৎসর কাল এইরূপ অশান্তির মধ্যে যাপন করিয়া, শান্তির ক্রোড়ে আশ্রয় লইবার জন্যই যেন তিনি পরলোক গমন করিলেন।

অতঃপর রাজবল্লভের পঞ্চম পুত্র রায় গোপালকৃষ্ণ পিতৃত্যক্ত জমিদারীর শাসনভার প্রাপ্ত হইলেন। তিনি গঙ্গাদাস অপেক্ষা অধিকতর সাহসী এবং কার্য্যকুশল ছিলেন। শাসনভার গ্রহণ করিবার অব্যবহিত পরেই গোপালকৃষ্ণ উপযুক্ত সেনা সংগ্রহ করিয়া কার্ত্তিকপুরের ভূম্যধিকারিগণের বিরুদ্ধে অভিযান করিলেন। যুদ্ধে কার্ত্তিকপুরের ভূম্যধিকারিগণ পরাভূত হইলেন এবং কার্ত্তিকপুর ও সুজাবাদ পরগণা পুনরায় রাজবল্লভের পুত্রগণের অধিকারে আসিল। এই যুদ্ধে যে সমস্ত শত্রুসেনা নিহত হইল, তাহাদের ছিন্নশির রাজনগরে আনীত হইয়া অবিলম্বে ভূগর্ভে প্রোথিত হইল এবং গোপালকৃষ্ণ সেই স্থলে জয়চিহ্ন স্বরূপ এক মন্দির নির্ম্মাণ করাইয়া তন্মধ্যে "রণদক্ষিণা কালী" প্রতিষ্ঠা করিলেন। (২)

(১) Long's Unpublished Records, page 408.

(২) "অমৃতবাজার" পত্রিকার দৈনিক সংস্করণে এই সম্বন্ধে এক প্রবন্ধ বাহির হইয়াছিল। তাহাতে লিখিত আছে যে, শ্যামসুন্দর নামে জনৈক লোক এই যুদ্ধে গোপালকৃষ্ণের সেনা পরিচালনা করিয়া অসাধারণ বীরত্ব প্রদর্শন করিয়াছিলেন। এই

কাহারও মতে রাজনগরের সুপ্রসিদ্ধ "একবিংশতি রত্ন" নামক তোরণদ্বার গোপালকৃষ্ণের প্রযত্নেই নির্ম্মিত হইয়াছিল। বাকরগঞ্জ জিলার অন্তর্গত সিদ্ধকাঠীগ্রামনিবাসী মদননারায়ণ চৌধুরীর বংশোদ্ভব কোনও বালিকার সহিত রায় গোপালকৃষ্ণের পুত্র পীতাম্বর সেনের বিবাহ সম্বন্ধ সুস্থির হইলে, বিবাহের অব্যবহিত পূর্ব্বে গোপালকৃষ্ণকে বরযাত্রিসহ সিদ্ধকাঠীর সমীপবর্ত্তী নলছিটি নামক স্থানে কিয়ৎকাল শিবিরসন্নিবেশ করিয়া অবস্থান করিতে হইল। সেই উপলক্ষে তিনি ঐ স্থানে এক বন্দর ও তারা দেবীর মন্দির প্রতিষ্ঠা করিলেন। (১) বাকরগঞ্জ জিলায় এখন যে সমস্ত প্রধান বন্দর আছে, নলছিটির বন্দর তন্মধ্যে অন্যতম।

উক্তি কতদূর সত্য তাহা নির্ণয় করা সুকঠিন। অনুসন্ধানে জানা গিয়াছে যে, গোপালকৃষ্ণ স্বয়ংই এই সময় সেনাপতিত্ব করিয়াছিলেন। শ্যামসুন্দর নামে যে কোন ব্যক্তির অস্তিত্ব ছিল তাহা রাজপরিবারস্থ কোন লোকেই অবগত নহেন। তবে "শ্যামাই বাঘ" নামে যে গোপালকৃষ্ণের একজন অনুগৃহীত পরিচারক ছিল একথা সকলেই বলেন। ছয়গাঁনিবাসী শ্রীযুক্ত বঙ্গচন্দ্র ন্যায়ভূষণ মহাশয় বলেন যে, "গোপালকৃষ্ণের মৃত্যুর পর এই শ্যামাই বাঘই তাঁহার সংসারের কর্তৃত্ব করিত এবং এই ঘটনা উপলক্ষ করিয়া জনৈক বিদ্রূপ-কারী নিম্নলিখিত কবিতাটি রচনা করিয়াছিলেন :—

অঘাট হইল ঘাট, শূন্য হ'ল রাজপাট
শ্যামাই বাঘের চলে চিঠি
কি কহিব বিধির লীলা, কৃষ্ণচন্দ্র পড়ায় ছাইলা
রামকান্ত হইল মুখুটি।

কৃষ্ণকান্ত চক্রবর্ত্তী রাজনগরে চাকলাদারবংশে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন এবং তাঁহার বংশে তিনিই সর্ব্বপ্রথম পণ্ডিত হইয়াছিলেন। রামকান্তের পূর্ব্ব পুরুষগণ "শর্ম্মা" বলিয়া অভিহিত হইতেন। রামকান্ত উন্নত অবস্থা প্রাপ্ত হইলে কুলাচার্য্যগণ বশীভূত হইয়া তাঁহাকে মুখুটি উপাধি দিয়াছিলেন।

(1) History of Backergunge by Beveridge, page 153.

বোজরগ উমেদপুর পরগণায় যে সমস্ত ফারি মহাল ছিল, তাহার উপর ইংরেজ কোম্পানী দেওয়ানী সনন্দের অনুবলে কর ধার্য্য করিলে, ১৭৭৫ খৃষ্টাব্দে রায় গোপালকৃষ্ণ কলিকাতা কৌন্সিলে আবেদন করিলেন এবং সেই আবেদনের ফলে পূর্ব্বোক্ত কর উঠিয়া গেল।

রায় গোপালকৃষ্ণ বুদ্ধিমান্ এবং কার্য্যক্ষম হইলেও স্বার্থান্ধ হইয়া মাতা, ভ্রাতা ও ভ্রাতুষ্পুত্রগণের অনিষ্টসাধন করিতে পরাঙ্মুখ হইলেন না। রাজবল্লভের সহধর্ম্মিণীগণ ভর্ত্তার আমল হইতে আপন আপন ব্যয় নির্ব্বাহার্থ যে সমস্ত ভূমি নিষ্কর উপভোগ করিতেছিলেন, গোপালকৃষ্ণ কর্ত্তৃত্বভার গ্রহণ করিয়াই তাহা সমস্ত বাজেয়াপ্ত করিয়া ফেলিলেন, এবং ঐ সমস্ত ভূমি পুত্র পীতাম্বর সেনের নামে তালুক বন্দোবস্ত করিতেও কুণ্ঠিত হইলেন না। ক্রমে জমিদারীর অধিকাংশ খাসদখলীয় ভূমি রায় গোপালকৃষ্ণের আমলে পীতাম্বর সেনের তালুক ভুক্ত হইল এবং এইরূপ বন্দোবস্তের ফলে রাজবল্লভের জমিদারীর মোট আয়ের প্রায় অর্দ্ধাংশ একমাত্র গোপালকৃষ্ণেরই হস্তগত হইয়া গেল।

এই সময় রাজবল্লভের উত্তরাধিকারিগণমধ্যে কেবলকৃষ্ণ নামে রামদাসের বিধবা পত্নীর দত্তক পুত্র, প্রাণকৃষ্ণ, রাজকৃষ্ণ- হৃদয়কৃষ্ণ, ও রমাকৃষ্ণ নামে কৃষ্ণদাসের চারি পুত্র, কালীশঙ্কর ও রামকানাই নামে গঙ্গাদাসের দুই পুত্র, রামনারায়ণ নামে রতনকৃষ্ণের বিধবা পত্নীর দত্তক পুত্র, নীলমণি নামে রাধামোহনের পোষ্যপুত্র এবং কেবলরাম নামে রাজবল্লভের সর্ব্ব কনিষ্ঠ পুত্র বিদ্যমান ছিলেন। গঙ্গাদাসের জ্যেষ্ঠ পুত্র কালীশঙ্কর পিতৃব্যের স্বার্থপরতায় ক্ষুণ্ণ হইয়া ঢাকার মফস্বল দেওয়ানী আদালতে জমিদারী বাটোয়ারার নিমিত্ত মোকদ্দমা রুজু করিলেন। গোপালকৃষ্ণ সেই মোকদ্দমায় নানারূপ আপত্তি উত্থাপন করিয়া জবাব দিলেও, বিচারপতি ডন্‌কান সাহেব ১৭৮৩ খৃষ্টাব্দের ১৩ই নবেম্বর তারিখে

কালীশঙ্করের অনুকূলেই মোকদ্দমা নিষ্পত্তি করিলেন। এই নিষ্পত্তির ফলে রাজবল্লভের জমিদারী সম পাঁচভাগে বিভক্ত হওয়ায়, একভাগ রাজা গঙ্গাদাসের দুই পুত্র, একভাগ কৃষ্ণদাসের চারিপুত্র, একভাগ গোপালকৃষ্ণ, একভাগ রাধামোহনের দত্তক পুত্র এবং পঞ্চমভাগ কেবলকৃষ্ণ প্রাপ্ত হইলেন। রামদাস ও রতনকৃষ্ণ পিতার জীবদ্দশায় পরলোক গমন করিয়াছিলেন বলিয়া, বিচারক তাঁহাদের দত্তক পুত্রদ্বয়ের প্রত্যেকের নিমিত্ত জমিদারীর উপস্বত্ব হইতে মাসিক একশত টাকা বৃত্তি নির্দ্ধারণ করিয়া দিলেন। গোপালকৃষ্ণ এইরূপ নিষ্পত্তিতে সন্তুষ্ট না হইয়া সকৌন্সিল গবর্ণর জেনারল বাহাদুরসমীপে আপিল করিলেন, কিন্তু তাহাতেও ডন্‌কান্ সাহেবের রায়ই বাহাল রহিল।

আপিল নিষ্পত্তির অব্যবহিত পরেই গোপালকৃষ্ণ পরলোক গমন করিলেন এবং তদীয় পুত্র পীতাম্বর সেন ঐ ডিক্রি যাহাতে কার্য্যে পরিণত না হইতে পারে তদ্বিষয়ে নানারূপ চেষ্টা করিতে ত্রুটি করিলেন না। অবশেষে ঢাকাবিভাগের কালেক্টর শ্রীযুক্ত ডে সাহেব পূর্ব্বোক্ত ডিক্রি অনুসারে জমিদারী বিভাগ করিয়া দেওয়ার নিমিত্ত সহকারী টমসন সাহেবের উপর ভার অর্পণ করিলেন। (১)

যে সময় রাজবল্লভের উত্তরাধিকারিগণের মধ্যে এইরূপ গৃহবিবাদ চলিতেছিল, তৎকালে আর একটি আকস্মিক বিপদ্ উপস্থিত হইয়া তাঁহাদিগকে অধিকতর বিপন্ন করিয়া তুলিল। রাজনগর ও কার্ত্তিকপুর সুজাবাদ পরগণার কৃষকগণ ১৭৮৭ খৃষ্টাব্দের প্রারম্ভে আশানুরূপ ধান্য কর্ত্তন করিয়া মনের আনন্দে গৃহজাত করিয়াছিল এবং আগামী ফসলের প্রত্যাশায় ক্ষেত্রকর্ষণপূর্ব্বক বীজ বপন করিয়া বিবিধ সুখের কল্পনা

---

(1) History of Backergunge by Beveridge, page 96,

করিতেছিল। বর্ষাকাল সমাগত হইলে তাহাদের শ্যামল শস্যরাজি বর্ষা-সলিলে বর্দ্ধমান হইয়া লোচন স্নিগ্ধকর শোভার অবতারণা করিল, কিন্তু বিধাতার বিড়ম্বনায় এই শোভা অনেক দিন স্থায়ী হইতে পারিল না। হঠাৎ জল বৃদ্ধি হইল এবং তাহার ফলে সমস্ত শস্যই জলে নিমগ্ন হইয়া গেল। সঙ্গে সঙ্গে কৃষককুলের সমস্ত আশা ভরসাও নির্ম্মূল হইল। ক্রমে জল আরো বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইয়া সকলের ভদ্রাসন গ্রাস করিল। গৃহস্থেরা এখন নিজ নিজ গৃহপরিত্যাগপূর্ব্বক মঞ্চ প্রস্তুত করিয়া তদুপরি বাস করিতে লাগিল। শরৎকাল গত হইলে জল কমিয়া গেল, কিন্তু তখন কৃষকের গৃহে যে কিছু শস্য সঞ্চিত ছিল তাহা সমস্তই নিঃশেষ হইয়া গিয়াছে। সুতরাং দেশে এখন অন্নাভাব উপস্থিত হইল। কৃষক জনক জননীগণ এখন স্বয়ং অর্দ্ধাশনে থাকিয়া সন্তানগণের ক্ষুন্নিবৃত্তি করিতে লাগিল। অবশেষে সমস্ত সঞ্চিত শস্য ফুরাইলে তাহাদিগকে সসন্তান অভুক্ত অবস্থায়ই কাল কাটাইতে হইল। যাহারা ইতিপূর্ব্বে কখনও পর-প্রত্যাশী হয় নাই, তাহারা এখন দ্বারে দ্বারে ভিক্ষা করিয়া জীবিকা সংস্থান করিতে লাগিল। দেশে সকলেরই অন্নাভাব, সুতরাং ভিক্ষাও দুষ্প্রাপ্য হইয়া উঠিল। কৃষকগণ অতঃপর কঙ্কালশেষ দেহ লইয়া দলে দলে গৃহপরিত্যাগপূর্ব্বক ঢাকায় চলিয়া গেল। এস্থলে তাহারা সমস্ত দিন ভিক্ষা করিয়া রজনীতে রাজপথেই ক্লান্তির অপনোদন করিতে বাধ্য হইল। ভগবান্ তাহাদিগকে এইভাবেও অনেকদিন কালযাপন করিবার অবসর প্রদান করিলেন না। অল্পদিনমধ্যেই বিসূচিকা রোগের আবির্ভাব হইল এবং সেই হতভাগ্য নরনারীগণ তাহাতে আক্রান্ত হইয়া কালকবলে নিপতিত হইল। জনমানবপরিপূর্ণ রাজনগর ও কার্ত্তিকপুর-পরগণার অধিকাংশ এইরূপে বিনষ্ট হইলে সে স্থলের অধিকাংশ ভূমি পরবর্ত্তীবর্ষে অকর্ষিত অবস্থায়ই রহিয়া গেল। (১)

(1) History of Backergunge by Beveridge, page 401.

১৭৬৫ খৃষ্টাব্দে ইংরেজ কোম্পানী বাঙ্গালা দেশের দেওয়ানী লাভ করেন এবং তাঁহারা তদবধি প্রতিবর্ষে জমিদারগণের উপর পূর্ব্ব বন্দোবস্ত রহিতক্রমে কর ধার্য্য করিতেছিলেন। কোম্পানীর কর্ম্মচারীগণ এইরূপ করধার্য্যোপলক্ষে জমিদারগণের হিতের প্রতি দৃষ্টি না করিয়া, যাহাতে কোম্পানী লাভবান্ হইতে পারেন একমাত্র সেই বিষয়েই আগ্রহ প্রদর্শন করিতেন। সুতরাং প্রতিবর্ষেই জমিদারগণের স্কন্ধে অধিকতর গুরুভার রাজস্ব নিক্ষিপ্ত হইয়া তাঁহাদিগকে ব্যতিব্যস্ত করিয়া তুলিতেছিল। কোন জমিদার কোম্পনীর নির্দ্ধারিত রাজস্ব প্রদান করিতে অসম্মত হইলেই কোম্পানীর পক্ষ হইতে তাঁহার জমিদারী ক্রোক করিয়া, অধীন প্রজাগণ হইতে প্রত্যক্ষভাবে কর সংগ্রহ করা হইতেছিল।

১৭৮৭ খৃষ্টাব্দে রাজনগর পরগণার উপর ২০১৯৪৲ টাকা এবং কার্ত্তিকপুর সুজাবাদ পরগণার উপর ২৫৭৯১৲ টাকা রাজস্ব ধার্য্য হইল। এই সময় টমসন সাহেব কালেক্টর সাহেবের নির্দ্দেশ অনুসারে, উভয় পরগণার শাসনভার গ্রহণ করিয়া প্রজাগণ হইতে যে কর সংগ্রহ করিলেন, তাহাতে পূর্ব্বোক্তভাবে নির্দ্দিষ্ট রাজস্ব পর্য্যন্ত সংকুলান হইল না। এই বৎসর রাজনগর পরগণার ৪৫১৭৯৲ টাকা এবং কার্ত্তিকপুর সুজাবাদ পরগণার ১২২৩৮৲ টাকা রাজস্ব বাকি পড়িয়া রহিল। ১৭৮৮ খৃষ্টাব্দে ১৭৮৭ খৃষ্টাব্দের নির্দ্দিষ্ট হারে রাজস্ব দেওয়ার সর্ত্তে বন্দোবস্ত করার নিমিত্ত রাজবল্লভের উত্তরাধিকারিগণ আদিষ্ট হইলেন, কিন্তু তাঁহারা ঐ সর্ত্তে বন্দোবস্ত গ্রহণ করিতে প্রস্তুত না হওয়ায়, রেভেনিউ বোর্ড উভয় পরগণাই ডাক নীলামে বন্দোবস্ত করার জন্য ঘোষণা প্রচার করিলেন। ঢাকার কালেক্টরের বিস্তর চেষ্টা সত্ত্বেও কেহ নীলাম ডাকিতে অগ্রসর হইল না। অগত্যা ১৭৮৮ খৃষ্টাব্দে রাজনগর ও কার্ত্তিকপুর সুজাবাদ পরগণা কোম্পানীর খাস দখলেই রহিয়া গেল। এই বৎসর দুর্ভিক্ষ ও

মহামারীর ফলে পরগণার অবস্থা অত্যন্ত শোচনীয় হইয়া দাঁড়াইল, সুতরাং ১৭৮৭ খৃষ্টাব্দে যে পরিমাণ কর সংগৃহীত হইয়াছিল, এবার তাহাও হইল না। উপায়ান্তর অভাবে কোম্পানী ১৭৮৯ খৃষ্টাব্দে রাজনগর পরগণার রাজস্ব ৮৯৩৪৲ টাকা এবং কার্ত্তিকপুর সুজাবাদ পরগণার রাজস্ব ১৩৭৯১৲ টাকা মিনাহ দিয়া ঐ সনের জন্য রাজবল্লভের উত্তরপুরুষগণের সহিত বন্দোবস্ত করিলেন। (১)

টমসন সাহেব ১৭৯০ খৃষ্টাব্দে বাটোয়ারার কার্য্যে নিযুক্ত হইয়া ১৭৯২ খৃষ্টাব্দের ২রা মে তারিখে কার্য্য শেষ করিলেন। এই সময় জমিদারীর অধিকাংশ স্থল বনজঙ্গলে পরিপূর্ণ ছিল; সুতরাং তিনি ভূমি চিহ্নিত করিয়া না দিয়া প্রাপ্য কর ও দেয় রাজস্ব সমান পাঁচভাগ করিয়া দিলেন। তৎকালে বোজরগ উমেদপুর পরগণার বার্ষিক স্থিতের পরিমাণ ২৩০৪০৬৲ টাকা নির্দ্ধারিত হইল এবং টমসন সাহেব সেই স্থিতের হারাহারী ধরিয়া পরগণার দেয় রাজস্বের পরিমাণ ১৮৭১০৭।৴ আনা ধার্য্য করিলেন। রাজবল্লভের উত্তরপুরুষগণ এইরূপ গুরুভার রাজস্ব বহন করিতে অসম্মত হইলেন। কিন্তু টমসন সাহেব তাঁহাদিগের সকলেকে ধৃত করিয়া আনিয়া কারাগারে নিক্ষেপপূর্ব্বক কয়েকদিন অনশনে রাখিলেন। অগত্যা তাঁহারা টমসন সাহেবের নির্দ্ধারিত রাজস্ব প্রদান করিবার মর্ম্মে তাহুত স্বাক্ষর করিয়া নিষ্কৃতি লাভ করিলেন। (২) এরূপে যে রাজস্ব নির্দ্দিষ্ট হইল তাহা দশসনা বন্দোবস্তেও স্থিরতর রহিল। কিন্তু রাজবল্লভের উত্তরপুরুষগণ এইরূপ গুরুভার রাজস্ব অনেক দিন বহন করিতে সমর্থ হইলেন না। ১৭৯৬ খৃষ্টাব্দে বাকি রাজস্বদায়ে পরগণা নীলামে উঠিল। কিন্তু কেহই নীলাম ডাকিতে অগ্রসর

---

(1) History of Backergunge by Beveridge, pages 399 to 401.

(2) History of Backergunge by Beveridge, pages 399 to 401.

না হওয়ায় কোম্পানী ১৲ টাকা মূল্যে উহা নীলাম খরিদ করিলেন। (১) ফলে একমাত্র গুরুভার রাজস্বই যে এক্ষেত্রে সর্ব্বনাশের কারণ হইল সে বিষয়ে সন্দেহ মাত্রই নাই।

রামদাসের দত্তকপুত্র কেবলকৃষ্ণ সেনের কালীশঙ্কর ও ভৈরবচন্দ্র নামে দুই পুত্র জন্মিয়াছিল। কালীশঙ্কর নিঃসন্তান পরলোক গমন করেন। ভৈরবচন্দ্রের পুত্র রাজকুমার সেন এক অপ্রাপ্তবয়স্ক পুত্র বিদ্যমান রাখিয়া অল্পকাল যাবৎ পরলোক গমন করিয়াছেন।

রতনকৃষ্ণের দত্তকপুত্র রাজনারায়ণের কালীকিশোর ও হরকিশোর নামে দুই পুত্র বিদ্যমান ছিল। কালীকিশোরের পুত্র তারাপ্রসন্ন ও হরপ্রসন্ন জীবিত আছেন। হরকিশোর, চন্দ্রকিশোর ও বিপিনচন্দ্র নামে দুই পুত্র বিদ্যমান রাখিয়া পরলোক গমন করেন। বিপিনচন্দ্র এখন জীবিত নাই; তাঁহার একমাত্র পুত্র জিতেন্দ্র বর্ত্তমান আছেন। চন্দ্রকিশোর বাবু আগরতলার রাজসরকারে বিচারকের পদে প্রতিষ্ঠিত আছেন। চরিত্রবান্ বলিয়া লোকের নিকট তাঁহার যথেষ্ট খ্যাতির কথা শুনিতে পাওয়া যায়।

কৃষ্ণদাসের জ্যেষ্ঠ পুত্র রাজকৃষ্ণের শিবচন্দ্র, মাধবচন্দ্র ও ঈশ্বরচন্দ্র নামে তিন পুত্র ছিল। মাধব ও ঈশ্বরের বংশ বিলুপ্ত হইয়াছে। শিবচন্দ্রের একমাত্র প্রপৌত্র রাজেন্দ্রভূষণ জীবিত আছেন।

কৃষ্ণদাসের দ্বিতীয় পুত্র প্রাণকৃষ্ণের একমাত্র পুত্রের নাম কাশীচন্দ্র। কাশীচন্দ্রের পুত্র প্রতাপচন্দ্র জীবিত আছেন। প্রতাপ বাবু যৌবন অতিক্রম করিয়া পৌঢ়াবস্থায় পদার্পণ করিয়াছেন। রাজবল্লভের উত্তর-পুরুষগণ মধ্যে তিনিই পূর্ব্বপুরুষের গৌরব রক্ষা করিতে সমধিক যত্নশীল।

---

(1) History of Backerguuge by Beveridge, pages 60, 62. 63 and 96.

সে বিষয়ে সন্দেহ নাই।

কৃষ্ণদাসের তৃতীয়পুত্র হৃদয়কৃষ্ণের রামকুমার, নীলরতন এবং রতনচন্দ্র নামে তিন পুত্র ছিল। রামকুমার ও রতনচন্দ্র নিঃসন্তান পরলোকগমন করিয়াছেন, নীলরতনের একমাত্র পুত্র শশিভূষণ এখনও জীবিত আছেন।

রাজা গঙ্গাদাসের পুত্র কালীশঙ্করের নিত্যানন্দ, স্বরূপচন্দ্র, ঈশ্বরচন্দ্র, অভয়চন্দ্র ও নবকুমার নামে পাঁচ পুত্র ছিল। নিত্যানন্দ, স্বরূপচন্দ্র ও অভয়চন্দ্রের বংশ লোপ পাইয়াছে। ঈশানচন্দ্রের পুত্রের নাম জগদ্বন্ধু। জগদ্বন্ধু সেন দক্ষিণা, সুরেন্দ্র, মহেন্দ্র ও মনোরঞ্জন নামে চারি পুত্র বর্ত্তমান রাখিয়া পরলোক গমন করেন। দক্ষিণা অতি অল্পকাল যাবৎ একটি শিশুপুত্র রাখিয়া কালকবলে পতিত হইয়াছেন।

কালীশঙ্করের কনিষ্ঠপুত্র নবকুমারের চন্দ্রকান্ত নামে এক পুত্র বিদ্যমান ছিলেন। চন্দ্রকান্ত বাবু স্বীয় প্রতিভাবলে ব্যবহারাজীবের কার্য্যে বিপুল অর্থ উপার্জ্জন করিয়া কামখ্যাধামে পরলোকের প্রতীক্ষায় অবস্থান করিতেছিলেন। সম্প্রতি তিনি কালীচরণ, উমাচরণ এবং তরণীচরণ নামে তিনপুত্র বিদ্যমান রাখিয়া পরলোক গমন করিয়াছেন। চন্দ্রকান্ত বাবুর ন্যায় ইহারা সকলেই চরিত্রবান্। কালীবাবু বিশ্ব-বিদ্যালয়ের বি, এল উপাধি লাভ করিয়া গৌহাটি জিলায় উকিল-সরকারের পদে নিযুক্ত আছেন। উমাচরণ বাবুও ওকালতী ব্যবসায়ে বিস্তর অর্থ উপার্জ্জন করিতেছেন।

রাজা গঙ্গাদাসের দ্বিতীয়পুত্র রামকানাই সেনের দুর্গাদাস সেন নামে এক পুত্র ছিল। দুর্গাদাসের পুত্র প্রসন্নকুমার এখনও জীবিত আছেন।

রায় গোপালকৃষ্ণ কেবলরামের বংশে কোন পুত্রসন্তান জীবিত নাই।

রাজবল্লভের ষষ্ঠ পুত্র রাধামোহন সেনের নীলমণি নামে এক পুত্র ছিল। নীলমণির পুত্র ভারতচন্দ্র ও বলরাম। ভারতচন্দ্র নিঃসন্তান

পরলোকগমন করিয়াছেন। বলরামের দুই পুত্র শ্যামাকান্ত ও বরদাকান্ত জীবিত আছেন। ইহারা উভয়েই সুশিক্ষিত। বরদা বাবু বিশ্ববিদ্যালয়ের বি, এ উপাধি লাভ করিয়াছেন।

রাজনগর কীর্ত্তিনাশার কুক্ষিগত হওয়ার পর হইতে রাজবল্লভের উত্তরপুরুষগণ ফরিদপুর জিলার অন্তর্গত পালঙ্গ গ্রামে অবস্থান করিতেছেন। তাঁহাদের সকলের বর্ত্তমান আর্থিক অবস্থা তাদৃশ সচ্ছল না হইলেও, পূর্ব্ববঙ্গের জনসাধারণ তাঁহাদিগকে এখনও অতিশয় সম্মান করিয়া থাকেন। অনেক লোকে তাঁহাদের নাম করিতে হইলে সম্মানার্থ "মহারাজ" বলিয়াই সম্বোধন করে। (১)

(১) শ্রীযুক্ত কৈলাসচন্দ্র সিংহ রাজবল্লভ সম্বন্ধে লিখিতে গিয়া তাঁহাকে ভ্রমেও "মহারাজ রাজবল্লভ" না লিখিয়া কেবল "রাজা রাজবল্লভই" লিখিয়াছেন। কিন্তু দুর্ল্লভরামসম্বন্ধে যখনই তিনি কোন কথা বলিয়াছেন তখনই তিনি মহারাজ দুর্ল্লভরাম লিখিতে কখনও বিস্মৃত হন নাই। অনেকে বলেন, রাজবল্লভকে 'মহারাজ" বলিয়া সম্বোধন করিতে কৈলাস বাবুর মনে অত্যন্ত কষ্ট বোধ হয় বলিয়া তিনি এ বিষয়ে মৌনাবলম্বন করিয়াছেন। রাজবল্লভ যে "মহারাজ" উপাধি লাভ করিয়াছিলেন, এ বিষয়ে কাহারও সন্দেহ হইলে তিনি ৮ম অধ্যায়ের চতুর্থ পরিচ্ছেদে রামনারায়ণ ও রাজবল্লভের যে দুইখানা ইংরেজী চিঠী উদ্ধৃত করা হইয়াছে, তাহা পাঠ করিয়া সন্দেহ নিবারণ করিতে পারেন।

পরিশিষ্ট

(ক)

To

WILLIAM DOUGLAS, ESQ.,

Collector of Ducca, Jalalpur.

Sir,

I was duly favoured with your letter of the 22nd ultimo communicating the orders of the Board of Revenue relating to the two petitions presented at the Khalsa by Kebal Kissen and Rajnarayan and on the one forwarded in my answer to them from the three surviving windows of Rajballab claiming a maintenance from the estate.

2. The Zemindars not possessing any other means for the discharge of the balance of stipend to the two former on account of 1196 B. S., amounting as per account adjusted by me to Rs. 1707. I have in obedience to the orders of the Board paid it to the parties from their Mashara and the collections being continued Khas in consequence of the Zemindars having declined to offer made them by the Board, I shall in obedience to their further orders discharge the stipend due to the claimants both for 1197 and 1198 from the Mashara recoverable by the parties for the current year and after the division of the Zemindary they have unanimously agreed to provide for the payment of it by joint contribution in money in preference to the appropriation of land for the purpose, each partner engaging to pay his proportion of it monthly.

3. From the enquiry which I found it necessary to make to give the information required by the Board relative to the provision that has been made to the three widows of Rajballab since the discontinuation of the allowance paid to them by Mr. Day, it appears that the annual allowance amounting to Rs. 7262 was ordered by him from the commencement of the Bengali year 1194 making for the four past years, 15104 and of which they have received only Rs. 7262, the balance therefore due to them on the order is Rs. 7842. But the Board taking into consideration that the balance was withheld principally in these years when the Zemindary was held Khas, when no allowance of Mashara (excepting in the last) was made, the proprietors and Zemindars of it in seasons when they experienced great difficulties in the discharge of the public revenue may not think it just to make them responsible for it, nor do I think the widows can be desirous of the balance when they know that the payment of it must distress the parties and believe they will be extremely thankful if the Board secure to them the regular payment of a maintenance for the future.

4. In order to show that the payment of it would much distress the Zemindars, I herewith send a statement of their account of Mashara both for the past and current year, by which it will be seen that estimating the net collection at Rs. 263000 including the *Jama* of the separated landholders, the balance recoverable by them amounts to no more than Rs. 6009 which their descent and increase of establishment and consequently additional expense, the rank of the ancestor invariably throws upon the Hindu progeny is considered barely sufficient to afford them a subsistence for the remainder of the year.

5. This statement, I am also to observe, neither includes a provision for the widows nor for indispensable religious charges, an expense attached to them and from which they cannot free themselves while they continue proprietors of the Zemindary, without incurring much disgrace and odium in the eyes of all Brahmins and Hindu sects in general. I shall therefore hope the Board will take these charges into consideration and allow me to repay them as in the past year independent of their Mashara.

6. With regard to Taluqs, alluded to in the petition forwarded by me from the widows, it appears that one in Rajnagar includes a very small part of the Pargana lands yielding an annual revenue of about Rs 220, and which they hold up on rent free tenure, the remainder of the Taluq is composed of lands rented from other parganas and being subject to the assessment of them, they enjoy the property only, the annual amount of which does not exceed Rs. 140, making the whole yearly amount forthcoming to them from it, Rs. 360. But prior to the abolition of the *Sair*, it amounted to Rs. 850. It seems that the latter lands of this Taluq were rented by Rajballab's elder widow, during the lifetime of her husband, who annexing the former to them made them over to her, and she accordingly enjoyed possession of them during her life, and on her demise the rents of them appear to have been appropriated to defray religious charges until the year 1196, when they were assigned over by the five partners to the petitioners who, prior to that period do not appear to have ever had any possession of the Taluq, but to have received occasionally sums of money for their necessary expenses.

7. With regreat to the Taluq in Bozergomedpur, claimed by the petitioners, it appears that it was Malguzari land.

subject to the assessment of Purgana during the life time of Rajballab and rendered Lakhiraj after his death in the Bengali year 1192 *by Lala Ramprosad the then managing Naib* who assigned it over to the elder widow for her life. I have before stated in my letter of the 22nd May last, that on her death it it was taken possession of by the late Rai Gopal Kissen, who annexing it to his Taluq, it devolved with them to his son Pitambar Sen, both of them continuing it on a Lakhiraj or rent-free tenure. In regard to the assertion before made by the latter, "that he held it in virtue of a deed of gift from the elder widow, granting it exclusively to his father", it appears to be false and he admits himself that he does not, nor ever did, possess such a deed, shifting it off to another assertion apparently equally false, "that it was a verbal gift," for it appears he was in the Pargana at the time of her death. But admitting that he possessed such a deed well authenticated, I submit, whether the doner had the right of making a gift of property assigned to her for her life only and which consequently on her death, reverted to the assignees *who were the heirs in general of Rajballab, through the managing Naib.* I may also observe that had it been her own independent property, such a gift would be contrary to the Hindu law, which makes in default of daughters, the childless widows her heirs, and in default of those, all her sons inherit her properties in equal shares, nor is any gift contrary to this law valid. In respect, however, to the property in question, this law is not applicable for the reasons above stated, the assignment having been made for her life only. *Nor had the Naib the powers of making any disposal of it in perpetuity to deprive any particular heir for ever of his right in it.* I should further think that the rendering of it Lakhiraj originally was improper and

unauthorised, under the consideration that it before formed a part of the Malguzari lands assessed and consequently responsible for the public revenue, for although every Zemindar may be admitted and invariably does, when Zemindary affords him a profit, set apart lands for each separate branch of his private expense, I believe, none were vested with the power of releasing them from this responsibility ; a power which might be carried to an extent to deprive the Government vesting it to the means of existence. The Taluq, at least, I think ought to have been re-annexed to the Purgana and made again to the assessment of it on the demise of the elder widow, for whose maintenance, the revenue of it had been assigned, or otherwise to have devoted to the surviving widows for their lives ; for Pitambar sen can have no inclusive right to it or to hold it on a rent-free tenure, by which the revenue for some years past has been subject to a double charge for the maintenance of the widows, and the other partners must continue subject to a double charge, if he be permitted to retain it.

8. The four partners, it appears, authorised the assignment of it to the surviving widows in the year 1196 B. S., when they were in possession of the one in Rajnagar, and are now desirous that both should be made over to them for their lives including them however in the Butwara, in order to guard against disputes after their demise, regarding their right to the reversion of their respective shares ; similar to that now subsisting between them relative to the Taluq in Bozergomedpur and which I recommend to be done as both reasonable and advisable. Pitambar Sen is the only partner who objects to give them possession of the Taluqs, and this objection is evidently to retain the one in Bozergomedpur ; but the Board, I trust will be enabled to determine from the

information herein given, taking at the same time into consideration that he holds neither *patta* nor other documents, for it, whether he had any just right to it, as also whether it is to be continued on a rent-free tenure, either in the event of its being confirmed to him or determined the joint property of all the parties in equal shares.

9. The Board were informed in my former letter upon the subject that their Taluq was included in the attachment of the lands claimed by Pitambar Sen, in the last year and it also continues attached for the current. The next amount realised from it in the past year was Rs. 2300, and the annual revenue of it may be estimated at this sum which added to the produce of the one in Rajnagar, will make the total yearly amount from both, receivable by the widows, about Rs. 266c, being little deficient of Rs. 75 per mensem to each of them; considering however, they have numerous female slaves who form a part of their family and whom they conceive themselves bound to maintain, that they have also their religious ceremonies to perform attended with an expense, I do not think this allowance adequate. I must further think that the appropriation of land will subject them to a deduction from it for the pay of officers whom they must necessarily employ and the amount receivable by them will always much depend on their faithful discharge of the trust, nor have they the loss which may arise for the dishonesty of these servants only to apprehend, but, the further, and probably the greater one from the oppression of the partners over their tenants, and which they have already experienced in the Taluq in Rajnagar in a degree to lay them under the necessity of having a peon at a monthly charge from the Collector for their protection. I therefore submit to the Board, whether it will be more advisable

to make a division of the Taluq between the partners, and in lieu of them to fix a monthly stipend for the widows to be paid them regularly by each partner in equal proportion. This stipend, I would propose to be fixed at Rs. 100 per mensem for each of the widows which with the same amount payable to each of the adopted sons will be Rs. 500 per mensem from the whole Zemindary or Rs. 100 for each share and to secure the regular payment of it to the pensioners after the division of the Zemindary, I submit, the property of each partner entering into an obligation binding himself for the regular discharge of his proportion of it and in default agreeing to the stoppage of it by the Collector from his monthly *kists*.

10. Should this mode meet with the approbation of the Board, the stipend of each pensioners will be fixed and the regular payment of it secured to them and I am induced to recommend it in preference to the appropriation of land, as this in case of death might be subject to dispute among the partners in resuming their respective shares of the deceased pensioner's proportion.

11. I shall be much obliged by the early instruction of the Board relative to this proportion that in the event of it meeting with their approbation the Taluqs may accordingly be included in the Butwara.

12. I shall be further obliged by their order whether the produce of these Taluqs may be paid to the widows for the current year, or from what other fund they are furnished with a maintenance, accompanying statement of the Zemindar's Mashara making no provision for it as already observed, nor for religious charges upon which I must also solicit the favour

of early orders of the Board, as likewise upon the points whether the Masahara is to includ the 100 per cent upon the Jama of the seperated Taluq, the amount of which will be seen in the account of proposed statement transmitted you.

RAJNAGAR,
The 23rd September 1791.

I am &c., &c.
Sir
Your most obedient servant
(SD.) G. THOMSON,
2nd Asst. D. C.

(খ)

৺উমাচরণরায়প্রণীত জীবনী

গ্রন্থারম্ভ

উপক্রমণিকা

কীর্ত্তিমান্ ও কৃতী ব্যক্তিদিগের জীবনচরিতজ্ঞাপন যে অস্মদাদির পক্ষে অপরিমিত হিতকর কর্ম্ম ইহা গুণাকরনিচয় জনগণ ভিন্ন অদ্যাপি অন্যেতর সাধারণের ধারণাস্থ হইয়াছে কি না সন্দেহ। কেন না, এ যাবৎকাল মধ্যে বঙ্গদেশীয় যে সমস্ত প্রশংসনীয় ব্যক্তি অস্ত পাইয়াছেন, আর যাঁহাদিগের বলবীর্য্য পরাক্রম এবং বিদ্যা বুদ্ধি বদান্যতা এতদ্বঙ্গধামে কি পুরুষ কি যোষিৎ তাবতের মুখেই ঘোষিত, অদ্যাপি তাঁহাদিগের

অনেকের জীবনচরিত সংকলিত হইল না এবং কাহাকেও তৎহিতসাধনের সাধক দেখা যাইতেছে না। ইহা কি সামান্য দুঃখের বিষয়? জীবনচরিত পাঠে যে সাহস ও বুদ্ধি বিবেচনা ও সৎকর্ম্মাদির উৎসাহ বৃদ্ধি পায়, ইহা সজ্জন মাত্রেরই স্বীকার্য্য; যেহেতুক কাহারো জীবন-চরিতে সন্ধি-বিগ্রহাদির বর্ণন. কাহারো জীবন-চরিতে বদান্যতার বর্ণন, কাহারো জীবন-চরিতে বুদ্ধিকৌশলকীর্ত্তন, কাহারো জীবন-চরিতে ধার্ম্মিকতার প্রশংসন, ইত্যাকার নানা ব্যক্তির জীবন-চরিতে নানা প্রকারের স্বভাব শক্তির উক্তি হইয়া থাকে; তজ্জ্ঞাপনে নিকৃষ্ট ব্যক্তি নিবৃত্তি পাইয়া নিঃসন্দেহ সমূহ সদগুণাশ্রয়ী হওয়া যায়।

এ অভাজনের চিরাকিঞ্চন ছিল যে, শ্রীমন্মহারাজ রাজবল্লভ সেনের জীবন চরিত সংকলন করি; কিন্তু তাহার বিশেষ বৃত্তান্ত জ্ঞাত না থাকাতে এবং কোন পুরাবৃত্ত না পাওয়াতে তৎকল্প সম্পূর্ণ করণে অপারগ হইয়া ভগ্নোৎসাহই ছিলাম। ইদানীং শ্রীমন্মহারাজের বংশধর শ্রীযুক্ত বাবু গঙ্গাপ্রসাদ সেন মহাশয়ের অনুকম্পায় বিক্রমপুর রাজনগর নিবাসী মৃত গুরুদাস গুপ্তের বিরচিত পদ্যপূরিত শ্রীমন্মহারাজের জীবন-চরিতের অত্যন্ত জীর্ণ শীর্ণ পুরাতন এক গ্রন্থ পাইয়া তাহার বাহুল্যাংশ বর্জ্জনপুরঃসর স্থূলাংশ উদ্ধারপূর্ব্বক যথাসাধ্য যত্ন ও শ্রম সহকারে এই জীবন-চরিত প্রচার করিলাম।

আমি কখনও কোন গ্রন্থ অনুবাদ বা রচনা করি নাই, রচনার প্রণালীও বিশেষরূপে জ্ঞাত নাই। তথাচ এই দুঃসাধ্য কর্ম্মে প্রবর্ত্ত হইয়া কি পর্য্যন্ত সশঙ্কিত হইয়াছি, তাহা অকথ্য। দোষ থাকে গুণগ্রাহক দর্শক মহাশয়গণ মার্জ্জনা করিবেন, ইতি প্রার্থনা।

শ্রীউমাচরণ রায়, কাননগো।

জীবনী আরম্ভ

ঢাকাপ্রদেশীয় বিক্রমপুরের অন্তঃপাতী দাওনিয়া নামে এক গ্রাম ছিল। ঐ গ্রামে মজুমদারপ্রসিদ্ধি কতিপয় বৈদ্যবংশীয় আঢ্য লোকের বসতি ছিল। সেই বংশ ভিষক্‌কুলে সর্ব্বাংশে অদ্বিতীয়াবতংস ছিলেন। সেই মহদ্বংশজ ধর্ম্মকর্ম্ম-নিষ্ঠ পোষ্যপোষতৎপর দানশীল, জ্ঞানে জনগণ মধ্যে মান্যগণ্য শ্রীযুক্ত কৃষ্ণজীবন সেন মজুমদার মহাশয় ঢাকার নবাবের অধীন কানুনগো সিরিস্তায় একজন প্রধান কর্ম্মচারী ছিলেন। তদীয় সহধর্ম্মিণী পতিপ্রাণা সতী শ্রীমতী লক্ষ্মীপ্রিয়ার গর্ভে ১৭১৪ খৃষ্টাব্দে শ্রীমন্মহারাজ রাজবল্লভের জন্ম হয়। মজুমদারের চারি পুত্র ও এক কন্যা ছিল। তাহার প্রথম রাজারাম, দ্বিতীয় ধনীরাম, তৃতীর রাজবল্লভ, চতুর্থ রামরাম। তৃতীয় পুত্র রাজবল্লভের বাল্যকালাবধিই বুদ্ধির প্রাখর্য্য, ধারণাশক্তির গাম্ভীর্য্য, অর্জ্জনস্পৃহা ও বিলক্ষণ ধর্ম্মপ্রবৃত্তি ছিল। যদিও শৈশবাবস্থাতেই তাঁহার পিতৃবিয়োগ হইয়াছিল, তথাচ তিনি কোন বিষয়ে কোন প্রকারে ক্ষুব্ধচিত্ত বা ভগ্নোৎসাহী না হইয়া দৃঢ় প্রতিজ্ঞা ও পরিশ্রম সহকারে পারস্য ও তাৎকালিকী বাঙ্গালা বিদ্যায় বিলক্ষণ পটুতা লাভ করেন। বাল্যকাল হইতেই তাঁহার ভাব স্বভাব এবং কৃতকার্য্যদ্বারা গাম্ভীর্য্য চাতুর্য্যাদি মহত্ত্ব প্রকাশ পাইতে লাগিল। ক্রমে বিদ্যাবুদ্ধি সভ্যতা লাভ করিয়া ১৭৩৪ খৃষ্টাব্দে (১) ১৯ বর্ষ বয়েসেতে ঢাকার নায়েব নাজেম মুরাদআলী খাঁর অধিকারকালে

(১) গুরুদাস গুপ্ত লিখেন, রাজবল্লভের ১৯ বর্ষ বয়োগতে ১৭৩৪ খৃষ্টাব্দে ঢাকার নবাবের অধীনে তিনি স্বীয় পিতার পদে নিযুক্ত হন। এতাবতা ১৭৩৪ খৃষ্টাব্দ অবধি বিপরীত ক্রমে ১৯ বর্ষের আদি গণনা করিলে ১৭১৪ খৃষ্টাব্দ হয়। অতএবই ১৭১৪ খৃষ্টাব্দকে রাজবল্লভের জন্মাব্দ স্বীকার করা হইল।

রাজবল্লভ স্বীয় পিতার পরিত্যক্ত পদলাভের বাসনায় ঢাকা নগরে গমন করেন। তথায় যাইয়াই ঢাকার কানুনগো বিক্রমপুর মালখা-নগর নিবাসী কায়স্থ কুলনিধি রামনিধি বসু মহাশয়ের সাহায্যে অভীষ্ঠ পদলাভে কৃতকার্য্য হইলেন। (১) পরে নবাবের দেওয়ান যথার্থ যশস্বান যশোবন্ত রায় রাজবল্লভের কৃতকার্য্যে এবং গুণগৌরবে মোহিত হইয়া প্রথমতঃ রাজবল্লভকে পেস্কারী পদে উন্নতি প্রদান করাইয়াছিলেন। অনন্তর বঙ্গ, বিহার উড়িষ্যার সুবাদার মুরশিদাবাদের নবাব আলিবর্দ্দি খাঁর ভ্রাতুষ্পুত্র অথচ জামাতা নিবাইশ মহম্মদ ঢাকা প্রদেশের অধিকার প্রাপ্ত হইলে কিঞ্চিৎকাল পর রায় দেওয়ান আপনার স্থবিরাবস্থায় তীর্থাশ্রমে বিশ্রাম করাই বিধেয় বিবেচনায় নবাব সন্নিধানে আপনার অভীষ্ট ব্যক্ত করেন। নবাব তৎপদোপযোগী অপর এক ব্যক্তিকে দেওয়ানী কর্ম্মে নিযুক্ত করণ প্রতীক্ষায় রায় দেওয়ানকে অবসর দিতে অসম্মত হন। তাহাতে রায় দেওয়ান রাজবল্লভের সদ্বংশোদ্ভবতা ও কর্ম্মদক্ষতার

---

(১) প্রবাদ আছে যে, কৃষ্ণজীবন মজুমদার রাজবল্লকে সমভিব্যবহারে করিয়া ঢাকার পূর্ব্ব কানুনগো মালখানগরনিবাসী দেবীদাস বসুর ভবনে গিয়াছিলেন, তাহাতে বাল্যস্বভাববশতঃ রাজবল্লভ বসু কানুনগোয়ের পর্য্যাঙ্কোপরি শয়ন করিয়াছিল। এমন সময়ে কানুনগো মহাশয় তথায় উপস্থিত হইয়া দেখেন, বালক নিদ্রাবস্থায় অবস্থিত; কিন্তু তাহার আকার প্রকার বিলক্ষণ নিরীক্ষণ করত বিবেচনা করিয়াছিলেন, কোন না কোন সময়ে অবশ্য এই বালক মহদৈশ্বর্য্য ও বীর্য্যবান্ হইবেক। দৈবাৎ ইহাদ্বারা আমার বংশের অনিষ্টও হইতে পারে, অতএব সম্ভাবিত বিপদাশঙ্কা বিনাশার্থ এই বালকের পিতাকে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ করা বিহিত। এতাবতা কৃষ্ণজীবন মজুমদারকে বারংবার অনুরোধ করত বসুবংশের প্রতি রাজবল্লভের করুণাবিতরণের প্রতিজ্ঞায় প্রতিজ্ঞাত করাইয়া ভবিষ্যতের মঙ্গলাকর স্থাপন করিয়াছিলেন। তৎকালেই এ প্রদেশস্থ কায়স্থ জাতীয়ের মধ্যে উক্ত বসুবংশধরগণ রাজবল্লভের অনুগ্রহভাজন হইয়া বৃত্তিসম্পত্তি সহ রক্ষা পাইয়াছিলেন।

গুণানুবাদপূর্ব্বক পূর্ব্ব নবাব (রাজবল্লভের পিতা কৃষ্ণজীবন মজুমদারের কৃতকার্য্যে) নিকাশের দায় হইতে নিস্তার পাওয়ার এবং সেই সুকৃত কর্ম্মের ফলস্বরূপ নবাবসরকারহইতে লক্ষ মুদ্রা মজুমদারকে পুরস্কারী দেওয়া যাইবার প্রসঙ্গসহ পরিচয় দিয়া রাজবল্লভকে দেওয়ানীপদে নিয়োগ করণের অনুরোধ করাতে (পরদিন) তাহাকে নবাবের সমক্ষে আনয়নের অনুজ্ঞা হয়। তদনুসারে যশোবন্তরায় রাজবল্লভকে তদ্বার্ত্তা জ্ঞাপন করত আপন সমভিব্যাহারে নবাবের সাক্ষাৎ লইয়া যান। নবাব বাহাদুর নানাবিধ আলাপকলাপ দ্বারা রাজবল্লভের বিদ্যাবুদ্ধির পরীক্ষা করিয়া তাঁহাকে যথাযোগ্য পাত্র বিবেচনায় সন ১৭৪২ খৃষ্টাব্দে স্বীয়াধিকারের দেওয়ানীপদে নিযুক্ত করত নিয়োগ-পত্রী এবং উপযুক্ত খেলাত প্রদান করেন। এই পদই রাজবল্লভের সমস্ত সম্পত্তি ও যশোরাশি প্রাপ্তির সোপান বলিতে হইবেক)। রাজবল্লভ দেওয়ানী প্রাপণান্তর অত্যন্ত মনোযোগের সহিত রাজকার্য্যসম্পাদনে প্রবর্ত্ত হইয়া স্বীয় বুদ্ধিকৌশলে রাজ্যশাসনের নানাবিধ সদ্বিধি অবধারণ ও বহুতর পতিত রাজস্ব উদ্ধারকরণাদি সুকৃত কার্য্যের দ্বারা নবাবের প্রিয়পাত্র হইয়াছিলেন।

ইতি মধ্যে ১৭৪৩ খৃষ্টাব্দে মুরশিদাবাদের নবাব আলিবর্দ্দী খাঁ (নবাব নিবাইস মহম্মদের স্থানে ঢাকা প্রদেশের বক্রী রাজস্বসহ আয় ব্যয় স্থিতি বৃদ্ধির) নিকাস চাহিতে নবাব নিবাইস মহম্মদ আপনার সমভিব্যাহারে নিকাসের কাগজ পত্রসহ দেওয়ান রাজবল্লভকে মুরশিদাবাদ যাইবার আদেশ করেন। দেওয়ান রাজবল্লভ আজ্ঞানুসারে অনতিবিলম্বে স্বীয় পুত্রদ্বয় অর্থাৎ রামদাস ও কৃষ্ণদাস এবং ভ্রাতুষ্পুত্র মৃত্যুঞ্জয়ের সহিত যাত্রা করিয়া নবাব নিবাইস মহম্মদের অনুগামী হইয়া মুরশিদাবাদে উপনীত হন। তৎকালে মুরশিদাবাদের নবাবের অধীনে নায়েব ফৌজ

সাহামতজঙ্গ, রায় রাঁয়া মহেন্দ্রনারায়ণ, তন্মন্ত্রী বঙ্গাধিকারী স্বরূপ চাঁদ, ধন রক্ষক জগৎশেঠ প্রভৃতি কার্য্যকারক ছিলেন। দেওয়ানের মৃত্যু হওয়াতে যথাযোগ্য পাত্রের অভাবে তৎপদশূন্য ও দেওয়ানী সেরেস্তার কর্ম্মসকল বিশৃঙ্খল ছিল। পরে বিক্রমপুর জপ্সানিবাসী লালা রামপ্রসাদ সেন যিনি জ্ঞাতিত্ব সম্পর্কে রাজবল্লভের ভ্রাতুষ্পুত্র অথচ মুরশিদাবাদের নবাব সরকারের এক কর্ম্মচারী ছিলেন, তিনি দেওয়ান রাজবল্লভের মুরশিদাবাদে উপস্থিতের বার্ত্তা পাইয়া তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিলে উভয়ত স্ব স্ব দৈহিক বৈষয়িক কুশল সংবাদ জিজ্ঞাসানন্তর প্রসঙ্গত দেওয়ান রাজবল্লভ মুরশিদাবাদের নবাব সরকারের উপস্থিত অবস্থা জিজ্ঞাসু হওয়াতে রামপ্রসাদ সেনের দ্বারা নবাব সরকারের আর আর অবস্থা এবং দেওয়ানী পদ অবসর থাকাতে তৎকর্ম্মের ভার নায়েব ফৌজ সাহামতজঙ্গের প্রতি অর্পিত থাকা বৃত্তান্তও সমুদয় অবগত হন। সে যাহা হউক, পরে দেওয়ান রাজবল্লভ কিরূপে নিকাসের দায় হইতে স্বীয় প্রভুকে মুক্ত করিয়া স্বাভীষ্ট সাধন করিবেন তাহার সুযোগ চিন্তায় চিন্তিত থাকিয়া রামপ্রসাদ সেনের পরামর্শানুসারে স্বীয় কর্ম্মোদ্ধার মানসে প্রথমত নবাব নাজেমের সহিত সন্দর্শন করিয়া নানা কৌশলে নায়েব নাজেম বাহাতরের নিকট কিঞ্চিৎ প্রতিপন্ন হইলেন। আনীত বক্রী রাজস্ব ও নিকাস গ্রহণের প্রস্তাব করাতে রাজস্বের টাকা জগৎশেঠের কুঠিতে উঠাইবার আর সংক্ষেপতঃ ঢাকা প্রদেশের আয় ব্যয় স্থিতি বৃদ্ধির নিকাস উপস্থিত করিতে নবাব নাজেম কর্ত্তৃক আদিষ্ট হইয়া তদনুসার বক্রী রাজস্ব এবং সুচারুরূপে নিকাস প্রদান করিলে নবাব নাজেমের প্রসাদভাজন এবং কিঞ্চিৎকাল মুরশিদাবাদে অবস্থিতির অনুমতি প্রাপ্ত হইলেন। নবাব নিবাইস মহম্মদ রাজবল্লভের এই সুকৃত কার্য্যে পরম পরিতোষ প্রাপ্তে তাঁহাকে বহুতর ধন্যবাদ ও পুরস্কার

প্রদান করেন। তদনন্তর দেওয়ান রাজবল্লভ রাজ্যশাসন ও রাজস্বাহরণ বিষয়ে বহুবিধ সদাশয়তা প্রকাশ করিয়া নবাব নাজেমের প্রিয়পাত্র এবং সভাসদের শ্রেণীভুক্ত হইয়াছিলেন। এমন কি দেওয়ান রাজবল্লভের চতুরতা ও যোগ্যতা বিবেচনায় নবাব নাজেম সন্তুষ্ট হইয়া উপস্থিত মতে তাঁহার উপকার করিতেও অভয়দান করিয়াছিলেন। যদিচ তাহাতে দেওয়ান রাজবল্লভের অন্তঃকরণে মুরশিদাবাদের দেওয়ানী প্রাপণের প্রত্যাশার উদ্রেক হইয়াছিল, কিন্তু তাহা কখনও প্রকাশ করিয়াছিলেন না। ইতি মধ্যে এক দিবস দেওয়ান রাজবল্লভ নানা উপহার দ্বারায় ভগবতী গঙ্গাদেবীর তীরে তদীয় অর্চ্চনা করিতেছিলেন। তৎকালে জগৎশেঠের কনিষ্ঠ ভ্রাতা মহাতাপচাঁদ সলিলবায়ু সেবনার্থে তরণীযোগে পরিভ্রমণ করিতে করিতে সেই অর্চ্চনাস্থানে উপনীত হওত পূজোপ-হারাদির পারিপাট্য দৃষ্টে চমৎকৃত হইয়া দেওয়ান রাজবল্লভকে অসামান্য ব্যক্তি বিবেচনায় তদাহ্বানার্থে জনৈক পারিষদ প্রেরণ করেন। তন্মতে দেওয়ান রাজবল্লভ মাহাতাপচাঁদের যানোপরি গমন করিয়া তাঁহার সহিত নানা কৌশলালাপ করেন। তদীয় সৌজন্যে প্রণয়বদ্ধ হইয়া মহাতাপচাঁদ দেওয়ান রাজবল্লভের সহিত সখ্যসম্বন্ধনিবন্ধনের প্রস্তাব করেন। দেওয়ান রাজবল্লভও সম্মত হইয়া উভয়ের বন্ধুতা সম্বন্ধ করিলেন। (১)

অনন্তর মহাতাপচাঁদ স্বাবাসে উপনীত হইয়া জগৎশেঠকে এই সখ্য-নিবন্ধনের বার্ত্তা বলাতে তিনি অজ্ঞাতকুলশীল ব্যক্তির সহিত মিত্রতা

---

(১) এস্থলে কিংবদন্তী আছে যে, দেওয়ান রাজবল্লভ গঙ্গাদেবীকে পূজনান্তর ভূমিষ্ঠ হইয়া প্রণাম করণ কালে সুরধনী সলিল হইতে কোন কামিনীর নাভরণ সুকোমল করকমল উঠিয়াছিল এবং সেই হস্তগত নির্ম্মাল্য রাজবল্লভের মস্তকে পতন হয়। এই আশ্চর্য্য দর্শনেই মহাতাপচাঁদ দেওয়ান রাজবল্লভের সহিত বন্ধুতা করেন।

করা অনুচিত ও অপমানের কারণ বিবেচনায় মহাতাপচাঁদকে অনেক ভৎ'সনা করেন। মহাতাপ রাজবল্লভের গুণকীর্ত্তনের সহিত পরিচয় দিলে পর জগৎশেঠও সন্তুষ্ট হইয়া আগ্রহসহকারে দেওয়ান রাজবল্লভের সহিত আলাপ কৌশলে পরম প্রীতি প্রাপ্ত হইয়া তদবধি তাঁহার সমৃদ্ধি বৃদ্ধির পক্ষে সচেষ্ট রহিলেন। ভাগ্যবলে তৎকালে নবাব আলিবর্দ্দী খাঁ বাহাদুরের সদনেও জনৈক উপযুক্ত ব্যক্তিকে দেওয়ানীপদে পদস্থ করণ বিষয়ক প্রস্তাব উপস্থিত ছিল। প্রশ্নানুসারে রায় রাঁয়া প্রধান ব্যক্তির নাম উল্লেখও করিয়াছিলেন ; কিন্তু তাঁহাদিগকে নবাবের মনোনীত না হওয়াতে জগৎশেঠ আপন কল্পনা সিদ্ধ করণের এই সুসময় বিবেচনা করিয়া দেওয়ান রাজবল্লভের গুণানুবাদপূর্ব্বক মুরশিদাবাদের দেওয়ানের যোগ্য বিবেচনা হইলে তাঁহাকে "তৎপদ প্রদত্ত হইতে পারে ইত্যাদি ইত্যাদি নিবেদন করেন। এই সুযোগে নায়েব নাজেম সাহামতজঙ্গ বাহাদুর তৎপোষকতায় দেওয়ান রাজবল্লভের যোগ্যতার এবং ঢাকা প্রদেশের আয়ব্যয়স্থিতিবিষয়ক পরিষ্কার নিকাশ দেওয়ার বিবরণ বিদিত করিয়াছিলেন। তৎশ্রবণে নবাব বাহাদুর ঢাকার নবাবের দ্বারা দেওয়ান রাজবল্লভের যোগ্যতাদির বিশেষ বিবরণ জ্ঞাত হইয়া দেওয়ান রাজবল্লভকে স্বীয় দেওয়ানীপদে নিয়োজিত করিতে মনোনীত করেন। পরদিবস নবাব বাহাদুরের সভাতে উপস্থিত হইয়া রাজবল্লভকে আহ্বান করাতে দেওয়ান রাজবল্লভ যথোচিত বিনীতভাবে সভাস্থ হইয়া নবাবের প্রশ্নানুসারে আত্মপরিচয় এবং ঢাকার অবস্থার চুম্বক নিবেদন করিলে নবাব বাহাদুর তাঁহাকে সর্ব্বপ্রকারে যোগ্যপাত্র বিবেচনা করিয়া ১৭৪৩ খৃষ্টাব্দে রাজোপাধি প্রদান করতঃ সনন্দদ্বারা দেওয়ানীপদাভিষিক্ত করেন ; এবং নবাব বাহাদূরের অনুমত্যানুসারে জগৎশেঠ স্বহস্তে রাজা রাজবল্লভকে ভূষণে ভূষিত করিয়া দেন। তদ্ভিন্ন হস্তী ঘোটকাদি

নানাবিধ রাজপ্রসাদও প্রদত্ত হইয়াছিল। রাজা রাজবল্লভও নবাবকে সহস্র সুবর্ণ মুদ্রা নজরাণা প্রদান এবং নবাবের আত্মীয় অমাত্য ভৃত্য প্রভৃতি এবং ব্রাহ্মণ পণ্ডিত দীন দরিদ্রগণকে বিপুলার্থ বিতরণ করিয়াছিলেন। পর দিবস রামানন্দ সরকারকে সেরেস্তাদারী এবং ভ্রাতুষ্পুত্র রায় মৃত্যুঞ্জয়কে নাওয়ার দেওয়ান ও কনিষ্ঠ পুত্র কৃষ্ণদাসকে খালিসার দেওয়ানীকর্ম্মে নিযুক্ত ও রামপ্রসাদ সেনকে আপনার পারিষদ করণ কামনায় নবাব সরকারী কর্ম্ম হইতে অবসৃত করাইয়া মন্ত্রীত্বে নিয়োগ করিয়াছিলেন।

ঢাকার নবাব আপনার দেওয়ানের পদোন্নতিতে বিলক্ষণ আনন্দিত হইয়া রাজাকে যথোচিত ধন্যবাদ ও চিরকাল প্রণয়নিবন্ধন থাকার আশয়ে নানা প্রসঙ্গ করিলে, রাজাও প্রভুভক্তিপ্রদর্শনপূর্ব্বক আপনার জ্যেষ্ঠকুমার রামদাসকে ঢাকার দেওয়ানীপদ প্রদানের নিমিত্ত প্রার্থনা করেন। নবাবও সন্তুষ্টচিত্তে প্রতিশ্রুত হইয়া মুরশিদাবাদ হইতে পুনরাগমনকালে রায় রামদাসকে সঙ্গে আনিয়া ঢাকা নগরের দেওয়ানী কর্ম্মে নিয়োগ করিয়াছিলেন। দেওয়ান রামদাস সর্ব্বাংশেই কার্য্যক্ষম ও নিরপেক্ষ প্রতাপশীল পুরুষ ছিলেন। তাঁহার প্রতাপ ও সুবিচারের নিদর্শনস্বরূপ এস্থলে কিঞ্চিৎ লিখিত হইল। যথাঃ—দেওয়ান রামদাস পদস্থ হইয়া প্রথমত প্রদেশস্থ রাজা ও ভূম্যধিকারী সমস্তকে আহ্বানপূর্ব্বক তাঁহাদিগের অধিকারমধ্যে যত যত দস্যুতস্করাদির বসতি ছিল, তাহাদিগকে স্বস্বাধিকার হইতে নির্ব্বাসিত করিবার অঙ্গীকারে এক এক প্রতিজ্ঞাপত্র স্বাক্ষরিত করাইয়া লন। ইহাতে অনেক দুষ্টের দমন ও শিষ্টের অনিষ্টনিবারণ ও রাজ্যের মঙ্গলসংঘটন হয়। অপর ভদ্র নামক এক ব্যক্তির কিয়ৎপরিমাণ ভূমি রাজগুরুকর্তৃক অপহৃত হইবার অভিযোগ হইলে বিশেষ তদন্তানুসন্ধানে গুরুরই অত্যাচার প্রতিপন্ন

হওয়াতে যথার্থ বিচারে গুরুর পক্ষপাত করিলেন না! এমন কি এই গুরুর পক্ষে অন্যায় আদেশ না হইবার নিমিত্ত রাজা রাজবল্লভও অনুরোধ করিয়া কৃতকার্য্য হইতে পারিলেন না। বিচারে বাদিকে জয় প্রদান করিয়া গুরুর সন্তোষার্থ স্বীয় কোষ হইতে সহস্র মুদ্রা প্রদান করত কিঞ্চিৎপরিমাণ ভূমি ক্রয় করিয়া দেন। অপরঞ্চ তিনি ঢাকাস্থ মোগল মুসলমানদিগের সেলাম বাম হস্তে লয়নাপরাধে অভিযুক্ত হইয়া মুরশিদাবাদের নবাবসদনে আহূত হইয়াছিলেন। তত্রস্থ নবাব বাহাদুর বাম হস্তে সেলাম লইবার কারণ জিজ্ঞাসা করিলে দেওয়ান রামদাস তদুত্তরে বলিলেন, যে হস্ত ঈশ্বরাধনার কার্য্যে নিয়োজিত আছে, আর যে হস্তের দ্বারা মহীপালকে সেলাম করা হয়, সেই হস্তে অন্যের সেলাম লওয়া সুচারু বিবেচনা না করিয়াই বামহস্তে সেলাম লইয়া থাকি। পূর্ব্বকালে স্তাবকদিগের বাক্ চতুরতায় প্রায় তাবতেই পরিতুষ্ট ও মুগ্ধ হইতেন, সুতরাং দেওয়ান রামদাসের উক্ত বাক্‌কৌশল ও স্তুতিবাদে নবাব বাহাদুর মুগ্ধ হইয়া অপরাধমার্জ্জনাপূর্ব্বক পুরস্কার প্রদান করিয়া বিদায় করিয়াছিলেন।

সে যাহা হউক রাজ্যশাসনের ভার রায়রাঁয়ার প্রতি থাকাতে রাজা রাজবল্লভ মনে মনে তাদৃক্ সুখী ছিলেন না। সর্ব্বদা তাঁহার অন্তঃকরণে রায়রাঁয়ার সেই ক্ষমতা অপহরণের কল্পনাই জাগরূক ছিল। এতাবতা নবাব নাজেম তাঁহার প্রতি নিতান্ত প্রসন্ন থাকাতে তাঁহার দ্বারা আপন অভীষ্টসিদ্ধি করণের কল্প স্থির করিয়া কৌশলক্রমে নবাব নাজেমকে স্বয়ং রাজ্যশাসনের ভারগ্রহণের পরামর্শ দেন। নবাব নাজেম এই পরামর্শ আপন পক্ষে সৎপরামর্শ এবং ভাবি সম্ভাবিত মঙ্গলপ্রতিপাদক বিবেচনায় তাহাতে স্থিরসংকল্প হন।

ইতিমধ্যে বিশেষ প্রয়োজনবশতঃ নবাব বাহাদুর রায় রাঁয়ার স্থানে

এক দিবসের মধ্যে ৭ লক্ষ টাকা চাহিলে রায় রাঁয়া জগৎশেঠের নিকট টাকা না পাওয়াতে তৎপ্রদানে অক্ষম হইলে প্রধান নবাব বিরক্ত হইয়া নায়েব নবাবকে ঐ ৭ লক্ষ টাকা প্রাপণের উপায় জিজ্ঞাসিলে, তিনি রাজা রাজবল্লভের দ্বারা এতৎ কর্ম্মোদ্ধার হইতে পারিবার কথা বলেন। তন্মতে প্রধান নবাবকর্তৃক রাজার প্রতি ঐ টাকা দিবার অনুজ্ঞা হয়। আজ্ঞানুসারে রাজা,—জগৎশেঠের গোমস্তাকে ভয় ও অভয় উভয় প্রদর্শনে ৭ লক্ষ টাকা তাহা হইতে উদ্ধার করিয়া তদ্দিবসের মধ্যেই প্রদান করেন। তদ্ধেতুক প্রধান নবাব সন্তুষ্ট হইয়া সেই দিবসেই রাজার প্রতি রাজ্যশাসনের ভারার্পণপূর্ব্বক স্বাধিকারের প্রজাদিগের সহিত বন্দোবস্ত করণ ও নজরাণা গ্রহণের অনুমতি ও সপ্রসাদ "মহারাজ" উপাধি প্রদান করেন। তদ্রূপ মহারাজাও সমুচিত উপঢৌকনাদি প্রতিদান করেন। ফলে নবাব নাজেমের আনুকূল্যেই এই অভাবনীয় ঘটনার সংঘটন হয়। অতএব মহারাজ নবাব নাজেমের স্থানে নিতান্ত কৃতজ্ঞতা স্বীকারে তাঁহাকেও অনেকানেক উপঢৌকন প্রদান করিয়াছিলেন। তাহাতে নবাব নাজেম মহারাজের সৌজন্য বিনিময়ে মৌখিক সৌহৃদ্য প্রকাশ করিলেন বটে, কিন্তু আন্তরিক বিশেষ পরিতোষ হইলেন না। কারণ, সেই পদ প্রাপণে তাঁহার যে প্রত্যাশা ছিল, প্রোক্ত ঘটনায় তাহা নিষ্ফল হইয়াছিল। এই ব্যাপারে কেবল নবাব নাজেম অসন্তুষ্ট হইয়াছিলেন, এমত নহে। ৭ লক্ষ টাকা জগৎশেঠের গোমস্তা হইতে ছলে বলে গ্রহণহেতুক তিনিও মহারাজের প্রতিকূল হইয়াছিলেন। সে যাহা হউক, মহারাজ এই পদ প্রাপ্ত হইয়া প্রথমতঃ অনেকানেক রাজা ও ভূম্যধিকারী হইতে অনাদায়ী রাজস্ব শাসনদ্বারা অল্পকাল মধ্যে অশীতি লক্ষ মুদ্রা উদ্ধার করিয়া নবাবের ধনাগারে ন্যস্ত করেন এবং প্রদেশীয় অনেকানেক ভূম্যাধিকারীগণ ও

রাজগণের সহিত রাজস্ব বৃদ্ধিপূর্ব্বক নূতন বন্দোবস্ত করত নবাবের আয় বৃদ্ধি করাতে মহারাজ প্রধান নবাবের বিলক্ষণ বিশ্বাস ও আদরের পাত্র হইয়াছিলেন। (১) পরে আপনার পাপকর্ম্মে মতি না হয়, অথচ সতত ঈশ্বর নাম শ্রবণ করিতে পারেন, এতদাশয়ে মহারাজ স্বকীয় পার্শ্বে দুইজন ব্রাহ্মণ তনয়কে পার্শ্বস্থ করিয়া সময়ে সময়ে রামনাম উচ্চারণে

---

(১) কিংবদন্তী আছে যে, যৎকালে মহারাজ কর্ত্তৃক মেদিনীপুর, বীরভূম, গাকোড় বিক্রুপুর, দিনাজপুর, চাঁচরা, আওরঙ্গাবাদ, নাটোর, সুসুম, বর্দ্ধমান, নবদ্বীপের অধিপতিগণকে বন্দোবস্তের নিমিত্তে মুরশিদাবাদে আনয়ন করা হয়, তৎকালে নবদ্বীপাধিপতি স্বীয় রাজধানী হইতে আসিবার সময় কর চালন পরীক্ষা দ্বারা জানিতে পারিয়াছিলেন যে, "পূর্ব্বে রাজা জরাসন্ধঃ ইদানিং রাজবল্লভঃ" তাহাতেই তিনি মহারাজ সদনে উপস্থিত হইয়া স্বীয় উচ্চ সম্মান রক্ষার্থে এক চতুরতা প্রকাশ করেন। যথা—নবদ্বীপাধিপতি যথার্থ ব্রাহ্মণের বসন ভূষণের দ্বারা ভূষিত হইয়া অনেকতর ব্রাহ্মণসহ রাখি পূর্ণমাসী দিবসে মহারাজের সমীপস্থ হইয়া মহারাজের হস্তে রক্ষা বন্ধন করাতে, তিনি যথাযুক্ত সম্মান সহকারে লক্ষ মুদ্রা দক্ষিণা প্রদান করেন। নবদ্বীপাধিপতি এই রক্ষা বন্ধনকে স্বপক্ষে ভুজঙ্গের তির্য্যক ধরার ন্যায় জ্ঞানে অশেষ চিন্তাকুল হইয়াছিলেন। কারণ মহারাজদত্ত এক লক্ষ টাকা দক্ষিণা গ্রহণ না করিলে তাঁহার কোপে পতন হইবেন; গ্রহণ করিলেও অপ্রতিগ্রাহিকত্ব ধর্ম্ম নষ্ট হয়। মহারাজ নবদ্বীপাধিপতিকে চিন্তাকুল দেখিয়া দক্ষিণা ব্রাহ্মণ ভিন্ন কেহকেই প্রদত্ত হইতে পারে না, তদ্গ্রহণে ব্রাহ্মণেরই অধিকার, বরং ভোগ না করিয়া অন্যকে প্রদান করিলেই গ্রহীতা নিষ্পাপ হইবেন। এইরূপ বলিলে অগত্যা নবদ্বীপাধিপতিকে তাহাই স্বীকার করিতে হইয়াছিল; কিন্তু নবদ্বীপাধিপতি মহারাজের দক্ষিণাদত্ত লক্ষ মুদ্রা এবং আপন কোষ হইতে লক্ষ মুদ্রা আনাইয়া অকাতরে ব্রাহ্মণ, ভিক্ষু, দীন দরিদ্রকে বিতরণ করিয়াছিলেন। মহারাজকর্ত্তৃক নবদ্বীপাধিপতি এক লক্ষ মুদ্রা দক্ষিণা প্রাপ্ত হইয়াছিলেন, এমন নহে; নবদ্বীপাধিপতির সঙ্গীয় দ্বিজবরগণকেও যথাযুক্ত বহুতর প্রণামী প্রদান করা হইয়াছিল। ইতি

নিয়োজিত করিয়াছিলেন। পরিশেষে প্রচুর বুদ্ধিমান্ সুচতুর নবদ্বীপাধিপতি স্বীয়াধিকারের অপ্রতুলতা এবং কোন স্থানের ভূমি অনুর্ব্বরা ও পতিত থাকা হেতু রাজস্ব পরিশোধের ব্যাঘাত হওনাদির বিবরণ বিদিত করিলে মহারাজ তাঁহার (নবদ্বীপাধিপতির) বার্ষিক কর হইতে লক্ষ মুদ্রা ন্যূন করতঃ নূতন বন্দোবস্ত করিয়া দেন; তদ্ভিন্ন রাজাগণের মধ্যে কোন কোন রাজা বক্রী রাজস্ব প্রদানে অশক্ত হইয়া স্বীয়াধিকার নবাবের অধীনে অর্পণ করেন। তাহাতেও অনেকাংশে নবাবের আয় বৃদ্ধি পায়। প্রধান নবাব ইহাতে পরিতুষ্ট হইয়া মহারাজকে পঞ্চ লক্ষ মুদ্রা পারিতোষিক ও "দাওনীয়া" গ্রামে যথায় মহারাজের বসতি ছিল, তথায় মহারাজের বসতির নিমিত্তে এক মনোহর পুরী নির্ম্মাণ করিয়া দেওয়াইয়াছিলেন; এবং মহারাজও ঐ নগরের স্থানে স্থানে প্রবীণ প্রবীণ সাগরভিধ সরোবর, দেবালয় মঠমণ্ডপাদি প্রস্তুত করাইয়াছিলেন। তাহাতেই "দাওনীয়া" গ্রাম "রাজনগর" নাম প্রাপ্ত হয়। এই বন্দোবস্ত করণে কেবল নবাবসরকারের আয় বৃদ্ধি পাইয়াছিল না, মহারাজাও নজরানা দ্বারা অপর্য্যাপ্ত অর্থ সঞ্চয় করিয়াছিলেন, পরে মহারাজ আপন শেষকাল বিবেচনায় ধর্ম্মশাস্ত্রোক্ত কোন কোন মহৎ যাগাদি করণে মনস্থ করিয়া নবাব বাহাদুরের নিকট হইতে কিয়ৎকালের নিমিত্তে অবসর লইয়া রাজনগরে আগমনপূর্ব্বক অপূর্ব্ব পুরীদর্শনে অপরিমিত হর্ষ প্রাপ্ত হইয়া নির্ম্মাতাদিগকে পুরস্কার প্রদান করেন; এবং স্বগ্রামীয় অনেক অনেক ব্রাহ্মণ পণ্ডিত প্রভৃতির ইষ্টকালয় করিয়া দেন। এই রাজভবনের মানচিত্রাবলোকনে দর্শকগণ যেরূপ আশ্চর্য্য বোধ করিবেন কি বিস্ময়ান্বিত হইবেন, তদীয় লিপি বর্ণনা বিলোকনে তত হইবেন না। বিশেষতঃ রাজভবনের পূর্ব্ব শোভা যেরূপ অপূর্ব্ব মনোলোভা ছিল, তাহার স্বরূপ বর্ণনা করিলে অনেকেই বিরূপ বিবেচনা

করিতে পারেন; যে হেতুক রাজভবনের পূর্ব্বাবস্থা তাঁহাদিগের নয়ন গোচর নাই। অতএব তদ্বর্ণনা বিরহে পূরোভাগে রাজভবনের মানচিত্র প্রকটিত হইল। যে হউক মহারাজ পণ্ডিতগণসমীপে কোন বৃহৎ যাগ আদি করিবার কল্পনা ব্যক্ত করাতে, কর্ণাটদেশীয় কোন পণ্ডিতবর মহারাজকে অগ্নিষ্টোম, অত্যগ্নিষ্টোম, বাজপেয়াদি যজ্ঞ করিবার পরামর্শ প্রদান করেন। তদনুসারে মহারাজ লালা রামপ্রসাদের প্রতি তত্তৎ কর্ম্ম সম্পাদনোপযোগী আয়োজন করণের আজ্ঞা দেন। তদনুসারে তিনি অশেষ আয়াস ও যত্নে দানীয় এবং আহার ব্যবহারীয় অসংখ্য দ্রব্য আয়োজন করেন। অপর এই ব্যাপারে নানা দিগ্‌দেশীয় রাজা ভূম্যধিকারী ও উদাসীন ব্রহ্মচারী, বেদপারগ ব্রাহ্মণ পণ্ডিত ও অম্বষ্ঠ এবং প্রধান প্রধান কায়স্থ সমস্ত নিমন্ত্রিত হইয়া আগমন করেন। বোধ হয় এই সমারোহশালী যাগসময়ে দিগ্‌দেশীয় ব্রাহ্মণ পণ্ডিত কি রাজা কি ভূম্যধিকারী এবং অপর ভদ্র বিশিষ্টগণের মধ্যে প্রায় কেহই অনিমন্ত্রিত ছিলেন না। লালা রামপ্রসাদ যাগসম্বন্ধীয় সম্পূর্ণায়োজন ও দিগ্‌দেশীয় সমস্ত পণ্ডিতাদির সমাগম সংবাদ মহারাজ সন্নিধানে বিদিত করিলে, মহারাজ প্রথমতঃ একবার পণ্ডিতমণ্ডলীর অভ্যর্থনায় তাঁহা-দিগের সমক্ষে গমন করেন। তাহাতে মহারাজকে যজ্ঞোপবীত রহিত দেখিয়া দক্ষিণদেশীয় এবং কান্যকুব্জীয় কতিপয় পণ্ডিতগণ পাদজ শূদ্র অনুমানে নিমন্ত্রণ পরিত্যাগ করিয়া স্বস্থানে এস্থানে উদ্যত হন। ইহাতে মহারাজ মহা বিভ্রাট মানিয়া অত্যন্ত বিনয়াবনতিপূর্ব্বক আত্মপরিচয় প্রদান করতঃ মহারাজাধিরাজ বল্লাল সেনের কোন অত্যাচার ভয়ে ভীত ভীত হইয়া তৎপুত্র লক্ষ্মণসেন প্রভৃতি অনেকানেক ভিষক্‌কুলজগণকে যজ্ঞোপবীত পরিত্যাগপূর্ব্বক স্ব স্ব আচারধর্ম্মাদি সংগোপনে জাতিরক্ষা করিতে হইয়াছিল। আমরাও সেই ধর্ম্মসংগোপিতশ্রেণীস্থ ভিষক্‌বংশজ;

অতএবই যজ্ঞোপবীত-বিরহিত অবস্থায় শূদ্রবদাচারব্যবহারী হইয়াছি। ইহার বিহিত প্রতিকার করিতে আজ্ঞা হউক, এই বলাতে রাঢ়, গৌড়, বঙ্গ, তৈলঙ্গ, দ্রাবিড়, কাশী, কাঞ্চী, অবন্তী, মৈথিল, সৌরাষ্ট্র, মহারাষ্ট্র, কান্যকুব্জ, গুজরাট ও কর্ণাটাদি দিগ্‌দেশীয় পণ্ডিতগণ শাস্ত্রানুসারে প্রায়শ্চিত্তপূর্ব্বক উপনয়নের ব্যবস্থা প্রদান করিলে, তদনুসারে মহারাজ রাজবল্লভ স্বীয় জ্ঞাতিকুটুম্বাদির সহিত প্রায়শ্চিত্তকরতঃ যজ্ঞোপবীত ধারণ করিয়া ক্রমে ক্রমে অগ্নিষ্টোম, অত্যগ্নিষ্টোম, বাজপেয় ও স্বর্গারোহণ পর্য্যন্ত সম্পূর্ণ করিয়া ব্রাহ্মণপণ্ডিত- গণকে দক্ষিণা এবং রাজা ও ভূম্যধিকারী এবং আত্মীয়, অমাত্য, জ্ঞাতি, কুটুম্ব ও অম্বষ্ঠ প্রভৃতিকে যথাযুক্ত অর্থ, বসনভূষণাদি প্রদান করেন। যজ্ঞের দক্ষিণা তিন লক্ষ মুদ্রা এবং দেশীয় পণ্ডিতগণের প্রতিজনে ৫০০৲ টাকা, অনাহুত ও ভিক্ষুকগণের প্রত্যেকজনে ২০৲ টাকা আর বিদেশীয় পণ্ডিত ব্রাহ্মণগণকে যথাযোগ্য হস্তী, ঘোটক, উষ্ট্রযান, স্বর্ণরৌপ্যাদি ভূষণাভরণ দেওয়া হইয়াছিল। সর্ব্বসাকল্যে এই মহৎ ব্যাপারে কত ব্যয় হইয়াছিল, তন্নিরাকরণ করা হইতে পারিল না; অতএব লিখা গেল না।

সুচারুমতে এতদ্ব্যাপার নিষ্পাদন জন্য লালা রামপ্রসাদ বিপুলতর রাজপ্রসাদ পাইয়াছিলেন। এতদ্ব্যাপার সমাধাকরণে অন্যূন ছয় মাস কাল অতিবাহিত হইয়াছিল। অতঃপর মহারাজ মুরশিদাবাদ গমন করিয়া দেখেন, নওয়াব নাজেম সওকতজঙ্গের মৃত্যু হওয়ায়, মীরজাফর আলিখাঁ সেই পদ প্রাপ্ত হইয়াছেন। এদিকে দেওয়ান রামদাস অত্যন্ত সুখ্যাতির সহিত সাতবর্ষকাল পর্য্যন্ত ঢাকার দেওয়ানী করিয়া ২২ বর্ষ বয়োগতকালে কামাগ্নিসন্দীপক অবধৌতিক কোন ঔষধি অবিধিসেবন দোষে হঠাৎ কালগ্রাসে পতিত হন। (১) এ অবধিই মহারাজের বিপদ্

(১) প্রবাদ আছে যে রামদাস কিঞ্চিৎ কামকূট ছিলেন, তৎকারণেই ঢাকা নগরস্থ সাধারিগণ অদ্যাপি রামদাসের নামে খেপিয়া উঠে।

সমাগমারম্ভ হইতে লাগিল। লালা রামপ্রসাদ কথিত হৃদয়-বিদীর্ণকর শোকাবহ-বার্ত্তা পাইয়াও হঠাৎ তাহা মহারাজের বিদিত করা অবিহিত জানিয়া গোপন রাখিয়াছিলেন। পরিশেষে তদ্বিশেষ নবাব বাহাদুরের সুগোচর হইলে নবাব বাহাদুর মহারাজকে আহ্বান করিয়া অনেকানেক খেদোক্তির পর দেওয়ান রামদাসের মানবলীলা-সংবরণের বার্ত্তা জানাইয়া শোকশান্তি নিমিত্ত অনেকানেক প্রবোধ দেন; এবং ঢাকার নওয়াব নওয়াইস্ মহম্মদকে অনুরোধ-লিপি দ্বারা তথাকার দেওয়ানীপদে মহা-রাজের দ্বিতীয়পুত্র রায় কৃষ্ণদাসকে নিযুক্ত করাইয়াছিলেন। ইহার অনতিকালবিলম্বে মুরশিদাবাদের নবাব আলিবর্দ্দী খাঁ বাহাদুর বৃদ্ধাবস্থা ও জরাগ্রস্ত হইয়া আপন দৌহিত্র অথচ পোষ্যপুত্র সিরাজউদ্দৌলাকে ১৭৫৬ খ্রীষ্টাব্দের এপ্রিল মাসে উত্তরাধিকারিত্বরূপে স্বীয়াধিকারের কর্ত্তৃত্ব প্রদানের প্রস্তাব করেন। কিন্তু তাহাতে কেহই সন্তোষ প্রকাশ করিয়াছিল না। কি রাজা, অমাত্য কি প্রজাগণ তাবতেই আন্তরিক অসুখী হইয়াছিল। তথাচ বৃদ্ধ আলিবর্দ্দী খাঁ দৌহিত্রের মমতামুগ্ধ থাকাবশতই হউক, কি তদ্ভিন্ন অন্য উত্তরাধিকারীর অভাববশতই হউক, যাঁহার অপবিত্র চরিত্রদর্শনে অত্যন্ত অসন্তোষিত এবং যাঁহার অধিকার হইলে রাজ্য-বিপ্লবের শঙ্কায় সশঙ্কিত ছিলেন, তাঁহাকে অর্থাৎ সিরাজউদ্দৌলাকে স্বীয় রাজ্যাধিকারিত্ব প্রদান করিয়াছিলেন। ফলে, যিনি ইহজগতের স্রষ্টা, পাতা, হর্ত্তা এবং শুভাশুভ ঘটনার কারণস্বরূপ বটেন, তাঁহার ইচ্ছার বিপরীত কখনও কাহারও দ্বারা কিছুই হইতে পারে না, যে কোন রাজ্য নষ্টকরণের পক্ষে তাঁহার ইচ্ছা হয়, কোন উপলক্ষে তাহার সম্পাদন হইয়া উঠে। সুতরাং একজন দুর্নিবার দুরাচার রাজার অধীনে যে সাম্রাজ্য অর্পিত হইবে, আশ্চর্য্য কি এবং মনুষ্যের সাধ্য কি যে তদ্বিপরীত করে?

সুতরাং এতদ্দেশের ও দেশীয়ের দুর্দ্দশার সময় উপস্থিত হইবার সিরাজ-উদ্দৌলার চরিত্রবর্ণনে প্রবৃত্ত হওয়া যাইতেছে।

তিনি সুবাত্রয়ের রাজত্বশাসনগর্ব্বে গর্ব্বিত ও কতিপয় নষ্টলোক সহবাসী হইয়া সুরধুনীনীরে সারোহী নৌকা নিমগ্ন করাইয়া, গর্ভবতী অবলার গর্ভ বিদারণ করিয়া কৌতুকদর্শন এবং অসতের সমাদর ও সতের অনাদর করিতে লাগিলেন। কাহারও ধনাপহরণ, কাহারও শিরশ্ছেদন, কাহারও পত্নীহরণ, কাহারও কন্যাহরণ—বিশেষতঃ হিন্দুদিগের জাতিধর্ম্ম নষ্ট, দেবালয় ভ্রষ্টকরণেই অধিকতর নিবিষ্টচিত্ত হইলেন; এবং ১৭৫৬ খ্রীষ্টাব্দে ঢাকার নবাব ধার্ম্মিকবর নওয়াইস মহম্মদের মৃত্যু হইলে তাঁহার স্ত্রীধন পর্য্যন্ত বিলুণ্ঠনপূর্ব্বক মুরশিদাবাদে আনয়ন করিয়াছিলেন। (এই গোলযোগে দেওয়ান কৃষ্ণদাসও প্রজাপুঞ্জের বহুতর ধনরত্ন হস্তসাৎ করিয়াছিলেন।) অপিচ প্রবীণ নবাব আলিবর্দ্দী খাঁ নবীন নবাবের অপবিত্র চরিত্রতত্ত্ব পূর্ব্বাবধিই জানিতেন বটে, তদপেক্ষাও ইদানীং আরও অব্যবস্থিত-চিত্ততা প্রকাশ ও গুরুতর অত্যাচারের আরম্ভকরণক-বার্ত্তা পাইয়া অপরিমিত পরিতাপে তাপিত হইয়া নিতান্তই স্থির করিয়াছিলেন যে, এই কুলাঙ্গারদ্বারা অচিরে রাজ্য ভ্রষ্ট হইবে আর কাহারও প্রবোধ গ্রহণ করিবে না; তথাচ বারংবার সিরাজউদ্দৌলাকে অশেষ হিতোপদেশ দিয়া শান্ত হইতে অনুরোধ করেন। কিন্তু কিছুতেই তাঁহার কদর্য্য স্বভাবের অভাব হইল না; বরং ক্রমশঃ বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। বৃদ্ধ আলিবর্দ্দী খাঁ এ সমস্ত অসহনীয় পরিতাপ-তাপ-ভোগে এবং রোগে আক্রান্ত হইয়া ১৭৫৬ খ্রীষ্টাব্দের ৯ই এপ্রিল দিবসে পরলোক গমন করেন। তাহাতে সিরাজউদ্দৌলা আরও নির্ভীত ও নিঃশঙ্ক হইয়া পড়িলেন। অবশেষে দিল্লীর বাদসাহের প্রাপ্য রাজস্ব দেওয়া স্থগিত করিয়া দিলেন; এবং আপনার অধীনস্থ প্রধান প্রধান কর্ম্মচারী প্রভৃতি

তাবতের প্রতি যৎপরোনাস্তি অত্যাচার করিতে লাগিলেন, তাহাতে জমিদার ও সুবাদার প্রভৃতি তাবতই উত্যক্ত হইয়া কিসে প্রাণরক্ষা পাইবে, এই চিন্তাতে ব্যাকুল হইয়া উঠিল, এমন কি এই যুবা নবাব কর্তৃক কেহ বা প্রাতে শিরোপালব্ধ হইয়া বৈকালে নিগড়বন্ধনে কারাবাসে নিক্ষিপ্ত হইতে লাগিলেন! কোন সময়ে বিপুলার্থ লব্ধ হইত, কেহ বা কোন সময়ে সর্ব্বস্বান্ত হইত। (ফলে) ধনী মানী তাবতের অন্তঃক্ষেত্র হইতে স্বাস্থ্যভাব অন্তর্হিত হইয়াছিল। এ সমস্ত অত্যাচারে মহারাজ রাজবল্লভ অত্যন্ত সাবধানে প্রাণপণে রাজকীয় কর্ম্ম সম্পাদন করিয়াও যশ বা সুখ, কি স্বাস্থ্যলাভ করিতে পারিয়াছিলেন না; সর্ব্বদাই নবাব কর্তৃক ত্যক্ত বিরক্ত হইতেন।

মহারাজের প্রতি পূর্ব্বাবধিই রায় রাঁয়ার এবং জগতশেঠের জাতক্রোধ ছিল; সুতরাং মহারাজার ঐশ্বর্য্যাদি দৃষ্টে আপনাদিগকে পিশুনের অধীন করিয়া সিরাজদ্দৌলার নিকট তাঁহার বিরুদ্ধে নানাপ্রকার সূচকতা করিতে লাগিলেন। পারিষদগণও রায় রাঁয়ার পক্ষ হইয়া মহারাজের বিপক্ষে অনেক অনেক আরোপিত কথা উত্থাপন করাতে নবাব একেবারে রাজার প্রতি ক্রুদ্ধ হইয়াছিলেন। বিশেষতঃ ইংরেজদিগের পক্ষে কলিকাতার কুঠীর প্রধান কর্ম্মকর্ত্তা ড্রেক সাহেবের সহিত তাঁহার আন্তরিক প্রণয় থাকাতেও মহারাজকে নবাবের অমঙ্গল আকাঙ্ক্ষী বলিয়া ব্যক্ত করাতে, একেবারে প্রজ্জ্বলিত অনলে ঘৃতাহুতি করার ন্যায় জ্বলিয়া উঠিলেন। নবাব (রায় রাঁয়ার ও পারিষদগণের ষট্‌চক্রে মুগ্ধ এবং ক্রোধান্ধ হইয়া) মহারাজকে কোন কর্ম্ম উপলক্ষে আপন সমীক্ষে আহ্বান করিয়া অবিচারে শিরচ্ছেদনার্থ ঘাতুকের হস্তে অর্পণ করেন। ঘাতুক খরশান করবাল করস্থ করিয়া পুনরাদেশের অপেক্ষায় দণ্ডায়মান ছিল। তখন স্থিরবুদ্ধি মহারাজ সাহসে নির্ভর করিয়া নানাপ্রকার বিনয়বাক্যে

সিরাজদ্দৌলার ক্রোধের কিঞ্চিৎ শান্তি করিয়া প্রাণদণ্ড হইতে রক্ষা পান; কিন্তু মহারাজের কারাগারে বাস করিতে হইয়াছিল। এই অবসরে নবাবের পারিষদগণ মহারাজের ভবনে পরশমণি এবং অনেকতর ধনরত্ন আছে, তাহা নবাব সরকারে আনয়ন কর্ত্তব্য, এই পরামর্শ দেওয়াতে নবাব তথাস্তু বলিয়া সেনা ও সেনাপতিসহ স্বীয় শ্যালককে তৎকর্ম্ম সম্পাদনে নিয়োজিত করেন। এই উপলক্ষে মহারাজের যথা সর্ব্বস্ব লুণ্ঠনপূর্ব্বক মুরশিদাবাদে নীত হয়। এতদ্‌ঘটনার পূর্ব্বাহ্নে রাজকুমার দেওয়ান কৃষ্ণদাস বাহাদুর এই সংবাদ জানিয়া প্রাণভয়ে ১৭৫৬ খৃষ্টাব্দের ১৭ই মার্চ্চ তারিখে পলায়ন করতঃ কলিকাতার প্রধান কর্ম্মকর্ত্তা ড্রেক সাহেবের শরণাগত হন। ড্রেক সাহেব তাঁহাকে যত্নে ও সমাদরে গ্রহণ পূর্ব্বক অভয়দান করেন। সিরাজদ্দৌলা দূতমুখে দেওয়ান কৃষ্ণদাসের পলায়নবার্ত্তা শ্রুত হইয়া ইংরাজদিগের সহিতও নানাপ্রকার দ্বন্দ্ব উপস্থিত করণোদ্যত হইলেন; (একে ত প্রজাকুল মাত্রেই নবাবের প্রতিকুল ছিল, আবার ইংরাজগণও তদ্রূপ হইবার লক্ষণ হইয়া উঠিলেন।) এবং পুনরায় মহারাজকে কারাগার হইতে শিরশ্ছেদনের মানসে আনাইয়া হন্তার হস্তে সমর্পণ করেন। তৎকালেও মহারাজ এমনি চতুরতা প্রকাশ করিয়াছিলেন যে, তাহাতে সিরাজদ্দৌলা মহারাজের শিরশ্ছেদন না করিয়া তাঁহাকে কারামুক্ত করিয়া দিলেন; কিন্তু অপদস্থভাবে কিয়ৎকাল নগর-বদ্ধ থাকিতে হইয়াছিল। এক্ষণে প্রসঙ্গত সিরাজদ্দৌলার রাজ্যভ্রষ্ট ও শ্রীভ্রষ্ট এবং ইংরেজদিগের ইষ্টসাধনে সচেষ্ট হইবার প্রসঙ্গ করা যাইতেছে।

ফলতঃ উল্লিখিত কারণেই ইংরাজদিগের সহিত সিরাজদ্দৌলার বিবাদের বীজ অঙ্কুরিত হয়। এই ঘটনাই ইংরাজ রাজকুলের এই ভারত-খণ্ডের অখণ্ড-দণ্ড-ধরত্ব প্রাপণের এবং সিরাজদ্দৌলার নিধনের কারণ হইয়াছিল। যে হেতু তৎসময়েই ইংরাজগণের প্রতি দেওয়ান কৃষ্ণদাস

বাহাদুরকে মুরশিদাবাদে পাঠাইয়া দিবার আদেশে নবাব পত্র লিখিয়াছিলেন। ইংরাজগণ তদুত্তরে নানাপ্রকারের প্রবোধের সহিত শরণাগত জনকে পরিত্যাগ করা অনুচিত ইত্যাদি প্রসঙ্গে পত্র লিখিয়া রাজদূতকে বিদায়পূর্ব্বক ভাবী সম্ভাবিত কোন বিপদাশঙ্কাবিনিবারণার্থ কলিকাতায় দৃঢ়রূপে দুর্গ নির্ম্মাণারম্ভ করেন। সিরাজদ্দৌলা ঐ পত্র এবং দৃঢ়রূপে দুর্গনির্ম্মাণের সংবাদ পাইয়া দুর্গনির্ম্মাণ নিষেধ এবং দেওয়ান কৃষ্ণদাসকে পাঠান বিষয়ে পুনরায় কঠিনরূপে পত্র লিখেন। এদিকে সিরাজদ্দৌলার অত্যাচারে উত্যক্ত হইয়া অন্য উপায়ে নিরুপায় জানিয়া প্রধান প্রধান রাজকর্ম্মচারিগণ মিলিত হইয়া পুনরায় নবাব সওকৎজঙ্গ বাহাদুরের সদনে মুরশিদাবাদ অধিকার করণ-কামনায় পত্র লিখা হয়। তাহাতে পূর্ণিয়ার নবাব সম্মত হইয়া যুদ্ধসজ্জাকরণে প্রবৃত্ত হন। সিরাজদ্দৌলা এই ষড়যন্ত্র মন্ত্রণার তত্ব জ্ঞাত হইয়া সৈন্যসামন্তসহ পুর্ণিয়ার নবাবের দমনার্থে রাজমহল পর্য্যন্ত উপস্থিত হইয়াছিলেন। ইতিমধ্যে ইংরাজদিগের লিখিত পত্র প্রাপ্তে অমনি রাজমহল হইতে ক্রোধাবেশে ইংরাজদিগের দমন নিমিত্ত ৭০ হাজার সৈন্যসহ কলিকাতাভিমুখে স্বয়ং আগমন করেন। আসিবারকালে পথিমধ্যে ইংরাজদিগের কাসিমবাজারের কুঠী লুণ্ঠন করিয়া ১৭৫৭ খৃষ্টাব্দের জুনমাসে নগর বেষ্টন করেন। তৎকালীন কলিকাতায় ইংরাজদিগের সেনার অল্পতা, এবং দুর্গের জীর্ণতাবশতঃ তাঁহারা পরাক্রম প্রকাশকরণে অপারগ হইয়া নবাবের নিকট ক্ষমাপ্রার্থী ও অর্থদানে সম্মত হইতে বাধ্য হইয়াছিলেন। তথাচ দুর্ব্বৃত্ত নবাব শান্ত বা সম্মত না হইয়া ৯ই জুন দিবসে দুর্গ আক্রমণ এবং দুর্গের বহির্ভাগস্থ বাজার দগ্ধ করেন। তৎকালে ইংরাজসেনাপতি সাহেব নবাবের প্রধান সেনাপতি মাণিকচাঁদের নিকট পুনরায় সন্ধি নিবন্ধনের প্রস্তাব করেন। মাণিকচাঁদ সম্মত না হওয়াতে অগত্যা ৩।৪ দিবসকাল ঘোরতর যুদ্ধ হয়। ইংরাজ-

দিগের সৈন্য সামন্ত ছিল না ; বিশেষতঃ প্রধান কর্ম্মকর্ত্তা ড্রেক সাহেব প্রভৃতি অনেকানেক ইংরাজগণ পলায়নপরায়ণ হইয়া জাহাজারোহণে গমন করাতে অবশিষ্ট ২০০ কি ২৫০ শত ইংরাজ যাহারা দুর্গ মধ্যে ছিল, তাহারা প্রাণপণে যুদ্ধ করত কতেক হত অবশিষ্ট হতাশ ও নিবীর্য্য হইয়া পড়িলে সেনাপতি মাণিকচাঁদ ২৩ শে জুন দুর্গাধিকার করিয়া লয়। প্রভাত-কালে সিরাজদ্দৌলা দুর্গমধ্যে যাইয়া ইংরাজগণকে দৃঢ়রূপে কারাবদ্ধের আজ্ঞা করেন। তদ্দিবস রাত্রে ইংরাজগণকে এক নির্ব্বাত গৃহে বন্ধ রাখা হয়। তাহাতে বন্দিগণের প্রায় ত্রি-চতুর্থাংশ মহাকষ্টে মৃত্যুমুখে গমন করে ; অবশিষ্টগণ মৃতপ্রায় হইয়াছিলেন। প্রাতে সিরাজদ্দৌলা তাহাদিগকে বন্ধমুক্ত করিয়া কলিকাতার দুর্গ মাণিকচাঁদের রক্ষণাবেক্ষণে রাখিয়া দেওয়ান কৃষ্ণদাসকে ধৃত করিয়া ইংরাজদিগের কয়েকজনে সবন্ধনে মুরশিদাবাদে লইয়া যান। গমনকালে কলিকাতার বিলুণ্ঠিত ইংরাজ-দিগের যৎকিঞ্চিৎ ধন এবং ওলন্দাজ হইতে উপঢৌকনস্বরূপ বহুতর ধন লইয়া মুরশিদাবাদের কোষ পূর্ণ করেন। ইহাকেই সিরাজদ্দৌলার রাজ্য চ্যুতির ও শিরশ্ছেদনের বীজ বপন বলিতে হইবেক। এই যুদ্ধ জয়ে নবাবের অন্তঃকরণে কতই যে আস্পর্দ্ধার বৃদ্ধি হইয়াছিল। অতঃপর সিরাজদ্দৌলা পুনরায় পুর্ণিয়া গমনপূর্ব্বক তথাকার নবাব সওকৎজঙ্গকে সমরাঙ্গণে শয়ান করিয়া বিজয়াবোধনসূচক অশেষ আনন্দোৎসব করিয়া-ছিলেন। অপর যৎকালে দেওয়ান কৃষ্ণদাস এবং কয়েকজন ইংরাজ নিগড়বন্ধনে মুরশিদাবাদে নীত হন, তৎকালে তাঁহাদিগের জীবনাশা মাত্রই ছিল না। কিন্তু বিধিবশতঃ রাজ্ঞীর দয়া সঞ্চার হওয়াতে তদীয় অনুরোধে কয়েকজন ইংরাজ বন্ধন-দশা হইতে মুক্তি পাইলেন, এবং দেওয়ান কৃষ্ণদাস মহারাজ মুরশিদাবাদের ভবনে এবং ইংরাজগণ যথেচ্ছ স্থানে বসতি ও গমন করিতে আদিষ্ট হইলেন। অনন্তর পরাজিত

ইংরাজগণ মান্দ্রাজের কর্তৃপক্ষের সাহায্যে বহুতর সেনা সংগ্রহ করিয়া ডিসেম্বর মাসের মধ্যভাগে কলিকাতা নগর আক্রমণপূর্ব্বক নবাবের সেনাপতি মাণিকচাঁদকে যুদ্ধে পরাজয় করতঃ ১৭৫৮ খৃষ্টাব্দেই জুন মাসে পুনরায় কলিকাতার দুর্গাধিকার করিয়া হুগলী আক্রমণ করেন। তাহাতে ভীত হইয়া সিরাজদ্দৌলা ফেরওয়ারি মাসের প্রথমে ইংরাজগণ সঙ্গে নানা প্রকার প্রতিজ্ঞাসহ সন্ধি সংস্থাপন করিলেন।

নবাব প্রকাশ্যে সন্ধি সংস্থাপন করিলেন বটে, কিন্তু ইংরাজদিগের প্রতিকূলাচরণে বিবৃত না হইয়া গোপনে গোপনে দুরভিসন্ধিসাধনের পথ দেখিতে লাগিলেন। ইহাতে ইংরাজগণ নবাবের প্রতি অত্যন্ত কোপাবিষ্ট হইয়া উঠিলেন। বিশেষতঃ এদিকে নবাবের অত্যাচারে তাঁহার কর্ম্মচারী সেনাপতি, রাজা প্রজা প্রভৃতি তাবতেই উত্যক্ত ছিলেন। সুতরাং তাবতেই সিরাজদ্দৌলার শ্রীভ্রষ্টাকাঙ্ক্ষী হইয়া রায় রাঁয়ার দ্বারা সৈন্যাধ্যক্ষ নবাব জাফরআলি খাঁর নিকট উপস্থিত উপদ্রব শান্তির উপায় অবধারণের প্রস্তাব করেন। জাফরআলি খাঁ জগৎশেঠ প্রভৃতির সহিত সমবেত হইয়া কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য স্থির করিবেন এই অভিপ্রায়ে রায় রাঁয়া জগৎশেঠের নিকট যাইয়া গোপনে সিরাজদ্দৌলার প্রভুত্ববিনাশের প্রসঙ্গ করিলে, প্রথমতঃ জগৎশেঠ একবারে মহাশঙ্কিত ও বিস্ময়াপন্ন হইয়াছিলেন, পরে সিরাজদ্দৌলার দৌরাত্ম্য ও অত্যাচার স্মরণ করিয়া মহারাজ রাজবল্লভের সহিত ইহার পরামর্শ করিতে বলেন। যদিচ যায় রাঁয়া মহারাজের সম্পূর্ণ বৈরী ছিলেন, তথাচ সিরাজদ্দৌলার বিনাশার্থ মহারাজের স্থানে উল্লেখিত বিষয়ের পরামর্শ জিজ্ঞাসু হন। তাহাতে মহারাজ এই মাত্র কহিয়াছিলেন যে, এ কর্ম্ম নিতান্ত ধর্ম্ম-বিরুদ্ধ, বিশেষতঃ আমরা এই নবাবের প্রজা,—চিরাশ্রিত বেতনভোগী ব্যক্তি। এ অবস্থায় আমি এবিষয়ে কি বলিব? আপনাদিগের নিতান্ত কামনা হইয়া থাকিলে নবদ্বীপাধিপতি

শ্রীমন্মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র রায় বাহাদুরকে আনাইয়া পরামর্শ ধার্য্য করুন। রায় রাঁয়া তন্মতে সম্মত হইয়া নবদ্বীপাধিপতির নিকট পত্র প্রেরণ করেন। নবদ্বীপাধিপতি পত্র-প্রাপ্তে কিঞ্চিৎ পর্য্যালোচনা করিয়া স্বীয় মন্ত্রী কালিকা প্রসাদ সিংহকে মুরশিদাবাদে পাঠাইয়া দেন। মন্ত্রীবর তথায় উপস্থিত হইয়া রায় রাঁয়ার সহিত সাক্ষাৎ করত নবদ্বীপাধিপতিকে আহ্বানের মর্ম্ম জ্ঞাত হইয়া নবদ্বীপে আসিয়া মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র রায় বাহাদুরকে তদ্বিষয় সবিশেষ বিদিত করিলে. নবদ্বীপাধিপতি অতি সংগোপনে মুরশিদাবাদে গমন করিয়া গোপনে রায় রাঁয়া, জগৎশেঠ, মিরজাফর আলি, রাজা বুনিয়াদসিংহ. চুনিলাল. মতিলাল. খাজাওয়াজেদ, ওমরচাঁদ প্রভৃতির ষড়যন্ত্রে মিলিত হন। জাফরআলি খাঁ নবদ্বীপাধিপতিকে সিরাজদ্দৌলার দৌরাত্ম্য ও অত্যাচারের বৃত্তান্ত কহিয়া তন্নিবারণের সদুপায় জিজ্ঞাসিলে, মহারাজ নবদ্বীপাধিপতি অগ্রে স্বীয়াভিপ্রায় ব্যক্ত না করিয়া কতিপয় ভাবী ভয় প্রদর্শনের সহিত বামনের চাঁদধরা ইত্যাদি উপমা দর্শাইয়া. প্রস্তাবিত কর্ম্ম হইতে নিবৃত্ত থাকিতে পরামর্শ দেন। পরে জাফরআলি এবং রায় রাঁয়া উক্ত বিষয়ে নিতান্ত আগ্রহপূর্ব্বক দৃঢ় প্রতিজ্ঞার নিদর্শন প্রদর্শন করাইলে মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র এই পরামর্শ দেন যে, ইদানীং ইংরাজ-দিগের তুল্য সাহসী ও যোদ্ধা এবং জ্ঞানবান্. গুণবান্, গুণগ্রাহক, পরাক্রমশালী ও ন্যায়পর ব্যক্তি অতি বিরল দেখা যাইতেছে। অতএব যদি এই দুর্ল্লংঘ্য সিন্ধুসন্তরণ কামনা থাকে, তবে ইংরাজদিগের দ্বারা কার্য্য উদ্ধারের চেষ্টা পাওয়া কর্ত্তব্য; নচেৎ কৃতকার্য্য হইবার সম্ভাবনা দেখা যায় না।

জাফরআলি খাঁর অন্তঃকরণে পূর্ব্বাবধিই নবাবীপদলাভের লালসা জাগরূক ছিল। সুতরাং তিনি তৎক্ষণাৎ নবদ্বীপাধিপতির বিশ্বাসযোগ্য ষড়যন্ত্রীয় নানা কথা কথনান্তর উপস্থিত বিষয়ের দৌত্য কার্য্যের ভার

গ্রহণার্থ নবদ্বীপাধিপতিকে অনুরোধ করেন। তদনুসারে ৺কালীদর্শন উপলক্ষে নবদ্বীপাধিপতি কলিকাতায় যাইয়া কলিকাতার প্রধান অধ্যক্ষ শ্রীযুক্ত ক্লাইব সাহেবের সহিত সাক্ষাতালাপ করতঃ এরূপ স্থির করিয়াছিলেন যে, ইংরাজগণ অগ্রসূচি হইয়া নবাবের সহিত যুদ্ধ বাধাইবেন;—তাহাতে নবাবের প্রধান সেনাপতি মীর জাফরআলি খাঁ যুদ্ধকালে ইংরাজের পক্ষ হইয়া পৃষ্ঠভঙ্গ দিবেন, যুদ্ধ জয় হইলে মীরজাফরআলি খাঁ রাজ্যাধিকারী থাকিবেন; কিন্তু ইংরাজের পরামর্শ অনুসারে সমস্ত কার্য্য চালাইবেন এবং ইংরাজগণ কলিকাতার নিকটস্থ কতক ভূমি ও যুদ্ধব্যয় নবাব সরকারে পাইবেন; তদ্ভিন্ন পূর্ব্ব নিয়মিত বাণিজ্য শুল্কেরো কিঞ্চিৎ ন্যূন হইবেক। ইহা অবধারণান্তর নবদ্বীপাধিপতি মুরশিদাবাদে যাইয়া জাফরআলি খাঁকে আনুপূর্ব্বিক সমস্ত বিবরণ বিদিত করেন এবং ইংরাজ পক্ষীয় এজেণ্ট ওয়াট্ সাহেবও মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্রের কথিত কথার সত্যতা মন্ত্রণা স্থিরতরের বিষয় ক্লাইব সাহেবকে জ্ঞাত করেন। সিরাজদ্দৌলার সহিত সাক্ষাৎ না করিয়া স্বদেশে গতিবিধি অনুচিত বিবেচনায়, নানা উপঢৌকন সহিত রাজা কৃষ্ণচন্দ্র রায় নবাবের সাক্ষাৎকার লাভ করিয়া স্বীয়াধিকারের অপ্রতুলতার বিষয় নিবেদনপূর্ব্বক স্বদেশে গমন করত সন্নিহিত ষড়যন্ত্রীয় বিষয়ে কখন কি ঘটনা হয়, তদ্বিষয়ে সচিন্তিত ছিলেন।

ইংরাজগণের সহিত নবাবের সেনাপতি প্রভৃতি প্রধান প্রধান সমস্ত কর্ম্মচারীদিগের অভিসন্ধি স্থির হওয়াতে তাহারা সাহস পাইয়া সিরাজদ্দৌলা কর্ত্তৃক ইংরাজের প্রতি যে সমস্ত দৌরাত্ম্য হইয়াছিল, তাহার প্রতীকার করণোপলক্ষ করিয়া ক্লাইব সাহেব সসৈন্যে :মুরশিদাবাদাভিমুখে গমন করেন। সিরাজদ্দৌলা ইহা জানিতে পারিয়া রণসজ্জায় সজ্জীভূত হইয়া ১৭৫৭ খৃঃ অব্দের জুন মাসে পলাসী পর্য্যন্ত উপনীত হন। তৎকালে মীরজাফর আলি খাঁর অধীনে নবাব ১৫ হাজার অশ্বারোহী এবং

৩৫ হাজার পদাতিক সাহসিক সৈন্য ছিল। প্রথম দিবসীয় যুদ্ধে সেনাপতিত্বে ব্রতী হইয়া মীরমদন সংগ্রামস্থলে উপস্থিত ছিলেন। তদ্দিবসীয় যুদ্ধে ইংরাজগণকে রঙ্গভূমি হইতে পৃষ্ঠভঙ্গ দিতে হইয়াছিল। তাহাতে ইংরাজগণের সেনাপতি ক্লাইব সাহেব নিতান্ত ভাবিত হইয়া রাজা কৃষ্ণচন্দ্রের চাতুরী ও প্রবঞ্চনানুমান করিয়া অনেকানেক বিতর্কনার পর জনৈক গুপ্তচর জাফরআলি খাঁর শিবিরে পাঠাইয়া রাজা কৃষ্ণচন্দ্রের প্রতিজ্ঞার বিষয় উল্লেখ পূর্ব্বক তদ্বিরুদ্ধাচরণ করা অন্যায় ইত্যাদি কহিয়া পাঠাইলে, জাফর আলি খাঁ প্রত্যুত্তরে দূতের প্রতি অনেক আশ্বাস বাক্য প্রয়োগানন্তর ইহাও বলিয়াছিলেন যে প্রথমক্ষণে আমার পৃষ্ঠভঙ্গ দেওয়া কি ইংরাজগণের সহিত সম্মিলিত হওয়া বিহিত নহে; আগামী কল্য পরশ্ব দিবসের যুদ্ধেই রাজা কৃষ্ণচন্দ্রের কথার সত্যতা দেখিতে পারিবেন। তজ্জ্ঞাপনে ইংরাজকুলের ব্যাকুলতা নিবারণ হয়; এবং পরদিবসীয় যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইতে উদ্যোগী হন। প্রভু-ঘাতক জাফর আলি খাঁ এই আশ্বাস না দিলে অবশ্যই ইংরাজগণ পরাজয় স্বীকার করিতে বাধ্য হইতেন। অনন্তর পরদিবস জাফর আলি খাঁ বহ্বাড়ম্বরসহ সমরস্থলে সেনাগণ প্রেরণ পূর্ব্বক ক্ষণকাল মাত্র যুদ্ধ করত স্থগিত রাখিলে, নবাব অত্যন্ত ব্যস্ত হইয়া যুদ্ধ করিবার নিমিত্ত জাফর আলি খাঁকে বারম্বার অনুরোধ করেন। তদুত্তরে জাফর আলি খাঁ বলিলেন "আগামী কল্য যুদ্ধ করিয়া ইংরাজদিগকে পরাজয় করিব, এক্ষণে সেনাপতি মদনকেও বারণ করা যাউক।" সমস্ত উদ্যোগ বৃথা হওয়াতে অগত্যা নবাবকে তূষ্ণীম্ভূত হইতে হইয়াছিল। ইহাতে মীরমদন বিরক্ত হইয়া নবাবকে অনেক ভৎর্সনা করেন এবং নবাবের অমঙ্গলানুমানে শোকাবেগে মগ্ন থাকিয়া সেই দিবাবিভাবরী প্রায় ক্রন্দনেই যাপন করিয়াছিলেন। পরদিবস জাফর আলি খাঁ বাহ্যিক নানামত

বিশ্বাসজনক আড়ম্বর দর্শাইয়া সিরাজউদ্দৌলাকে সঙ্গে করিয়া ন্যূনাধিক ৫০ হাজার সেনাসহ সমরাঙ্গণে উপস্থিত হইয়াছিলেন বটে, কিন্তু সেনাগণ জাফর আলি খাঁর ইঙ্গিতানুসারে কপটযুদ্ধ করিতে লাগিল। এই অবসরে ইংরাজগণ সুযোগ পাইয়া অনিবার তোপধ্বনি করিতে করিতে ক্রমশঃ অগ্রসর হইতে লাগিলেন। তাহাতে নবাবের সেনাপতি মদন ও বহুতর সেনা হতাহত হয়। এবম্প্রকারে তদ্দিবাবসান হইলে রজনীমুখে যুদ্ধ বিরাম থাকে। পরদিবস অর্থাৎ তৃতীয় দিবসে মোহনলাল নামক এক ব্যক্তি সেনাপতি হইয়া কিয়ৎকাল পর্য্যন্ত অত্যন্ত বীরত্বপ্রকাশপূর্ব্বক যুদ্ধ করিতেছিল। জাফর আলি খাঁ ইহা জানিতে পারিয়া নবাবের পক্ষ হইতে তাহাকে আহ্বান করা হইয়াছে বলিয়া চক্রান্তে যুদ্ধ হইতে নিবৃত্ত করাতে উপস্থিত যুদ্ধের নিবারণ হয়; এবং যুদ্ধনিবৃত্তিপূর্ব্বক মোহনলালের প্রত্যাগমনে তদধীনস্থ সৈন্যসমস্ত একেবারে ভগ্নাশ হইয়া ইতস্তত পলায়ন করিতে লাগিল। ইহাতে মোহনলাল জাফর আলি খাঁর এই দুষ্কৃতি কার্য্যে ত্যক্তবিরক্ত হইয়া নবাবকে তদ্বিষয় আবেদন করিয়া বিহিত উপায় চেষ্টিবার পরামর্শ দেন। তাহাতে নবাব সমুচিত প্রতিকারের প্রত্যাশায় মীর জাফর আলি খাঁর নিকট কত কত কাকুবাদসহ চরণে উষ্ণীষ রাখিয়া মনোযোগপূর্ব্বক অকপটে যুদ্ধ করিবার প্রার্থনা করেন। এবং ইহাও কহিয়াছিলেন যে, মাতামহের উপকার স্মরণ করিয়া অপরাধ থাকে মার্জ্জনা কর, এই যুদ্ধে আমাকে প্রাণ মান দান দেও, কিন্তু তাহাতে কিছুই প্রত্যুপকার হইল না।

সিরাজউদ্দৌলার শ্রীভ্রষ্টই জাফর আলি খাঁর ইষ্টসাধনের উপায় ছিল। সুতরাং জাফর আলি খাঁ এই কাকুবাদে কেনই বা আর্দ্র হইবেন? অতঃপর মোহনলাল (বিশ্বাসঘাতক সৈন্যাধ্যক্ষ জাফর আলি খাঁর বিপক্ষ পক্ষে সম্মিলিত হওয়ার বৃত্তান্ত) বিদিত করিয়া পলায়নপূর্ব্বক প্রাণরক্ষা

করিবার পরামর্শ দেওয়াতে নবাব এককালে হতাশ হইয়া শরীররক্ষক সঙ্গীয় কতিপয় অশ্বারোহীসহ উষ্ট্রারোহণে সমস্ত রাত্রি চলিয়া মুরশিদাবাদে উপনীত হন। প্রভাতে রাজকর্ম্মচারিগণকে আহ্বান করাতে আসিতেছি, আসিব ইত্যাকার স্তোভবাক্য দ্বারা কাল হরণ করিতে লাগিল। এমন কি, তৎকালে নবাবের আত্মীয় কুটুম্বগণও তাঁহার মুখাবলোকন করিল না। এতাবৎ কারণে সমস্ত দিবারাত্রি শেষার্দ্ধ পর্য্যন্ত মহতী উৎকণ্ঠাসহ স্বাবাসে অবস্থিতি করিয়া যখন দেখিলেন এই ঘোরতর বিপদ্‌সময়ে আত্মীয় বান্ধব, সেনা, সেনাপতি ও ভৃত্যামাত্য কেহই তাঁহার সাহায্য করিল না, তখন কাযেই পলায়ন-পথাশ্রয় করা আপনপক্ষে শ্রেয়স্করজ্ঞানে সিরাজউদ্দৌলা মূল্যবান্ দ্রব্যাদি এবং কিছু আসরফি লইয়া শকটারোহণে পরিবারসহ দ্রুতগমনে ভগবানগোলা পর্য্যন্ত পঁহুছিয়া তথা হইতে তরণী-যোগে রাজমহলের অন্তঃপাতীয় কোন স্থলে উপনীত হইয়া উপবাসিনী পত্নী ও কন্যার আহার আহরণজন্য ভৃত্য প্রেরণ করেন। ভৃত্য অনতি-দূরে এক ফকিরের আলয়ে যাইয়া কয়েকটি রুটি প্রার্থনা করে। ফকির আপন আহারীয় রুটি হইতে কয়েকটি রুটি দিতে স্বীকার হইলে ভৃত্য অমনি একটি স্বর্ণমুদ্রা ফকিরকে প্রদান করিয়া রুটি লয়। ইহাতে ফকির অনুমান করিল, বুঝি বা দুরাত্মা সিরাজউদ্দৌলাই পলায়নপর হইতেছে, ইনি আমার প্রতি যে অত্যাচার করিয়াছিলেন, তাহার প্রতিফল দিবার এই সময়েই সুসময়। এইরূপ বিবেচনা করিয়া জাফর আলি খাঁর পক্ষীয় চরগণকে সিরাজউদ্দৌলার আগমনবার্ত্তা বিদিত করিয়া তাহাদিগের সমভিব্যাহারে আনিয়া ইঙ্গিতে সিরাজউদ্দৌলার নৌকা দেখাইয়া দেয়। তাহাতে তাহারা নৌকার প্রতি আক্রমণ করিয়া সিরাজউদ্দৌলাকে ধৃত করে। অপিচ নবাব তৎকালে ধৃতকারিদিগকে বহুমূল্য ধন দিয়া মুক্তির চেষ্টা পাইয়াছিলেন, কিন্তু তাঁহার সেই চেষ্টা সর্ব্বতোভাবে বিফল হইয়া

ছিল। ধৃতকারিগণ কোনমতেই তাঁহাকে ছাড়িল না। সবন্ধনে জাফর আলি খাঁর পুত্র মীর মীরণের সমীক্ষে উপস্থিত করিল। মীরণ এ বিষম শত্রুকে বধ করা শ্রেয়ঃ বিবেচনায় আপন পিতার আজ্ঞা অপেক্ষা না করিয়া সিরাজউদ্দৌলার শিরশ্ছেদনের আজ্ঞা করেন। ১৭৫৭ খ্রীষ্টাব্দের জুন মাসের শেষে সিরাজউদ্দৌলার শিরশ্ছেদন হয়। সিরাজউদ্দৌলা প্রাণরক্ষার্থে কত কত বিনয়, শত শত কাকুবাদ করিয়াছিলেন বটে! কিন্তু তাঁহার সেই যত্ন কেবল বানরের হস্তগত রত্নবৎ হইয়াছিল।

মীরণের এই দুরূহ আচরণে, বিশেষতঃ অত্যন্ত অনুচিতভাবে বধ-করত সিরাজউদ্দৌলার মৃতদেহখণ্ড হস্তীপৃষ্ঠে উত্তোলন করিয়া নগরভ্রমণ করাইতে মুরশিদাবাদস্থ আপামরজনগণেই অত্যন্ত শোক ও দুঃখ প্রকাশ এবং মীরণের স্বভাবের প্রতি ভর্ৎসনা প্রয়োগ করিয়াছিল। (হা পর-মেশ্বর! তোমার কি অখণ্ডনীয় দণ্ডবিধান যে দণ্ডে দণ্ডে অপরাধিগণের দণ্ড হইতেছে! তথাচ আমরা তাহা মান্যমান হই না!) যদিচ সিরাজ-উদ্দৌলাকে উক্ত প্রকারে বধ করাতে মিরণের স্বভাবের প্রতি ভর্ৎসনা ভিন্ন আর কিছুই করা যাইতে পারে না, কিন্তু তথাচ সিরাজউদ্দৌলার কঠিন ক্রূর স্বভাব, অসদাচার ও অবিচারের কথা স্মরণ হইলে কোন মতেই মিরণের নিষ্ঠুরতা দোষের প্রতি দোষারোপ করিতে ইচ্ছা হইত না।

এবম্প্রকারে মির জাফর আলি খাঁ রাজত্বপ্রাপ্ত হইয়া মহারাজ রাজ-বল্লভের প্রতি পুনরায় রাজ্যশাসনের ভারার্পণ করিয়াছিলেন এবং দেওয়ান কৃষ্ণদাস ঢাকার দেওয়ানীপদে পুনঃ পদস্থ হইয়াছিলেন; কিন্তু রায় মৃত্যুঞ্জয় রাজবল্লভের উন্নতিলাভে আন্তরিক অসুখী ছিলেন। সে যাহা হউক, মহারাজ পদস্থ হইয়া অত্যন্ত সাবধান ও সতর্কতাসহ সুবিচারে রাজ্যশাসন করিয়াছিলেন বটে; কিন্তু জাফর আলি খাঁ রাজত্ব পাইয়া কতিপয় কুচক্র, সূচক ও স্তাবকদিগের সূচকতায় ও স্তাবকতায় মোহিত

হইয়া একেবারে এমনি দোষাবহ কর্ম্মাচরণ ও অহঙ্কারমদে প্রমত্ত হইয়া পড়িলেন যে, যে সমস্ত ব্যক্তির যত্নানুকূল্যে তিনি রাজত্ব পাইয়াছিলেন, তাহাদিগের অনেককেও নষ্টকরণে প্রবর্ত্ত হইলেন, সিরাজউদ্দৌলার ভ্রাতাকেও বধ করিয়াছিলেন। দুর্ল্লভরাম ও রাজা রামনারায়ণ ইংরাজের শরণ লইয়া প্রাণরক্ষা করিয়াছিলেন এবং ধ্যানসিংহ ও তদ্‌ভ্রাতার প্রতিও দৌরাত্ম্য করিয়াছিলেন। তদ্ভিন্ন আরও আরও অনেক প্রধানগণের সহিত, বিশেষতঃ যে ইংরাজদিগের প্রসাদাৎ তিনি রাজ্য প্রাপ্ত হন, তাঁহাদিগের সহিতও নানাপ্রকার অসদাচরণ করিতে ত্রুটি করিয়াছিলেন না। এমন কি, জাফর আলি ও তৎপুত্র মিরণের কদাচারে ও অবিচারে প্রজাগণের অন্তঃকরণ হইতে সিরাজউদ্দৌলার দৌরাত্ম্য স্মৃতি-পথাতীত হইয়াছিল। এতৎ কারণ বশতই ইংরাজগণ অপনাপন দুর্গ সমস্ত দৃঢ় ও যুদ্ধায়োজন করিয়া জাফর আলিকে দমনের নিমিত্ত ছিদ্রানুসন্ধান করিতে লাগিলেন। (এ বিষয়ে জাফর আলি খাঁর ও ইংরেজদিগের মধ্যে যে যে রূপ ঘটনা হইয়াছিল তদ্বিশেষ উল্লেখ করা অপ্রয়োজন বিবেচনায় লিখা হইল না)। কিন্তু এ বিষয়ে একটি কথা ব্যক্ত না করিয়া গুপ্ত রাখিতে পারিলাম না। (যথা:— নির্ব্বোধ ক্রূরকর্ম্মাদিগের আচরণের তুলনা শুদ্ধ নির্ব্বোধ অজাকুলের আচরণের সহিত দেওয়া যাইতে পারে। যেহেতু ইহা অনেকেই প্রত্যক্ষ করিয়া থাকিবেন যে, যৎকালে বহুসংখ্যক একস্থানে সমবেত করিয়া ছেদন করা যায়, আর এক একটা অজার শিরচ্ছেদ হইতে থাকে এবং তাহার শোণিত ধারা ধরাদেবীকে আর্দ্র করিতে থাকে তৎকালেও এক অজা অজান্তরের কণ্ঠহারাদি ভক্ষণ এবং নানা আমোদে প্রকাশ করে; আপনার যে তদ্দশাই হইবে, ইহার বিবেচনাই করে না। মদান্ধ ব্যক্তির আচরণ ও তদ্বৎ। দেখুন যে অত্যাচার ও অবিচার দোষে

সিরাজউদ্দৌলা সম্পূর্ণ দুই বৎসর কালও রাজত্ব করিতে না পারিয়া অকালেই কালক্রোড়ে গমন করিল, ইহা প্রত্যক্ষ করিয়াও জাফর আলি খাঁ এবং তৎপুত্র সেই প্রকার নানা কদর্য্য কার্য্যে প্রবর্ত্ত হইলেন)। তাহার সবিশেষ পশ্চাৎলিপি হইবে। এক্ষণে প্রসঙ্গত আগা মেহদি কর্ত্তৃক ঢাকার নবাবের বধ ও সুবাদারী পদ গ্রহণ এবং মুরশিদাবাদের নবাবের আদেশে তাহার সপরিবারের নিধনাদি বৃত্তান্ত সঙ্কলন করা হইতেছে। যথাঃ—ঢাকা নগরে আগা মেহদি ও আগা বাকর নামে দুই ভ্রাতা অতি প্রধান ভূম্যধিকারী ও প্রতাপশীল ব্যক্তি বসতি করিত। তাহারা মিলিত হইয়া দিল্লীশ্বরের কৃত্রিম নিয়োগপত্র ও কৃত্রিম পাঞ্জা (১) প্রস্তুত করতঃ আপনাদিগকে সুবেদার প্রকাশ করিয়া হঠাৎ অতি সুশীল ধার্ম্মিকবর ঢাকার নবাবের শিরশ্ছেদন করিয়া ১৭৫৬ খৃঃ অব্দে আগা মেহদি স্বয়ং সুবেদারী পদ গ্রহণ করে। দেওয়ান কৃষ্ণদাস বাহাদূরকর্ত্তৃক উহা মুরশিদাবাদের প্রধান নবাবের সদনে ব্যক্ত হইলে নবাব ঐ ঐ দুরাত্মাদিগের শিরশ্ছেদন ও সর্ব্বস্ব বিলুণ্ঠনের আদেশ সহ সেনা সেনানী সহিত মহারাজকে ঢাকা নগরে প্রেরণ করেন। তদনুসারে স্বসৈন্যে মহারাজ ঢাকা নগরে আসিয়া দুরাত্মাদ্বয়কে আক্রমণ করিয়া সপরিবারে বন্ধনপূর্ব্বক যৎসামান্য ধনসম্পত্তি যাহা পাওয়া গেল, তন্মাত্র বিলুণ্ঠন করিয়া অবশিষ্ঠ গুপ্তধন প্রকাশার্থ আগার দেওয়ান রামকেশব সেনকে ধৃত করিয়া শিরশ্ছেদের ভয় দর্শাইয়া অনেক যন্ত্রণা দিয়াছিলেন। তথাচ রামকেশব আপন প্রভূর গুপ্তধনের তত্ত্ব ব্যক্ত করিল না। অনন্তর রামকেশবের কনিষ্ঠ ভ্রাতৃদ্বয় শ্রীনাথ ও রঘুরাম, যাহারা ঢাকার নবাবের অধীনে কোন কর্ম্মচারিত্বে ছিল, তাহারা মহারাজ সন্নিধানে আসিয়া অনেকানেক বিনয় কৌশলক্রমে আপন ভ্রাতার নিষ্কৃতি ও প্রাণরক্ষা করে। পরে অশেষ অনুসন্ধানে আগার শয়নাগারের পশ্চাৎভাগের

গুপ্ত কোষ্ঠে যে মূল্যবান হীরা, চুনী, মণি এবং স্বর্ণ রৌপ্য মুদ্রাদি প্রোথিত ছিল, তাহা পাপ্ত হইয়া আগা মেহেদি ও আগাবাকরের সবংশে ধ্বংস করিয়া সহর বিলুণ্ঠিত করিয়া ধনরত্নাদিসহ মুরশিদাবাদে যাইয়া নবাবকে প্রদান এবং আগদ্বয়ের সবংশে ধ্বংস করণ বৃত্তান্ত বিদিত করেন। তাহাতে নবাব সন্তোষ হইয়া বোজরগ উমেদপুর পরগণা মহারাজকে প্রদান করেন।

অতঃপর ১৭৬০ খৃষ্টাব্দের প্রথমে জাফর আলি খাঁ রোগাক্রান্ত হইয়া মিরণের হস্তে রাজ্যাধিকার অর্পণ করতঃ আপনি নির্ব্বিষয়ীর ন্যায় বসতি করিতে লাগিলেন। মীরণ অধিকার পাইয়া পূর্ব্ব নবাবের পরিবারের অনেককেই সংহার করিয়াছিলেন, এবং কখন কি আদেশ বা আচরণ করেন নিরুপণই ছিল না, একেবারে যথেচ্ছাচারী হইয়া পড়িয়াছিলেন। মিরণের এতাবৎ দুর্বৃত্ততায় প্রজাকুলের মধ্যে ব্যাকুলতার আর অবশেষ মাত্রই ছিল না। বাস্তব নবাব আলিবর্দ্দী খাঁর পর অবধি উত্তরোত্তর যাহারা এতদ্রাজ্যের অধিরাজ হইয়াছিলেন, তাঁহারা কেহই শান্তস্বভাবী সুখ্যাতাপন্ন ছিলেন না; সকলেই পূর্ব্ববর্ত্তীয়ের কৃতকার্য্যকে উত্তম বলাইয়াছিলেন। এতৎসমকালে মহারাজা বিবেচনা করিলেন যে, দুরন্ত কৃতান্তরূপ প্রভুর অধীনে অবস্থিতি করিতেছি, কখন কি কারণে কৃতান্ত হইয়া বসেন, তাহার নিশ্চয় নাই; তবে যে কিয়ৎকাল বাঁচিয়া থাকা যায়, ইতিমধ্যে কিঞ্চিৎ সৎকার্য্য করিয়া নেওয়া বিধেয়। এই স্থির করিয়া বিপুলার্থব্যয়পূর্ব্বক মুরশিদাবাদেই মহারাজ যজ্ঞ এবং কিরীটেশ্বরীর মন্দিরের উত্তরাংশে পাষাণময় কএক শিব সংস্থাপন করেন। অদ্যাপি তাহা তথায় বর্ত্তমান আছে। এতদ্ব্যাপারে নবদ্বীপাধিপতি রাজা কৃষ্ণচন্দ্র রায় বাহাদুর সদস্যরূপে উপস্থিত ছিলেন, এবং নানা দিগ্‌দেশীয় ব্রাহ্মণ পণ্ডিত, রাজা

ভূমাধিকারিগণ নিমন্ত্রিত ছিলেন। ক্রিয়া সমাপনান্তে দক্ষিণা ও আহুত রবাহুতগণকে যথাযুক্ত বিদায় দেওয়া হইয়াছিল। মহারাজের বদান্য শক্তির পরীক্ষার্থ কপটে কন্যাদায় উদ্ধারের উপলক্ষে রাজাসমীপস্থ হইয়া অর্থ যাচ্ঞা করাতে মহারাজ তাঁহাকে লক্ষ মুদ্রা প্রদান করিয়াছিলেন। ব্রাহ্মণ যথার্থতঃ অপ্রতিগ্রাহী ছিলেন। সুতরাং স্বীয়াশয় ব্যক্ত করিয়া অর্থগ্রহণে অসম্মতি প্রকাশ করিলে মহারাজ বলিলেন, যে স্থলে তোমাকে দান করার কল্পে এই অর্থ আনয়ন করা হইয়াছে, তৎকালে তাহা আমি কদাচ পুনঃগ্রহণ করিতে পারি না। অগত্যা ব্রাহ্মণ সেই টাকা দীন দরিদ্র দুঃখিগণকে বিতরণপূর্ব্বক স্বস্থানে প্রস্থান করিয়াছিলেন। মহারাজের অর্থব্যয়ের বিষয় পর্য্যালোচনা করিলে নবাব সরকারের অর্থের দ্বারাই এতদ্রূপ ব্যয় বাহুল্য নির্ব্বাহ পাওয়া প্রতীতি ও অনুমিত হয় বটে; কিন্তু তৎকালীনের নিয়মানুসারে যে পরিমাণ নজরাণা, উপঢৌকন ও সুকৃত কার্য্যের ফল স্বরূপ পুরস্কার পাইয়াছিলেন, আর বোজরগ উমেদপুর প্রভৃতি যে পরিমাণ লাভকর বিষয়াধিকারী হইয়াছিলেন তদ্দ্বারা কথিত ব্যয় নির্ব্বাহোপযোগী অর্থের আনুকূল্য হওয়া অসম্ভব বোধ হয় না। বরং এক্ষণকার ভূপতির প্রথমাধিকারকালীয় প্রধান রাজপুরুষগণের উপার্জনের প্রতি দৃষ্টি করিলেও মহারাজের অতুলার্থ উপার্জ্জন এবং ব্যয় বাহুল্য করা অসম্ভব নয়।

এক্ষণে বাকী রাজস্ব উদ্ধারাদি নিমিত্ত দিল্লীর সাহজাদা পাটনা পর্য্যন্ত আগমন এবং মীর মদনের সহ যুদ্ধ ও বজ্রাঘাতে তাহার নিধনাদির বৃত্তান্ত লিপি করা যাইতেছে যথা :—

উপরোক্ত ঘটনার কিছুকালান্তরে দিল্লীর বাদসাহ মুরশিদাবাদের নবাবের অনাদায়ী রাজস্ব উদ্ধার এবং নবাবের দমনার্থ বহুতর সৈন্যসহ পাটনা পর্য্যন্ত আসিয়া শিবির স্থাপনান্তর রাজস্ব পরিশোধপূর্ব্বক পদানত

হওন আদেশে মুরশিদাবাদের নবাবকে পত্র লিখেন। পাটনার নায়েব রাজা রামনারায়ণ এই তত্ত্ব পাইয়া যত্ন পুরঃসর রাজ্য রক্ষা করিতে প্রবর্ত্ত হইয়া মুরশিদাবাদে তত্ত্ব দিয়াছিলেন। ইতিমধ্যে তাঁহার সহিত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দুই একটি যুদ্ধও হইয়াছিল। কিন্তু বাদসাহের পক্ষীয়গণ রামনারায়ণের সন্ধান ও পরাক্রমে নগর আক্রমণ করিতে পারিয়াছিলেন না; পরিখার বহির্দ্দেশেই থাকিতে হইয়াছিল। এতদ্‌ঘটনার বার্ত্তা পাইয়া অহঙ্কার পরবশ মদগর্ব্বে গর্ব্বিত দুর্বৃত্ত মিরণ রাজস্ব না দিয়া যুদ্ধকরণে স্থিরকল্প হইয়া সমূহ সেনাপতি, হস্তি, ঘোটক, উষ্ট্রযান এবং শত শত শকটপূর্ণ খাদ্যসামগ্রী এবং যুদ্ধ দ্রব্যাদিসহ মহারাজকে সেনাপতিত্বে বরণ করিয়া স্বয়ং পাটনায় উপনীত হন। মহারাজ বারংবার মিরণকে এ অনাহুত রক্তারক্তি ব্যাপার হইতে নিবৃত্ত হইতে অনুরোধ করিয়া অকৃতকার্য্য হন। অবশেষে যুদ্ধারম্ভ হয়। প্রাথমিক যুদ্ধে সাহজাদার জয় হয়। তাহাতে মিরণকে ২০ সহস্র সেনা সমভিব্যাহারে পৃষ্ঠভঙ্গ দিয়া ব্যবধানে শিবির স্থাপন করিয়া অবস্থিতি করিতে হইয়াছিল। এই অবসরে সাহজাদার সেনাগণ হঠাৎ মিরণের ধনাগার আক্রমণ করে। তাহাতে মহারাজ রাজবল্লভ সেনাসহ সমর সম্মুখীন হইয়া বিবিধ পরাক্রম ও সাহস প্রকাশে সাহজাদার সেনাগণকে পরাভূত করিয়া নবাবের ধনরক্ষা করেন। এই যুদ্ধে ইংরাজপক্ষেরও একজন সেনাপতি কতক সৈন্যসহ মহারাজের পৃষ্ঠবর্ত্তী ছিলেন। এদিকে মিরণ মহারাজের প্রতি (পূর্ব্ব যুদ্ধে উপস্থিত না থাকার অপরাধেই, ক্রোধিত হইয়া শিরশ্ছেদন করিতে কৃতকল্প হন। ক্ষণকাল পরে সমর জয়পূর্ব্বক ধনাগার রক্ষার শুভসংবাদ প্রদানার্থ মহারাজ মীরণের সমীক্ষে উপস্থিত হইলে, মিরণ স্বীয় পূর্ব্ব কথা সিদ্ধকরণে উদ্যত হন। তাহাতে অন্যান্য পারিষদগণ মহারাজের কৃতকর্ম্মের মর্ম্ম প্রকটন করাতে মীরণের দারুণ ক্রোধোন্মুখ হইতে মহারাজ নিস্তার পান।

এই যুদ্ধঘটনা বর্ষা সময়েই ঘটিয়াছিল ; সুতরাং অনিবার বারিধারা পতন হইতে লাগিল, দৈবাৎ সেই রজনীযোগেই ঘোরতর মেঘাড়ম্বর বিদ্যুৎ হইতে হইতে অকস্মাৎ বজ্রাঘাত হইয়া ১৭৬০খ্রীঃ অব্দের জুলাই মাসে মীরণের মৃত্যু হয়। ভৃত্যকর্ত্তৃক এই সাংঘাতিক মৃত্যুসংবাদ মহারাজ জ্ঞাত হইয়া পাছে বিপক্ষ পক্ষেরা এতদ্বার্ত্তাশ্রবণে প্রবল হইয়া উঠে. এতদাশঙ্কায় মীরণের মৃত্যু সংবাদ গোপন করা শ্রেয় বিবেচনায় তদীয় শিবিরে যাইয়া মিরণের মৃতদেহে নানা ঔষধি পূর্ণ করতঃ বিবিধ ভূষণে ভূষিত করিয়া জীবিতাবস্থায় যেরূপ সেবা করা যাইত তদ্রূপ আচরণ করণাদেশে মৃত্যুঘটনা রটনার বারণ করিলেন।

প্রভাতে মহারাজ ইংরাজ পক্ষের জনৈক সৈন্যধ্যক্ষ কাশিয়ো সাহেবকে অনুরূপ করিয়া স্বীয় সৈন্যসামন্তসহ বিষম সমরে প্রবর্ত্ত হন। সেই যুদ্ধে মহারাজ ও কাশিয়ো সাহেবের বুদ্ধিকৌশলে ও বীরত্ব প্রকাশে সাহাজাদার সৈন্যশ্রেণী ছিন্ন ভিন্ন এবং হতাহত হইয়াছিল। তাহাতে সাহাজাদা পরাজয় স্বীকার করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। মহারাজ যুদ্ধজয়ী হইয়া দিবাবসানে শিবির স্থলে আসিয়া জাফর আলি খাঁকে মিরণের সাংঘাতিক মৃত্যু এবং সমর বিজয়ের বার্ত্তা লিখিয়া পাঠান। মিরণের মরণের তত্ত্ব প্রাপ্তে জাফর আলি খাঁ এমনি শোকাভিভূত হইয়াছিলেন যে কত শত সদ্জ্ঞানী মৌলবী ও মুফাথী ও মোসাহেবগণ তাঁহাকে প্রবোধ প্রয়োগের দ্বারাও সান্ত্বনা করিতে পারিয়াছিল না। এদিকে জাফর আলি খাঁর প্রত্যাদেশ প্রাপণ অপেক্ষা না করিয়া মিরণের মৃতদেহ সংকার অর্থাৎ মৃত্তিকায় প্রোথিত করিয়া মহারাজ মুরশিদাবাদে গমন করিবেন কি তদপেক্ষায় তথায় অবস্থিতি করিবেন ইতস্তত: ভাবনায় অভিভূত আছেন, এমনি সময়ে সাহজাদা সন্ধির মানসে মহারাজকে আহ্বান করেন। রাজামাত্যগণ রাজাকে শত্রুর শিবিরে গমনের নিষেধ করে। মহারাজ

তাহা অবিধেয় বিবেচনায় সাহাজাদার শিবিরে উপনীত হইয়া নানাবিধ উপঢৌকন প্রদানে করপুটে দণ্ডায়িত হইলে, সাহাজাদা মহারাজের দ্বারা ঢাকা ও মুরশিদাবাদের উপস্থিত অবস্থা সবিশেষ জ্ঞাত হইয়া রাজকর না দিবার হেতু জিজ্ঞাসা করেন। তাহাতে মহারাজ নবাব অধিকারের অপ্রতুলতা ও পূর্ব্ব পূর্ব্ব কএক যুদ্ধে অনেক অর্থ অপচয় হওন বিষয়ক বৃত্তান্ত নিবেদন করাতে, সামরিক ব্যয় মাত্র লইয়া সাহাজাদা ক্ষান্ত থাকিতে স্বীকৃত হন। তন্মতে সামরিক ব্যয় প্রদান করতঃ সন্ধি স্থাপন করা হয়। অনন্তর সাহাজাদা মহারাজকে স্বীয় পত্রে যোগ্য সুপাত্র জ্ঞান করিয়া একটি কলমদান আর একখানা তরবাল মহারাজ সমীক্ষে উপস্থিত করেন। মহারাজা ইঙ্গিতে সাহাজাদার অভিপ্রায় বুঝিতে পারিয়া কলমদানই গ্রহণ করেন। সাহজাদা তরবাল গ্রহণ না করার হেতু জিজ্ঞাসিলে মহারাজ উত্তরে এই নিবেদন করিয়াছিলেন যে, সেনাপতিত্বাপেক্ষায় মন্ত্রিত্বপদই শ্রেষ্ঠ গণ্য করি। বিশেষতঃ কলমের প্রসাদাৎ রাজ্যাধিপতির সদনে উপনীতের যোগ্য হইয়াছি; অতএব সাহসপূর্ব্বক কলমদান গ্রহণ করিয়াছি। কিন্তু আপন প্রভুর অনভিমতে ভূপতির মন্ত্রিত্ব স্বীকার করিতে পারি না। প্রার্থনা করি আমার এই অপরাধ পরিহারের আজ্ঞা হয়। ইহাতে সাহাজাদা অধিকতর পরিতোষ প্রাপ্ত পাইয়া মহারাজকে অভিনন্দনপত্র ও পাঞ্জা প্রদানে পুরস্কৃত করিয়াছিলেন। মহারাজও রাজপ্রসাদ প্রাপণে আপনাকে কৃতার্থ মানিয়া সহস্র স্বর্ণমুদ্রা সাহাজাদার সমীক্ষে অর্পণ করতঃ কৃতজ্ঞতা স্বীকার-পূর্ব্বক বিদায় গ্রহণ করিয়া স্বীয় শিবিরে আসিয়া দিবসদ্বয় বিশ্রামান্তর মিরণকে তথায় প্রোথিত করিয়া সসৈন্যে মুরশিদাবাদে উপনীত হন। কিন্তু সৈন্যগণ আপনাপন পূর্ব্ব বেতনের জন্য অনেক গোলযোগ উপস্থিত করিয়াছিল, তাহাতে জাফর আলি খাঁর জামাতা কাশিমালি খাঁ স্বীকার্য্যের

দ্বারা দুর্ব্বৃত্ত সেনাগণকে শান্ত ও বশীভূত করিয়াছিলেন। যদিচ জাফর আলি খাঁ পুত্রশোকী ও রোগী ছিলেন, তথাচ তাঁহার রাজত্বলাভের অভিলাষ ঘুচিয়াছিল না। এবং তাঁহার আশা রাজ্যলাভার্থ আরো বলবতী হইতে লাগিল কিন্তু ফলবতী হইতে পারিল না। যে হেতুক, ইংরাজগণ জাফর আলিকে পদচ্যুত করিয়া কাশিম আলি খাঁকেই মুরশিদাবাদের নবাবী প্রদানের স্থিরসংকল্প হইয়াছিলেন। যদিচ জাফর আলি খাঁ তাহাতে অসম্মত ছিলেন, কিন্তু ইংরাজগণ বিবেচনা করিলেন, এই দুষ্ট অধিকারীর অধিকারে রাজ্য থাকিলে অবশ্যম্ভাবী বিপদ ঘটনার সম্ভাবনা হইবে, অতএব তাঁহাকে ভয় অভয় উভয় দর্শাইয়া রাজ্যাধিকারিত্বের অভিলাষ ত্যাগ করিতে বলা হয়। ইহাতে জাফর আলি খাঁ বিবেচনা করিলেন, এইক্ষণ আমি রোগগ্রস্থ অপুত্রক অথচ বৃদ্ধ হইয়াছি; এ অবস্থায় ইংরাজদিগের মতে অসম্মত হইলে অপমানিত হইতে হইবে। এতাবতা তাঁহাদিগের মতে সম্মত হওয়াই কর্ত্তব্য বিবেচনায় রোগোপলক্ষে তিনি বেগমকে লইয়া কলিকাতায় গমন করেন। এতদগতিকে ১৭৬০ খ্রীঃ অব্দের শেষভাগে কাশিম আলি খাঁ নবাবী প্রাপ্ত হন। কিন্তু তিনিও দুই বৎসরের অধিককাল রাজত্ব করিতে পারিয়াছিলেন না। অচিরে জাফর আলির কুচক্রে তাঁহার সহিতও ইংরাজদিগের মনোবাদ ঘটিয়াছিল। তৎকারণে কাশিমালি খাঁকে দুরীকরণপূর্ব্বক পুনরায় জাফর আলি খাঁকে পদস্থকরণ কামনায় ইংরাজগণ সেনানী সমভিব্যাহারে জাফর আলি খাঁকে মুরশিদাবাদে পাঠাইয়া দেন। ইহাতে কাশিম আলি খাঁর সহিত যুদ্ধ হয়। সেই যুদ্ধে কাশিম আলি খাঁ পরাস্ত হইয়া মুঙ্গেরে গমন করেন, তথাকার দুর্গে পূর্ব্বে যে সমস্ত ব্যক্তিকে তিনি কারারুদ্ধ রাখিয়াছিলেন, তথা হইতে প্রস্থানকালে তাহাদিগকে বধ করিয়াছিলেন। ইহার সবিশেষ

পশ্চাদ্বিবরণ হইবেক। এইক্ষণে মহারাজা যে সমস্ত কীর্ত্তিকর ধর্ম্মকর্ম্ম করিয়াছিলেন, তদ্বর্ণনে প্রবৃত্ত হইলাম। যথাঃ—

একদা মহারাজ রাজস্থয় যজ্ঞ করিতে কল্পনা করেন। পণ্ডিতগণ নিষেধ করিলে তাহা হইতে ক্ষান্ত থাকিয়া তৎপরিবর্ত্তে ক্রমে কোটী শিবপূজা করাইয়াছিলেন। তাহাতে অনেক অর্থব্যয় হয়। তৎপর মহারাজ নবাব হইতে কিয়দ্দিবসের নিমিত্ত অবসর গ্রহণ করিয়া আত্মা অমাত্য সৈন্যসামন্তসহ গয়াক্ষেত্রে গমনপূর্ব্বক পরিপাটিরূপে শ্রাদ্ধাদি করাইয়াছিলেন, এবং সঙ্গীয় সমস্তের ব্যয়ও মহারাজাই দিয়া গয়া কর্ম্মাদি করাইয়াছিলেন। পূরণদান কালে গয়ালি পাণ্ডাগণ আপনাদিগের বসতিস্থান নিষ্কর প্রাপণের প্রার্থনা করে। তন্মতে মহারাজ পাণ্ডাদিগের বসতিভূমি নিষ্করদানে তাহাদিগের প্রার্থনা পূর্ণ করেন। তদ্ভিন্ন স্বর্ণ রৌপ্য মুদ্রা এবং হয় হস্তি প্রভৃতিও প্রদান করিয়াছিলেন। গয়াকর্ম্মের অবসানে মুঙ্গেরে আসিয়া তথাকার সীতাকুণ্ড তীর্থের যাজকদিগকেও তীর্থদক্ষিণায় ভূমি বৃত্তি প্রদান করিয়াছিলেন। অদ্যাপি সেই সমস্ত নিষ্করদান নিষ্কররূপেই আছে, কিন্তু কি ক্ষমতা ক্রমে যে মহারাজ এই সমস্ত নিষ্কর দান করিয়াছিলেন, তাহা কোন ইতিহাসে পাওয়া যায় না। অদ্যাপি তাহা নিষ্কররূপে থাকাতে বোধ হয়, তাহা নবাবের সম্মতিক্রমেই দেওয়া হইয়াছিল।

এস্থলে নবাব কাসিম আলি খাঁর অধিকারকালীয় ঘটনাবলী বিবৃত করা আবশ্যক হইল; যথাঃ—মহারাজের তীর্থগমন অবসরে কতিপয় সূচক ব্যক্তি সময় পাইয়া রাজা রামনারায়ণ, দেওয়ান কৃষ্ণদাস, উমেদ সিংহ, বুনিয়াদ সিংহ, ফতে সিংহ, বিশেষতঃ মহারাজ রাজবল্লভের নামে আরোপিত নানা কথার সৃষ্টি করেন। তাহাতে নবাব কাশিম আলি খাঁ কথিত ব্যক্তিদিগের প্রতিকূলে সংহারমূর্ত্তি ধারণ করেন। সূচকগণ আরও

কহিয়াছিলেন যে, এই রাজবল্লভ প্রভৃতিই সিরাজউদ্দৌলার নিধনের এবং নবাব সরকারের অপরসীম ধনাদি বিলুণ্ঠন করণের মূলীভূত। তদ্বৎ আপনাকেও বিনষ্ট করিবার নিমিত্ত বিবিধ ষড়যন্ত্র হইয়াছে। আমরা নবাব-সরকারের চিরানুগত; অতএব সুবিদিত করিলাম। এক্ষণে আত্মরক্ষার পক্ষে সমুচিত উপায় করিতে হয়, করুন। হতভাগ্য নবাব এই সমস্ত সূচকের কুহকে মুগ্ধ হইয়া মহারাজ রাজবল্লভ ও তৎপুত্র কৃষ্ণদাস ও রাজা রামনারায়ণ ও উমেদ সিংহ ও বুনিয়াদ সিংহ ও ফতে সিংহ প্রভৃতিকে হঠাৎ ধৃতপূর্ব্বক মুঙ্গেরের দুর্গে বদ্ধ করতঃ মহারাজের যথাসর্ব্বস্ব মুরশিদাবাদের রাজধানীতে আনিবার আজ্ঞা করেন। রাজ-পরিবারস্থগণ এতদ্ভাবী বিপদ ঘটনার বৃত্তান্ত পূর্ব্বাহ্নে জানিতে পারিয়া পলায়নপূর্ব্বক জাতি প্রাণ রক্ষা করিয়াছিলেন।

যদিচ কাসিম আলি খাঁ মহারাজের যথা সর্ব্বস্ব অপহরণ করিয়াছিলেন। কিন্তু কোনমতেই তদুপভোগী হইতে পারিয়াছিলেন না। অচিরেই ইংরাজদিগের কোপানলে পতন হইয়া রাজ্যচ্যুত হইতে হইয়াছিল। তদ্বিবরণ পূর্ব্বেই করা হইয়াছে। তৎকারণে কাশিম আলি খাঁ বিবেচনা করিলেন, এক্ষণে আমি সম্পূর্ণরূপেই পদচ্যুত হইলাম। এ অবস্থায় এস্থানে অবস্থান করাও চারু নহে। জাফর আলি খাঁর সৈন্য আসিয়া কখন কি উপদ্রব ঘটায় নিরূপণ নাই ইত্যাদি অগ্রপশ্চাৎ বিবেচনা করিয়া মুঙ্গের হইতে উদুয়ার দুর্গে গমন করা এবং কারারুদ্ধ ব্যক্তিগণকে বধ করাই শ্রেয়ঃ বিবেচনা করিয়া ১৭৬৩ খৃঃ অব্দের জুলাই মাসে রাজা রামনারায়ণ ও দেওয়ান কৃষ্ণদাস ও উমেদসিংহ ও বুনিয়াদ সিংহ ও ফতে সিংহ ও মহারাজ রাজবল্লভাদি প্রত্যেক জনকে বালুকা পূর্ণ থলিগণ বদ্ধ করিয়া সুরধনী নীরে নিমগ্ন করিয়াছিলেন। তদ্ভিন্ন আরও কয়েক রাজা এবং জগৎশেঠের পক্ষে দুই ব্যক্তিকেও মুঙ্গেরের দুর্গের উচ্চ চূড়া হইতে

গঙ্গানদীর গর্ভে নিপাত করিয়াছিলেন। দেওয়ান কৃষ্ণদাসকে গঙ্গাতে ডুবাইবার কালে মহারাজ রাজবল্লভ উৎকোচ দিয়া তাঁহার জীবন রক্ষার্থ অনেকানেক চেষ্টা পাইয়াছিলেন; কিন্তু দারুণ ঘাতুকগণ কোনমতেই কৃষ্ণদাসকে মোচন করিল না। অবশেষে মহারাজা ঘাতুকদিগের নিকট আগ্রহাতিশয়ে ইহাও প্রার্থনা করিয়াছিলেন যে, অগ্রে আমাকে জলমগ্ন করাও, পরে কৃষ্ণদাসকে ইচ্ছানুরূপ করিও। তাঁহার সেই শেষ চেষ্টাও নিষ্ফল হইয়াছিল; অর্থাৎ মহারাজের সমীক্ষেই প্রথমতঃ দেওয়ান কৃষ্ণদাসকে, পরে মহারাজকে নিমজ্জন করিয়াছিল। উভয়ই প্রাণপ্রয়াণ সময়ে পুনঃ পুনঃ পরমেশ্বরের নাম উচ্চারণ করিতে করিতে নীরমগ্ন হইয়া প্রাণত্যাগ করিয়াছিলেন। হাঃ পরমেশ্বর! হাঃ পরমেশ্বর! আহা! এরূপ নিরপরাধী, বিশেষতঃ পিতার অগ্রে পুত্রকে নিহত করিয়া অভীষ্ট সিদ্ধকারী পাষাণ-হৃদয় নির্দ্দয় নৃশংস ক্রূরাতিক্রূর মনুষ্যও কি সৃষ্ট হইয়া থাকে? কাশিম আলি খাঁর এই ঘৃণিত ব্যাপার যাঁহারা চাক্ষুষ প্রত্যক্ষ করিয়াছিলেন, তাঁহাদিগের অন্তঃকরণে কতই যে বক্ষ-ভেদকর দুঃখ ও খেদ উদয় হইয়াছিল তাহা আর বলিবার নয়। বোধ করি, যাঁহারা কাশিম আলি খাঁর এই কদর্য্যাচরণ শ্রবণ করিবেন তাঁহারাও শোকাভিভূত হইয়া অবশ্য নয়নধারায় ধরাদেবীকে আর্দ্রীভূত করিবেন, ইহাতে সন্দেহ নাই।

"গুরুদাস গুপ্ত" এই পর্য্যন্ত লিখিয়াও ক্ষান্ত পান নাই। রাজপরিবারের শোক-দুঃখের এবং জাফর আলি খাঁর অবশিষ্ট রাজত্বকালের বৃত্তান্তও লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। তদ্বিষয় বর্ণন মদীয় মুখ্য উদ্দেশ্য নহে; অতএব ক্ষান্ত করিলাম। সামান্যত গুণীগণের গুণকীর্ত্তন ও সজ্জনের সচ্চরিত্র-বর্ণন গ্রন্থের চরমাবস্থাতেই চিত্ত প্রফুল্লকর হইয়া থাকে। অতএব মহারাজ রাজবল্লভের স্বভাব চরিত্রের এবং তাঁহার দ্বারা সর্ব্বসাধারণের

উপকারজনক যে সমস্ত সৎকার্য্য হইয়াছিল, এই উপসংহার সময়েই তদ্বিবরণ করা হইতেছে ; যথাঃ—মহারাজের রাজত্বকালে প্রায় যবনগণই সার্ব্বভৌম ছিলেন; সুতরাং তৎকালে বঙ্গবিদ্যার সমালোচনাই ছিল না। ভূম্যধিকারী প্রভৃতি তাবতেই প্রায় আপন আপন আয় ব্যয় স্থিতি নিশ্চায়ক লিপিতেও পারস্য ভাষা ব্যবহার করিতেন। এক্ষণে ইংরাজী বিদ্যায় অবিদ্বান্ হইলে ইংরেজ রাজপ্রতিনিধিগণ সন্নিধানে যেরূপ প্রতিপন্ন হওয়া যায় না, তদ্রূপ যবন রাজার রাজত্বকালেও তাহার ব্যত্যয় ছিল না। ফলে এক্ষণে ভারতবর্ষের প্রায় সমুদয়াংশে ইংরাজাধিপতির আধিপত্য হওয়াতে ভারতবর্ষের যত ইংরাজজাতির বাস হয় নাই, যবন রাজগণ ভারতবর্ষের অল্পাংশাধিকারী হইয়াও স্বজাতীয় অধিকাংশগণের দ্বারা ভারতরাজ্যকে পরিপূর্ণ করিয়াছিলেন। সুতরাং ইহাতে পারস্য বিদ্যার সমধিক উন্নতি ও প্রচার হইবে ও তাহার সমাদর অধিক থাকিবে, সন্দেহ কি? এতাবতা প্রজাপুঞ্জই বা রাজভাষা শিক্ষায় উৎসাহী না থাকার হেতু কি ? অন্তঃকরণে মহারাজ রাজবল্লভের বঙ্গবিদ্যানুশীলনের পক্ষে বিশেষ যত্ন বা আয়াস ছিল না; কিন্তু সংস্কৃত বিদ্যার উন্নতিকল্পে সমধিক উৎসাহী ছিলেন। পূর্ব্বকালে হিন্দুশাস্ত্রাধ্যায়ী পণ্ডিতগণ অর্থ গ্রহণপূর্ব্বক কদাচ অধ্যায়ীগণকে অধ্যায়ন করাইতেন না। অদ্যাপি পণ্ডিতমণ্ডলীতে প্রায় তৎপ্রথা প্রচলিত আছে। অতএব মহারাজ বেতনদানে বিদ্যাভ্যাস করাইতে উৎসাহী হইতে পারিয়াছিলেন না। প্রকারান্তরে অর্থাৎ প্রতি টোলে প্রতিবর্ষে অর্থসমূহ প্রদান এবং পণ্ডিত ও ছাত্রগণকে সময় সময় আহ্বান করতঃ শাস্ত্রীয় বিচার করাইয়া যথাযুক্ত পুরস্কারে পুরস্কৃত করিতেন। তাহাতেই অনেকানেক বিদ্যার্থীদিগের বিদ্যাশিক্ষার উৎসাহ-সমৃদ্ধি বৃদ্ধি পাইয়াছিল। বিশেষ, বিক্রমপুরস্থ ব্রাহ্মণ মাত্রেই প্রায় শাস্ত্রাধ্যায়ী এবং এক একজন মহাপণ্ডিত ছিলেন। মহারাজের সন্নিহিতে

বিদ্বানের সম্মান ও সমাদর থাকাতে অবিদ্বান্‌গণ আপনাদিগকে নিতান্ত দুরদৃষ্টভাজন জ্ঞান করিত। যে হেতুক, রাজসভায় মূর্খের সমাদর মাত্র ছিল না। অধ্যাপক এবং ছাত্রগণকে যে আকারের দান ছিল, বোধ হয় ইদানীং মহারাজের তুল্য অকাতরে অধ্যাপক ও ছাত্রের আনুকূল্যকারী কেহই এতদ্দেশে জন্মধারণ করেন নাই। নিঃসন্দেহে বলা যাইতে পারে যে মহারাজের কৃত ক্রিয়াদির ন্যায় ইহকালে কোন মহৎ ব্যক্তি কোন ক্রিয়াকরণানুষ্ঠান করিলে তদ্বিধি বিধানযুক্ত পুস্তকাদি এবং পণ্ডিতমণ্ডলীর মধ্যে তদ্বিধানজ্ঞ ব্যক্তি লব্ধ হওয়া এবং সর্ব্বাঙ্গসুন্দর ব্যাপার নিষ্পাদন পাওয়া মহা সুকঠিন হইয়া পড়িবেক। কারণ ইহকালে তদ্বৎ ক্রিয়াদি করাই নাই।

ঢাকা, জঙ্গিয়া, মুরশিদাবাদ, রাজমহল, মুঙ্গের ও বারাণসী প্রভৃতি স্থানে মহারাজের যে কএকটি আবাস ছিল, তাহার প্রত্যেক স্থানে অতিথি সেবার পৃথক পৃথক স্থান ছিল। যখন যে কোন অভ্যাগত তথায় উপস্থিত হইতেন তখনি তাহাদিগকে যথাভিরুচি আহার দানে এবং শীতসমাগমে শীতনিবারক বসনাদি, গ্রীষ্মসমাগমে আতপতাপনিবারক ছত্রাদি প্রদান করা হইত। বস্তুতস্ত যাজকগণ কোন অংশে প্রত্যাশায় বঞ্চিত হইতেন না, ইহাতে যে কত কত ভিক্ষুক দীন দরিদ্র দুঃখীর দুঃখ মোচন হইত সীমাই নাই।

তদ্ভিন্ন ঢাকা নগর হইতে বিক্রমপুর গমনাগমনে মেঘনা নদী দিয়া যাতায়াত করা অতীব প্রাণসঙ্কট বিকট ভয়াবহ ব্যাপার ছিল। তদ্দৃষ্টে ঢাকায় গমনাগমন যোগ্য বহর হইত তালতলা পর্য্যন্ত দ্বিপ্রহরের পথ ব্যাপিয়া প্রশস্ত এক তরণীপথ প্রস্তুত করিয়াছিলেন। ইহাতে সাধারণের গমনাগমনের সময়ে অত্যন্ত ক্লেশ নিবারণ হইয়াছিল। বরং বাণিজ্য ব্যবসায়েরও বৃদ্ধি পাইয়াছিল। অদ্যাপি সেই কাটা খাল বিরাজিত।

(কিন্তু বর্ষাবসানে মাঘাদিতে তাহা শুষ্ক পাইলে কিয়ৎকালের নিমিত্ত যাতায়াতের ক্লেশ ঘটিয়া থাকে। এক্ষণে বিক্রমপুরে অনেকানেক ধনাভিমানী ব্যক্তি আছেন বটে, এবং মাতাপিতার শ্রাদ্ধাদিতেও কথঞ্চিৎ প্রঘটুও করিয়া থাকেন। কিন্তু রাজখনিত সেই খাল, যাহা স্বল্পব্যয়েই পরিশোধিত হইতে পারে অদ্যাপি তাহাদিগের দ্বারা তাহা পুনঃ শোধিত হইতে পারিল না। যদিচ বিক্রমপুরস্থ ফুরসালী নিবাসী বৈদ্য কুলোদ্ভব রামকানাই রায় নিজ হইতে দশ হাজার টাকা দিয়া অবশিষ্ট দশ হাজার টাকা গবর্ণমেণ্ট হইতে লইয়া তৎপরিশোধন করণেচ্ছা করিয়াছিলেন, কিন্তু দুঃখের বিষয় যে তাঁহার এই কল্পনা সিদ্ধ না হইতেই তেঁহ কালগ্রাসে পতিত হইলেন। তদ্ভিন্ন ঢাকা অঞ্চলের কোন কোন স্থানে বিশেষতঃ বিক্রমপুরের অনেক অনেক স্থানে যথায় লোকের গমনাগমনের প্রশস্ত পথ ছিল না, তথায় অনেক অনেক পথ নির্ম্মাণ করিয়া দিয়াছিলেন। আর জলের সৌষ্ঠভ নিমিত্ত পুষ্করিণী ও দীর্ঘিকা প্রদানেও ত্রুটি করিয়াছিলেন না।

কিংবদন্তী আছে যে এই মহাত্মাই অক্ষতযোনি বালিকা বিধবা-বিবাহের প্রথম অনুষ্ঠানকারী। তিনি রাঢ়, গৌড়, বঙ্গ, কাশী, কাঞ্চী, মহারাষ্ট্র, কান্যকুব্জ দ্রাবিঢ় আদি দেশের মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিতগণের স্বাক্ষরিত ব্যবস্থা গ্রহণ করিয়া স্বীয় তনয়া অভয়ানাম্নী বালিকার পুনর্ব্বিবাহ দেওয়ায় সমুদ্যত হইয়াছিলেন। কেবল দেশাচারের বাধ্য থাকাতেই মহারাজের সাধ্য হইয়াছিল না যে স্বীয়ৈকান্তিক বাসনা পূর্ণ করেন। আশ্চর্য্য যে ৯৫ পঞ্চনব্যই বর্ষের পরে পুনস্তৎপ্রস্তাব উত্থাপিত হইয়া কত শত তর্ক বিতর্কনার পর তদ্বিধি বিষয়ক রাজনীতি প্রচার দ্বারা তাহা সুসিদ্ধ লক্ষণ হইয়াছে। বোধ করি যদ্যপি মহারাজ কথিত ব্যবস্থানুসারে স্ব দুহিতার বিবাহ নির্ব্বাহ করিয়া উঠিতেন শ্রীযুক্ত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর মহাশয়ের এতৎ সম্বন্ধীয় বিতর্ক সিন্ধু মন্থনপূর্ব্বক বিধবোদ্বাহ-বিধি-বিধানরূপ

অমূল্য প্রমাণ প্রয়োগ প্রচলন করণে কখনও এত পরিশ্রম করিতে হইত না।

মহারাজা ১৭১৪ খৃষ্টাব্দে জন্মগ্রহণ করিয়া ১৭৩৪ খৃষ্টাব্দে ঢাকার নবাবের অধীনে কর্ম্মচারিত্বে নিযুক্ত হইয়া উত্তরোত্তর মহারাজাধিরাজ পদবী ধারণ এবং ধন জন-পুত্র-পৌত্রে আত্মীয় সুখভোগ করিয়া দুরন্ত যবন রাজার কোপে পতিত হইয়া ১৭৬৩ খৃষ্টাব্দে মৃতুমুখে পতিত হন। এই ৪৯ বৎসর পররায়ুর মধ্যে ২৯ বৎসরকাল তিনি চাকরী করিয়া আত্মবুদ্ধিকৌশলে অসংখ্য ধনমান যশঃকীর্ত্তি পূণ্য অর্জ্জন করতঃ এবং প্রভুসন্নিধানে প্রতিপন্ন হওত উত্তরোত্তর উন্নতি পাইয়া অতুলৈশ্বর্য্য লাভ এবং অনেক অনেক ধর্ম্মকর্ম্ম যাহা কদাচ এতদ্বতা ভূমিতে হইয়াছিল না তাহা করিয়া এতদ্বঙ্গ ভূমিকে পবিত্র প্রভাবতী করিয়াছিলেন। ইহা কি অসামান্য সৌভাগ্যবান্ ব্যক্তির কর্ম্ম নহে ?

অধুনা যদিচ রাজবল্লভ-তুল্য যাজ্ঞিক ও দানশীল ব্যক্তি অতি বিরল দৃষ্ট হয় বটে, তথাপি কখনই বলা যাইতে পারে না যে তাহা হইতে বিদ্বান্, বুদ্ধিমান্, বিষয়পটু কি কার্য্যদক্ষ, বদান্যশীল, ধার্ম্মিকব্যক্তি এতদ্দেশে জন্মে নাই। স্বীয় গুণ বীর্য্য দর্শাইবার উচিত সময় পাওয়া ভিন্ন মনুষ্য কদাচ কোন বিষয়ে বিখ্যাত হইতে পারে না। যেরূপ সমুদ্র-গর্ভস্থ মুক্তাবলী তরঙ্গলহরী বিনা তটস্থ হয় না, অপ্রকাশিত থাকে, মনুষ্যের পক্ষেও তদ্রূপ বটে। ফলে পূর্ব্বকার রাজনিয়ম এক্ষণকার রাজনীতি প্রণালী হইতে ভিন্ন থাকাবশতই ইদানীন্তন আমরা মহারাজ রাজবল্লভতুল্য রাজপ্রসাদলব্ধ ক্ষমতাশীল ব্যক্তি দেখিতে পাই না। যেরূপ রাজনিয়মানুসারে রাজা বীরবল, রাজা মানসিংহ, রাজা তোড়লমল্ল, যশোবন্ত রায়, রাজবল্লভ প্রভৃতি কৃতিপুরুষগণ যবনাধিকারকালীন স্বাধীন-রূপে রাজকীয় পদে উন্নত হন, এক্ষণকার রাজনীতি সম্পূর্ণরূপে তাহার

বিপরীত হওয়াতেই দেশীয় লোকেরা নিরুৎসাহ ও হীন ব্যবসাদ্বারা জীবিকার সংস্থান করিতে বাধ্য হইতেছেন। কিন্তু রাজপুরুষেরা আমাদিগের বিদ্যাবুদ্ধি ও জ্ঞানের পরিচয় পাইলে আমাদের উন্নতিকল্পে যে নেত্র নিক্ষেপ না করিবেন এরূপ হইতেই পারে না। অতএব অস্মদ্দেশীয়ের সর্ব্বতোভাবে কর্ত্তব্য যে যাহাতে রাজসদৃশী স্ব স্ব বিদ্যাবুদ্ধির পরিচয় দিবার ক্ষমবান হইতে পারেন তদ্রূপ আচরণ করেন। ইতি উপসংহার।